পবিত্র কুরআনের কল্যাণকর ফায়েদাসমূহ

(সূরা আল-ফাতিহা ও সূরা আল-বাকারার আলোকে)



فوائد القرآن الزكية

[سورة الفاتحة – سورة البقرة]

লেখক:

প্রফেসর ড. খালিদ বিন হামিদ আল হাযেমী

সাবেক প্রফেসর, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

النسخة البنغالية

ভূমিকা:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর, তার পরিবার ও সকল সাহাবীর ওপর। অতঃপর:

আমি আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি কুরআনকে স্পষ্ট আরবি ভাষায় তাঁর বান্দা ও রাসূল, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন। যিনি এটিকে উপদেশ, আরোগ্য, পথপ্রদর্শক, রহমত এবং মুমিনদের জন্য সুসংবাদরূপে ও কাফের অবিশ্বাসীদের জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যিনি এতে কোনো বক্রতা রাখেননি, এটিকে প্রতিটি বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে সুরক্ষিত করেছেন এবং এটিকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আলো, জ্ঞান, প্রমাণ ও বার্তাবাহক বানিয়েছেন।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার অন্যতম অনুগ্রহ হলো, তিনি তাঁর বান্দাকে হেদায়েত দেন এবং তাকে এমন উপকারী ও কল্যাণময় কাজের জন্য প্রস্তুত করেন, যা তার সময় ও জীবনের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং যার দ্বারা সে নিজে উপকৃত হয় এবং অন্যদেরও উপকার করে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহরই, যিনি কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন, কলমের মাধ্যমে জ্ঞান দিয়েছেন, মানুষকে বর্ণনার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং যা কিছু মানুষ জানে না তা শেখানোর ব্যবস্থা করেছেন। তিনি মানুষকে পাঠ ও লেখার জ্ঞান দিয়েছেন, কলমের ব্যবহার শিখিয়েছেন এবং যা দিয়ে লেখা হয় ও যার ওপর লেখা হয় তার ব্যবস্থাও করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “ الرَّحْمَٰنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ. خَلَقَ الْإِنسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ” অর্থ: [পরম করুণাময় (আল্লাহ), তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনি তাকে শিখিয়েছেন ভাষা।] (সূরা আর-রহমান: ১-৪)। তিনি আরো বলেছেন: “ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ.

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ” অর্থ: *[*পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে। তুমি পড়। আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।*]* *(*সূরা আলাক: ১-৫*)*। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্যই।

নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ তাআলার তাওফিক, অনুগ্রহ ও করুণার প্রতিফল যে, তিনি আমাকে এই মহান কাজে নিয়োজিত হওয়ার তাওফিক দিয়েছেন। এ কাজটি, যা আমি বিশ্বপ্রভুর বাণীর মর্যাদার প্রতি সম্মান দেখিয়ে এবং পবিত্র কুরআনের মহান অবস্থান উপলব্ধি করে সম্পন্ন করেছি। তবু আমি লক্ষ্য করেছি যে, কুরআনের রত্নভাণ্ডার থেকে কিছু শেখার ভালোবাসা ও উৎসাহ আমাকে এই পথে অগ্রসর করেছে। পাশাপাশি আমি আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রতিদানের প্রত্যাশা করেছিলাম এবং কুরআনের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও তার অসাধারণ ভাষাশৈলীতে এক ধরনের স্বাদ ও সান্ত্বনা অনুভব করেছি। আল্লাহর বাণীর গভীর অর্থ এবং এর অনিঃশেষ কল্যাণধারাও আমাকে অবিরাম উৎসাহিত করেছে, যা কোনো মানুষের উপলব্ধি দিয়ে শেষ করা সম্ভব নয়। আমি দোয়া ও ইস্তিখারার পথই বেছে নিলাম, যা আমার এই মহান ও মহৎ কাজে অংশ নেওয়ার আগ্রহ ও ভালোবাসা আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। এরপর আমি পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞানের অধিকারী আল্লাহর ওপর নির্ভর করলাম এবং তাঁর কাছে তাওফিক ও সঠিকতা প্রার্থনা করলাম। আমি আল্লাহর পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আয়াতের তাফসির নিয়ে তাফসীরের বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন শুরু করলাম, এগুলোর পৃষ্ঠাগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত আলেমদের জ্ঞান থেকে উপকৃত হলাম এবং তাদের ওপর আল্লাহর বরকত থেকে অংশীদারিত্ব অর্জন করলাম। পরে আমি এই ফলাফলগুলো একত্রিত করলাম, তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলাম এবং পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের অর্থ ও নির্দেশনাসহ সেগুলোকে এমনভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করলাম যাতে ধারাবাহিকতায় কোনো

বিচ্ছিন্নতা না থাকে। যাতে পাঠক অর্থ, ফায়েদাসমূহ ও দিকনির্দেশনার মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্নতা অনুভব না করেন। তাছাড়া আমি তাফসিরের গ্রন্থ থেকে শুধুমাত্র এমন বিষয় সংগ্রহ করেছি যা ফায়েদার অন্তর্ভুক্ত, তবে এমন কোনো বিধান বা হুকুম-আহকাম অন্তর্ভুক্ত করিনি যা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি আমি কারো কোন উক্তি উদ্ধৃত করি, তবে তা সেই বিশিষ্ট আলেমের প্রতি সম্বন্ধ করেছি। সুতরাং, এই বইয়ের উপকারিতাগুলো কেবল তাফসিরের গ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ বিষয়ের সংকলন বা স্থানান্তর নয়। যদিও এতে সেই মহৎ পরিশ্রমের কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, আমি তা লেখার সময় যথাযথ স্থানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি। তাই এটি এমন কিছু বিশ্লেষণ যা আল্লাহর অনুগ্রহে কুরআনের আয়াতের দিকনির্দেশনা ও প্রাসঙ্গিক বিষয় থেকে আমি নিজে উদ্ভাবন করেছি এবং তাফসিরের বিশেষজ্ঞ আলেমদের বক্তব্য থেকে যা বুঝেছি, তার আলোকে তৈরি করেছি। আল্লাহ তাদের সবার প্রতি রহমত ও বরকত নাযিল করুন এবং আমাদেরকে নবী, সত্যবাদী, শহীদ, আমাদের পিতা-মাতা, পরিবারবর্গ ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সাথে তাদের সংস্পর্শে মিলিত করুন।

আমি এই মহৎ ও মর্যাদাপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছি ১৪৩৭ হিজরির শাওয়াল মাসের ১৯ তারিখ মোতাবেক ২৪শে জুলাই ২০১৬ সালে।

আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমাকে তাঁর মহিমান্বিত কিতাব, যা “হিকমতপূর্ণ যিকির, সুস্পষ্ট ও মহিমান্বিত” বলে বর্ণিত, সেই কিতাবের সেবায় নিয়োজিতদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি যেন আমাকে এমন কাজের তাওফিক দান করেন যা তিনি ভালোবাসেন ও যা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে। যেন এই কাজটি কল্যাণময় হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত একটি চলমান সদকা হিসেবে থাকে। তিনি যেন আমাকে এটি তাঁর পছন্দনীয় পদ্ধতিতে পূর্ণ করার তাওফিক দেন, আমাকে সঠিক দিকনির্দেশনা ও স্পষ্ট প্রজ্ঞা দান করেন। তিনি যেন এটি আমার পক্ষ থেকে কবুল করেন, এর দ্বারা

আমাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং এটিকে একটি কল্যাণকর ও গ্রহণযোগ্য কাজ বানিয়ে দেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরম দয়ালু ও হান দাতা।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তার পরিবার ও সকল সাহাবির ওপর শান্তি ও বরকত নাযিল হোক।

লেখক:

প্রফেসর ড. খালিদ বিন হামিদ বিন মুবারক আল হাযেমী

সূরা আল-ফাতিহার ফায়েদসমূহ

সূরা আল-ফাতিহার ফায়েদসমূহ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧﴾

অর্থ: ***[পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।* সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব।* যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু।* বিচার দিনের মালিক।* আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য চাই।* আমাদেরকে সরল পথের হিদায়াত দিন;* তাদের পথ, যাদেরকে আপনি নিয়ামত দিয়েছেন, তাদের পথ নয় যাদের উপর ক্রোধ আপতিত হয়েছে এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।]***

সূরা ফাতিহার সূচনা হয়েছে "বিসমিল্লাহ" দিয়ে, যা এর একটি আয়াত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ তথা: **পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।**", এটি আল্লাহর কিতাবের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ সূরার শুরুতে রয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহর নামে শুরু করার গুরুত্ব এবং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিসমিল্লাহ দ্বারা সূচনা করার শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানো হয়েছে। এর কারণ হলো এতে আল্লাহর তিনটি নাম "আল্লাহ", "আর-রহমান" এবং "আর-রহিম" অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর অসীম রহমত প্রকাশ পায়, যা সমস্ত কিছুকে পরিবেষ্টিত করেছে। যখন একজন মুসলিম তার কোনো কাজ বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করেন, তখন তিনি আল্লাহর সেই নামগুলোর মাধ্যমে শুরু করেন, যেগুলোর মাধ্যমে দোয়া করতে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনটি সূরা আল-আ'রাফে এসেছে: ***[আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসমূহ, সুতরাং তাঁকে তা দ্বারা ডাকো।]*** এতে বান্দা সেই নামগুলো দ্বারা আল্লাহকে

আহ্বান করে, যা দিয়ে আল্লাহ তাঁর পবিত্র কিতাবের সূচনা করেছেন। কাজেই পাঠকারী যখন এটা পাঠ করে, তখন এর অর্থ দাঁড়ায়: "আমি পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।" এইভাবে, এই মহান ও বরকতময় সূরাটি আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্বলিত 'তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত'র স্বীকৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বিসমিল্লাহর পরে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এসেছে: (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ তথা সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব।) এখানে "আলহামদু লিল্লাহ" বলা হয়েছে, যা তাঁর প্রতি পূর্ণ প্রশংসা ও সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বুঝায় যার তিনি হকদার ও যোগ্য। মূলত সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা শুধুমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। আল্লাহর কিতাবের সূচনা এই বাক্য দিয়ে করা হয়েছে: (আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন)। যাতে এর মাধ্যমে একজন মুসলিম উপলব্ধি করে যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত, এবং তিনিই পূর্ণাঙ্গ ও মধুর প্রশংসার উপযুক্ত। এটি বান্দাকে এ কথাও শেখায় যে, তাকে আল্লাহকে সেইভাবে প্রশংসা করতে হবে, যেমনটি আল্লাহ নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর পবিত্র কোরআনে বান্দাদের তা শিখিয়েছেন। আয়াতটিতে অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়ও বান্দাদেরকে স্পষ্ট করে দেয় যে, আল্লাহ তাআলা সবকিছুর প্রতিপালক এবং সৃষ্টি ও পরিচালনার মালিকানা তাঁরই। তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন, যেমন ইচ্ছা তেমন পরিচালনা করেন এবং যখন ইচ্ছা করেন তখন তা সম্পাদন করেন।

(رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ তথা সৃষ্টিকুলের রব) বাক্যটি ইঙ্গিত করে যে, তিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। মানবজগৎ, ফেরেশতাদের জগৎ, জিনদের জগৎ, প্রাণীজগৎ এবং উদ্ভিদজগত—সবকিছুরই রব তিনি। তিনিই আসমান ও জমিনের রব, এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো স্রষ্টা নেই। বস্তুত এর দ্বারা সূরা ফাতিহা 'তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ'কে প্রতিষ্ঠা করেছে।

এতে মুসলিমের জন্য এই বিষয়টি জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সে আল্লাহ তাআলার মালিকানার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। যে কোনো বস্তু যা মানুষের কাছে রয়েছে, তা আল্লাহরই দেওয়া এবং তাঁর ইচ্ছার অধীন। এমনকি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা কোন কিছুর মালিক, তারা যা কিছু তাদের হাতে রয়েছে তা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার বাইরে কিছু করতে পারে না। কোনো কিছু বিক্রি, ক্রয়, স্থানান্তর, কোনো লক্ষ্য অর্জন বা কোনো আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারে না, যদি না আল্লাহ তাআলা তা ইচ্ছা করেন। অতএব, বান্দা নিজ ইচ্ছায় যা করে, তা আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে সূরা আল-কাহফে নির্দেশ দিয়েছেন: ***[আর তুমি বলো না, 'আমি আগামীকাল এটা করব', তবে আল্লাহ চাইলে।]*** এই উপলব্ধি মুসলিমকে দোয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহর অনুগত বান্দা বানাতে সহায়তা করে, যাতে সে আল্লাহকে ডাকতে পারে, যিনি তার ও তার অধিনস্ত সবকিছুর মালিক, এবং তাকে সাহায্য করতে ও তার অধীনে থাকা সবকিছুর ব্যাপারে ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা করতে পারেন।

এটি দোয়া এবং সাহায্যের জন্য সত্যিকার মালিক (রাব্বুল আলামীন)-এর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার সাথে সম্পর্কিত। এর মাধ্যমে আল্লাহর একক উপাস্যত্ব সম্পর্কিত 'তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ' প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই শুধুমাত্র সেই সত্তা থেকে দয়া, ক্ষমা, অথবা সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত, যিনি তাদের মালিক, সৃষ্টিকারী ও পরিচালনাকারী।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলার দুটি গুণবাচক নাম বর্ণিত হয়েছে: "আর-রহমান আর-রহিম"। এই নামগুলো আল্লাহর অসীম ও মহান রহমতের ধারণা দেয়, যা মুসলিমদের মধ্যে আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি জাগায়। আল্লাহ নিজেই তাঁর এই মহান ও সম্মানজনক নামগুলির মাধ্যমে নিজেকে নামকরণ করেছেন। বরং এটি বান্দাকে আল্লাহর রহমতের প্রতি আশা রাখতে উদ্বুদ্ধ করে, কারণ "আর-রহিম" নামটি আল্লাহর দয়ার গুণ প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে মুসলিমের আশা আরও শক্তিশালী হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম রহমত দিয়ে তাঁকে কৃপা করবেন।

ইমাম কুরতুবী রহঃ বলেন: "যখন আল্লাহর "রাব্বিল আলামীন" গুণে কিছু ভীতি ভয় প্রকাশ পায়, তখন তা "আর-রহমান আর-রহিম"-এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, যাতে তাঁর গুণাবলীতে ভয় ও আশা একত্রিত হয়। এটি বান্দাকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল হতে এবং নিরাপত্তা অনুভব করতে সাহায্য করে।"[১] যেমনটি সূরা আল-হিজরে বলা হয়েছে: ***[তুমি আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও, নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল এবং দয়ালু। আর আমার শাস্তি হলো অত্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি।]*** এই আয়াতটি ইসলামী শিক্ষায়, দাওয়াত এবং নেতৃত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিকে প্রতিফলিত করে, যেখানে শাসন ও শক্তি প্রয়োগের সাথে সাথে অন্যদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এটি শিক্ষা দেয় যে, শক্তি প্রয়োগের পাশাপাশি সহানুভূতি ও দয়া দেখানো উচিত, যাতে গ্রহণযোগ্যতা এবং কার্যকরী ফলাফল পাওয়া যায়। এটাই হচ্ছে প্রেরণা ও ভয় এর মধ্যে সমন্বয় সাধন, যা মানসিক শান্তি এবং সঠিক প্রতিক্রিয়া ও সম্পর্কের ভারসাম্য সৃষ্টি করে।

অতঃপর এই মহান সূরাতে আল্লাহ তাআলার কিয়ামত দিবসের উপর মালিকানা বর্ণিত হয়েছে: *(مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ তথা বিচার দিনের মালিক।)* এটি আল্লাহর মহিমা ফুটে উঠে, যেহেতু তিনি কিয়ামতের দিবসের একমাত্র মালিক। এই আয়াতটি মানুষকে কিয়ামতের দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে কেউ কারো জন্য কিছুই করতে পারবে না। যেমনটি আল্লাহ তাআলা সূরা আল-ইনফিতারে বলেছেন: ***[সেদিন কেউ কারো জন্য কিছু করতে পারবে না এবং সেদিন সমস্ত ব্যাপার আল্লাহর হাতে থাকবে।]*** এটি মুসলিমকে কিয়ামত দিবসকে স্মরণ করার গুরুত্ব তুলে ধরে। সে প্রতিদিন তার সালাতে এই আয়াতটি বহুবার পাঠ করে, যাতে কিয়ামতের দিনের স্মরণ তার মনে

---

(১) দেখুন: আল-জামে লি আহকামিল কুরআন: *(১/৯৮)*।

থাকে। এর মাধ্যমে তার চিন্তা ও আচরণ পরিশুদ্ধ হয়, যা তাকে প্রতিটি ভাল কাজের দিকে পরিচালিত করে এবং সকল গোনাহ থেকে বিরত রাখে।

এরপর কুরআনিক প্রসঙ্গ কেবলমাত্র আল্লাহর একক ইবাদতের দিকে আহ্বান জানিয়েছে, যার কোন শরীক নেই: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ তথা আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি)। এতে স্পষ্ট করা হয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই। কাজেই বান্দা তার রবের কাছে স্বীকার করে যে, সে শুধুমাত্র আল্লাহরই এবাদত করে। এর ফলে সে শিখে নেয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য কোনো ধরনের ইবাদত করা যাবে না। (إِيَّاكَ نَعْبُدُ তথা আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি) এই বাক্যটি দিয়ে বান্দা কেবল আল্লাহর প্রতি দাসত্বকে গ্রহণ করে এবং তার ইবাদত ও আনুগত্যের সমস্ত শর্তগুলি মেনে চলে। বরং সে এ কথাও স্বীকার করে যে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্য চাইবে না, যখন বিষয়টি আল্লাহর অধিকার সম্পর্কিত হবে: (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এবং আপনারই কাছে সাহায্য চাই।) যদিও সাহায্য প্রার্থনা ইবাদতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তবে একে আলাদা করে উল্লেখ করা হয় তার মহান স্থান এবং দোয়া, আশা, ভয়, ভালোবাসার সাথে সম্পর্ক স্পষ্ট করার জন্য, যা ইবাদতের কেন্দ্রবিন্দু। কেননা আশা হলো সাহায্য চাওয়া তার কাছ থেকে যার প্রতি আশা করা হয়, ভয় হলো সাহায্য চাওয়া তার কাছ থেকে যার শাস্তির ভয় করা হয়, এবং সাহায্য চাওয়া হলো দোয়া, যেখানে সাহায্য প্রার্থনা করা হয় সেই সত্তার কাছে যে তাকে তার পছন্দসই কিছু অর্জনে বা অপছন্দনীয় কিছু থেকে বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে। সাহায্য চাওয়া হলো সেই সত্তার কাছে আশ্রয় নেওয়া, যার উপর ভরসা রাখা হয়। কাজেই সাহায্য প্রার্থনা হলো সেই সত্তার ওপর নির্ভরশীলতা, যার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। তাই এই নির্ভরশীলতা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার ওপরই হওয়া উচিত। এটি এই মহান সূরার মর্ম এবং তার মধ্যে আমাদের প্রভু ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার মহিমার জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বকে প্রমাণ করে।

আরেকটি ফায়েদা হলো যে, এই মহান আয়াতটি তাওহীদ-উলুহিয়্যাহ (ইবাদতে আল্লাহর একত্ব) নিয়ে আলোচনা করেছে, যেখানে ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত। কারণ তিনিই একমাত্র উপাস্য, এবং তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্যিকারের উপাস্য নেই।

এরপর পরবর্তী আয়াতে কুরআনিক প্রসঙ্গ হেদায়াত প্রত্যাশা এবং আল্লাহর নিকট সঠিক পথের সন্ধান চাওয়ার দিকে চলে যায়: (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ /**আমাদেরকে সরল পথের হিদায়াত দিন।**)। এটি হলো বান্দার পক্ষ থেকে তাঁর প্রভু ও স্রষ্টা আল্লাহর কাছে একটি মহান নিবেদন, যাতে আল্লাহ তাঁকে সঠিক পথের হেদায়াত দেন, অর্থাৎ তাঁকে কল্যাণ, সত্য ও প্রজ্ঞার দিকে পরিচালিত করেন এবং তাঁকে সেই পথের ওপর সাহায্য ও স্থিরতা প্রদান করেন। এটি নির্দেশ করে যে, বান্দা আল্লাহ তাআলার কাছে হেদায়াতের জন্য পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল, তাই তাকে আল্লাহর কাছে সঠিক পথের হেদায়াত লাভ ও তাতে স্থিতিশীল থাকার জন্য বারবার প্রার্থনা করতে হবে। কারণ পথ অনেক ও বিভিন্ন, এবং প্রতিটি পথ মানুষকে তার দিকে নিয়ে যেতে চায়। তবে কেবল একটি পথই সঠিক, আর তা হলো সঠিক পথ সিরাতে মুস্তাকীম তথা সরল পথ। এ পথটিই আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছানোর একমাত্র পথ, যা তিনি পছন্দ করেন এবং যার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। এটি সেই পথ যা বান্দাকে আল্লাহর জান্নাতে পৌঁছাতে সাহায্য করে। এর দাবী হলো ইসলামকে অবলম্বন করা আবশ্যক, যা আল্লাহর দ্বীন, এবং যা আল্লাহ তাআলা তাঁর ভাষায় বর্ণনা করেছেন (صراط الذين أنعمت عليهم / তাদের পথ, যাদেরকে আপনি নিয়ামত দিয়েছেন,) অর্থাৎ তাদের পথ, যাদের ওপর আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন, যেমন নবীগণ, শহীদগণ, সত্যবাদীগণ ও সৎলোকেরা। এটি ছাড়া অন্য কোনো সঠিক পথ নেই; মহান আল্লাহ অন্যান্য সব পথ অস্বীকার করেছেন এবং যারা অভিসপ্ত হয়েছে বা যারা পথভ্রষ্ট, তাদের পথকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন (غير المغضوب عليهم/ তাদের পথ নয় যাদের উপর ক্রোধ

আপতিত হয়েছে), যারা সত্য জানার পর তা ত্যাগ করেছে, এরা হচ্ছে ইহুদী জাতি। অনুরূপভাবে, (ولا الضالين/ এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।) যারা অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার কারণে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তারা হল খ্রিস্টান এবং তাদের মতো অন্যান্য সম্প্রদায়।

এই মহান সূরার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হলো, এটি রুকয়াহ বা ঝাড়ফুঁক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে রোগী সুস্থ হতে পারে। যেমন একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, **জনৈক সাহাবি সূরা ফাতিহা দিয়ে একজন ব্যক্তি যে সফরে ছিলো, তাকে ঝাড়ফুঁক করে দিয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থ করে দেন ও আরোগ্য দান করেন। ফিরে আসার পর, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালে, তিনি বলেছেন, (সে কীভাবে জানল যে এটি রুকয়াহ?)** সহীহ বুখারী। আবু সাঈদ বিন মুআল্লা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন: **(মসজিদ থেকে তোমার বের হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তোমাকে কুরআনের মধ্যে মহত্তম সূরাটি শিখিয়ে দেব না কি? অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন। তারপর আমরা যখন বের হওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন আমি বললাম, হে আল্লার রসূল! আপনি বলেছিলেন আমি তোমাকে কুরআনের মহত্তম সূরাটি শিখিয়ে দেব। তিনি বললেন, সেটি হলো: "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন।" এটাই হল সেই সপ্তপদী (সূরা) যা নামাযে পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয়, আর সেটাই হল মহা কুরআন; যা আমাকে দান করা হয়েছে।)** সহীহ বুখারী।

এই বরকতময় সূরার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হলো, যা এই হাদীসে কুদসীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে: **(মহামহিম আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি নামাযকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি। এর অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক আমার বান্দার। আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করে তাই তাকে দেয়া হয়। ... বান্দা যখন বলে, (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ/সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর), তখন**

মহামহিম আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে, আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে তাই তাকে দেয়া হবে। সে বলে, (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ /তিনি দয়াময় পরম দয়ালু), তখন আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে তা পাবে। সে বলে, (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ /প্রতিফল দিবসের মালিক), তখন আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছে। এটা হলো আমার জন্য, আর এ আয়াতটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি। বান্দা বলে: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ /আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই)। অর্থাৎ এটা আমার ও আমার বান্দার জন্য, আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে তা পাবে। সূরার শেষাংশও আমার বান্দার জন্য। বান্দা বলে: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ /আমাদেরকে সরল পথের হিদায়াত দাও;* তাদের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দিয়েছো, তাদের পথ নয় যাদের উপর ক্রোধ আপতিত হয়েছে এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।)। এটা আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে, তাই সে পাবে।) সুনানে ইবনে মাজাহ।

সূরা আল-বাকারার ফায়েদাসমূহ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿الٓمٓ ۝١ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ۝٢ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ۝٣ وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ وَبِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ۝٤ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ۝٥﴾

অর্থ: **[আলিফ-লাম-মীম।* এটা সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।* যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে আমি যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।* আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে। আর আখিরাতের প্রতি তারা ইয়াকীন রাখে।* তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।]** (আয়াত নং: ১-৫)

কুরআনের দ্বিতীয় সূরাটি এমন তিনটি বিচ্ছিন্ন অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে, যার অর্থ অনুধাবনে মানুষ অক্ষম। যাতে সে তিনটি অক্ষরের সামনে দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে যায়, যা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। সে এমন এক ভাষাগত শৈলী দেখে থমকে যাবে, যা সে আগে কখনও শোনেনি, এবং তার মনে কখনও এমন শব্দ গঠনের ধারণাও আসেনি। এটি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করে, যাতে তারা পরবর্তী অংশে কী রয়েছে তা জানার জন্য আরও বেশি উৎসাহিত হয়। বস্তুত আল্লাহ তাআলাই এর অর্থ ও মর্ম জানেন। এটা মহাগ্রন্থে আল্লাহর এক গোপন রহস্য, এর প্রতি আমরা বিশ্বাস করি এবং যেমন এসেছে তেমনই পাঠ করি। এগুলো এমন যা ব্যাখ্যাযোগ্য নয়।

এর একটি উপকারিতা হল: এটি তাদের জন্য একটি পরীক্ষাস্বরপ যারা এর প্রতি ঈমান আনে এবং যেমন এসেছে তেমনই মেনে নেয়। আর এর উপকারিতা নিয়ে

আলোচনা করার বিষয়ে অনেক বিশিষ্ট আলেম বলেছেন: "বরং আমাদের এই বিষয়ে আলোচনা করা উচিত এবং এর অন্তর্নিহিত উপকারিতা অনুসন্ধান করা উচিত।"(২)

এর একটি উপকারিতা হলো মনোযোগ আকর্ষণ করা। কাতরাব বলেন, আরবরা কুরআন শোনার সময় সরে যেত, তবে যখন তারা 'الم' এবং 'المص' শব্দ দুটি শুনেছিল, তখন তারা এই শব্দগুলি অবাঞ্ছিত এবং অস্বাভাবিক মনে করেছিল। কিন্তু যখন তারা হজরত মুহাম্মদ সাঃ-এর কণ্ঠে কুরআন শুনতে শুরু করল, তখন তিনি তাদের কাছে সুসংগঠিত কুরআন উপস্থাপন করেন, যাতে তা তাদের মনে স্থায়ীভাবে প্রতিস্থাপিত হয় এবং তাদের উপর হুজ্জত কায়েম হয়।(৩)

যখন এই বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলো নাজিল হলো, তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। কারণ তাদেরকে এমন কিছু দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে যার অর্থ তারা বুঝে না। মূলত এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল যেন তারা কুরআন শুনতে আগ্রহী হয়। কারণ মানুষ এমন কিছু জানার প্রতি আকর্ষিত হয় যার অর্থ তারা জানে না। অতঃপর যখন তারা কুরআন শুনতে আসল, তখন তাদেরকে এমন ভাষায় সম্বোধন করা হলো যা তারা বুঝতে পারে, ফলে এটি বার্তা পৌঁছানোর একটি মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল। তবে এর অবশ্যই এমন অর্থ থাকতে হবে যা অন্যরা জানে, অথবা যা শ্রোতাদের কাছে পরিচিত। এই কথাটি সমস্ত অক্ষরের জন্য প্রযোজ্য। এটি শিক্ষায় আগ্রহ উদ্দীপনার গুরুত্ব এবং শিক্ষার জন্য এবং শ্রোতার কাছে যা শিখানো বা জানানো হচ্ছে, তার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের গুরুত্ব নির্দেশ করে। এটি শ্রোতাকে তার শোনা তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করাতে সহায়ক, এবং সেই তথ্যের মধ্যে যে জ্ঞান, বোঝাপড়া, পরামর্শ বা অন্য কিছু থাকতে পারে, তা জানাতে সাহায্য করে।

---

(২) দেখুন: আল-জামে লি আহকামিল কুরআন: *(১/১০৯)*

(৩) আল-জামে লি আহকামিল কুরআন: *(১/১০৯)*

তারপর সুরা আল-বাকারা সূচনায় বিদ্যমান আরেকটি ফায়েদা হলো যে, শুরুতেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন থেকে সন্দেহ ও সংশয়ের অপসারণ করা হয়েছে *(**এটা সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই,**)*, এরপর এই নাকচ করার পর, কুরআনের মধ্যে যে সার্বজনীন দিকটি রয়েছে তা প্রমাণ করা হয়েছে *(**এটা মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত**)*। সন্দেহ ও সংশয় নাকচ করার পর হেদায়েতের প্রমাণ মানুষের মনকে এটি শোনার জন্য আকৃষ্ট করে, এবং যখন কেউ এটি শোনে, সে অবশ্যই এটি গ্রহণ করবে। কারণ এতে রয়েছে সত্য বিষয়, উন্নত নৈতিকতা ও কল্যাণ। এছাড়া এর শব্দমালা ও বাক্যগঠনের সৌন্দর্য এবং ব্যাখ্যার অলৌকিকতা রয়েছে। তবে, কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া যার হৃদয়ে অহংকার রয়েছে, তার জন্য হেদায়েত ও তাওফীক নেই।

শায়খ আব্দুর রহমান ইবন সাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "যখন সন্দেহ নাকচ করা হয়, তখন এর বিপরীত, অর্থাৎ পূর্ণ বিশ্বাস, তার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কিতাবটি এমন এক জ্ঞান ধারণ করে যা সন্দেহ ও বিভ্রান্তি দূর করে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি যে, নাকচ করার মাধ্যমে প্রশংসা করা হয়।"[৪]

এর আরেকটি ফায়েদা হলো যে, এটি যাদের শিক্ষা, নির্দেশনা ও পরিচালনা করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে সন্দেহ, বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতা দূর করার গুরুত্ব বোঝায়। যাতে তাদের মন ও হৃদয় সঠিকতা ও কল্যাণ গ্রহণে প্রস্তুত থাকে। পাশাপাশি, এটি স্পষ্ট করে যে, দায়ী, শিক্ষক, উপদেশদাতা, নির্দেশক ও পথপ্রদর্শক তাদের কাজের ব্যাপারে অধিক জ্ঞানের অধিকারী। সুরাটি এমন কিছু দিয়ে শুরু হয়েছে, যা তারা বুঝতে অক্ষম *(الٓمٓ)*, যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, এই কিতাবটি মানুষের সৃষ্টি নয়, এবং যিনি এটি নিয়ে এসেছেন, অর্থাৎ আমাদের নবী মুহাম্মদ *(সা.)* এর পক্ষ থেকেও নয়; বরং এটি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এসেছে, যিনি গায়েব ও দৃশ্যমান সবকিছু জানেন।

---

(৪) দেখুন: তাইসীরুল কারীমির রহমান ফি তাফসীরি কালামিল মান্নান: *(১/৩১)*।

এই আয়াতে রয়েছে মহান উপদেশ এবং অতীব সূক্ষ্মতা ও অলৌকিকতা, যেখানে মস্তিষ্ক অবাক হয়ে দাঁড়ায়। এতে বিভিন্নভাবে থামানোর (وقف) মধ্যে নানা ধরনের নির্দেশনা আছে, এবং প্রতিটি সংযুক্তি (وصل) একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে। যেমন: (ذلك الكتاب) ও (ذلك الكتاب لا ريب), (لا ريب فيه هدى للمتقين) ও (فيه هدى للمتقين), (ذلك الكتاب لا ريب فيه) ও (هدى للمتقين)। প্রতিটি থামানোই (وقف) নির্দিষ্ট অর্থ ও ব্যাখ্যা দেয়, যা তাফসির গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে জানা যায়। এটি কুরআন কারীমের ভাষাগত অলৌকিকতার একটি উদাহরণ, যেখানে কেবল থামানোর (وقف) এবং শুরু করার (ابتداء) পরিবর্তন করেই একে অপরের সাথে সম্পর্কিত অর্থ উদ্ভূত হয়, যাতে অর্থ ও উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশিত হয়। সুতরাং, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন ও তা নাজিল করেছেন, এবং এর মাধ্যমে তিনি মানব ও জিন জাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

এর আরেকটি ফায়েদা হলো যে, কুরআন হেদায়েতকে কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা দিক, বা একাধিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা সীমাবদ্ধ করেনি; বরং এটি সকল ধরনের দুনিয়াবী ও পরকালীন মঙ্গলের সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করে।

আর আল্লাহর বাণী: (هدى للمتقين) এখানে হেদায়েতকে মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কারণ যারা এটি গ্রহণ করবে, তারা এর মাধ্যমে হেদায়েত পাবে এবং মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই, যারা এটি গ্রহণ করে এবং এর মধ্যে যে শিক্ষাগুলি রয়েছে তা মেনে চলবে, তারাই তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। অতঃপর যারা এর হেদায়েত কামনা করে, এটা তাদেরকে হেদায়েত করবে। এভাবেই এটি হবে মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত, যারা এটি গ্রহণ করে এবং এর পথ অনুসরণ করে।

এছাড়া আরেকটি ফায়েদা হলো: সংক্ষিপ্ততার পর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান। প্রথমে মুত্তাকীদের উল্লেখ করা হয়েছে যারা আল্লাহ তাআলার কিতাব থেকে উপকৃত হবে, এবং পরে তাকওয়ার মূল উপাদানগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন: গায়েবের প্রতি বিশ্বাস,

সালাত প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর দেওয়া রিজিক থেকে দান, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.) ও পূর্ববর্তী নবীদের উপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস, এবং পরকাল (الآخرة) সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস। মহান আল্লাহ বলেন: **[যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে আমি যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।* আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে। আর আখিরাতের প্রতি তারা ইয়াকীন রাখে।]**

সংক্ষেপের পর বিশদ ব্যাখ্যার রয়েছে মহান উপকারিতা, কারণ সংক্ষেপিত যে বিষয়টি সংক্ষেপে উপস্থাপিত হয়, তা জানার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং শ্রোতা বিষয়টি একসাথে উপলব্ধি করতে পারে, যা দ্রুত ও সহজে বুঝতে সহায়ক। তারপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আসে, যা সংক্ষেপিত বিষয়ের মধ্যে দেওয়া তথ্যকে বিস্তারিত প্রকাশ করে। এটি শিক্ষা ও পাঠদানের পদ্ধতিতে অত্যন্ত উপকারী, যেখানে প্রথমে সারাংশ দেওয়া হয়, তারপর বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। কারণ এর ফলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া, এটি বক্তৃতা ও দাওয়াতের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে এটি শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সহায়ক।

গায়েবের প্রতি বিশ্বাসকে অন্য বিষয়গুলোর আগে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ গায়েবের প্রতি বিশ্বাসের ফলে ঈমানের বাকি অংশগুলোর উপর গভীর প্রভাব পড়ে এবং অন্যান্য রূকনগুলোর উপর আমল করার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গায়েবের প্রতি বিশ্বাসে এমন এক ধরনের জ্ঞানের স্বীকৃতি রয়েছে যা দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি থেকে অদৃশ্য। এটি এমন এক নেয়ামত, যা যাকে প্রদান করা হয়, সে সর্বোচ্চ নেয়ামতের অধিকারী হয়। আর অন্যসব নেয়ামত এর অনুগামী।

আরেকটি ফায়েদা হলো: আল্লাহ তাআলা রিযিককে নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন, যেমন তিনি বলেছেন: **(এবং তাদেরকে আমি যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে**

ব্যয় করে)। তিনি বলেননি, 'এবং যা তারা উপার্জন করেছে, তা থেকে তারা ব্যয় করে', যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে রিযিক আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ, এবং এর জন্য পরিশ্রম করা শুধুমাত্র মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। কত মানুষ রিযিক অর্জনের চেষ্টা করেও খুব সামান্য পেয়েছে, আর কত মানুষ চেষ্টা করে অনেক কল্যাণ লাভ করেছে, যা তার চেষ্টা থেকেও বেশি। এটি আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় আল্লাহ তাআলার এই আয়াতে, যা তিনি সূরা আয-যারিয়াতে বলেছেন: **(আর আসমানে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং যা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।)**

প্রখ্যাত আলেম ইবনে সাদী রহ. বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা আখিরাতের ওপর ঈমানের কথা সাধারণভাবে উল্লেখ করার পর বিশেষভাবে তা উল্লেখ করেছেন, কারণ এটি সবচেয়ে বড় উৎসাহ ও ভয় সৃষ্টি করে, এবং আমল করার প্রেরণা দেয়। বস্তুত যে ব্যক্তি আখিরাতের দিন সম্পর্কে পূর্ণবিশ্বাসী, সে এজন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।"

এই আয়াতগুলোতে বান্দার প্রত্যাশিত বিষয়ের প্রতি বিশাল পুরস্কারের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়েছে। আর তা হলো সফলতা **(এবং তারাই সফলকাম)**। এটি হলো সেই অর্জন যা ব্যক্তির পছন্দ ও প্রত্যাশা। পাশাপাশি এটি সেসব ভয় ও শঙ্কা থেকে মুক্তি যা সে অনুভব করে।

এরপর, আল্লাহ তাআলা সফলতা ও মুক্তির পথ বর্ণনা করার পর, কাফিরদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ٦ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ وَعَلَىٰ سَمۡعِهِمۡۖ وَعَلَىٰٓ أَبۡصَٰرِهِمۡ غِشَٰوَةٞۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ ٨ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٩ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ١٠﴾

অর্থ: *[***নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন তারা ঈমান আনবে না।* আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।* আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান এনেছি, অথচ তারা মুমিন নয়।* আল্লাহ ও মুমিনদেরকে তারা ধোঁকা দিচ্ছে। বস্তুতঃ তারা নিজেদেরকেই নিজেরা প্রতারিত করছে, অথচ তারা তা বুঝে না।* তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী।*]* (আয়াত নং: ৬-১০)

আল্লাহ তাআলা যেভাবে ঈমানদার, মুত্তাকী ও ইবাদতগোজার বান্দাদের গুণাবলী এবং তাদের সফলতার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন, তেমনি তিনি কাফিরদের অবস্থা তুলে ধরেছেন— যারা ঈমান গ্রহণে অস্বীকৃতি ও অহংকার দেখিয়েছে। তাদের অহংকার ও অস্বীকৃতির স্তর এমন ছিল যে, তারা ঈমানের প্রতি শুধু অস্বীকারই করেনি, বরং তাদের কাছে উপদেশ বা সতর্কীকরণও আর কোনো উপকারে আসেনি। আল্লাহ বলেছেন: ***[নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন তারা ঈমান আনবে না।]***

এর একটি ফায়েদা হলো: কিছু মানুষ এমন আছে যারা সত্য গ্রহণ করে না, যদিও তা তার জন্য সূর্যের মতো স্পষ্ট। তাই একজন দাঈ এমন লোকদের নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করবেন না, যারা অহংকার ও সত্যের প্রতি তাদের বিরোধিতার কারণে স্পষ্ট সত্য দেখতে পেলেও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। কারণ আল্লাহ তাদের হৃদয়, কান ও চোখ সীলমোহর করে দিয়েছেন; তাদের গর্ব ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে। তারা হলো কাফিররা, যারা অস্বীকারকারী ও বিরোধী। এটি অহংকার ও সত্য গ্রহণে অনীহার ভয়াবহতা সম্পর্কে একটি প্রমাণ। আর এটি সেই কারণ, যা আল্লাহ

তাআলার রহমত ও দানকে বান্দার কাছে পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করে। বরং, শিক্ষা অর্জনের উৎসগুলো থেকে তাদের উপকৃত হওয়ার পথে অন্তরায় তৈরি করে রেখেছেন। উক্ত উৎসগুলো হলো, যেমন: হৃদয়; যার মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারে, শ্রবণশক্তি; যার মাধ্যমে সে শ্রবণযোগ্য বিষয়গুলি শোনে, এবং দৃষ্টিশক্তি; যার মাধ্যমে সে দৃশ্যমান বস্তুগুলো দেখতে পারে। ***[আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে।]***

কখনো কখনো অহংকার মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও বাধা হতে পারে। যেমন এ কারণে ইসলাম, ঈমান ও হক গ্রহণ না করা, যাতে কোন সন্দেহ নেই। আবার কখনো ছোট বিষয়েও হতে পারে। কাজেই যে ব্যক্তি সত্যের উৎস থেকে সত্যকে গ্রহণ করতে অবজ্ঞা করবে, আল্লাহ তাকে তা থেকে অন্তরালে রাখবেন।

যেহেতু মুমিনগণ সফলকাম, কাজেই কাফেররাই ক্ষতিগ্রস্ত এবং তারাই শাস্তিপ্রাপ্ত। যেমন আল্লাহ বলেছেন: ***[তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।]*** বস্তুত এটা হবে মুমিনদের জন্য সওয়াব, আর কাফেরদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ।

তারপর আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের কথা বর্ণনা করেছেন, এরা যা গোপণ রাখে তার বিপরীত প্রকাশ করে: ***[আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান এনেছি, অথচ তারা মুমিন নয়।]*** এরা তাদের এ নেফাকী আচরণ দ্বারা ধোঁকা ও হুমকি দিতে চায়: ***[আল্লাহ ও মুমিনদেরকে তারা ধোঁকা দিচ্ছে। বস্তুতঃ তারা নিজেদেরকেই নিজেরা প্রতারিত করছে, অথচ তারা তা বুঝে না।]*** অথচ কারো পক্ষেই আল্লাহকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয়। কেননা কোন কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন নয়। এখানে আল্লাহকে ধোঁকা দেয়া মানে তাঁর দ্বীনের সাথে তাদের প্রতারণা করা; ভেতরে ভেতরে কুফরী লালন করে এর বিপরীত জাহির করার মাধ্যমে। তেমনিভাবে রাসূল সাঃ-এর সাথেও প্রতারণা করা; কুফরী গুপ্ত রেখে দ্বীনদারিতা জাহির করার মাধ্যমে।

মূলত মুনাফিক ব্যক্তি প্রতারক; সে মনে করে অন্যকে সে ধোঁকা দিচ্ছে, অথচ সে নিজেকেই প্রতারিত করছে: ***[বস্তুতঃ তারা নিজেদেরকেই নিজেরা প্রতারিত করছে]*** ইমাম কুরতুবী রহঃ বলেছেন: (অর্থাৎ প্রতারণার ফল তাদের উপরই নেমে আসবে। কেননা প্রতারণা তো তার সাথে করা যায় যে গোপন বিষয়টি জানে না। কিন্তু যে সব গোপন খবর জানেন, তার সাথে প্রতারণা করতে গেলে নিজেকেই প্রতারিত হতে হবে। এ থেকে এটাও বুঝা যায় যে, মুনাফিকরা আল্লাহকে যথাযথভাবে চিনতে পারেনি। কেননা তারা যদি তাকে চিনতো তাহলে এটা জানতো যে, তাকে ধোঁকা দেয়া যায় না।) কেননা আল্লাহ তাদেরকে ও তাদের সমস্ত গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত। বান্দা যা তার হৃদয়ে গোপন রাখে এবং ভবিষ্যত জীবনের পরিকল্পনা ও কর্ম যা সে গোপন রাখবে তাও তিনি জানেন। তবুও তারা মনে করে না যে, তারা নিজেদেরই প্রতারিত করছে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ***[বস্তুতঃ তারা নিজেদেরকেই নিজেরা প্রতারিত করছে]*** এটি সবচেয়ে জঘন্য পথ, এবং সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হলো, যখন একজন ব্যক্তি মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, অথচ সে জানে না যে, মানুষ তার নীচু কাজ, বিশ্বাস এবং আচরণ সম্পর্কে জানে। সে মনে করে যে, সে মুনাফিকির মাধ্যমে নিজেকে আড়াল করেছে, যাতে মানুষ তার প্রকৃত অবস্থান জানতে না পারে, অথচ সে আসলে আচরণ ও নীতিহীনভাবে উন্মুক্ত, এবং আল্লাহ তাআলা একসময় তার প্রকৃত চেহারা মানুষের সামনে প্রকাশ করবেন, অথবা আল্লাহ তাআলা তার সত্যতা দ্রুত প্রকাশ করবেন। যেমনটি আল্লাহ তাআলা সূরা ফাতির-এর এ আয়াতে বলেছেন: ***[কু-চক্রান্ত তাকেই ঘিরে ধরবে যে তা করবে।]***

মানুষদের মধ্যে তাদের আচরণের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা অস্বীকারকারী, দাম্ভিক: ***[আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন তারা ঈমান আনবে না।]***, এবং কিছু লোক আছে যারা প্রতারণা করে: ***[আল্লাহ ও মুমিনদেরকে তারা ধোঁকা দিচ্ছে।]***, এই দুটি শ্রেণীর লোক মানুষের মধ্যে সম্পর্কের

ক্ষেত্রে ঈমান ও ইসলাম, বা আরও কম পর্যায়ে থাকতে পারে। কিছু রয়েছে বিরোধী, আর কিছু এমন লোক যারা অন্যদের সামনে সম্মতি ও সমর্থন দেখায়, কিন্তু তাদের অন্তরে বিপরীত কিছু থাকে। উভয়ই খারাপ চরিত্র ও সবচেয়ে নীচু নৈতিকতার অধিকারী।

যারা অহঙ্কারী এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, দুনিয়াতে ও আখিরাতে রয়েছে তাদের জন্য আল্লাহর শাস্তি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ***[আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।]***

এই আয়াতগুলির একটি ফায়েদা হল যে, তা অন্তরের অসুস্থতার বিষয়টি উন্মোচন করেছে: ***[তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী।]***, তাদের রাসূলদের মিথ্যারোপ করা, এবং নবী মুহাম্মদ *(সা.)*-এর উপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি অস্বীকৃতি, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও তাতে সন্দেহ উত্থাপন করা, ইত্যাদি তাদের হৃদয়ের রোগকে আরও বৃদ্ধি করেছে, ফলে আল্লাহ তাদের শাস্তি হিসেবে তাদের হৃদয়ে আরও রোগ বাড়িয়ে দিয়েছেন। এতে বোঝা যায় যে, এমন পথ থেকে বিরত থাকা উচিত যা মানুষকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে বা সন্দেহে ফেলে দেয়। তাই একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর নবী মুহাম্মদ *(সা.)*-এর উপর নাযিলকৃত কিতাব, অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন একজন ব্যক্তি তার শরীরকে রোগের কারণ থেকে দূরে রাখে এবং তা থেকে সুরক্ষিত রাখে, তেমনি তাকে তার দ্বীনকেও সকল সন্দেহ ও সংশয় থেকে দূরে রাখতে হবে, যা তার অন্তরকে অসুস্থ করে তুলতে পারে। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, যেমন সূরা আস-সফফে তিনি বলেন: ***[যখন তারা পথভ্রষ্ট হলো, আল্লাহ তাদের অন্তরকে আরও ভ্রষ্ট করে দিলেন।]'*** আর যখন একজন ব্যক্তি সঠিক পথ অনুসরণ করে, আল্লাহ তাকে

আরো হিদায়েত দেন। যেমন সূরা মরিয়মে বলা হয়েছে: ***[এবং যারা সঠিক পথে চলতে থাকে, আল্লাহ তাদের হিদায়েত আরও বৃদ্ধি করেন।]***

এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় দিক হলো, ধর্মে ছলচাতুরি থেকে দূরে থাকা, যাতে আল্লাহ তাআলা যা নিষেধ করেছেন তা অনুমোদনযোগ্য মনে না হয়, অথবা আল্লাহ তাআলা যে কিছু আদেশ করেছেন তা না পালন করা যায়। কারণ, এটি মুনাফিকদের অভ্যাস। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ***[তিনি জানেন চোখের খেয়ানত এবং অন্তরের গোপনীয়তা।]'*** আকাশ ও পৃথিবীতে কিছুই তাঁর কাছে অজানা নয়।

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ ١١ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ ١٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ ١٣﴾

অর্থ: ***[আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তারা বলে, আমরা তো কেবল সংশোধনকারী।* সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, তা কিন্তু তারা তা বুঝে না।* আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা ঈমান আন যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে', তারা বলে, 'আমরা কি ঈমান আনব যেমন নির্বোধরা ঈমান এনেছে'? জেনে রাখ, নিশ্চয় তারাই নির্বোধ; কিন্তু তারা জানে না।]*** (আয়াত নং: ১১-১৩)।

তারপর আল্লাহ মুনাফিকদের অবস্থাকে তাদের কথোপকথন ও পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও সঠিকতার বিষয়ে তাদের উপলব্ধির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন: ***[আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তারা বলে, আমরা তো কেবল সংশোধনকারী।]*** ফলে তারা তাদের মুনাফিকী ও অসত্য কাজগুলোকে সংস্কার মনে করে, যা তাদের নিজেদের কল্পনা ও মিথ্যা বক্তব্যের ফলস্বরূপ। আল্লাহ তাআলা তাদের ভুল ধারণার প্রতি উপরে সাত আকাশ থেকে উত্তর দেন: ***[সাবধান! এরাই***

ফাসাদ সৃষ্টিকারী, তা কিন্তু তারা তা বুঝে না।], তারা নিজেদের অশান্তি ও ক্ষতি দেখতে পায় না, কারণ তাদের ওপর কুফরী, অহংকার ও বিদ্বেষের প্রভাব রয়েছে, তাই তারা মনে করে যে, তাদের কাজটাই সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত।

এই আয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা হলো যে, অহংকারী ব্যক্তি কখনও তার আলোচনা বা বিতর্কের বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে না; সে শুধু মনে মনে ভাবে, কিভাবে প্রতিপক্ষকে উত্তর দেয়া যায়। তাদের মুনাফিকী কাজের জন্য, যেমন কুফর, পাপ এবং মুমিনদের গোপন তথ্য শত্রুর কাছে প্রকাশ করা, এ কারণে যখন তাদের বলা হয়, **" তোমরা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না,"** তখন তারা বলে, **" আমরা তো কেবল সংশোধনকারী।"** অর্থাৎ, তারা তাদের অসত্য কাজগুলোকে সঠিক এবং ভালো কাজ হিসেবে উপস্থাপন করে।

এর আরেকটি উপকারিতা হলো যে, মুনাফিক ও অহংকারী ব্যক্তি তার খারাপ কাজ স্বীকার করে না, বরং তা এমনভাবে যুক্তি দেয় যা সে মনে করে অন্যরা বিশ্বাস করবে। কিন্তু সে বুঝতে পারে না যে, অন্যরা তার দূর্নীতি ও অশান্তি উপলব্ধি করছে। সে নিজের মিথ্যার সাথে আত্মবিশ্বাসী থাকে, এবং ভাবে যে, অন্যরা তার মুনাফিকী ধরতে পারবে না, কিন্তু তার দূর্নীতি এবং অপকর্ম সৎ মানুষের কাছে পরিষ্কার ও স্পষ্ট।

এর আরেকটি উপকারিতা হলো, যে ব্যক্তি সৎ কাজ ও সংস্কারকে ভালবাসে তার একটি গুণ হলো চুপ করে মনোযোগ দিয়ে শোনা, চিন্তা ও গভীর পর্যালোচনা করা। যাতে সে সঠিক, সর্বোত্তম ও সত্য বিষয়টি চিনে সে অনুযায়ী কাজ করতে পারে। সুতরাং, মুমিন ব্যক্তি সৎ কাজের ব্যাপারে অহংকার প্রদর্শন করে না, বরং তা মেনে চলে। কারণ সে জানে যে, ফাসাদ বা বিশৃংখলা সৎ কাজের বিপরীত, এবং এই বিশৃংখলা ইমান, ইবাদত, আচার-আচরণ, বা সামাজিক, পেশাদারি, ও পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যে কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে।

এছাড়াও পৃথিবী ধ্বংস করা শুধু তার মাটি, পানি এবং পরিবেশ নষ্ট করাতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা পাপাচার ও অবাধ্যতার মাধ্যমেও হয়, যা মহান আল্লাহর ক্রোধ ও গযবের কারণ হয়। যখন পৃথিবী পাপাচারের মাধ্যমে বিশৃঙ্খল হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের ফাসাদের কারণে পাকড়াও করেন। যেমনটি আল্লাহ সূরা আরাফে বলেন: ***[আর যদি গ্রামবাসীরা ঈমান আনতো ও তাকওয়া অবলম্বন করতো, তবে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতের দরজা খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যাচার করেছে, ফলে আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করেছি।]***

তেমনি, অহঙ্কারী ও মুনাফিক ব্যক্তি অন্যের সৎ কাজ ও সঠিক চিন্তাধারাকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা বলে আখ্যায়িত করে: ***[আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা ঈমান আন যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে', তারা বলে, 'আমরা কি ঈমান আনব যেমন নির্বোধরা ঈমান এনেছে'?]***, তারা সৎকর্মশীল ও সংস্কারক মুমিনদেরকে নির্বোধ বলে অভিহিত করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে নির্বোধ সে ব্যক্তি, যার চিন্তা-ভাবনা হালকা এবং যে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে অক্ষম। বরং, তাদের অহংকার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তারা এই কথা প্রশ্নাত্মক ও বিদ্রূপের সুরে বলে থাকে: ***[আমরা কি ঈমান আনব যেমন নির্বোধরা ঈমান এনেছে'?]***, এতে তাদের নিকট দৃষ্টিভঙ্গি ও মানদণ্ড উল্টে যায়, ফলে তাদের হৃদয় ও বিবেকে এটি গেঁথে গিয়েছে যে তারাই সৎ এবং মুমিনগণ নির্বোধ ও দুষ্কৃতিকারী! এ থেকে বুঝা যে, যার হৃদয় ও মস্তিষ্ক অন্ধ হয়ে গেছে, সে তার অসততা ও বিশৃঙ্খলাকে সংস্কার ও অগ্রগতি বলে মনে করে, ভ্রান্ত যুক্তির মাধ্যমে। এটি এ বিষয়েও ইঙ্গিত দেয় যে, আলোচনায় ধৈর্যশীলতা ও উপলব্ধি থাকা অত্যন্ত জরুরি, যেন অন্যের কথার সারমর্ম বোঝা যায় এবং মুনাফিক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যক্তিদের আচরণ থেকে দূরে থাকা যায়।

অহঙ্কারী ও জেদী ব্যক্তি অন্যের সঠিক চিন্তা ও কাজকে নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা ও ধ্বংসাত্মক বলে অভিহিত করে। অথচ সে নিজেই তার নফসের অসততা এবং চিন্তার

দীনতা অনুভব করে না। আল্লাহ বলেন: ***[জেনে রাখ, নিশ্চয় তারাই নির্বোধ; কিন্তু তারা জানে না।]***

আল্লাহ তাদের জবাব দিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বোধ। আল্লাহ বলেন: ***[জেনে রাখ, নিশ্চয় তারাই নির্বোধ; কিন্তু তারা জানে না।]***, এখানে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে তারা নিজেদের প্রতারণা এবং ধ্বংসের প্রকৃতি বুঝতে অক্ষম। যেমন আল্লাহ বলেন: ***[সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, তা কিন্তু তারা তা বুঝে না।]*** এটি কুরআনের ভাষাগত দক্ষতার এক নিদর্শন, যা একটি গভীর ও বাস্তব রূপে বর্ণনা ও বর্ণিত বিষয়টির সঠিক সম্পর্ক প্রতিস্থাপন করে। এতে "উপলব্ধি না করা" এবং "অজ্ঞতা" এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য চিত্রিত হয়। কারণ মূর্খতা হলো বুদ্ধির দুর্বলতা, যা পরিকল্পনা ও পরিচালনায় অক্ষমতা প্রকাশ করে। সুতরাং, তাদের কর্মকাণ্ডটি সেই ব্যক্তি বা আচরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যার "পরিপক্কতা" নেই, যা ঈমান গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। কারণ তার মূর্খতা তাকে তা থেকে বিরত রাখে। এর মানে এই নয় যে, তারা বোঝার ক্ষমতা হারিয়েছে যা দায়িত্ব ও হিসেবের জন্য প্রয়োজনীয়, যেমন আল্লাহ তাআলা সুরা মুলকে বলেছেন: (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ) অর্থাৎ, "তারা বলল, যদি আমরা শোনতাম বা বুঝতাম, তবে আমরা জাহান্নামীদের মধ্যে থাকতাম না।" তাদের বুদ্ধি হারানো মানে হচ্ছে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা হারানো, কিন্তু জ্ঞানগত দায়িত্বের জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধি ঠিকই রয়েছে। আর "উপলব্ধি" হলো সেই জ্ঞান যা বোঝার বিভিন্ন স্তরের সাথে সম্পর্কিত, যা অনুভূতি বা সংবেদনকে নির্দেশ করে। তারা তাদের প্রতারণা ও দুর্নীতির ফলাফল অনুভব বা বুঝতে পারে না। কাজেই তারা অনুভব করতে পারে না যে, তারা সেই ব্যক্তিকে প্রতারণা করছে যে তাদের মুনাফিকি প্রতারণা জানে। তারা অনুভব করতে পারে না যে, তারা সমাজে ক্ষতি করছে; তারা প্রতারণা ও বিশৃঙ্খলা চালিয়ে যায়। তাদের প্রতারণা এবং বিশৃঙ্খলা প্রকাশ্য, কিন্তু

তারা তাও অনুভব করে না। এটি মানুষের সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থাগুলির একটি। তাই আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

যখন মুনাফিক ও অহংকারী ব্যক্তিরা যখন মুমিনদের নির্বোধ বলে উল্লেখ করে, তখন এতে কোনো আশ্চর্যের বিষয় নেই যে সত্য, সৎকাজ এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের সব যুগে এমন অপবাদ দেওয়া হয়েছে। এগুলো হয়েছে মিথ্যাবাদী, হিংসুক এবং বিদ্বেষপরায়ণদের পক্ষ থেকে। তাই একজন মুমিনকে প্রস্তুত থাকতে হবে যে, দ্বীনের শত্রুদের পক্ষ থেকে তার পছন্দনীয় কথা শোনা যাবে না। তাকে এসবের মোকাবিলা করতে হবে প্রজ্ঞা এবং ধৈর্যের মাধ্যমে। মুমিনদেরকে অবশ্যই তাদের মনে স্থির করতে হবে যে, মিথ্যার আওয়াজ যখন ন্যায় ও পুণ্যকে আক্রমণ করে, তখন তা জ্ঞানের আলো ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। কারণ এটি মানুষের মধ্যে থাকা সৃষ্টিগত ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে নেফাকী ও কুফরের কারণে ধ্বংস করতে পারেন, কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের মাধ্যমে তিনি সৃষ্টির মাঝে তাঁর বিধান পরিচালনা করেন।

﴿وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ ١٤ ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ ١٥﴾

অর্থ: ***[আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী'।* আল্লাহ তাদের প্রতি উপহাস করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরার অবকাশ দেন।]*** *(*আয়াত নং ১৫*)*।

কুরআনের এই প্রসঙ্গটি মুনাফিকদের অবস্থার চিত্র তুলে ধরে। যখন তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তারা মুমিন হওয়ার ভান করে। কিন্তু যখন তারা তাদের

নেতাদের সাথে থাকে, তারা ভিন্ন কিছু বলে: *[**যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী'।]* তারা যখন তাদের শয়তানদের কাছে ফিরে যায় এবং একান্তে তাদের সাথে থাকে, তখন তারা মুমিনদের থেকে মুক্ত থাকার ঘোষণা দেয় এবং তাদের শয়তানদের প্রতি তাদের আনুগত্য নিশ্চিত করে। এই শয়তানরা তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হতে পারে অথবা শয়তান জিন জাতি কিংবা গণক-জাদুকর। তবে "শয়তান" শব্দটি, যা ঈমান ও সৎ কাজ থেকে দূরে থাকার অর্থ বহন করে, এখানে সব ধরনের নেতিবাচক চরিত্রকে বোঝায়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।[৫] এটি কুরআনের ভাষাগত নিখুঁত শৈলীর একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত, যেখানে একটি শব্দ একাধিক উদ্দেশ্যপূর্ণ অর্থ ধারণ করে। যেমন, *"(شياطينهم)"* "তাদের শয়তানদের" শব্দটি এমন সব ব্যক্তিদের বোঝায় যারা শয়তানের কাজের প্রতিনিধিত্ব করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ কতই না পবিত্র, যিনি তাঁর কিতাবের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টি কে অবাক ও বিমূঢ় করেছেন।

কুরআনের আরেকটি সূক্ষ্ম ভাষাগত বৈশিষ্ট্য হলো, এটা মুমিনদের সাথে তাদের একত্রিত হওয়াকে "সাক্ষাত" এবং শয়তানদের সাথে মিলিত হওয়াকে "একান্তে মিলিত হওয়া" হিসেবে বর্ণনা করেছে। এটি প্রমাণ করে যে, মুমিনদের বিষয়টি স্পষ্ট এবং তাদের কোনো চক্রান্ত বা গোপন পরিকল্পনা নেই, তাদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ প্রকাশ্যে হয়। তবে, তাদের শয়তানদের সাথে সাক্ষাৎ গোপনে হয়, যাতে অন্য কোনো মুমিন তাদের দেখতে না পারে। এটি স্পষ্টভাবে মুনাফিকির একটি চিত্র, যা কুরআনের ভাষাগত সূক্ষ্মতা ও ব্যাখ্যায় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

---

(৫) দেখুন: আল-জামে লি আহকামিল কুরআন: *(১/১৪৫)*

এই পবিত্র আয়াতসমূহ থেকে বোঝা যায়, মুনাফিকদের আচরণের মূলনীতি হলো, তারা বাহ্যিকভাবে মুমিনদের সাথে একমত হওয়ার ভান করে, কিন্তু অন্তরে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং গোপনে মুমিনদের শত্রুদের সাথে মিলিত হয়। এটি নির্দেশ করে যে, মুনাফিক স্বভাবের মানুষের থেকে সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত। কারণ তারা যতই বাহ্যিকভাবে মুমিনদের সঙ্গে একমত হোক না কেন, তাদের এই আচরণ আসলে প্রতারণারই অংশ। যে আল্লাহকে প্রতারিত করার চেষ্টা করে, তার জন্য অন্যদের প্রতারিত করা আরও সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার।

এই আচরণ শয়তানি পথ। কেননা আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন*: [**যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি।**]*, এতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের শয়তানি স্বভাব অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, মানুষ তার অভ্যাস ও আচরণের ভিত্তিতে বর্ণনা পায়। আল্লাহ তাদেরকে শয়তানদের অনুগামী বলেছেন, কারণ তাদের পথ শয়তানি পথ। কুরআনের এই ব্যাখ্যা মুনাফিকদের প্রকৃত চেহারা উন্মোচন করে, যাতে মুমিনরা তাদের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পায় এবং সতর্ক হতে পারে। একই সঙ্গে, এটি মুমিনদের জন্যও শিক্ষা দেয়, যেন তারা এই শয়তানি আচরণ থেকে দূরে থাকে। যেমন হাদিসে দু-মুখী ব্যক্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। নবী সাঃ বলেছেন*: (**তোমরা সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তিদের মধ্যে তাদের পাবে, যারা দু-মুখী; এক দলের কাছে একটি চেহারা নিয়ে যায় এবং অন্য দলের কাছে অন্য চেহারা নিয়ে যায়।**)* সহীহ বুখারী। এমন ব্যক্তি প্রত্যেক দলের কাছেই আনাগোনা করে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে।

আরেকটি ফায়েদা হলো যে, ফাসাদ ও পথভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সর্বদা নিজেদের জন্য যুক্তি ও ব্যাখ্যা খোঁজে, যাতে তারা তাদের পাপ ও বিভ্রান্তি অন্যদের কাছে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য বলে উপস্থাপন করতে পারে। যখন মুনাফিকরা তাদের শয়তানদের সঙ্গে একাকী থাকে, তখন তারা নিজেদের অবস্থানকে এভাবে ব্যাখ্যা করে*:*

"আমরা তো শুধু মজা করছি," অর্থাৎ, তারা মুমিনদের সঙ্গে যেভাবে আচরণ করছে তা শুধুমাত্র উপহাস ও তামাশা করার উদ্দেশ্যে। তারা আসলে শয়তানদের সাথে সম্পর্ক রেখে তাদের সাহায্য, সমর্থন এবং দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে। তবে আল্লাহ তাআলা তাদের অবস্থান জানেন, কিন্তু দ্রুত তাদের শাস্তি দেন না, কারণ আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু ও ধীরস্থির। তিনি তাদের পাপাচারিতায় অবকাশ দেন, যাতে তারা আরো বিপথে চলে যায়, এরপর তিনি তাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবেন। আল্লাহ বলেন: ***[আল্লাহ তাদের প্রতি উপহাস করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরার অবকাশ দেন।]*** এর মানে হলো, আল্লাহ তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবেন, তাদের শাস্তি দেবেন, তাদেরকে হাস্যকর করে তুলবেন এবং তিনি তাদের উপহাসের কারণে তাদের শাস্তি দিবেন। এখানে তিনি শাস্তিকে গোণাহের নামে নামকরণ করেছেন। জমহুর আলেমগণ এমনই বলেছেন।

এটি মুসলিমকে সতর্ক থাকার শিক্ষা দেয়, এবং আল্লাহ কর্তৃক যালিমদেরকে অবকাশ দেয়ায় তারা যেন বিভ্রান্ত না হয় অথবা আল্লাহ তাআলার কাছে দ্রুত তাদের শাস্তি দাবি করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে। যেমন আল্লাহ সুরা আলে ইমরানে বলেন: ***[কাফিরদের দেশে প্রত্যাগমণ তোমাকে যেন প্রতারিত না করে। এটা এক ক্ষণস্থায়ী উপভোগ, তারপর তাদের গন্তব্য হবে জাহান্নাম, তা খুবই খারাপ আবাসস্থল।]*** একইভাবে পাপের বিষয়ে আল্লাহ তাআলার শাস্তি থেকে সতর্ক থাকতে হবে, এবং আল্লাহ তাআলা যখন পাপে সময় দেন, তখন তা দেখে পাপীকে অনুসরণ করা উচিত নয়, বা আল্লাহ তাআলার শাস্তি দ্রুত না হওয়ার কারণে আত্মবিশ্বাসী হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীল, কিন্তু তাঁর শাস্তি অত্যন্ত শক্তিশালী ও নির্ভুল হবে। সুতরাং, মুমিন কখনোই যালিম বা পাপীর শাস্তির দেরি দেখে প্রভাবিত হবে না, বা আল্লাহ তাআলা তাদের অবহেলা করছেন এমন ধারণা নেবে না।

﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ ١٦ مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسۡتَوۡقَدَ نَارٗا فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَٰتٖ لَّا يُبۡصِرُونَ ١٧ صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ ١٨ أَوۡ كَصَيِّبٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٞ وَرَعۡدٞ وَبَرۡقٞ يَجۡعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِۚ وَٱللَّهُ مُحِيطُۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَ ١٩ يَكَادُ ٱلۡبَرۡقُ يَخۡطَفُ أَبۡصَٰرَهُمۡۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوۡاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظۡلَمَ عَلَيۡهِمۡ قَامُواْۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمۡعِهِمۡ وَأَبۡصَٰرِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٢٠﴾

অর্থ*: [***এরাই তারা, যারা হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা কিনেছে। কাজেই তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, আর তারা হেদায়াতপ্রাপ্তও নয়।* তাদের উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো; তারপর যখন আগুন তার চারদিক আলোকিত করল, আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, যাতে তারা কিছুই দেখতে পায় না।* তারা বধির, বোবা, অন্ধ, কাজেই তারা ফিরে আসবে না।* কিংবা আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায়, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক। তারা বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে তাদের কানে আঙ্গুল দেয়। আর আল্লাহ কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।* বিদ্যুৎ চমকে তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয়। যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তখনই তারা পথ চলে এবং যখন অন্ধকারে ঢেকে যায় তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর ক্ষমতাবান।*]* (আয়াত নং ১৬-২০)।

তারপর কুরআনের প্রেক্ষাপট তাদের বর্ণনা ও অবস্থা তুলে ধরেছে ***[যারা হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা কিনেছে।]*** অর্থাৎ, তারা হিদায়াত ত্যাগ করে গোমরাহীকে বেছে নিয়েছে এবং গোমরাহীর বিনিময়ে হিদায়াতকে মূল্য হিসেবে দিয়েছে। মুনাফিকদের আচরণের সূক্ষ্ম বর্ণনা প্রদানে আল্লাহ তাদের কাজকে গোমরাহী কেনার মতো বর্ণনা করেছেন, যেখানে তারা হিদায়াতকে গোমরাহীর জন্য মূল্য হিসেবে দিয়েছে। এর চেয়ে

বড় ক্ষতি কী হতে পারে? আর কী বোকামি হতে পারে? কেনাকাটা মানে মূল্য প্রদান করা, এবং মূল্য প্রদান তখনই হয় যখন মানুষ কিছু পছন্দ করে। আর যে বস্তু দেওয়া বা পরিবর্তন করা হয়, তা অবশ্যই ক্রেতার কাছে কম মূল্যবান এবং সস্তা হয়। এতে পৃথিবী ও আখিরাতে তাদের ভীষণ ক্ষতির পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাআলা এই ব্যবসার ফলাফল স্পষ্ট করেছেন: *[**কাজেই তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, আর তারা হেদায়াতপ্রাপ্তও নয়।**]*, এটি একটি ক্ষতিগ্রস্ত এবং ব্যর্থ ব্যবসা, কারণ তারা এমন একটি কাজ করেছে যেখানে তাদের কাছে সেই হিদায়াত ছিল না যা তাদের ইমান অর্জন করতে সক্ষম করত। এর বিপরীতে যারা ইমানদার, তারা আল্লাহর সাথে তাদের ব্যবসায় লাভবান হয়। এতে বর্ণনায় সূক্ষ্মভাবে উল্লেখ করে উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বোঝানো, এবং শিক্ষা, দিকনির্দেশনা ও পরামর্শের ক্ষেত্রে বাস্তবতা তুলে ধরার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে, সূক্ষ্ম চিত্রায়ন এবং যথাযথ, স্পষ্ট ও প্রতীকী অর্থের নির্বাচনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তারপর আল্লাহ মুনাফিকদের অবস্থার উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করেছেন: *[**তাদের উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো; তারপর যখন আগুন তার চারদিক আলোকিত করল, আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, যাতে তারা কিছুই দেখতে পায় না।**]*, আল্লাহ মুনাফিকদের অবস্থা এইভাবে উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করেছেন, যাতে প্রত্যেকে যারা সত্য ও হিদায়াত চায়, তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। কেননা উদাহরণ হলো জ্ঞান ও তথ্য পৌঁছানোর একটি মাধ্যম, যা বিষয় ও অবস্থাকে স্পষ্টভাবে চিত্রিত করে প্রতিষ্ঠিত করে। আল্লামা বাইযাবী *(রহ.)* বলেছেন: *(*এটি হৃদয়ে বেশি প্রভাব ফেলে এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে।*)*

অতএব মুনাফিকদের উদাহরণ যারা কুফরের অন্ধকারে ছিল, এমন এক ব্যক্তির মতো, যে প্রবল অন্ধকারে ছিল এবং আলো খুঁজে বের করতে আগুন জ্বালাল, যাতে

তার চারপাশের রাতের অন্ধকার দূর করতে পারে। এরপর সে যা চেয়েছিল তা পেল, অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন, যা কুফরের অন্ধকারকে সরিয়ে দেয়, এবং বিশ্বাস, উপাসনা, নৈতিকতা ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের অন্ধকার দূর করে। তারা আল্লাহর দ্বীনের মাধ্যমে তেমনি উপকার পেয়েছিল, যেমন আগুনের আলো দিয়ে অন্ধকার দূর করা হয়, এবং এই দ্বীনের সত্যতা তারা এর আলো দিয়েই বুঝেছিল, যেমন আগুনের সত্যতা এর আলো দিয়ে জানা যায়। কিন্তু তাদের প্রবৃত্তি ও সন্দেহ তাদের ওপর প্রভাব ফেলল, এবং তারা ঈমানের পরিবর্তে মুনাফিকি গ্রহণ করল। তারপর আল্লাহ তাদের আলো নিভিয়ে দিলেন যেমনটি আগুনের আলো নিভে যায়, যা তারা জ্বালাচ্ছিল। এর ফলে তাদের ওপর কুফরের অন্ধকার আছড়ে পড়ল। ফলে তাদের অবস্থা হলো*: [**তারা বধির, বোবা, অন্ধ, কাজেই তারা ফিরে আসবে না।**]*, অতএব তারা কুফরের অন্ধকারে, যা তাদের অন্তরের অন্ধকারকে প্রতিফলিত করে, কিছুই দেখতে পায় না; এবং তারা মূক, অর্থাৎ কিছু বলতে পারে না, যাতে কেউ তাদের শুনতে পায় না, এছাড়াও তারা পূর্বের অবস্থায় যেমনটি তারা ছিল, ফিরে যেতে পারে না—না তাদের স্থানেই, না তাদের ঈমানের অবস্থায়। এই মুনাফিকরা যখন ঈমানের পরিবর্তে কুফর ও মুনাফিকি গ্রহণ করে এবং কুফর ও শয়তানের প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করে, তখন তাদের অবস্থা এমনই, যেমন এই উদাহরণে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার বাণীতে বলা হয়েছে, "'استوقد' তথা যে আগুন জ্বালালো; এখানে 'استوقد' শব্দটি একবচন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু আলোর হারানোর সময় বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন "فذهب الله بنورهم" তথা তারপর আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নিলেন। ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহর মতে, 'المستوقد' শব্দটি এমন একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ করছে, যিনি একটি দলের জন্য আগুন জ্বালিয়েছিলেন। তাই যখন আলো চলে গেল, তা পুরো দলকেই প্রভাবিত করল। এই ব্যাখ্যাটি ভাষাগত দিক থেকে

আরও স্পষ্ট ও অর্থপূর্ণ। আল্লাহর কুরআনিক ভাষা অত্যন্ত নিখুঁত এবং সুনির্দিষ্ট, যা পরিস্থিতির সঠিকতার সাথে মিলে যায়।

আরেকটি সুক্ষ্ম অর্থ যা ইমাম ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহ তায়ালার বাণী: "فذهب الله بنورهم" তথা তারপর আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নিলেন', বাক্যটি বোঝায় যে, আল্লাহ তাদের থেকে তাদের উপকারে আসা আলো সরিয়ে নিয়েছেন এবং তাদের জন্য বিপদজনক কিছু, যেমন আগুন ও ধোঁয়া রেখে দিয়েছেন। **তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন'** বাক্যটি তাদের অবস্থা বর্ণনা করছে, যা সন্দেহ, কুফর ও নেফাকী। 'তারা দেখতে পায় না' মানে তারা সৎপথে পরিচালিত হতে পারে না, এবং তারা সেই পথ চিনে না। 'বধির' শব্দটি নির্দেশ করে যে, তারা ভালো কিছু শোনে না, 'মূক' তারা এমন কিছু বলে না যা তাদের উপকারে আসে, এবং 'অন্ধ' তারা পথহারা ও অন্তর্দৃষ্টি হারানো অবস্থায় রয়েছে।

এ থেকে বোঝা যায় যে, যেই মুমিন ব্যক্তি ঈমানের আলোকে চিনেছে, তার জন্য এই উপমা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা অপরিহার্য। তাকে ইসলামিক আলোর সংরক্ষণ করতে হবে তার হৃদয়, কর্ম, ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে। তাকে ঈমানের দুর্বলতা ও তা হারানোর কারণগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে, যাতে সে তার আলোকিত ঈমান হারিয়ে না ফেলে, যেমনটি করেছে দাম্ভিক মুনাফিক ব্যক্তি। ঈমানের আলো নিভে যাওয়ার ঘটনা আগুনের আলো নিভে যাওয়ার মতোই। তখন শয়তানরা, যারা নানা ধরনের এবং বিভ্রান্তির বিভিন্ন উপায় অনুসরণ করে, সেই আলোকে ছিনিয়ে নেয়। এজন্য নিজের আত্মপ্রশংসা থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ এটি গর্বে পরিণত হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে, অন্যদের ঈমান বা ইবাদতকে তুচ্ছ করা, এবং তাদের অজ্ঞতার উপর হাসি-তামাশা করা। বরং, যে অবস্থায় আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, তাদের উপদেশ, নির্দেশনা এবং শিক্ষা দিতে হবে, তাদের কোনরূপ অসম্মান করা উচিত নয়।

আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের জন্য একটি উদাহরণ দিয়েছেন, যারা সত্য শ্রবণ এবং আল্লাহর আয়াত শোনার প্রতি বিরাগী। তিনি বলেন: *[**কিংবা আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায়, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক। তারা বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে তাদের কানে আঙ্গুল দেয়।]* এই উদাহরণটি এমন একজন ব্যক্তির মতো, যাকে রাতের অন্ধকার, মেঘের অন্ধকার, বৃষ্টির অন্ধকার, বজ্রের গর্জন এবং বিজলির ঝলকানি তীব্রভাবে ভয় দেখায়। এভাবেই, যখন তারা আল্লাহর আয়াত শোনে, তাদের কাছে তা ভীতিকর মনে হয়, যেন তারা মৃত্যুর ভয় থেকে কান বন্ধ করে দিচ্ছে। বস্তুত আল্লাহ কাফিরদের চারপাশে ঘিরে রেখেছেন, সুতরাং তাদের মধ্যে কেউই তাঁর হাত থেকে পালাতে সক্ষম হবে না। তিনি তাদের সকলকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের অবস্থাকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন, যা তাদের সত্য এবং আলোর প্রতি মনোভাবকে স্পষ্ট করে। তাদের কাছে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও শাস্তি এমন ভয়াবহ, যেন বজ্রের শব্দ। কারণ তাদের কুফরী, যার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য শাস্তির হুমকি দিয়েছেন।

এটি আমাদেরকে ঈমান, দৃষ্টি, শ্রবণ এবং অন্যান্য নেয়ামতের গুরুত্ব বুঝতে শেখায়, যেগুলোকে রক্ষা করা অপরিহার্য, যাতে এগুলো হারিয়ে না যায় এবং আমরা সেগুলো থেকে বঞ্চিত না হই। এগুলোকে সঠিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে। এখানে হারানোর অর্থ শুধুমাত্র শারীরিকভাবে হারানো নয়, বরং সত্যকে উপেক্ষা করা এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ফলেও এগুলো হারানো। যেমন আল্লাহ বলেন: *(**অতঃপর তিনি তাদেরকে বধির করে দিলেন ও দৃষ্টি অন্ধ করে দিলেন।) (এরা সেই ব্যক্তি, যাদের হৃদয়, শ্রবণ এবং দৃষ্টিতে আল্লাহ সীল মেরে দিয়েছেন, এবং তারা হচ্ছে গাফিল)**। **(আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার উপর বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দিব।)* সূরা আল-আনআম: ১১০। এজন্য মুমিন তার আত্মাকে সঠিক

পথে চলার জন্য সংগ্রাম করে এবং আল্লাহর কাছে স্থিরতা প্রার্থনা করে। যেমন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: **"রাসূল (সা.) এর সবচেয়ে সাধারণ দোয়া ছিল: (**يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك/ **'হে হৃদয়ের পরিবর্তনকারী, আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনে দৃঢ় রাখ।)** সুনানে তিরমিযি।

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٢١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٢ وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّن مِّثۡلِهِۦ وَٱدۡعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٢٣ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ وَلَن تَفۡعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُۖ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ٢٤ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنۡهَا مِن ثَمَرَةٖ رِّزۡقٗا قَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِي رُزِقۡنَا مِن قَبۡلُۖ وَأُتُواْ بِهِۦ مُتَشَٰبِهٗاۖ وَلَهُمۡ فِيهَآ أَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞۖ وَهُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٥﴾

অর্থ: ***[হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদাত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববতীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও।* যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আসমানকে করেছেন ছাদ এবং আকাশ হতে পানি অবতীর্ণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন। কাজেই তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করিও না।* আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে তোমরা তার মত একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।* অতএব যদি তোমরা তা করতে না পার আর কখনই তা করতে পারবে না, তাহলে তোমরা সে আগুন থেকে বাঁচার ব্যবস্থা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য।* আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে শুভ সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে - পূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেয়া হত এতো তাই'। আর তাদেরকে তা দেয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করেই এবং সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র স্ত্রীগণ। আর তারা সেখানে স্থায়ী হবে।]*** (আয়াত নং ২১-২৫)

অতঃপর কুরআনী প্রেক্ষাপট আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সকল মানুষের জন্য একটি আহ্বান নিয়ে আসে, যাতে তারা তাঁর ইবাদত করে: ***(হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদাত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববতীদেরকে সৃষ্টি করেছেন)***। এই আয়াতটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের উদ্দেশ্যে একটি আহ্বান দিয়ে শুরু হয়েছে, যেখানে "হে মানুষ" এ ধরনের সম্বোধন করা হয়েছে, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বানের দিকে দৃষ্টিগোচর করে। *(إعبدوا ربكم)* শব্দের মাধ্যমে ইবাদত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যা এর গুরুত্ব প্রকাশ করে। এখানে সম্বোধনের ধরন, অর্থাৎ আহ্বান করা, বিশেষভাবে একটি সতর্কতার ইঙ্গিত বহন করে, এবং এতে শ্রোতা নির্ধারণ করা হয়। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে সমস্ত মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, যদিও কারো মতে এখানে কাফিরদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যারা বিশ্বাস করেন যে এটি সবার জন্য, তাদের মতে এই আহ্বান মুমিনদের জন্য ক্রমাগত ইবাদতের জন্য এবং কাফিরদের জন্য নতুন করে শুরু করার জন্য। এর মানে হল যে, এমন সম্বোধন সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি শুধু নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্যই নয়, বরং এটা এক সাধারণ বার্তা, যার মাধ্যমে অন্যরা বুঝতে পারে কীভাবে উল্লেখিত শ্রেণিকে পরামর্শ ও সতর্ক করা হয়েছে, যাতে তারা আরও বেশি ধৈর্য, শান্তি, জ্ঞান ও বুঝ অর্জন করতে পারে এবং এতে তাদের জন্য নির্দেশনা ও সতর্কতা থাকে।

এখানে আদেশের পর যুক্তি প্রদান করার পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষকে তাঁর ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন ***(হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো)*** এবং এর পেছনে যে যুক্তি রয়েছে, তা হলো—তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে পালন করছেন এবং তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অস্তিত্বহীনতা থেকে। বরং আদেশটি *الربوبية (রাবুবিয়াত)* এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ***(হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের***

ইবাদত করো), ফলে যদি পাঠক শুধুমাত্র (ইবাদত করো) এতটুকুতে থেমে যায়, তবে আদেশের পূর্ণ অর্থ কেবল তখনই পরিপূর্ণ হবে যখন (তোমাদের রবের) শব্দটি যুক্ত হবে।

অনুরূপভাবে এই আয়াতে উদ্দেশ্যও প্রকাশিত হয়েছে: যে উদ্দেশ্য মানুষেরই মঙ্গলসাধন করে: **(যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো)**। কারণ তাকওয়া অর্জনকারী ব্যক্তি ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে সফল হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা সূরা আন-নাবা'তে বলেছেন: (إن للمتقين مفازا) "তাকওয়া অর্জনকারীদের জন্য রয়েছে সফলতা।" এটি একটি শিক্ষণীয় এবং দাওয়াতমূলক উপকারিতা প্রদান করে, যা মানুষের জন্য তার শেখা বা করা কাজের সুফল ও উপকারিতা ব্যাখ্যা করে, যাতে সে কাজটি করতে উৎসাহিত হয়। কারণ মানুষের মন সবসময়ই লাভ ও উপকারিতার দিকে আকৃষ্ট হয়।

আয়াতগুলোতে হেতু বিশ্লেষণে সাতটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে, যথা:

প্রথম: **(তোমাদের রব)** অর্থাৎ যিনি আপনাদেরকে স্বীয় নেয়ামত দিয়ে লালন পালন করেছেন।

দ্বিতীয়: তিনি আপনাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ আপনাদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে সৃষ্টি করেছেন।

তৃতীয়: তিনি আপনাদের পূর্ববর্তীদেরও সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকেও অস্তিত্বহীনতা থেকে সৃষ্টি করেছেন।

চতুর্থ: তিনি পৃথিবীকে আপনাদের জন্য স্তপিত করেছেন, যাতে আপনারা তাতে বসতে, শুতে এবং চলাফেরা করতে পারে।

পঞ্চম: তিনি আকাশকে আপনাদের উপর একটি নির্মিত ছাদের মতো করেছেন।

ষষ্ঠ: তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যা পৃথিবীর জীবন ও গাছপালা উৎপাদনে সহায়তা করে, যা মানুষ, পশু ও অন্যান্য প্রাণী খায়।

সপ্তম: তিনি ফলসমূহকে আপনাদের রুজি হিসেবে প্রদান করেছেন।

এছাড়া, যদিও পশু ও অন্যান্য প্রাণীও পৃথিবী থেকে উদ্ভূত শস্য খেয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিশেষভাবে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করেছেন, কারণ মানুষই এ বিষয়ে প্রধান লক্ষ্য, এবং অন্যান্য প্রাণী তাতে মানুষের অনুগামী।

এই সাতটি কারণ, যা আপনাদের একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে বাধ্য করে, যার কোনো শরীক নেই। এগুলো সবই মহান ও বিস্ময়কর, বিশালতায় অমিত এবং যারা চিন্তা করে, তাদের জন্য অবাক করার মতো। যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টির প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দেয়, তার চোখ, কান, বুদ্ধি, বোধশক্তি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবিধি এবং অন্যান্য বিশাল সৃষ্টি, যা আল্লাহর দান, তা তাকে অবাক করে দেয়। যদি সে পূর্ববর্তী প্রজন্মের ধারাবাহিকতা ও অটুট চলার বিষয়টি চিন্তা করে, যে ধারাবাহিকতা আল্লাহ ছাড়া কখনো থামবে না, তাহলে সে তা দেখে বিস্মিত হবে। এবং যদি সে পৃথিবীর বিস্তার, সমতলতা, পাহাড়ের মধ্যে পথ, নদীর শাখা-প্রশাখাগুলি পর্যবেক্ষণ করে, যেখানে পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়, তাহলে সে সেই বিস্ময়কর বিষয়টি দেখে হতবাক হবে। যদি সে আকাশের দিকে লক্ষ্য করে এবং মেঘের চলাচল ও তা থেকে নামা বৃষ্টির প্রতি মনোযোগী হয়, তাহলে সে এই মহান স্রষ্টার মহত্ত্ব বুঝতে পারবে, যিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। যদি সে বৃষ্টি বর্ষণ ও উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়ার মাঝে সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা করে, তখন সে এ সত্যে পৌঁছতে বাধ্য যে, আল্লাহই এগুলোর সৃষ্টিকর্তা এবং একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য। যদি সে উদ্ভিদের ভিন্নতা, যেমন তাদের উচ্চতা, আকার, রূপ, সৌন্দর্য, এবং ফলের ভিন্নতা—আকার, গঠন ও স্বাদ নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে সে বিস্মিত হয়ে যাবে।

যদি সে একটিমাত্র ফলের আকার এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করে, তার মন ও হৃদয় ঈমানের দিকে পরিচালিত হবে, তার মুখ স্বীকৃতি ও প্রশংসায় ভরে উঠবে, এবং তার সমস্ত অঙ্গ আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত হবে।

অতঃপর, এই স্পষ্ট ও বিস্ময়কর ব্যাখ্যার পর, যা আল্লাহর মহান সৃষ্টির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে, আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে আদেশ দেন যে, তারা যেন তাঁর সমকক্ষ কোনো সঙ্গী স্থির না করে, যেন তারা কোনো অংশে তার ইবাদত না করে। কারণ ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। ***(কাজেই তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করিও না।)***

অতঃপর এই যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার পর, যা আল্লাহর দাসত্বকে স্থির করেছে এবং সব ধরনের অজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করেছে, আল্লাহর বাণী তাঁর রাসূল মুহাম্মদ *(সা.)*-এর উপর অবতীর্ণ কোরআনকে নিয়ে আলোচনা করে। এর উদ্দেশ্য হলো কোরআন শোনার, গ্রহণ করার এবং বোঝার পথে যেকোনো প্রতিবন্ধকতা দূর করা। আল্লাহ বলেন*: [**আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে তোমরা তার মত একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।***]* এই আয়াতে, যাদের কোরআন সম্পর্কে সন্দেহ ও শঙ্কা রয়েছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে যে তারা কোরআনের মতো একটি সূরা উপস্থাপন করুক, যদিও তারা আরবী ভাষার আরবী ভাষার গদ্য ও পদ্যে অতি উচ্চস্তরের ভাষাগত দক্ষতায় পারদর্শী। তারা চাইলে যেকোনো সহায়কদের সহায়তা নিতে পারে এবং তাদের পক্ষ থেকে সাক্ষী আনতে পারে।

কাজেই, যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে এবং তাদের বাধা যদি সন্দেহ-সংশয় হয়, তবে তারা কোরআনের মতো একটি সূরা নিয়ে আসুক, যাতে তাদের সন্দেহ দূর হয় এবং তারা বিশ্বাসে আসতে পারে। আর যদি বাধা তাদের গর্ব ও অহংকার হয়,

তবে তাতে বুঝা যায় যে, তারা সত্য জানে এবং তাদের কাছে তা পরিষ্কার, কিন্তু তাদের অবাধ্যতা ও অহমিকাই সত্য গ্রহণে প্রতিবন্ধক।

এটি ইঙ্গিত করে যে, বিশ্বাস, উপাসনা, শিক্ষা, এবং দাওয়াতের পথে বাধাগুলি হতে পারে অবাধ্যতার কারণে, অথবা অজ্ঞতার কারণে, যা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে—যেমন তথ্যের সঠিকতা নিয়ে সন্দেহ, সাধারণ অজ্ঞতা, বা জটিল অজ্ঞতা। সুতরাং, একজন শিক্ষক বা দায়ীর জন্য প্রয়োজন যে, তিনি যেন বাধাগুলোর উৎস শনাক্ত করেন—এটি কি অজ্ঞতা ও অক্ষমতার কারণে, না কি অহংকার ও অবাধ্যতার কারণে—যাতে তিনি সঠিকভাবে উপযুক্ত পদ্ধতিতে বিষয়টি মোকাবিলা করতে পারেন।

আল্লাহর এই বাণীর একটি উপকারিতা হলো, এটি শিখিয়ে দেয় যে, শ্রোতার মনে যে সন্দেহ বা শঙ্কা থাকতে পারে, তা দূর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দাঈ-কে অবশ্যই সেই সম্ভাব্য সন্দেহ বা শঙ্কা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে, যাতে তিনি তা দূর করতে পারেন। এটি শিক্ষা ও দাওয়াতের জন্য জ্ঞানের গুরুত্ব এবং দাঈ-এর জন্য শ্রোতার অবস্থা জানার প্রয়োজনীয়তাও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে।

আরেকটি ফায়েদা হলো: এই চ্যালেঞ্জে দুটি সময়ের উল্লেখ রয়েছে, একটি বর্তমান ***(যদি তোমরা না করতে পারো)*** এবং অন্যটি ভবিষ্যত ***(এবং কখনোই তোমরা তা করতে পারবে না)***। এই চ্যালেঞ্জটি একটি কঠিন প্রমাণ প্রদান করে যে, তারা কোরআনের মতো একটি সূরা আনতে কখনোই সক্ষম হবে না ***(যদি না করতে পারো এবং কখনোই করতে পারবে না)***, এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, তারা বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয় কালেই এটি করতে পারবে না)। ইবন কাসীর বলেছেন: (**"لن"** শব্দটি ভবিষ্যতের নাকচ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ "এবং তোমরা কখনোই এটি করতে পারবে না"। এটি আরেকটি মুজিজা, যা আল্লাহ পূর্বেই নিশ্চিতভাবে জানিয়ে

দিয়েছেন যে, কোরআনকে কখনোই তার মতো কোনো কিছু দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যাবে না, না বর্তমানে, না ভবিষ্যতে, না কোনো কালে।)[৬]

তিনি মক্কা ও মদিনায় বহুবার তাদের চ্যালেঞ্জ করেছেন, যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর প্রতি তীব্র শত্রুতা ও ইসলামকে ঘৃণা করত। তবুও তারা তা করতে অক্ষম ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **"তবে যদি তোমরা না করতে পারো এবং কখনোই তা করতে পারবে না..."**[৭]

এরপর চ্যালেঞ্জের পর আসে পরিণতির বিষয়ে সতর্কতা, অর্থাৎ, **(যদি তোমরা না করতে পারো এবং কখনোই তা করতে পারবে না, তবে সেই আগুন থেকে সাবধান হও, যার জ্বালানি মানুষ ও পাথর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।)**

আরেকটি ফায়েদা হলো, ভীতি ও আশার মাঝে সঠিক ভারসাম্যের উপস্থিতি। আল্লাহ তাআলা প্রথমে কাফেরদের পরিণতি এবং তাদের জন্য যা প্রস্তুত করেছেন, তা উল্লেখ করেছেন। এরপর, তিনি মুমিনদের জন্য যা প্রস্তুত করেছেন, তা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ***[আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে শুভ সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে - পূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেয়া হত এতো তাই'। আর তাদেরকে তা দেয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করেই এবং সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র স্ত্রীগণ। আর তারা সেখানে স্থায়ী হবে।]***

এই পবিত্র আয়াতটি **(যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে শুভ সংবাদ দিন)** শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে, যা নির্দেশ করে যে, উৎসাহিত করার জন্য এবং শ্রোতার মানসিক ও

---

(৬) তাফসীরে ইবনে কাসীর: (১/৬৩)।

(৭) পূর্বোক্ত।

চিন্তাগত প্রস্তুতির জন্য সুসংবাদ বা এর সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই শব্দগুলো আনন্দদায়ক খবরের ঘোষণা দেয়, যা মানুষের মনে সুখকর প্রভাব ফেলতে পারে এবং তাদের মধ্যে একটি গভীর আনন্দ এবং আশাবাদ সৃষ্টি করে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হলো: আয়াতে বাগান, ফল, নদী এবং ইমান ও সৎকর্মের বিভিন্ন স্তরের বিস্তারিত উল্লেখ না করেও তা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তবুও, আয়াতটি পাঠকারীকে সব তথ্য অনুভব করাতে সক্ষম, এবং এটি কোরআনের ভাষাগত মুজিযা। এছাড়াও, এই আয়াতে ঈমান ও সৎকর্মের মর্যাদা স্পষ্ট করা হয়েছে, যা আল্লাহর রহমত, দয়া ও অনুগ্রহে মুমিনদের জান্নাতে প্রবেশের কারণ।

এই আয়াতটি মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সত্যটিকেও তুলে ধরে, যেখানে মানুষ জান্নাতে চিরকাল স্থায়ী হবে, যা মৃত্যু বা অবসানের ঊর্ধ্বে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হলো ঈমান এবং সৎকর্মের মধ্যে সম্পর্ক, যা আল্লাহর জান্নাত লাভ এবং সেখানে প্রবেশের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **"আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে শুভ সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত।"** এই আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুধু ঈমান থাকলেই হবে না, সৎকর্মও থাকতে হবে।

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡيِۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَلٗا مَّا بَعُوضَةٗ فَمَا فَوۡقَهَاۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلٗاۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرٗا وَيَهۡدِي بِهِۦ كَثِيرٗاۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقِينَ ٢٦ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقۡطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ٢٧﴾

অর্থ: **[নিশ্চয় আল্লাহ মশা কিংবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না। অতঃপর যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটা তাদের রব-এর পক্ষ হতে সত্য। কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা বলে যে, আল্লাহ কি উদ্দেশ্যে এ উপমা পেশ করেছেন? এর দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে হেদায়াত করেন। আর তিনি ফাসিকদের ছাড়া আর কাউকে এর দ্বারা বিভ্রান্ত করেন না।* যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আর যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনের উপর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।]** (আয়াত নং: ২৬-২৭।)

সাঈদ ইবনু কুতাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহ সত্যকে প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না, যদিও তা ছোট কিংবা বড় কিছু হোক। যখন আল্লাহ তাঁর কিতাবে মাকড়সা ও মাছির কথা উল্লেখ করেছেন, তখন গোমরাহী লোকেরা বলেছিল, "আল্লাহ এদের কথা উল্লেখের মাধ্যমে কী উদ্দেশ্য করেছেন?" এরপর আল্লাহ এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন।[৮]

এটি নির্দেশ করে যে, উদাহরণ দেওয়ার গুরুত্ব রয়েছে, যাতে শ্রোতার কাছে জ্ঞান পৌঁছানো যায়। মানুষের কখনো উচিত নয় উদাহরণ দিতে লজ্জা অনুভব করা, যদিও তা ছোট বা তুচ্ছ মনে হয়। কারণ মূল উদ্দেশ্য হল জ্ঞান বিতরণ। একইভাবে,

---

(৮) তাফসীরে ইবনে কাসীর: (১/৬৬)।

মানুষের উচিত নয় অন্যকে সত্য জানানোর ক্ষেত্রে লজ্জা অনুভব করা, যদি তা সঠিক ও উপযুক্ত পদ্ধতিতে হয়, যা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হয়।

একটি ফায়েদা হলো, অহংকারী ব্যক্তি সত্য, তা প্রকাশের পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুকে তুচ্ছ ও অসম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করে, যাতে সে নিজেকে প্রশান্ত করতে পারে এবং অন্যদের মধ্যে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করতে পারে। সে হাস্যরস ও উপহাসের মাধ্যমে সত্যকে ছোট করে দেখায়, যাতে অন্যরা তার প্রতি প্রভাবিত হয় এবং সত্যের প্রতি তাদের বিশ্বাস নষ্ট হয়।

এটি ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি গভীর যত্নশীল এবং তাদের কাছে সত্য পৌঁছানোর জন্য নানা উপায় ব্যবহার করেছেন। যেমন নবীদের প্রেরণ, মুজিযা, ব্যাখ্যা, এবং বিভিন্ন পদ্ধতি যা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে সহায়ক। এছাড়া, এটি কোরআনের শিক্ষা ও দাওয়াতের পদ্ধতির গভীর বিশ্লেষণের গুরুত্বও প্রকাশ করে, যাতে আমরা কোরআনের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বিষয়গুলিতে পরিষ্কারভাবে বুঝতে ও বিশ্বাসী করতে পারি।

আরেকটি ফায়েদা হলো, মানুষের মধ্যে দুটি দল রয়েছে: এক দল যারা সত্য গ্রহণ করে, এবং অন্য দল যারা অহংকার ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: **" অতঃপর যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটা তাদের রব-এর পক্ষ হতে সত্য। কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা বলে যে, আল্লাহ কি উদ্দেশ্যে এ উপমা পেশ করেছেন?"**

এ থেকে আরো বুঝা যায় যে, একজন সংস্কারক, দাঈ, আলেম বা শিক্ষককে তাদের কাজে এই বৈচিত্র্য ও পার্থক্যকে মেনে নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ মানুষ সত্য গ্রহণে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। যদি এমন বিভেদ আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান বিষয় নিয়ে আগত নবী (সা.)-এর বেলায় ঘটতে পারে, তাহলে তার চেয়ে নিম্ন

স্তরের অন্যান্য মানুষের সাথে, এবং তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন ও বিষয়গুলিতে এই বিভেদ কেমন হবে তা ভাবা উচিত।

আরেকটি ফায়েদা হলো, একজন মুমিন কখনোই অহংকার করে না যদি সে সত্য ও সঠিকতা দেখে; বরং সে তার পূর্ববর্তী ভুল চিন্তা বা বোঝাপড়া থেকে সরে এসে সত্য গ্রহণ করে এবং তা অনুসরণ করে। কারণ, সত্য প্রত্যাখ্যান করা কাফের ও অবাধ্যদের পথ।

তাছাড়া সত্য গ্রহণ করে ও এর দ্বারা পথপ্রদর্শন লাভ করেন তারা যারা সৎ ও ঈমানদার। কিন্তু যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গকারী এবং তাঁর নির্দেশিত সম্পর্ক ছিন্নকারী, তারা সেই সত্যকে অস্বীকার করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: আল্লাহ তাআলা বলেন: ***[এর দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে হেদায়াত করেন। আর তিনি ফাসিকদের ছাড়া আর কাউকে এর দ্বারা বিভ্রান্ত করেন না।* যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আর যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনের উপর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।]***

এটি বোঝায় যে, মানুষ সত্যের ব্যাপারে দুটি দলে বিভক্ত: একদল যারা আল্লাহর আয়াত এবং নবীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে সঠিক পথে চলে, এবং অন্যদল যারা ফাসিক এবং অহংকারী। ফলে, ফাসিকদের আচরণ হলো আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক, তা ভেঙে ফেলা। কেউ বলেছেন: এই নির্দেশনা সাধারণভাবে সমস্ত সম্পর্ককে অন্তর্ভুক্ত করে যেগুলোর প্রতি আল্লাহ তাআলা সংযোগ স্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং আত্মীয়তা তার একটি অংশ। এছাড়াও, তাদের একটি পথ হলো পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করা, যেমন কুফর ও পাপের মাধ্যমে এবং মানুষকে কুফরের দিকে আহ্বান করার মাধ্যমে। এই ব্যক্তিরাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত, কারণ তারা পরকাল

হারিয়েছে, যা চিরস্থায়ী জীবন। সেখানে মুমিনদের জন্য রয়েছে নানান আনন্দ, আর কাফেরদের জন্য রয়েছে শাস্তি।

﴿كَيۡفَ تَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمۡ أَمۡوَٰتٗا فَأَحۡيَٰكُمۡۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡ ثُمَّ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٨ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٩﴾

অর্থ: ***[তোমরা কিভাবে আল্লাহর সাথে কুফরী করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন। তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন, তারপর তারই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।* তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আসমানের প্রতি মনোনিবেশ করে সেটাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করেছেন; আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।]*** *(*আয়াত নং: ২৯*)*।

এই সম্মানিত আয়াতটি আল্লাহর প্রতি কাফেরদের কুফরির বিষয়টি নিয়ে একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয়েছে, যা একটি প্রতিবাদী প্রশ্ন। এটা সর্বজনবিদিত যে, তারা আগে কিছুই ছিল না, বরং শূন্য ছিল, এরপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সে একটি ছোট শিশু হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, তারপর আল্লাহ তাকে যতটুকু ইচ্ছা করেন ততটুকু জীবন দেন, এবং শেষে সে মরতে হবে, যেমন অন্য সবাই মারা যায়। এটি একটি প্রশ্ন যা মানুষের মধ্যে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তারপর আয়াতটি কাফেরদের জানা সেই সত্যের পর আরেকটি সত্য প্রকাশ করেছে, যা হলো মৃত্যুর পর পুনরুত্থান। এই পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতে হলে প্রথমত সেই মৌলিক সত্যগুলো জানা ও তাতে ঈমান আনা আবশ্যক, যা হলো: শূন্য অবস্থা থেকে সৃষ্টি, তারপর জীবিত হওয়া এবং তারপর মৃত্যু। কারণ যিনি মানুষকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে জীবন দিয়েছেন এবং

মৃত্যুর পর মৃত্যু ঘটিয়েছেন, তিনি অবশ্যই তাকে আবার জীবিত করতে সক্ষম। সুতরাং, যিনি শূন্য থেকে সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন, তার জন্য পুনরুত্থান করা একেবারেই কঠিন নয়।

এটি শিক্ষামূলক ও প্রমাণমূলক শৈলীর গুরুত্বকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে, যেখানে শ্রোতাকে এমন একটি সত্যের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যা সে জানে এবং অস্বীকার করতে পারে না। এটি এক ধরনের সংলাপও, যা বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে, যেন সে কিছু বিষয় সম্পর্কে, যেগুলি হয়তো সে ভুলে গেছে বা এড়িয়ে গেছে, সেগুলোর দিকে মনোযোগ দেয়। যেন শ্রোতা নিজে বলছে: "হ্যাঁ, আমি একসময় ছিলাম না, তারপর আমাকে অস্তিত্ব দিয়েছেন সেই সত্ত্বা যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি আমাকে মৃত্যু দেবেন যেমন অন্যদের দেন, এবং যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাকে আবার জীবিত করতে পারবেন, আর তাই তার উপর ঈমান আনা এবং একমাত্র তার উপাসনা করা উচিত।" আল্লাহ বলেন: ***[তোমরা কিভাবে আল্লাহর সাথে কুফরী করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন। তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন, তারপর তারই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।]***

এই জাতীয় প্রশ্নের ধরন, যা একদিকে প্রতিবাদমূলক এবং অন্যদিকে প্রমাণমূলক, মনকে গভীরভাবে চিন্তা করতে উদ্দীপিত করে, যেমনভাবে এটি হৃদয়কে ভাবতে প্রেরণা দেয় যে, এই স্পষ্ট সত্যটি একজন বুদ্ধিমান মানুষের কাছে কিভাবে লুকিয়ে থাকতে পারে। এটি চিন্তাশক্তির উন্নতিরজন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, যেখানে শ্রোতাকে এমন সত্যগুলোর দিকে নিয়ে আসা হয় যা সে জানে ও স্বীকার করে, তারপর সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে চিন্তা করতে উৎসাহিত করা হয়, নির্দিষ্ট ধাপে ধাপে, যাতে তাকে সেই উদ্দেশ্যে পৌঁছানো যায়, যা উক্ত বিষয়টির মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে।

এটি পরবর্তী আয়াতে জীবন সৃষ্টির শক্তি এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতার একটি প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে, যা বিশ্বাস এবং কুফর পরিত্যাগের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"** যা কিছু পৃথিবীতে আছে তা সবই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ও অস্তিত্ব দিয়েছেন, যিনি আপনাদেরও অস্তিত্ব দিয়েছেন। এখানে এক শিক্ষার বিষয় রয়েছে অস্তিত্বের পর জীবনদান এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান থেকে। পৃথিবী ও এর অভ্যন্তরে যে সমস্ত নেয়ামত রয়েছে, সেগুলি মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যেন মানুষ তাদের প্রয়োজনের সাথে সেগুলির সঙ্গতি বুঝতে পারে। এটি মানবের জন্য একটি উপলব্ধি প্রদান করে যে, পৃথিবীতে তার সকল প্রয়োজন- এমনকি বিলাসিতা বা আরামদায়ক উপাদানও আল্লাহ তাআলা নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। যেমন, খেজুরের বিভিন্ন প্রজাতি, যার প্রতিটি ধরনের স্বাদ, আকার, রঙ এবং মিষ্টি হওয়ার পরিমাণ আলাদা, এমনকি একটি গাছের ফলেও এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, তাহলে অন্যান্য গাছের মধ্যে এই বৈচিত্র্য কতখানি হবে!

এখানে কুরআনী আয়াতের উপস্থাপনায় একটি বিশেষ ধরনের মনোযোগ আকর্ষণের কৌশল দেখা যায়, যেখানে সংক্ষেপের মাধ্যমে শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে এবং বিস্তারিত বিবরণ থেকে বিরত রাখা হয়েছে, শুধুমাত্র মূল বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই কৌশলটি এমনভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে যাতে মনের দৃষ্টি বৃহত্তম এবং গম্ভীর সত্যের দিকে নিবদ্ধ থাকে, যেমন পৃথিবীর উপাদান, এর উপর যা কিছু ঘটে— যেমন মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়া, শুকিয়ে যাওয়া, মৃত্যু, তারপর বৃষ্টির মাধ্যমে পুনরায় জীবিত হওয়া।

এটি তাগিদ দেয় যে, আলোচনায় এবং বিতর্কে মূল বিষয়ে ফোকাস করা উচিত, অতিরিক্ত বিস্তারিত বিশ্লেষণ থেকে বিরত থাকা উচিত, যাতে মানুষের মন বড় এবং

গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্যগুলোতে নিবদ্ধ থাকে, এবং অপ্রয়োজনীয় তথ্যের মধ্যে হারিয়ে না যায়।

যখন শ্রোতা চিন্তা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি সত্য উপলব্ধি করেছে, তখন তাকে একটি মহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ সত্যের দিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"তারপর তিনি আসমানের প্রতি মনোনিবেশ করে সেটাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করেছেন; আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।"** এখানে, আল্লাহ তাআলা নিজেই পরিষ্কার করেছেন যে, তিনি আকাশ সৃষ্টি কার ইচ্ছা পোষণ করেছেন এবং সেই আকাশকে সাতটি স্তরে সুষমভাবে সৃষ্টি করেছেন।

এখানে বার্তাটি ধাপে ধাপে পাঠানো হয়েছে, যাতে অবশেষে শ্রোতা ঈমান বা বিশ্বাসে পৌঁছাতে পারে। প্রথমে বলা হয়েছে যে, মানুষ ছিল অস্থিত্বহীন এবং আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ করা হবে, যেমন অন্য সকল প্রাণীর মৃত্যু ঘটে, এবং পরবর্তীতে আল্লাহ তাকে পুনরুত্থান করবেন, এবং সবকিছু আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। এরপর, পৃথিবী এবং তার অভ্যন্তরে যা কিছু আছে, তা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের উপকারিতার কথা বলা হয়েছে, এবং সেগুলি তার প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই সকল প্রমাণ থেকে, সে স্বীকার করবে যে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি পৃথিবী ও তার উপাদান সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আকাশও সৃষ্টি করেছেন। সে বিশ্বাস করবে যে, আকাশ সাতটি, যেমনটি সর্বজ্ঞানী আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন।

এই পবিত্র আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, শুন্য থেকে মানুষের অস্তিত্ব লাভ, অস্তিত্বে আসার পর তার মৃত্যু, পাশাপাশি পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল সৃষ্টিজীবের অবস্থান- এসব বিষয় চিন্তা করা, মানুষকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

এটি আরও নির্দেশ করে যে, আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর ইবাদত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং সমস্ত ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই হওয়া উচিত। তাছাড়া, চিন্তা-ভাবনা ও গভীর বিশ্লেষণের গুরুত্ব এবং সঠিক কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে সত্যের দিকে পরিচালিত করা প্রয়োজন। সঠিকভাবে শ্রোতার অবস্থান বোঝার মাধ্যমে, ধাপে ধাপে মনোযোগ আকর্ষণ করে তাকে বড় সত্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াও এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই পবিত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির প্রতি তাঁর মহান দয়া ও করুণার প্রকাশ ঘটেছে, যেখানে তিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী এবং তার সমস্ত উপাদান মানব জাতির উপকারের জন্য, এবং তাদের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে পৃথিবীকে তাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তিনি মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পৃথিবীতে এমন সব উপাদান তৈরি করেছেন, যা তাদের জীবনকে সমৃদ্ধ ও পূর্ণতা প্রদান করে, এবং এ সকল উপাদান আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব এবং তাঁর শক্তির নিদর্শন। অতএব, সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে সঠিক পথে অবিচল থাকার এবং সত্যের ওপর স্থির থাকার জন্য সাহায্য কামনা করি।

﴿وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٠ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي بِأَسۡمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٣١ قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ٣٢ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئۡهُم بِأَسۡمَآئِهِمۡۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسۡمَآئِهِمۡ قَالَ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ غَيۡبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَأَعۡلَمُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ ٣٣﴾

অর্থ: **[আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, নিশ্চয় আমি যমীনে খলীফা সৃষ্টি করছি'। তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে ফাসাদ ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আর আমরা আপনার হামদসহ তাসবীহ পাঠ করি এবং পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি তা জানি, যা তোমরা জান না।* আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করে বললেন, 'এগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।* তারা বলল, আপনি পবিত্র মহান! আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'।* তিনি বললেন, 'হে আদম! তাদেরকে এসবের নাম বলে দিন। অতঃপর তিনি (আদম) তাদেরকে সেসবের নাম বলে দিলে তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় আমি আসমান যমীনের গায়েব জানি। আরও জানি যা তোমরা ব্যক্ত কর এবং যা তোমরা গোপন করতে'।]** (আয়াত নং: ৩০-৩৩)

এই আয়াতগুলো মানবজাতির প্রথম পিতা আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির শুরু এবং প্রাথমিক পদক্ষেপগুলিকে বর্ণনা প্রদান করে। কুরআন এসব গায়েবী সত্য সংবাদ তুলে ধরেছে, যেগুলি কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন, এবং এটি মানবজাতির নিকট প্রকাশ করার জন্য যে, তার সৃষ্টির সূচনা কীভাবে হয়েছে এবং তার সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে কীভাবে জানিয়েছিলেন। এটি আল্লাহর একটি বড়

অনুগ্রহ, যেহেতু তিনি আদম ও তার সন্তানদের নাম ঊর্ধ্বাকাশে উল্লেখ করেছেন, তাদের সৃষ্টির আগে থেকেই: *[**আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, নিশ্চয় আমি যমীনে খলীফা সৃষ্টি করছি'**।]* ইবনে কাসীর রহঃ বলেছেন: "***(নিশ্চয় আমি যমীনে খলীফা সৃষ্টি করছি),*** এর অর্থ হল, এমন কিছু জনগণ যারা একে অপরকে অনুসরণ করবে, যুগের পর যুগ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম।"

এই মহান আয়াতগুলির মাধ্যমে পরিষ্কার হয় যে, ফেরেশতারা শুধুমাত্র ঐ জ্ঞানই জানেন যা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যেমন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলেছেন: **'আমি জানি যা তোমরা জানো না'**। তাছাড়া ফেরেশতাদের ভাষ্যে তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে: **আপনি পবিত্র মহান! আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'**

এই আয়াতগুলি থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তার সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা এবং যা দ্বারা ইচ্ছা বিশেষ কিছু দান করেন। যেমন আল্লাহ আদমকে সেই সমস্ত নামের জ্ঞান দান করেছিলেন, যা ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয়নি। এটি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। "**আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করে বললেন, 'এগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।* তারা বলল, আপনি পবিত্র মহান! আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'।* তিনি বললেন, 'হে আদম! তাদেরকে এসবের নাম বলে দিন। অতঃপর তিনি *(আদম)* তাদেরকে সেসবের নাম বলে দিলে তিনি *(আল্লাহ)* বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় আমি আসমান যমীনের গায়েব জানি। আরও জানি যা তোমরা ব্যক্ত কর এবং যা তোমরা গোপন করতে'।"

আদম এবং তারপর তার বংশধরদেরকে নামের জ্ঞান দান করা আল্লাহ তাআলার এক মহান অনুগ্রহ এবং মানুষের জন্য একটি বিশেষ সন্মান।

এটি মানুষের জন্য এই নেয়ামতের, অর্থাৎ অস্তিত্ব ও জ্ঞানের নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো প্রয়োজন, এবং আল্লাহ তাআলাই তাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা উপলব্ধি করা উচিত। তার জ্ঞান নিয়ে অহংকার বা গর্ব করা চলবে না, কারণ আল্লাহই তাকে বুঝ, স্মরণ, বিশ্লেষণ, প্রাপ্তি, উদ্ভাবন ও সৃষ্টির ক্ষমতা দান করেছেন। যদি আল্লাহ তাআলা তাকে এই বিশেষ ক্ষমতা না দিতেন, তবে মানুষ কখনোই যে জ্ঞান, উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনে আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে, তা অর্জন করতে পারতো না।

এই মহান আয়াতগুলির একটি নির্দেশ হল, ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ও প্রশংসায় মগ্ন, এবং তারা কখনো আল্লাহর অবাধ্য হয় না, তাদের মধ্যে মানুষের মতো ফাসাদ বা অবক্ষয়ের কোনো ঘটনা ঘটে না। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন: "**তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে ফাসাদ ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আর আমরা আপনার হামদসহ তাসবীহ পাঠ করি এবং পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি তা জানি, যা তোমরা জান না**" এই বাক্যটি তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী একটি তুলনা ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এমন জ্ঞান ধারণ করেন যা ফেরেশতারা জানে না।

এই মহান আয়াতগুলি থেকে এটাও বুঝা যায় যে, ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে আগেই জানতেন যে, আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির পর মানবজাতির মধ্যে কিছু মানুষ ফাসাদ সৃষ্টি করবে, যেমন হত্যাকাণ্ড, লুটপাট, অত্যাচার ও কুফরী। তবে আল্লাহ তাআলা জানতেন যে, মানবজাতির মধ্যে কিছু মানুষ হবে নবী, সৎ, সত্যবাদী, ইবাদতকারী, মুজাহিদ, এবং সৎকর্মশীল যারা তাঁর পথে কাজ করবে।

এই আয়াতগুলি ফেরেশতাদের আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের আচরণের আদব প্রকাশ করে, যেখানে তারা বলেছিল: "**আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়**'।" এরপর তারা আল্লাহ তাআলার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করেছে।

এ থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের উচিত যে বিষয়ে সে জানে না, সেখানে 'আল্লাহ তাআলা জানেন' এমন বলা, এবং যা জানে না, সে বিষয়ে অহংকার বা গর্ব করা থেকে বিরত থাকা। এভাবে মানুষ ফেরেশতাদের সদাচরণের অনুকরণ করতে পারে। এছাড়া, জ্ঞান অর্জনের পর আল্লাহ তাআলাকে সম্মান করা এবং নিজের অজ্ঞতার অনুভূতি রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই আয়াতগুলি নিশ্চিত করে যে, যেসব জিনিস আল্লাহর সৃষ্টির জ্ঞানের বাইরে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু গায়েব, তা আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের বাইরে নয়। বরং, আল্লাহ তাআলা জানেন, মাখলুক যা প্রকাশ করে এবং যা তারা গোপন রাখে। আল্লাহ বলেন: "**আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় আমি আসমান যমীনের গায়েব জানি। আরও জানি যা তোমরা ব্যক্ত কর এবং যা তোমরা গোপন করতে**।" আল্লাহ তাআলার জ্ঞান সম্পর্কে জানার দাবি হলো আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা। আর মানুষের উচিত আত্ম-নিরীক্ষণ, নিজেকে পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিটি ছোট-বড় কাজে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা, যেন তারা অকল্যাণ থেকে দূরে থাকতে পারে এবং কল্যাণ লাভ করতে পারে।

﴿وَإِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٤ وَقُلۡنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسۡكُنۡ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلۡجَنَّةَ وَكُلَا مِنۡهَا رَغَدًا حَيۡثُ شِئۡتُمَا وَلَا تَقۡرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٣٥ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيۡطَٰنُ عَنۡهَا فَأَخۡرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِۖ وَقُلۡنَا ٱهۡبِطُواْ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوّٞۖ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٖ ٣٦ فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٖ فَتَابَ عَلَيۡهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٧ قُلۡنَا ٱهۡبِطُواْ مِنۡهَا جَمِيعٗاۖ فَإِمَّا يَأۡتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدٗى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٣٨ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٣٩﴾

অর্থ: **[আর স্মরণ করুন, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল; সে অস্বীকার করল ও অহংকার করল। আর সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।* আর আমি বললাম, 'হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তা থেকে আহার কর স্বাচ্ছন্দ্যে, তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।* অতঃপর শয়তান সেখান থেকে তাদের পদস্খলন ঘটালো এবং তারা যাতে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল, আর আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রু রূপে নেমে যাও। আর তোমাদের জন্য যমীনে রয়েছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবাস ও ভোগ-উপকরণ'।* তারপর আদম তার রবের কাছ থেকে কিছু বাণী পেলেন। অতঃপর আল্লাহ তার তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনিই তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।* আমি বললাম, 'তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না'।* আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।]** (আয়াত নং: ৩৪-৩৯)।

এই আয়াতগুলি আল্লাহ তাআলার কাছে মানবজাতির স্থান ও মর্যাদা প্রকাশ করেছে। কেননা আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের আদেশ দিয়েছেন যে তারা তাদের পিতা আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করুক, তাকে সম্মান জানিয়ে এবং আল্লাহর ইবাদত স্বরূপ। কারণ আল্লাহর প্রতি আনুগত্যই তাঁর ইবাদত। এছাড়া, এই আয়াতগুলো ফেরেশতাদের আল্লাহর আদেশ পালন করার দৃঢ়তা এবং তাদের কোনো আপত্তি ছাড়া তা সম্পাদন করার বিষয়টিও তুলে ধরে, যা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের গুরুত্বকে প্রকাশ করে। এটা এ মর্মে উপলব্ধি করায় যে, আল্লাহর আদেশকে মেনে চলা ও তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করা যুক্তির ঊর্ধ্বে থাকা উচিত, এবং আল্লাহর বাণী ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও অনুসরণ নিশ্চিত করা উচিত। কারণ আল্লাহর বাণীই চূড়ান্ত এবং মানুষের বুদ্ধি সীমাবদ্ধ। আয়াতগুলি থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইবলিস সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল তার অহংকারের কারণে, ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যদিকে, বাকি ফেরেশতারা আল্লাহর আদেশ মেনে সিজদা করেছিলেন এবং সেজন্য তারা সম্মানিত হন।

বস্তুত অহংকার মানুষের ভালো কাজের পথে বাধা সৃষ্টি করে। কারণ এটি তাকে তার উপকারিতা, সাফল্য ও মুক্তি থেকে বঞ্চিত করে। যেমন কিছু লোক যারা রাসূলদের দেখেছে এবং তাদের উপর প্রমাণ ও দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তেমনি মক্কার কাফেরদের মধ্যে যারা অহংকার করেছিল, যদিও তারা সত্য জানতো, তারা আমাদের নবী মুহাম্মদ *(সা.)*-কে দেখেছিল, তাঁকে জানতো এবং তাঁর প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে অবগত ছিল। তারা জানত যে, তিনি কতটা বিশ্বাসী, কেমন সুন্দর গুণাবলী ও চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, এবং নবুয়ত পাওয়ার পূর্বে ও পরেও তাঁর ভদ্রতা ও আত্মবিশ্বাস কত উঁচু ছিল।

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তাআলা কথা বলেন মর্মে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, আদেশ ও নিষেধ আল্লাহ তাআলারই, এবং তিনি যা করেন তা সম্পর্কে তাকে কোনো প্রশ্ন করা যায় না, বরং বান্দাদেরকেই প্রশ্ন ও জবাবদিহিতার সম্মুখীন

করা হবে। আল্লাহর আদেশ ও নিষেধে অসীম প্রজ্ঞা রয়েছে। তদুপরি, এটি সৃষ্টির সীমিত জ্ঞানকে তুলে ধরে।"

এই আয়াতগুলি নির্দেশ করে যে, আদম এবং তার স্ত্রীর মূল বাসস্থান ছিল জান্নাত, যা মৃত্যুর পর যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস এবং সৎ কাজের মাধ্যমে আনুগত্য করবে, তাদের জন্য জান্নাতে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে। এছাড়া এই আয়াতগুলি জান্নাতে খাওয়ার সুবিধা এবং তার বিশালতা প্রমাণ করে, যেখানে খাবার হবে উপভোগ্য এবং সুস্বাদু। তাছাড়া, সেখানে অবাধে চলাচল করা যাবে এবং সেখানে থাকা সমস্ত কিছু উপভোগ করা যাবে, যেমন আল্লাহ বলেছেন: "**এবং তা থেকে আহার কর স্বাচ্ছন্দ্যে, তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী**।"

এই আয়াতগুলোতে স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলার হিকমতে দাবি হলো: তিনি তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করবেন। যেমন আদম আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি ওই গাছ থেকে খেতে পারবেন না। এতে পরীক্ষা ও শাস্তির পরিণতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা সাধারণভাবে বোঝায় যে, আল্লাহর আদেশ অমান্য করা মানুষের নিজের প্রতি অত্যাচারের শামিল। তাই তার জন্য আল্লাহর আদেশ পালন করা এবং নিষেধাজ্ঞা থেকে বাঁচা অপরিহার্য। আর যদি নিষেধের কারণ না জানা থাকে, তবে তার সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত নয়, কারণ আল্লাহর আদেশে অগণিত হিকমত রয়েছে।

আয়াতগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শয়তান মানবজাতির শত্রু, এবং এটি শুরু হয়েছিল যখন আল্লাহ তাআলা আমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "**অতঃপর শয়তান সেখান থেকে তাদের পদস্খলন ঘটালো এবং তারা যাতে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল**।" এতে তার পরবর্তী বংশধরের জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা শয়তানকে নিজেদের শত্রু হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার প্ররোচনা ও প্রতারণা থেকে সাবধান থাকে, যা তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিতে পারে।

আল্লাহ তাআলা সেই অবাধ্যতার শাস্তি সম্পর্কে বলেছেন: "**আর আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রু রূপে নেমে যাও।**" এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, জান্নাতে শত্রুতা ও বিদ্বেষের স্থান নেই, বরং এটি সুখ ও প্রশান্তির স্থল, আর শত্রুতা ও বিরোধিতার স্থান হলো পৃথিবী। এই আয়াতগুলো দ্বারা মানবজাতির উপর প্রমাণ স্থাপিত হয়েছে যে, তাদের প্রথম শত্রু হলো শয়তান, এবং তার শয়তানি ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে মানুষকে প্ররোচনা করা, পাপকে সুশোভিত করে উপস্থাপন করা এবং তা করতে প্রবৃত্তি জাগানোর জন্য আকর্ষণীয় যুক্তি প্রদান করা। এজন্য শয়তান থেকে সাবধান থাকা জরুরি, যাতে মানুষকে জান্নাত থেকে দূরে না ঠেলে দেয়, যেমন আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাত থেকে বের করেছিল। আল্লাহ বলেন: "**আর আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রু রূপে নেমে যাও। আর তোমাদের জন্য যমীনে রয়েছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবাস ও ভোগ-উপকরণ**'।"

আল্লাহর বাণী: "**আর তোমাদের জন্য যমীনে রয়েছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবাস ও ভোগ-উপকরণ।**" এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, আদম সন্তান এবং শয়তান উভয়েই পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বসবাস করবে, যা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ জীবনকাল পর্যন্ত, অর্থাৎ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, এবং মানবজাতির কিয়ামত আসা ও পৃথিবী শেষ হওয়া পর্যন্ত। এটি একটি অস্থায়ী বসবাস, যা আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

আয়াতে উল্লেখিত 'إلى حين' (এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) শব্দটি মনকে ভাবায় যে, দুনিয়া একটি উপভোগ্য বস্তু, তবে তা সীমিত সময়ের জন্য; দুনিয়া একটি কাজের জায়গা, তবে তা সময়সীমিত; এবং শয়তান, যে আমাদের শত্রু, সে আমাদের সাথে থাকবে, কিন্তু শুধুমাত্র এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তাই তাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শত্রু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং সেই সময় পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, তবে তা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। 'إلى حين' (এক

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) আমাদের জন্য শক্তি, আশাবাদ এবং একটি পথ হতে পারে, যা আমাদের যেকোনো বাধা কাটিয়ে জান্নাতের পথে পৌঁছানোর সহায়তা করবে।

অতঃপর, আল্লাহ তাআলার রহমত ও যত্ন মানুষের প্রতি অবিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে, যা তাকে পরিবেষ্টন করে রাখে। "**তারপর আদম তার রবের কাছ থেকে কিছু বাণী পেলেন। অতঃপর আল্লাহ তার তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনিই তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।**" আদম আলাইহিস সালাম তার ভুল সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহশীল ছিলেন। আল্লাহ তাকে কিছু কথার মাধ্যমে তওবা শিখিয়েছিলেন, যেখানে আদম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন: (ربنا ظلمنا أنفسنا) 'হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের উপরে জুলুম করেছি।' তিনি ভুল স্বীকার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তাআলা তার তওবা গ্রহণ করলেন। এই রহমত, যত্ন, অনুগ্রহ ও সম্মান যা আল্লাহ এই মানুষের প্রতি দেখিয়েছেন, তার জন্য মানুষের রব ও তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

এরপর আল্লাহ তাআলা আয়াতটির শেষে তাঁর দুইটি মহান গুণ প্রকাশ করেছেন: **'নিশ্চয়ই তিনি তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।'** আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে জানান যে, তিনি তওবা গ্রহণকারী; যারা তওবা করে, ক্ষমা চায় ও ফিরে আসে। এবং তিনি পরম দয়ালু। তাঁর এই গুণগুলোই বান্দাকে তওবা করতে ও তাঁর কাছে ফিরে আসতে উৎসাহিত করে। বান্দার উচিত আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহে আশা রাখা, তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা, এবং তাঁর শাস্তি ও নেয়ামত হারানোর ভয়ে তাকে ভয় করা।

এই আয়াতগুলি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন উপরের স্থান থেকে নিচে নামার জন্য, অর্থাৎ জান্নাত থেকে পৃথিবীতে, যাতে এই নামার মাধ্যমে মানব ও জিন জাতির জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়, যা শয়তান দ্বারা আদম আলাইহিস সালামের

প্ররোচনার ফলে ঘটেছে। এটি সেই সময়ের কথা, যখন আদম আলাইহিস সালাম ওই গাছটি থেকে খেয়েছিলেন, যা থেকে আল্লাহ তাকে খেতে নিষেধ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রু রূপে নেমে যাও।'**

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর বান্দাদের অনুসরণ করে, তাদের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে, আর তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি তাদের জন্য রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন, যা সঠিক ও সরল পথের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ বলেন: "**অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না'।* আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।**"

সুতরাং আল্লাহ তাআলার শরীয়ত হলো সেই হিদায়াত, যা মানবজাতিকে অন্যায় ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং তাদের জন্য কল্যাণ আনে, যদি তারা আল্লাহর হিদায়াত মেনে চলে ও তাঁর আনুগত্য করে। আর যারা অস্বীকার করে ও আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে, তাদের জন্য পরিণতি হবে জাহান্নাম, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

এই মহান স্রষ্টা ও অধিপতি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের স্বীয় হিদায়াত ও পথের নির্দেশনা প্রদর্শন করেন, তাওবা গ্রহণ করেন এবং যারা ক্ষমা চায় ও তাঁর আদেশ পালন করে তাদেরকে ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করেন। নিজ অনুগ্রহ ও দয়ার মাধ্যমে তাদের প্রতি করুণা করেন। তিনিই তাদের মালিক এবং যা কিছু তাদের কাছে রয়েছে তারও মালিক। তাই একজন বান্দার, যে নিজেও আল্লাহর দাস, তার উচিত আল্লাহর অন্য বান্দাদের প্রতি দয়া, নির্দেশনা, ক্ষমা ও সহানুভূতির সাথে আচরণ করা। কারণ সে তাদের মালিক নয়, বরং তাদের মতই আল্লাহর দাস।

পরিশেষে এই আয়াতগুলো শেষ হয় কাফিরদের জন্য কঠোর শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে: "**আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।**" এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সতর্কবাণী ও হুমকি, যিনি কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। যাতে মানুষ কুফরি থেকে সাবধান হয় এবং এর পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হয়। কারণ কুফরি মানুষকে ভয়াবহ ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়, যার পরিণতি হবে চিরকাল আগুনে দগ্ধ হওয়া।

﴿يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِيٓ أُوفِ بِعَهۡدِكُمۡ وَإِيَّيَ فَٱرۡهَبُونِ ٤٠ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلۡتُ مُصَدِّقٗا لِّمَا مَعَكُمۡ وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ كَافِرِۭ بِهِۦۖ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗا وَإِيَّيَ فَٱتَّقُونِ ٤١ وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٤٢ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣ * أَتَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبِرِّ وَتَنسَوۡنَ أَنفُسَكُمۡ وَأَنتُمۡ تَتۡلُونَ ٱلۡكِتَٰبَۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ٤٤ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ ٤٥ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمۡ وَأَنَّهُمۡ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ٤٦﴾

অর্থ: ***[হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আমার নিয়ামতকে স্মরণ কর, যে নিয়ামত আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর, তাহলে আমি তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর কেবল আমাকেই ভয় কর।* আর আমি যা নাযিল করেছি তোমরা তাতে ঈমান আন। এটা তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যতা প্রমাণকারী। আর তোমরাই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। আর তোমরা শুধু আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর।* আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-বুঝে সত্য গোপন করো না।* আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত দাও এবং রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ কর।* তোমরা কি মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজদেরকে ভুলে যাচ্ছ? অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত কর। তোমরা কি বুঝ না?* আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন।* যারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয় তাদের রব-এর সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবে এবং নিশ্চয় তারা তারই দিকে ফিরে যাবে।]*** (আয়াত নং ৪০-৪৬)।

এরপর কুরআনের বর্ণনা বানী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের বিষয়টি তুলে ধরে। এখানে তাদের সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে তারা স্মরণ করতে পারে এবং ঈমানদার ও অন্যদের জন্যও আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ স্পষ্ট হয়ে

ওঠে। "ইসরাইল" বলতে ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) কে বোঝানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বানী ইসরাইলের প্রতি তাঁর অসংখ্য নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চুক্তি পূরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে আল্লাহও তাঁদের প্রতি প্রতিশ্রুত পুরস্কার অক্ষুণ্ণ রাখেন: **"হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আমার নিয়ামতকে স্মরণ কর, যে নিয়ামত আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর, তাহলে আমি তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর কেবল আমাকেই ভয় কর।"** এখানে সম্বোধন করা হয়েছে "يا" (হে) দিয়ে, যা আরবিতে মনোযোগ আকর্ষণ ও গুরুত্ব প্রদান বোঝায়। এটি ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ তাদের সতর্কভাবে শোনার ও উপলব্ধি করার আহ্বান জানাচ্ছেন। এরপর আল্লাহ বানী ইসরাইলকে তাদের নবী ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর দিকে সম্পর্কিত করেছেন, যিনি "ইসরাইল" নামে পরিচিত। "হে বনী ইসরাইল!"—এই সম্বোধন তাদের প্রতি আল্লাহর দয়ার এক নিদর্শন, কারণ এতে সম্মান ও সৌজন্য প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁর অসংখ্য নিয়ামতের কথা, যা তারা খুব ভালো করেই জানত। পরবর্তী আয়াতগুলোতে এই নিয়ামতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

এরপর, আল্লাহ তাদের প্রতি তাঁর অসংখ্য নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর তাঁর সাথে করা চুক্তি পূরণের নির্দেশ দেন, যাতে তিনি তাদের প্রতিশ্রুত পুরস্কার দান করেন। এখানে আল্লাহর অসীম দয়া ও করুণা প্রকাশ পেয়েছে, কারণ তিনি তাঁদের একটি প্রভাবশালী ও সুসংগঠিত পদ্ধতিতে আহ্বান জানিয়েছেন: প্রথমে সম্বোধন করেছেন: "হে বনী ইসরাইল!"—যাতে তারা মনোযোগ দেয়। তারপর তাঁদের নবী ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, যা তাঁদের জন্য এক সম্মান। এরপর তাঁদের প্রতি প্রাপ্ত আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করিয়েছেন, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়। অবশেষে, তাঁদের চুক্তি পূরণের নির্দেশ দিয়েছেন, যার প্রতিদান হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতিশ্রুত পুরস্কার।

এটি ইঙ্গিত করে যে, বক্তব্য, শিক্ষা, দাওয়াত, স্মরণ করানো এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সংশোধনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ও সুসংগঠিত উপস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি গাফিল ব্যক্তিকে তার গাফলতি থেকে জাগ্রত করে। আল্লাহ তাআলার বক্তব্যেও কোনো প্রকার আক্রমণাত্মক ভাষা নেই। এটি শিক্ষা দেয় যে, নসিহতকারীর উচিত নয় তার উপদেশকে তিরস্কার বা আক্রমণ দিয়ে শুরু করা। বরং তার উচিত শ্রোতার মধ্যে মনোযোগ ও সাড়া দেওয়ার আগ্রহ জাগিয়ে তোলা। এছাড়াও, মানুষের প্রতি আহ্বান জানানোর সময় নম্রতা ও প্রিয় ভাষা ব্যবহারের গুরুত্বও এখানে ফুটে উঠেছে। যদি আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের এত নম্র ও প্রিয় ভাষায় সম্বোধন করেন, তবে বান্দাদের মধ্যে একে অপরের প্রতি এমন আচরণ করা আরও বেশি যুক্তিযুক্ত।

এই মহান আয়াতের অন্যতম উপকারিতা হলো, এটি একটি সার্বিক নির্দেশনা বহন করে, যার পরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আসে। কারণ, সাধারণ নির্দেশনা বুঝতে পারলে শ্রোতা বা পাঠক পরবর্তী বিস্তারিত জানার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় পদ্ধতি—যা চিন্তা, গভীর উপলব্ধি এবং সত্যের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য মনের দরজা খুলে দেয়। এছাড়াও, নিয়ামতের স্মরণ করানো শ্রোতার মধ্যে দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও লজ্জার অনুভূতি জাগ্রত করে। এটি তাকে নির্দেশনা শুনতে, মেনে চলতে এবং তা অনুসারে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে—যে ব্যক্তির হৃদয়ে রোগ ও হিংসা নেই সে ছাড়া।

বনি ইসরাইলের ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ বহন করে। কারণ, তিনি মক্কায় উম্মী (নিরক্ষর) হিসেবে বসবাস করতেন- যিনি পড়তে বা লিখতে জানতেন না। এভাবে আল্লাহ তাআলা তার সম্পর্কে ইতিহাসের এই বৃত্তান্ত সম্পর্কে যেকোনো পূর্বজ্ঞান বা অভিজ্ঞতার ধারণাকে অস্বীকার করেছেন, যা বনি ইসরাইলের জানা বিষয়। এছাড়াও, এই বক্তব্যের মাধ্যমে পূর্ববর্তী ধর্মের অনুসারীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া নির্দেশনা এটাই

প্রমাণ করে যে, কুরআন মাজিদ ও এই দ্বীন সকল মানুষের জন্য—এমনকি যাদের কাছে পূর্ববর্তী রাসূলগণ এসেছিলেন, যেমন বনি ইসরাইল।

এই মহান আয়াতে তাদেরকে সাধারণ নিয়ামতের কথা স্মরণ করানো হয়েছে এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের চুক্তি পূরণের দাবি করা হয়েছে। এই চুক্তি হলো: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করা, যাতে তারা আল্লাহ তাআলার পূর্ণ প্রতিদান লাভ করতে পারে। এরপর তাদেরকে আল্লাহ তাআলাকে ভয় ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, ভয় মানুষকে আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলেছেন: **"আর আমি যা নাযিল করেছি তোমরা তাতে ঈমান আন। এটা তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যতা প্রমাণকারী। আর তোমরাই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।"** এখানে আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে যা অবতীর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ কুরআন মাজিদে ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। এটি তোমাদের কাছে থাকা কিতাবের সত্যায়নকারী—অর্থাৎ, এটি তোমাদের কাছে থাকা পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেগুলোর বিরোধী নয়।

এটি ইঙ্গিত করে যে, আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টানরা) তাদের কাছে থাকা পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের মাধ্যমে কুরআন মাজিদের সত্যতা চিনতে পারে। ফলে এটি তাদের জন্য মুহাম্মাদ সাঃ-এর সত্যতার একটি নিদর্শন—যিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।

সত্য প্রকাশিত হওয়া এবং তা নিশ্চিত হওয়ার পর, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই সত্যের প্রতি অবিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন: **"আর তোমরাই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না।"** এটি বক্তব্য ও প্রমাণের ধারাবাহিকতা ও পর্যায়ক্রমের একটি উদাহরণ। এরপর তিনি তাদের সাথে কথোপকথনে ধাপে ধাপে এগিয়ে দুনিয়ার মিথ্যা

স্বার্থকে আল্লাহর আয়াতের উপর প্রাধান্য না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন: **"আর আমার আয়াতের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করো না এবং শুধু আমাকেই ভয় করো।"** তিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, আল্লাহর আয়াতের তুলনায় যেকোনো মূল্যই নগণ্য। কেননা, আল্লাহর আয়াতই হলো সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যবান।

এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর বর্ণনা পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য রয়েছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, চুক্তি পূরণ ও তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং মুহাম্মাদ সাঃ-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছেন। এরপর তিনি অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যে, এটি তোমাদের কাছে থাকা কিতাবের সাথে সাংঘর্ষিক নয়; বরং তা সত্যায়নকারী। এরপর তিনি সত্য জানার পরও আল্লাহর আয়াতের মূল্য হ্রাস করতে নিষেধ করেছেন এবং একটি উদাহরণ দিয়েছেন: তোমরা আল্লাহর আয়াত ও প্রমাণের উপর নিজেদের কল্পনাকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে এমন কাজ করছ, যেন তা দিয়ে তুচ্ছ কিছু ক্রয় করছ। নফসের প্রবৃত্তি ও তোমাদের যেকোনো কল্পনাকে আল্লাহর আয়াত ও নির্দেশের উপর প্রাধান্য দেওয়া হলো আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করার শামিল। এটি নিশ্চিত করে যে, আল্লাহর পণ্য অত্যন্ত মূল্যবান। কোনো মুমিনের উচিত নয় এর বিপরীত কোনো কিছুকে প্রাধান্য দেওয়া- এই ভেবে যে, তা তার জন্য উপকারী হবে। কারণ, আল্লাহর আয়াত এতই মহান যে, তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করা যায় না। আল্লাহর আয়াত, তাঁর ওয়াদা, শাস্তি ও চিরস্থায়ী জান্নাতের তুলনায় অন্য সব কিছুই নগণ্য ও তুচ্ছ।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন: "শুধু আমাকেই ভয় করো।" কারণ, আল্লাহর তাকওয়া (ভয়) আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে এবং তাঁর আয়াতের প্রতি ঈমানকে সামান্য মূল্যের উপর প্রাধান্য দিতে

বাধ্য করে। পক্ষান্তরে, যদি কেউ সামান্য মূল্যকে বেছে নেয়, তবে তা তার হৃদয় থেকে তাকওয়া হারিয়ে যাওয়ার প্রমাণ।

এ থেকে বোঝা যায় যে, তাকওয়া আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে এবং তাকওয়ার অভাব পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি তার তাকওয়ার মাত্রা বুঝতে পারে তার আনুগত্য, পাপের ভয় এবং আল্লাহর রহমতের প্রতি লোভের মাধ্যমে।

এরপর বনি ইসরাইলকে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করতে এবং সত্য গোপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **" আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-বুঝে সত্য গোপন করো না।"** এই মহান আয়াত ইঙ্গিত করে যে, তারা সত্যকে জানে এবং নিশ্চিতভাবে তা বুঝে। কারণ, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মিশ্রণ ঘটানো শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যারা উভয়কে সত্যিকার অর্থে জানে। এটি তাদের কাছে তাদের জ্ঞানের সত্যতা প্রকাশ করে, যা মুহাম্মাদ সাঃ-এর নবুওয়াতের সত্যতা নিশ্চিত করে। তারা তাকে চেনে যেমন তারা নিজেদের চেনে, কারণ তাদের কাছে যে সত্য রয়েছে, তা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর দ্বারা আনা সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ থেকে বোঝা যায় যে, সত্য জানা ব্যক্তির উচিত সতর্ক থাকা এবং সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করা বা তা গোপন করা থেকে দূরে থাকা। যাতে এর মাধ্যমে সে যে উপকার আশা করে, তা অর্জন করতে পারে।

এরপর ধারাবাহিকভাবে নির্দেশ ও ব্যাখ্যায় ইবাদত পালনের আদেশ দেওয়া হয়েছে: **"তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।"** এখানে সালাতের কথা একবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং রুকু করার মাধ্যমে আবারও এর প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এটি সালাতের সাধারণ গুরুত্ব এবং বিশেষভাবে এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রতি জোর দেওয়ার একটি পুনরাবৃত্তিমূলক

নিশ্চয়তা। এই সুন্দর শব্দচয়নের মাধ্যমে শব্দের পুনরাবৃত্তি এড়ানো হয়েছে এবং এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি এটিও স্পষ্ট করে যে, অংশের মাধ্যমে সমগ্রকে বোঝানো হলে তা সমগ্রকেই অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ, সমগ্র ছাড়া কোনো ইবাদত সম্পূর্ণ হয় না এবং অংশ সমগ্রের বিকল্প হতে পারে না। অংশের মাধ্যমে প্রকাশ করা কখনোই সমগ্রকে বাদ দেওয়া বোঝায় না, যা ছাড়া এর সত্যতা অর্জিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, সালাতকে সিজদার মাধ্যমে প্রকাশ করা মানে এই নয় যে, সালাত ছেড়ে শুধু সিজদা আদায় করলেই হবে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা সুরা আল-ফুরকানে বলেছেন: "আর যারা তাদের রবের জন্য সিজদা ও দাঁড়িয়ে রাত যাপন করে।"

এরপর তাদের এমন আচরণের প্রতি আরেকটি তিরস্কারমূলক বক্তব্য এসেছে, যেখানে তারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ করে, কিন্তু নিজেরা তা পালন করে না। এর মধ্যে তাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর আনীত বিধান মেনে না চলাও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: " **তোমরা কি মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজদেরকে ভুলে যাচ্ছ? অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত কর। তোমরা কি বুঝ না?**" নিঃসন্দেহে সৎকাজের মধ্যে রয়েছে নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর আনীত বিধান মেনে চলা। মদিনার ইহুদিরা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের, যারা মদিনাবাসী হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, বলত: "তুমি যা বিশ্বাস করছ, তা অবলম্বন করো এবং এই ব্যক্তি তোমাকে যা আদেশ করেন, তা মেনে চলো। কারণ, তার আদেশ সত্য।" তারা এই ব্যক্তি দ্বারা মুহাম্মাদ সাঃ-কে বুঝাত। তারা মানুষকে এই নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজেরা তা পালন করত না।[৯]

---

(৯) দেখুন: আল-জামে লি আহকামিল কুরআন: *(১/২৪৮)*।

এ থেকে বোঝা যায় যে, কোনো ব্যক্তির এ বিষয় থেকে সতর্ক হওয়া গুরুত্বপূর্ণ যে, সে ভালো কাজের আদেশ করবে, কিন্তু নিজে তা পালন করবে না, অথবা কেউ তাকে ভালো কাজের নির্দেশ দিলে তা পালন করতে অস্বীকার করবে। আল্লাহ এমন ব্যক্তির কাজকে অজ্ঞতার সাথে তুলনা করেছেন: "তোমরা কি বুঝ না?" এটি এমন ব্যক্তির মতো, যে বুদ্ধি ব্যবহার করে না এবং তার বুদ্ধি থেকে কোনো উপকার লাভ করে না।

এ থেকে বোঝা যায় যে, সত্যকে উপলব্ধি করা এবং নম্রতা প্রদর্শন করা, নফসের প্রবৃত্তিকে দমন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি সত্য ও কল্যাণ সম্পর্কে জানে, কিন্তু তা গ্রহণ করে না অথবা আদেশ করে কিন্তু নিজে পালন করে না, সে এমন ব্যক্তির মতো, যে বুদ্ধি ব্যবহার করে না এবং তার বুদ্ধি থেকে কোনো উপকার লাভ করে না।

এরপর আল্লাহ তাআলা সত্যের পথে চলা ও সৎকাজ পালনের জন্য সর্বোত্তম সহায়ক হিসেবে ধৈর্য ও সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: **"ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই এটি বিনয়ী ছাড়া অন্যদের জন্য কঠিন।"** এটি ইঙ্গিত করে যে, ধৈর্য সত্যের পথে অবিচল থাকা, সত্য গ্রহণ করা এবং এর উপর দৃঢ় থাকার জন্য একটি মহান মাধ্যম। কারণ, নফসের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। একইভাবে, মানুষ ও জিন শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়- আনুগত্যের উপর এবং পাপ থেকে দূরে থাকার বিষয়ে ধৈর্যের মাধ্যমে। তেমনিভাবে সালাতও আল্লাহ তাআলার সাহায্য লাভের একটি মহান মাধ্যম। এটি সালাত আদায়কারীকে ভালো কাজে সহায়তা করে এবং মন্দ থেকে দূরে রাখে। এটি বিনয়ী ব্যক্তিদের জন্য সহজ ও হালকা, কিন্তু যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই, তাদের জন্য কঠিন ও কষ্টদায়ক। এটি ইঙ্গিত করে যে, যাদের অন্তরে বিনয় নেই, তারা সালাত আদায়কে কঠিন ও কষ্টকর বলে মনে করে।

খুশু (বিনয়) হলো ভয়, প্রশান্তি, নম্রতা এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি হৃদয়ের আনুগত্য। এটি ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ তাআলার পর মুসলিমের জন্য সর্বোত্তম সহায়ক হলো ধৈর্য ও সালাত। নবীজি সাঃ যখন কোনো সমস্যায় পড়তেন, তখন সালাতের দিকে ধাবিত হতেন। হুযাইফা রাঃ বলেছেন: **(রাসূলুল্লাহ সাঃ যখন কোনো সমস্যায় পড়তেন, তখন সালাত আদায় করতেন।)** মুসনাদে আহমাদ।

﴿يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ٤٧ وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ ٤٨ وَإِذۡ نَجَّيۡنَٰكُم مِّنۡ ءَالِ فِرۡعَوۡنَ يَسُومُونَكُمۡ سُوٓءَ ٱلۡعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبۡنَآءَكُمۡ وَيَسۡتَحۡيُونَ نِسَآءَكُمۡۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآءٞ مِّن رَّبِّكُمۡ عَظِيمٞ ٤٩ وَإِذۡ فَرَقۡنَا بِكُمُ ٱلۡبَحۡرَ فَأَنجَيۡنَٰكُمۡ وَأَغۡرَقۡنَآ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ وَأَنتُمۡ تَنظُرُونَ ٥٠﴾

অর্থ: **[হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আমার নিআমতকে স্মরণ কর, যে নিআমত আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এবং নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।* আর তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না। আর কারো পক্ষ থেকে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং কারও কাছ থেকে কোন বিনিময় নেয়া হবে না। আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।* আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদেরকে ফির'আউনের দল থেকে রক্ষা করেছিলাম। তারা তোমাদেরকে কঠিন আযাব দিত। তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে যবেহ করত এবং তোমাদের নারীদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। আর এতে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ছিল মহা পরীক্ষা।* আর যখন তোমাদের জন্য আমি সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলাম, অতঃপর তোমাদেরকে নাজাত দিয়েছিলাম এবং ফির'আউন দলকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, আর তোমরা দেখছিলে।]** (আয়াত নং: ৪৭-৫০)।

এই আয়াতগুলোতে বারবার বনি ইসরাইলকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের কথা স্মরণ করানো হয়েছে ও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এটি মুমিনদেরকে তাদের পূর্ববর্তীদের ঘটনা থেকে শিক্ষা দেওয়ারও একটি মাধ্যম। এর মধ্যে রয়েছে বনি ইসরাইলকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার কথা। এ থেকে আরেকটি সত্য উদ্ঘাটিত হতে পারে, তা হলো: এই কুরআন মাজিদ যদি আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে তাদেরকে বলতেন

না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তিনি কখনোই তাদেরকে এমন প্রশংসা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন না। ফলে এটি নিশ্চিত করে যে, এই বাণী আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এবং এই নবী সাঃ সত্যবাদী, তিনি মনগড়া কথা বলেন না; বরং এটি তার প্রতি ওহী হিসেবে প্রেরিত হয় এবং তিনি তা অবিকলভাবে প্রচার করেন।

এই কুরআনিক প্রসঙ্গটি বারবার স্মরণ করানোর গুরুত্বকে তুলে ধরে—উপদেশ দেওয়া, ভয় দেখানো এবং পাপের পরিণতি থেকে সতর্ক করা, পাশাপাশি সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতির বিপদ সম্পর্কে সচেতন করা।

এই কুরআনি প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় যে, নসিহত দেওয়া, ভয় প্রদর্শন এবং পাপের পরিণতি সম্পর্কে বারবার সতর্ক করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে, সত্য প্রত্যাখ্যানের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কেও।

এরপর তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর আনীত বিধান মেনে চলার সাথে সম্পর্কিত। এই নির্দেশটি একটি সতর্কতা ও স্মরণ করানোর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে: **"আর তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না।"** এখানে আল্লাহ তাআলা সেই দিনের বিশেষত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যার পরিণতি এত ভয়াবহ যে, তা বর্ণনাতীত। এই পদ্ধতিতে সেই ভয়াবহ দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেদিন কেউ কারো জন্য কিছুই করতে পারবে না—শুধুমাত্র তার নিজের আমল ছাড়া। সেদিন কোনো বন্ধু, আত্মীয়, ধনী বা গরিব কেউ কারো আমলের সুফল ভোগ করতে পারবে না। প্রত্যেকে তার নিজের আমলের ফল ভোগ করবে, তবে যা আল্লাহ চান তা ছাড়া।

এরপর আল্লাহ তাআলা সেই দিনের আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করেছেন: **"আর কারো পক্ষ থেকে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না।"** অর্থাৎ, কাফিরদের পক্ষ থেকে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, যাদের কুফরের পাপ এত বিশাল যে, আল্লাহর ক্ষমা ও তাদের সুপারিশ গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। **"এবং কারও কাছ থেকে কোন বিনিময় নেয়া হবে না।" "আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।"** অর্থাৎ, কেউ কারো জন্য কোনো সাহায্য বা সমর্থন দিতে পারবে না। এই শাস্তি প্রমাণ করে যে, যারা নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর প্রতি ঈমান আনে না এবং তাঁর আনীত বিধান মানে না, সে কাফের। এমনকি পূর্ববর্তী আসমানি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও যারা তা মানে না তারাও। সুপারিশ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও এর প্রকারভেদ আকিদা বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়।

এই ধারাবাহিকতা শেষ পর্যন্ত আখিরাতের চূড়ান্ত বিচারের দিকে নিয়ে গেছে। সেদিনের বিশেষত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির কাজই একমাত্র বিবেচ্য হবে। সেদিন কারো পক্ষ থেকে কারো জন্য কোনো বিজয় বা সাহায্য থাকবে না, এবং কোনো মুক্তিপণও গ্রহণ করা হবে না। এই পরিস্থিতিতে বান্দার জন্য কর্তব্য হলো ভয় করা ও আত্মপর্যালোচনা করা। আর এটা স্মরণ করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর নির্ভরতা ও আশা ছিন্ন করতে হবে, যাতে সে সেদিনের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পেতে পারে। সেদিন কোনো গোত্র, বংশ, মর্যাদা, পুণ্যবান ব্যক্তির সন্তান হওয়া বা নবীর বংশধর হওয়া—কিছুতেই কাজে আসবে না। ব্যক্তির সামনে একমাত্র পথ হলো আল্লাহ ছাড়া সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা।

এটি শিক্ষাগত ও দাওয়াহের দৃষ্টিকোণ থেকে শেখায় যে, উপদেশ দেওয়ার সময় প্রথমেই আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করানো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সচেতন মানুষ এতে লজ্জিত হয়ে অনুগ্রহকারী মহান রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করে। এরপর নেক কাজ ও সত্য গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করা উচিত, যাতে মানুষ সত্যের প্রতি মনোযোগী হয় এবং

আন্তরিকতা অর্জন করে। শেষ ধাপে ভয় প্রদর্শন করা উচিত, যাতে উপদেশের প্রভাব আরও গভীর হয়।

তারপর ভয় প্রদর্শনের পর আল্লাহ তাআলা পুনরায় তাঁর নিয়ামতগুলোর স্মরণ করিয়ে দেন। এটি আল্লাহর রহমত ও করুণার প্রকাশ, যা প্রমাণ করে যে তিনি চান মানুষ সঠিক পথে ফিরে আসুক এবং তাঁর দিকে তাওবা করুক। তাই তিনি বিভিন্ন পদ্ধতিতে বারবার আহ্বান ও স্মরণ করান, যা এমন নয় যে অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়ে বিরক্তিকর হয়ে যায়, আবার এত সংক্ষিপ্তও নয় যে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই অসীম রহমতের চেয়ে বড় দয়া আর কী হতে পারে? এটি আল্লাহ তাআলার সুন্দর নাম ও শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর প্রকাশ, যা তাঁর রব্বানী করুণা ও মহত্ত্বের প্রমাণ। এরপর তিনি তাদেরকে ফেরাউনের জুলুম থেকে মুক্তির নিয়ামত স্মরণ করিয়ে দেন: **"যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের ওপর ভয়ানক নির্যাতন চালাত।"** ফেরাউন তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করত এবং কঠিন ও কষ্টকর কাজে বাধ্য করে তাদের ওপর নির্যাতন চালাত। এটি সংক্ষেপে ফেরাউনের অত্যাচারের বিবরণ, যাতে তারা পুরো বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ উপলব্ধি করতে পারে।

এরপর আসে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, যা তাদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য করে তোলে। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে যবেহ করত।"** এমন ভয়াবহ বিপর্যয়ের চেয়ে বড় দুর্দশা আর কী হতে পারে, যেখান থেকে আল্লাহ তাআলা তাদের মুক্তি দিয়েছেন? বরং, **"এবং তোমাদের নারীদেরকে বাঁচিয়ে রাখত।"** অর্থাৎ, তারা তাদের কন্যাদেরকে কেবল দাসত্ব ও সেবার জন্য জীবিত রাখত। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি তাদেরকে ফেরাউনের ভয়ানক নির্যাতন থেকে মুক্তি দিয়েছেন, যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করত, তাদের সন্তানদের রক্ত ঝরাত। **"এতে তোমাদের জন্য ছিল তোমাদের**

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহা পরীক্ষা।" এই মুক্তি আল্লাহ তাআলার এক মহান অনুগ্রহ, যা তাঁর সীমাহীন দয়া ও দানশীলতার প্রকাশ।

নিশ্চয় ভাষাশৈলীর পরিবর্তন, বৈচিত্র্য এবং পুনরাবৃত্তি মানুষের মনকে উদ্দীপিত করে, চিন্তা ও স্মরণ শক্তিকে জাগ্রত করে। এতে রয়েছে একদিকে উৎসাহ, অন্যদিকে সতর্কবার্তা- যেন মানুষ সঠিক পথের প্রতি আগ্রহী হয়।

এখানে মানুষের উচিত নিজেকে এবং অন্যদেরকে নির্দেশ দেওয়ার সময় নিয়ামতের কথা স্মরণ করা এবং স্মরণ করানো। তাকে স্মরণ করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে কত বিপদ, রোগ ও পরীক্ষা থেকে রক্ষা করেছেন, কতবার তার গুনাহ ঢেকে দিয়েছেন, কতবার তার শত্রুর দৃষ্টি থেকে তাকে লুকিয়ে রেখেছেন এবং তার নিরাপত্তা, সম্মান, সম্পদ ও ঈমান রক্ষা করেছেন। তাকে সেদিনের কথা স্মরণ করতে হবে এবং অন্যদেরও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, যেদিন কেউ কারো কাজের সুফল ভোগ করতে পারবে না এবং কেউ কারো সাহায্য করতে পারবে না। অতএব, নিয়ামতের সকল দিক ও সুখের মাধ্যমগুলো স্মরণ করানো হলো সত্যের দিকে ফিরে আসার একটি উপায়- আল্লাহর ইচ্ছায়।

এরপর আল্লাহ তাআলা আরও কিছু বিস্ময়কর নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: **"আর যখন তোমাদের জন্য আমি সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলাম, অতঃপর তোমাদেরকে নাজাত দিয়েছিলাম এবং ফির'আউন দলকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, আর তোমরা দেখছিলে।"** প্রথম নিয়ামত: সমুদ্রকে বিভক্ত করা, এটিকে দুভাগ করে পথ তৈরি করা। দ্বিতীয় বিস্ময়কর কুরআনিক নিয়ামত: তাদেরকে সমুদ্রের দুভাগের মাঝখান দিয়ে পার করা। তৃতীয় নিয়ামত: তাদেরকে ফেরাউন থেকে রক্ষা করা। চতুর্থ নিয়ামত: ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দেওয়া। পঞ্চম নিয়ামত: তারা সমুদ্রের বিভক্ত হওয়া, তাদের শত্রুর ধ্বংস, তাদের মুক্তি, নিরাপত্তা ও বিজয় প্রত্যক্ষ করেছিল।

এই মহান আয়াতটি আল্লাহর নিয়ামত ও তাঁর শক্তির প্রকাশ করে, যার সামনে কোনো সৃষ্টিই দাঁড়াতে পারে না। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ অহংকারী, অত্যাচারী ও জালিমকে ধ্বংস করতে সক্ষম। তিনি তাদের উপর কঠোর নজর রাখেন, এবং যখন তিনি শাস্তি দেন, তখন তা পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানের শাস্তি হয়। এ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য শক্তির সামনে অহংকার ও জুলুম করা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। এটি আরও ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ মজলুমের সাহায্য করতে সক্ষম। তাই মজলুমের উচিত একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করা- যিনি পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে শক্তি, ক্ষমতা, সাহায্য ও রহমত। আল্লাহ তাআলা সক্ষম যে, তিনি মহাবিশ্বের স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে গিয়েও কাজ করতে পারেন, যা তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি দুর্বলদেরকে শক্তিশালী করতে পারেন এবং তাদের শত্রুকে ধ্বংস করতে পারেন। এই সবকিছুই তাঁর প্রতি ভালোবাসা, ভয় ও আশা জাগ্রত করে। আল্লাহ তাআলার জন্য পৃথিবী বা আকাশে কিছুই অসম্ভব নয়।

﴿وَإِذۡ وَٰعَدۡنَا مُوسَىٰٓ أَرۡبَعِينَ لَيۡلَةٗ ثُمَّ ٱتَّخَذۡتُمُ ٱلۡعِجۡلَ مِنۢ بَعۡدِهِۦ وَأَنتُمۡ ظَٰلِمُونَ ٥١ ثُمَّ عَفَوۡنَا عَنكُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٥٢ وَإِذۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡفُرۡقَانَ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ٥٣﴾

অর্থ*: [**আর যখন আমি মূসাকে চল্লিশ রাতের ওয়াদা দিয়েছিলাম অতঃপর তোমরা তার যাওয়ার পর বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিলে, আর তোমরা ছিলে যালিম।* এর পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।* আর স্মরণ কর, যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দান করেছিলাম; যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ করতে পার।**] (*আয়াত নং ৫১-৫৩*)।

এরপর বনি ইসরাইলের ঘটনার আরেকটি পর্যায় বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে তারা একের পর এক নিয়ামত পাওয়ার পরও আল্লাহ ছাড়া বাছুরের পূজা করেছিল: **"আর যখন আমি মূসাকে চল্লিশ রাতের ওয়াদা দিয়েছিলাম অতঃপর তোমরা তার যাওয়ার পর বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিলে, আর তোমরা ছিলে যালিম।"** এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কীভাবে একটি সম্প্রদায় বা তার কিছু সদস্য আনুগত্যের উপর ধৈর্য ধারণ করতে ব্যর্থ হয়ে পথভ্রষ্ট হয়। তারা অন্যদের ধর্ম অনুকরণ করে বা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে। আল্লাহ তাআলা মুসাকে চল্লিশ রাতের জন্য অঙ্গীকার করেছিলেন, যাতে তিনি তাদের উপর তাওরাত নাযিল করেন। কিন্তু তারা এই সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার আগেই ধৈর্য হারিয়ে আল্লাহ ছাড়া বাছুরের পূজা শুরু করেছিল- তাওরাত নাযিলের অপেক্ষায় থাকাবস্থায়। এ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, তাড়াহুড়া ও এর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। তাড়াহুড়া করে কোনো কিছু অর্জনের চেষ্টা করা, যা আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পথের সাথে সাংঘর্ষিক, যেমন হারাম উপার্জন, প্রতারণা, ঘুষ ইত্যাদি- এগুলো মানুষের নিজের প্রতি জুলুম। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের শেষে এটিকে তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম হিসেবে উল্লেখ করেছেন: **"অতঃপর তোমরা তার যাওয়ার পর বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিলে, আর তোমরা ছিলে যালিম।"** এই গো-বাছুরের মূর্তিটি সামেরী নামক ব্যক্তি তাদের জন্য সোনা দিয়ে তৈরি করেছিল।

এরপরও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। এটি আল্লাহ তাআলার মহান ক্ষমার প্রমাণ, যেন মানুষ তার রবের শুকরিয়া আদায় করে যিনি তাকে ক্ষমা করেছেন এবং তাওবার দরজা খুলে দিয়েছেন। এই ক্ষমা ও তাওবার সুযোগ তাকে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতে বাধ্য করে, যা বিশ্বাস ও কর্মে আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তাকে সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, কারণ আল্লাহ তাআলাই নিয়ামত দান করেন এবং তিনিই একমাত্র শুকরিয়ার হকদার।

আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের আরও একটি বাড়তি দিক হলো, তিনি মুসা আঃ-কে কিতাব ও ফুরকান দিয়েছিলেন, যাতে তারা সঠিক পথ পায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের পথ জানতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **"আর স্মরণ কর, যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দান করেছিলাম; যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ করতে পার।"** আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীদের উপর যে আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন, তা অত্যন্ত মহান ও মর্যাদাপূর্ণ নিয়ামত। এর মধ্যে তাওরাতও রয়েছে, যা মুসা আঃ-এর অনুসারীদের জন্য হিদায়াতের উৎস। এ থেকে মুসলিমদের উচিত পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা- যিনি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর উপর কুরআন মাজিদ নাযিল করেছেন।

﴿وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ يَٰقَوۡمِ إِنَّكُمۡ ظَلَمۡتُمۡ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلۡعِجۡلَ فَتُوبُوٓاْ إِلَىٰ بَارِئِكُمۡ فَٱقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ عِندَ بَارِئِكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٥٤ وَإِذۡ قُلۡتُمۡ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤۡمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهۡرَةٗ فَأَخَذَتۡكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمۡ تَنظُرُونَ ٥٥ ثُمَّ بَعَثۡنَٰكُم مِّنۢ بَعۡدِ مَوۡتِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٥٦ وَظَلَّلۡنَا عَلَيۡكُمُ ٱلۡغَمَامَ وَأَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَنَّ وَٱلسَّلۡوَىٰۖ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ٥٧﴾

অর্থ: **[আর যখন মূসা তার কওমকে বলেছিল, 'হে আমার কওম, নিশ্চয় তোমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছ বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে। সুতরাং তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে তাওবা কর। অতঃপর তোমরা নিজদেরকে হত্যা কর। এটি তোমাদের জন্য তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট উত্তম। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবূল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।* আর স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, "হে মূসা আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে**

কখনও বিশ্বাস করব না, ফলে তোমাদেরকে বজ্র পাকড়াও করলো, যা তোমরা নিজেরাই দেখছিলে।* অতঃপর আমি তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনঃজীবন দান করলাম, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।* আর আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দিলাম এবং তোমাদের প্রতি নাযিল করলাম 'মান্না' ও 'সালওয়া'। তোমরা সে পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর, যা আমি তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছি। আর তারা আমার প্রতি যুলম করেনি, বরং তারা নিজেদের প্রতিই যুলম করেছিল।] *(*আয়াত নং ৫৪-৫৭*)*।

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা মুসা *(*আ.*)* ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কথোপকথন এবং তাদের আদেশ-নিষেধের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। মুসা *(*আ.*)* তাঁর সম্প্রদায়কে জানালেন যে, তারা নিজেদের উপর চরম জুলুম করেছে। তিনি তাদের এই জুলুমের ব্যাখ্যা দিলেন, যা তারা আল্লাহ ছাড়া গো-বাছুরের মূর্তি পূজা করার মাধ্যমে করেছিল*:* **"আর যখন মূসা তার কওমকে বলেছিল, 'হে আমার কওম, নিশ্চয় তোমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছ বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে।"** এই আয়াতে প্রথমে **"তোমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছ"** বলে তাদের অবস্থা ও হুকুম উল্লেখ করা হয়েছে, তারপর **"বাছুরের পূজা করে"** বলে এর কারণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে হুকুম উল্লেখ করে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, তারপর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এটি হৃদয়কে কারণ জানার দিকে পরিচালিত করে। এখানে কুরআনের বাগ্মিতা, নির্দেশনামূলক ও শিক্ষামূলক শৈলী প্রকাশ পেয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, নির্দেশনা ও জ্ঞান প্রদানের ক্ষেত্রে পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের সেই মহাপাপ থেকে মুক্তির উপায় বাতলে দিলেন, যা হলো তাঁর নিকটে তাওবা করা। তিনি তাদের স্রষ্টা, যিনি তাদেরকে অস্তিত্বে এনেছেন*:* **" সুতরাং তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে তাওবা কর।"** ইবনে কাসির *(*রহ.*)* বলেন*:* **"তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে"** বলার মাধ্যমে তাদের অপরাধের ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করেছে, অথচ তিনিই

তাদের সৃষ্টিকর্তা। এটি শিরকের ভয়াবহতা প্রকাশ করে, যেখানে তাদেরকে নিজেদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: **"তোমরা নিজেদের হত্যা কর। এটি তোমাদের স্রষ্টার কাছে তোমাদের জন্য উত্তম।"**

এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা তাই করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের কোনো প্রতিবাদকারী নেই। তিনি রাজা, যিনি প্রশ্ন করেন কিন্তু তাকে প্রশ্ন করা হয় না, যেমন সূরা আল-আম্বিয়ায় বলা হয়েছে: **"তিনি যা করেন, সে বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় না; বরং তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করা হবে।"** এটি এই উম্মতের প্রতি আল্লাহর রহমতেরও প্রমাণ, কারণ তিনি তাদেরকে শিরকের কাফফারা হিসেবে নিজেদের হত্যা করতে বলেননি; বরং তাওবা, ইস্তিগফার ও শিরক ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এরপর আল্লাহ তাআলা নিজেকে তাওবা ও রহমতের যোগ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন: **"অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু"**। আল্লাহ তাআলা তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু, যা দুটি মহান নিয়ামত। এজন্য তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। এই মহান নিয়ামতের কারণেই তিনি তাদের তাওবা কবুল করেছেন, যদিও তাদের অপরাধ ছিল ভয়াবহ।

এরপর আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের মধ্যে মানুষের জিদ ও অবাধ্যতার উদাহরণ দেন। তারা মুসা (আ.)-কে বলেছিল: **"হে মুসা! আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে পাই"**। তারা তাদের শর্ত ও অবাধ্যতায় এতটাই অগ্রসর হয়েছিল যে, ঈমান আনার জন্য তারা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখার দাবি করেছিল। এটি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, অবাধ্যতা ও বাতিল পথে জিদ করা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা বিদ্যমান রয়েছে, যা থেকে সাবধান হওয়া জরুরি। কেননা আল্লাহর আযাব কোন জাতির উপর নেমে আসলে তা নিতান্তই মর্মদায়ক কঠিন হয়। আল্লাহ তাআলা তাদের শাস্তি সম্পর্কে বলেন: **" ফলে তোমাদেরকে বজ্র পাকড়াও করলো, যা তোমরা নিজেরাই দেখছিলে।"**।

এরপর আল্লাহর ক্ষমতা ও রহমত হিসেবে, তিনি তাদেরকে পুনরায় জীবিত করলেন, যাতে তারা তাদের নির্ধারিত আয়ু পূর্ণ করতে পারে: **" অতঃপর আমি তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনঃজীবন দান করলাম, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।"** এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা মহান ও সর্বশক্তিমান; তাঁর জন্য কিছুই অসম্ভব নয়। এজন্য তাঁর ভয় ও আনুগত্য অবলম্বন করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত।

এরপর আল্লাহ তাআলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দেন: **"যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।"** অর্থাৎ, তোমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করার মাধ্যমে আল্লাহ যে নিয়ামত দিয়েছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, যাতে তোমরা তোমাদের আয়ু পূর্ণ করতে পার। এখানে শুকরিয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, বিশেষ করে যখন গুনাহ ও অবহেলা থাকা সত্ত্বেও নিয়ামত পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার সাথে সহনশীলতা ও দয়ার্দ্রতা প্রদর্শন করেন, যদিও তারা গুনাহ ও অবহেলার কারণে এর যোগ্য নয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা মুমিনদের শিক্ষা দেন এবং বনি ইসরাইলকে তাদের পূর্বপুরুষদের ঘটনা ও আল্লাহর সাথে তাদের আচরণ স্মরণ করিয়ে দেন, যাতে তারা আল্লাহর নিয়ামত উপলব্ধি করতে পারে এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াত ও তাঁর আনীত সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"আর আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দিলাম এবং তোমাদের প্রতি নাযিল করলাম 'মান্না' ও 'সালওয়া'"**। এখানে আল্লাহ তাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যদিও তারা জিদ ও অবাধ্যতায় লিপ্ত ছিল। তিনি তাঁর প্রজ্ঞা ও রহমত অনুযায়ী তাদের সাথে আচরণ করেছেন: তাদেরকে রোদ ও গরম থেকে রক্ষা করার জন্য মেঘের ছায়া দেওয়া হয়েছিল। তাদের উপর **মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছেন; মান্না:** এক ধরনের মিষ্টি খাদ্য, যা মধুর মতো। কিছু বিদ্বানের মতে, এটি কোনো শ্রম ছাড়াই পাওয়া রিযিক। **সালওয়া:** এক ধরনের ছোট পাখি। কেউ কেউ ভিন্ন ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।

এই ঘটনা মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ, কারণ কুরআন তাদের সেই ঘটনা জানাচ্ছে, যা নবী (সা.) কুরআন নাযিল হওয়ার আগে জানতেন না। এর আরেকটি ফায়েদা হলো যে, আল্লাহ তাআলাই রিযিকদাতা; তিনি যখন কোনো বান্দাকে রিযিক দিতে চান, তখন তা সহজ ও সরল উপায়ে দান করেন। তিনি মেঘকে তাঁর নির্দেশে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যান এবং তাঁর সৃষ্টির প্রয়োজন অনুযায়ী বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এরপর বৃষ্টি নির্দিষ্ট পরিমাণে পড়ে, যাতে তা প্লাবন বা ধ্বংসের কারণ না হয়। মেঘ আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী চলাচল করে। সুতরাং সেই সৃষ্টিকর্তা কতই না মহান, যিনি সময়, পরিমাণ, স্থান ও গতিবিধি নির্ধারণ করেছেন।

এরপর আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে জানান যে, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে তাদের অবাধ্যতার মাধ্যমে: **"তারা আমাদের উপর জুলুম করেনি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে"**। এটি প্রমাণ করে যে, মানুষের উপর যে বিপদ-আপদ আসে, তা তার নিজের কৃতকর্মের ফল।

﴿وَإِذۡ قُلۡنَا ٱدۡخُلُواْ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةَ فَكُلُواْ مِنۡهَا حَيۡثُ شِئۡتُمۡ رَغَدٗا وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدٗا وَقُولُواْ حِطَّةٞ نَّغۡفِرۡ لَكُمۡ خَطَٰيَٰكُمۡۚ وَسَنَزِيدُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٨ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوۡلًا غَيۡرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمۡ فَأَنزَلۡنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجۡزٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفۡسُقُونَ ٥٩ * وَإِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ فَقُلۡنَا ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَۖ فَٱنفَجَرَتۡ مِنۡهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَيۡنٗاۖ قَدۡ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٖ مَّشۡرَبَهُمۡۖ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزۡقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ٦٠ وَإِذۡ قُلۡتُمۡ يَٰمُوسَىٰ لَن نَّصۡبِرَ عَلَىٰ طَعَامٖ وَٰحِدٖ فَٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُخۡرِجۡ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ مِنۢ بَقۡلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَاۖ قَالَ أَتَسۡتَبۡدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدۡنَىٰ بِٱلَّذِي هُوَ خَيۡرٌۚ ٱهۡبِطُواْ مِصۡرٗا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلۡتُمۡۗ وَضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلۡمَسۡكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ يَكۡفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقۡتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ٦١﴾

অর্থ: **[আর স্মরণ কর, যখন আমি বললাম, ‘তোমরা প্রবেশ কর এই জনপদে। আর তা থেকে আহার কর তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী, স্বাচ্ছন্দ্যে এবং দরজায় প্রবেশ কর সিজদারত হয়ে। আর বল ‘ক্ষমা’। তাহলে আমি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং নিশ্চয় আমি সৎকর্মশীলদেরকে বাড়িয়ে দেব’।* কিন্তু যালিমরা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল কাজেই আমরা যালিমদের প্রতি তাদের অবাধ্যতার কারণে আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করলাম।* আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার কওমর জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, ‘তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত কর’। ফলে তা থেকে উৎসারিত হল বারটি ঝরনা। প্রতিটি দল তাদের পানি পানের স্থান জেনে নিল। তোমরা আল্লাহর রিযিক থেকে আহার কর ও পান কর এবং ফাসাদকারী হয়ে যমীনে ঘুরে বেড়িয়ো না।* আর যখন তোমরা বললে, ‘হে মূসা, আমরা এক খাবারের উপর কখনো ধৈর্য ধরব না। সুতরাং তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট দো‘আ কর, তিনি যেন আমাদের জন্য ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সবজি, কাঁকড়, গম, মসুর ও পেয়াজ উৎপাদন করেন। সে বলল, ‘তোমরা কি যা উত্তম তার পরিবর্তে এমন জিনিস গ্রহণ করছ যা নিম্নমানের? তোমরা কোন এক নগরীতে অবতরণ কর। নিশ্চয়**

তোমাদের জন্য (সেখানে) থাকবে, যা তোমরা চেয়েছ'। আর তাদের উপর আরোপ করা হয়েছে লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হল। তা এই কারণে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত এবং অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করত। তা এই কারণে যে, তারা নাফরমানী করেছিল এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত।] (আয়াত নং ৫৮-৬১)।

এখানেও আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদেরকে তাদের পূর্বপুরুষদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যাতে এই পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তাদের জন্য সেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যা তারা জানে। এটি প্রমাণ ও দলিলের গুরুত্ব এবং স্মরণ করিয়ে দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে, যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং কল্যাণের দিকে নির্দেশ করে। কারণ সত্যের স্মরণ মানুষের বুদ্ধি ও আবেগকে একসাথে জাগ্রত করে, যা একজন ব্যক্তিকে তার উপর অর্পিত নিয়ামতের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

ফলে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ও অন্যদেরকে জানাচ্ছেন, ইহুদিদেরকে তাদের পূর্বপুরুষদের সাথে যা ঘটেছিল এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয়েছিল তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তা হলো, যখন তারা জিহাদ ত্যাগ করে এবং তা থেকে বিরত থাকার কারণে তীহ (প্রান্তরে উদভ্রান্তের ন্যায় ভ্রমণ) এর সময় শেষ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বাইতুল মুকাদ্দাস শহরে প্রবেশের নির্দেশ দেন, যেমনটি ইবনে কাসীর রহঃ এ মতটি প্রাধান্য দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তীহের শাস্তি দেওয়ার পর তাঁর রহমত প্রকাশ করেছেন এবং তাদেরকে শহরে প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তারা সেখানে নিরাপত্তা ও পূর্ণ কল্যাণ লাভ করতে পারে: **"আমি বললাম, তোমরা এই শহরে প্রবেশ করো এবং যেখান থেকে ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে আহার করো"**। এটি তাদেরকে শহরের যে কোনো দিক থেকে প্রচুর ও প্রশস্ত জীবনের সুযোগ দেওয়ার ইঙ্গিত দেয়। এটি ইঙ্গিত করে যে এটি একটি বরকতময় ভূমি, যেখানে জীবনযাত্রা সহজ ও সুখময়। তারপর আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন

কীভাবে প্রবেশ করতে হবে: **"এবং দরজায় প্রবেশ কর সিজদারত হয়ে। আর বল 'ক্ষমা'। তাহলে আমি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং নিশ্চয় আমি সৎকর্মশীলদেরকে বাড়িয়ে দেব।"**। "সিজদারত" শব্দটি বিনয়, আনুগত্য ও ইবাদতের ইঙ্গিত দেয়, কারণ সিজদা হলো বিনয় ও বশ্যতা প্রকাশের মাধ্যম। আর "হিত্তাহ তথা ক্ষমা" শব্দটি আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের পাপ মোচনের প্রার্থনা বোঝায়। এটি আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পথে বিনয় ও আনুগত্যের গুরুত্ব তুলে ধরে এবং ইঙ্গিত দেয় যে অনুগ্রহ ও সমৃদ্ধি আসে আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে। অহংকার, জিদ ও অবাধ্যতার পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাতে ভয়াবহ।

যদিও এই আয়াতগুলোর বক্তব্য বনি ইসরাইলের বিষয়ে, তবে এটি মুমিনদের জন্য একটি উপদেশ, যাতে তারা অন্যান্য জাতির পতন থেকে শিক্ষা নেয় এবং তাদের ভুলগুলো এড়িয়ে চলে। আল্লাহ তাআলা নিশ্চিত করেছেন যে, তারা যদি তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী শহরে প্রবেশ করে, তবে তিনি তাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং নেককারদেরকে আরও বেশি কল্যাণ দান করবেন। তবে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে এবং তাঁর নেয়ামতকে কুফরিতে পরিণত করে, যা থেকে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"অতঃপর যারা জুলুম করেছে তারা সেই কথার পরিবর্তে অন্য কথা বলল"**। এমন লোকেরা আল্লাহর নির্দেশের পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণ করে এবং আনুগত্যের স্থলে অবাধ্যতা বেছে নেয়। এটি যেকোনো সময় ঘটতে পারে, বিশেষত যারা জুলুমের সাথে জড়িত তাদের দ্বারা। কেউ সম্পদের নেয়ামতকে অপচয় ও বেহুদা খরচে পরিবর্তন করে, কেউ সুস্থতার নেয়ামতকে গুনাহের কাজে ব্যবহার করে, কেউ সন্তানের নেয়ামতকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে গাফেল করে বা তাদেরকে গুনাহের কাজে নিয়োজিত করে। অনেকে আল্লাহর নির্ধারিত ইবাদতকে বিকৃত করে এবং এমন ব্যাখ্যা দেয় যা আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত। এর ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি দেন, যারা তাঁর নির্দেশের পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণ করে। আল্লাহ তাআলা

বলেন: **“অতঃপর যারা জুলুম করেছে তারা সেই কথার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। ফলে আমি তাদের অবাধ্যতার কারণে আকাশ থেকে আযাব নাযিল করলাম”**।

এটি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা এবং তাঁর ইচ্ছার বিপরীত কাজ করা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ আল্লাহ আসমান ও জমিনের সমস্ত সৈন্যবাহিনীর মালিক। অতএব, তাঁর শাস্তি স্বাস্থ্য, রিজিক, দুশ্চিন্তা, অপমান এবং অন্যান্য যে কোন ধরনের শাস্তির মাধ্যমে আসতে পারে।

তারপর আল্লাহ তাআলা তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি তাঁর আরও অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করেন, যখন মুসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের পানির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সবচেয়ে সহজ উপায়ে পানি দান করলেন, কোনো কষ্ট বা পরিশ্রম ছাড়াই। আল্লাহ তাআলা বলেন: **“আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার কওমর জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, ‘তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত কর’। ফলে তা থেকে উৎসারিত হল বারটি ঝরনা।”** এটি ইঙ্গিত দেয় যে, আল্লাহর দান অত্যন্ত মহান এবং সহজ। তিনি যাকে ইচ্ছা সহজেই দান করেন, কোনো কষ্ট বা পরিশ্রম ছাড়াই। শুধুমাত্র পাথরে লাঠি দিয়ে আঘাত করায় তা থেকে পানির ঝরনা প্রবাহিত হয়েছিল, যা তাদের জন্য একটি মুজিজা ছিল।

আল্লাহ তাআলার একটি অনুগ্রহ যে, তিনি বারোটি ঝরনা সৃষ্টি করলেন, বনি ইসরাইলের বারোটি গোত্রের সংখ্যার সাথে মিল রেখে। প্রতিটি গোত্র তাদের জন্য নির্ধারিত পানি পান করবে, যা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার ফল। আল্লাহ তাআলা বলেন: **“ফলে তা থেকে উৎসারিত হল বারটি ঝরনা। প্রতিটি দল তাদের পানি পানের স্থান জেনে নিল।”** তারপর আল্লাহ তাআলা এই নেয়ামতের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হবে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: **“তোমরা আল্লাহর দেওয়া রিজিক থেকে খাও এবং পান করো, কিন্তু পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না”**। আল্লাহ তাআলা রিজিককে তাঁর নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন: **“তোমরা আল্লাহর**

রিজিক থেকে খাও এবং পান করো”। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, সৃষ্টির কাছে যে সকল খাদ্য ও পানীয় আছে, তা আল্লাহ তাআলার রিজিক। তাই সৃষ্টির উচিত এগুলোকে আল্লাহর দান হিসাবে স্বীকার করা। খাদ্য ও পানীয়কে নিজের প্রচেষ্টার ফল হিসাবে না দেখে, বরং আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, দয়া ও মহানুভবতার সাথে সম্পর্কিত করা উচিত। কারণ তিনিই প্রকৃত দাতা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের জন্য সহজলভ্য করেছেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য যে লক্ষ্য ও পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন, তা হলো তারা যেন তাঁর দেওয়া নেয়ামতকে গুনাহ ও পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির কাজে ব্যবহার না করে। পবিত্র আয়াতে ফাসাদ থেকে নিষেধ করার মাধ্যমে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার নেয়ামত পাওয়ার পরও তা অবশ্যই তাঁর নির্দেশিত পথে ব্যবহার করতে হবে।

অতঃপর, যখন তারা মান্না ও সালওয়া (আল্লাহর বিশেষ রিজিক) থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং মিসরের পূর্বের জীবনযাত্রার কথা স্মরণ করল, তখন তারা মুসা (আঃ)-কে বলল যে তিনি যেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, যাতে তাদের জন্য মাটি থেকে তাদের পরিচিত খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: ***(“যখন তোমরা বললে, ‘হে মুসা! আমরা এক ধরনের খাবারে সন্তুষ্ট থাকতে পারব না। সুতরাং আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে প্রার্থনা করো, যাতে তিনি আমাদের জন্য মাটি থেকে ভূমিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করে দেন, যেমন শাকসবজি, শসা, রসুন, মসুর ডাল ও পেঁয়াজ”)***। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, মানুষ অত্যন্ত দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এমনকি যদি তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় খাবারও দেওয়া হয়। তারা মান্ন ও সালওয়ার মতো উত্তম রিজিক পেয়েও মাটির উৎপাদন চেয়েছিল। এটি ধৈর্য ধারণ করা এবং নিজেকে নেয়ামত ও কল্যাণের বাস্তবতা উপলব্ধি করার গুরুত্ব তুলে ধরে। মানুষের উচিত নয় যে, বিভিন্নতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে মহান নেয়ামতের মর্যাদা ও গুরুত্ব ভুলে যায়। বরং, তাকে নিজেকে উন্নত ও পরিশুদ্ধ করতে হবে। মানুষের বুঝা উচিত যে, নফস অস্থির

এবং যা তার কাছে নেই তা কামনা করে। আবার যখন তা পেয়ে যায়, তখন অন্য কিছু কামনা করে। এই প্রবণতা থেকে মুক্তি পেতে হলে নফসকে প্রশিক্ষিত করতে হবে এবং তার স্বভাবকে সংশোধন করতে হবে।

যদি মানুষ এই প্রকৃতি উপলব্ধি করে, তবে তার উচিত উত্তম আচরণ করা। কিন্তু একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ তাআলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছেন, যেমন মুসা (আঃ), তিনি তাদের এই অনুরোধের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন: **"তোমরা কি উত্তম বস্তুর বদলে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করতে চাও?"**। এটি তাদের অনুরোধের প্রতি একটি বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া, কারণ এটি আশ্চর্যের বিষয় যে আল্লাহ তাআলা যখন উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জিনিস দিয়েছেন, তখন তারা নিম্নমানের জিনিস চাইছে। এটি আরও ইঙ্গিত দেয় যে, যিনি কোনো সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে রয়েছেন, তার উচিত তাদেরকে সঠিক পথ দেখানো এবং তার প্রশ্ন করা ও অস্বীকার করার অধিকার রয়েছে। এরপর মুসা (আঃ) তাদের বললেন: **"তোমরা মিসরে (কোন এক নগরীতে) প্রবেশ করো, কারণ তোমরা যা চেয়েছ তা সেখানে পাবে"**। তাদের নিম্নমানের জিনিস কামনা করার পর তাদেরকে মিসরে যেতে বলা হয়েছে। এখানে "মিসর" বলতে সাধারণভাবে কোনো শহর বা জনপদ বোঝানো হয়েছে, কারণ তারা যা চেয়েছে তা পৃথিবীর যেকোনো শহর বা জনপদে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত নেয়ামতের পর, যা আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য সহজ করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করেছিলেন, তারপরও তারা যখন ধৈর্য হারাল, অহংকার ও অবাধ্যতা দেখাল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"এবং তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেওয়া হলো এবং তারা আল্লাহর গজবে পতিত হলো"**। আল্লাহ তাআলা তাদের শাস্তির বিভিন্ন ধরন বর্ণনা করেছেন, যেমন দৈহিক অপমান, হৃদয়ের দারিদ্র্য এবং আল্লাহর গজব। বলা হয়েছে যে, "যিল্লাত" (লাঞ্ছনা) অর্থ হলো হীনতা ও

দারিদ্র্য। এমনকি যদি কোনো ইহুদি ধনীও হয়, তবুও তার পোশাক-পরিচ্ছদে দারিদ্র্যের ছাপ থাকে এবং সে বিনয়ী ও নম্র থাকে। এটি তাদের পোশাকের ডিজাইনে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, যা দেখে মনে হয় যেন তা ছেঁড়া, যদিও তা নতুন। এ থেকে মুমিনদের সতর্ক হওয়া উচিত যে, তারা যেন ইহুদিদের অনুকরণ না করে, যারা নিজেদেরকে দরিদ্র দেখায় যদিও তারা ধনী। আরও সতর্ক হওয়া উচিত তাদের আচরণ থেকে, যারা আল্লাহর নেয়ামত ও রহমতের বিপরীতে অহংকার ও অবাধ্যতা দেখায় অথবা নেয়ামত পেয়েও অসন্তুষ্ট হয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। বরং, মুমিনের উচিত নিজেকে উন্নত করা এবং নফসকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ ও স্বীকৃতিপরায়ণ হওয়া। কারণ আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

তারপর আল্লাহ তাআলা তাদের উপর শাস্তি অর্থাৎ অপমান, দারিদ্র্য ও আল্লাহর গজব নাযিল করার কারণ বর্ণনা করেছেন। এর কারণ হলো তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। আল্লাহ তাআলা বলেন: **“এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। এটা তাদের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের কারণে”**।

এই সমস্ত গুনাহ তাদের উপর আল্লাহর গজব টেনে এনেছিল। এটি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, গুনাহ থেকে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ তা আল্লাহর গজব ডেকে আনে। আল্লাহ তাআলা দয়ালু ও করুণাময়, তিনি আনুগত্যকারী, কৃতজ্ঞ, ক্ষমাপ্রার্থী ও তাওবাকারী বান্দাকে ভালোবাসেন, যে আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আসে, নেয়ামতের হিফাজত করে এবং তা অপচয় বা বেহুদা খরচ করে অবমূল্যায়ন করে না। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, মুমিনের উচিত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে আন্তরিক ও সচেষ্ট হওয়া।

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ﴾

অর্থ: ***[নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, যারা ইহূদী হয়েছে এবং নাসারা ও সাবেয়ী যারাই আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের রব-এর কাছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।]*** *(*আয়াত নং ৬২*)*।

আল্লাহ তাআলা যারা তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করে এবং নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হয় তাদের অবস্থা ও তাদের উপর আপতিত শাস্তি বর্ণনা দেয়ার পর, তিনি মুহসিনদের *(*সৎকর্মশীলদের*)* প্রতিদানের কথা বর্ণনা করেছেন। তারা হলেন পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে যারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করেছিলেন এবং নবীদের প্রতি ঈমান এনেছিলেন। এদের মধ্যে ইহুদি, নাসারা *(*খ্রিস্টান*)* এবং সাবেয়ীগণও রয়েছেন, যারা ইহুদি বা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এ থেকে বুঝা যায় যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। আর এই বিধান কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। যারা এই উম্মী নবী *(*মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম*)*-এর অনুসরণ করবে, তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সুখ। ভবিষ্যতে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা যা পিছনে রেখে যাবে তা নিয়ে চিন্তিতও হবে না। এটি আল্লাহ তাআলার ন্যায়বিচারকে তুলে ধরে। তিনি তাদের প্রতি অবিচার করেন না, যারা তাদের নবীদের পথনির্দেশনা অনুসরণ করে আল্লাহ তাআলা ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে।

আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের পর, আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত করেছেন। তাই এখন ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানে

বলেন: **"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, তা কখনোই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না। আর আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"**

﴿وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَكُمۡ وَرَفَعۡنَا فَوۡقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيۡنَٰكُم بِقُوَّةٖ وَٱذۡكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٦٣ ثُمَّ تَوَلَّيۡتُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَۖ فَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٤ وَلَقَدۡ عَلِمۡتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعۡتَدَوۡاْ مِنكُمۡ فِي ٱلسَّبۡتِ فَقُلۡنَا لَهُمۡ كُونُواْ قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ ٦٥ فَجَعَلۡنَٰهَا نَكَٰلٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهَا وَمَا خَلۡفَهَا وَمَوۡعِظَةٗ لِّلۡمُتَّقِينَ ٦٦﴾

অর্থ: ***[আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম তুর পর্বত; (বলেছিলাম,) আমি যা দিলাম দৃঢ়তার সাথে তা গ্রহণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।* এর পরেও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে।* আর তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিল, তাদেরকে অবশ্যই তোমরা জান। অতঃপর আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও।* অতএব আমি এটাকে করেছি তাদের সমকালীন ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আর মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।]*** (আয়াত নং ৬৩-৬৬)।

এই আয়াতগুলো বনি ইসরাইলের অবস্থা বর্ণনা করে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর পাহাড় তুলে ধরেছিলেন এবং তাদের থেকে একটি শক্তিশালী অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। এই অঙ্গীকার ছিল তাওরাত গ্রহণ, তা পাঠ করা এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী অনুসরণ করার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা। তাদেরকে ধৈর্য ও আন্তরিকতার

সাথে আল্লাহর আদেশ পালন করতে বলা হয়েছিল, যাতে তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকতে পারে এবং মুত্তাকি হতে পারে।

এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বনি ইসরাইলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেওয়ার একটি উপায়, যাতে তারা পূর্ববর্তীদের ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়। এটি দাওয়াত ও তরবিয়াতের ক্ষেত্রে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার গুরুত্ব এবং সত্য প্রকাশের গুরুত্ব তুলে ধরে, যা মানুষকে আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে এবং গুনাহ থেকে সতর্ক করে।

অঙ্গীকার নেওয়ার মাধ্যমে এর গুরুত্ব প্রকাশ পায়, বিশেষত আল্লাহ তাআলার সাথে, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছুর মালিক। পাহাড় তুলে ধরার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। এটি তাঁর রহমতেরও নিদর্শন, কারণ তিনি তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য পাহাড় তুলে ধরেছিলেন, কিন্তু তাঁর রহমতের কারণে তাদের ধ্বংস করেননি।

এই বর্ণনা থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা, তা শেখা ও অন্যকে শেখানো এবং মানুষের মধ্যে তা প্রচার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে মুসলিম আল্লাহ তাআলার গজব থেকে বেঁচে থাকতে পারে এবং মুত্তাকি হতে পারে, যা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনে সাহায্য করে।

যদিও আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং তারা পাহাড়কে তাদের উপর দেখেছিল, তবুও তারা পিছনে সরে গিয়েছিল, যেমন আল্লাহ বলেন: **"এরপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে"**। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও রহমত অত্যন্ত মহান। তিনি বলেন: **"যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকত, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে"**। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মহান। যদি এই অনুগ্রহ ও রহমত না থাকত, তবে সবাই

ক্ষতিগ্রস্ত হতো। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও রহমতের কারণেই পাপীদের তাওবার সুযোগ দেওয়া হয়। তাঁর অনুগ্রহ ও রহমতের মাধ্যমেই তিনি নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যাদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এই মহাজাগতিক ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা, যেমন ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, দুর্ঘটনা ও যুদ্ধ, সবই বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন। এই ঘটনাগুলো মানুষকে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও মহিমা সম্পর্কে সচেতন করে এবং তাদেরকে তাঁর দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানায়।

এরপর আয়াতগুলো বনি ইসরাইলের কাছে সুবিদিত একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে, যারা শনিবারের দিন সীমা লঙ্ঘন করেছিল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর গজব নাযিল করলেন এবং তাদেরকে বানরে পরিণত করলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"আর তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিল, তাদেরকে অবশ্যই তোমরা জান। অতঃপর আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও।"** এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা আল-আরাফে রয়েছে, কিন্তু এখানে এটি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে ঘটনা উল্লেখ করার মাধ্যমে এর বিস্তারিত জানার আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বিস্তারিত জানার আগ্রহ তৈরি করে, যা মানুষকে কুরআনের আয়াতগুলো আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে উৎসাহিত করে। এই ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, গুনাহের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারে। আল্লাহ তাআলা যেকোনো সময় যেকোনো শাস্তি দিতে পারেন, যা গুনাহগার কল্পনাও করতে পারে না। যেমন তিনি তাদেরকে বানরে পরিণত করলেন, যা তাদের জন্য অত্যন্ত লাঞ্ছনাকর ও অপমানজনক ছিল। এটি গুনাহের ভয়াবহতা এবং আল্লাহর শাস্তির সহজতা সম্পর্কে সতর্ক করে।

সুতরাং গুনাহ গুনাহগারের অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ হতে পারে। তাই মুমিনের উচিত গুনাহের ভয়াবহ পরিণতি থেকে সতর্ক থাকা এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তাওফিক, সাহায্য ও সঠিক পথের জন্য দোয়া করা।

এরপর আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন যে, তিনি শনিবারের সীমা লঙ্ঘনকারীদের শাস্তিকে অন্যদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বানিয়েছেন: **"অতএব আমি এটাকে করেছি তাদের সমকালীন ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আর মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।"**। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, যখন কারো উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হয় বা আল্লাহ তাআলার সীমা লঙ্ঘনকারীর উপর শাস্তি কার্যকর করা হয়, তখন তা শুধুমাত্র সেই অপরাধীর জন্যই নয়, বরং অন্যদের জন্যও একটি শিক্ষা। এই ঘটনা মুত্তাকিদের জন্য একটি শিক্ষা, যা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং গুনাহ থেকে দূরে রাখে। এটি তাদেরকে গুনাহের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের পথে চলতে উৎসাহিত করে।

﴿وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُواْ بَقَرَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوٗاۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡجَٰهِلِينَ ٦٧ قَالُواْ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ لَّا فَارِضٞ وَلَا بِكۡرٌ عَوَانُۢ بَيۡنَ ذَٰلِكَۖ فَٱفۡعَلُواْ مَا تُؤۡمَرُونَ ٦٨ قَالُواْ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوۡنُهَاۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ صَفۡرَآءُ فَاقِعٞ لَّوۡنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرِينَ ٦٩ قَالُواْ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلۡبَقَرَ تَشَٰبَهَ عَلَيۡنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهۡتَدُونَ ٧٠ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ لَّا ذَلُولٞ تُثِيرُ ٱلۡأَرۡضَ وَلَا تَسۡقِي ٱلۡحَرۡثَ مُسَلَّمَةٞ لَّا شِيَةَ فِيهَاۚ قَالُواْ ٱلۡـَٰٔنَ جِئۡتَ بِٱلۡحَقِّۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفۡعَلُونَ ٧١ وَإِذۡ قَتَلۡتُمۡ نَفۡسٗا فَٱدَّٰرَـٔۡتُمۡ فِيهَاۖ وَٱللَّهُ مُخۡرِجٞ مَّا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ ٧٢ فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَذَٰلِكَ يُحۡيِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٧٣﴾

অর্থ: *[***আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার জাতিকে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করার আদেশ দিয়েছেন, তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ? মূসা বললেন, আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।* তারা বলল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট দো'আ কর, তিনি যেন আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দেন গাভীটি কেমন হবে'। সে বলল, 'নিশ্চয় তিনি বলছেন, সেটা এমন গাভী যা বৃদ্ধও নয়, অল্পবয়স্কও নয়, মধ্যবয়সী। অতএব তোমাদেরকে যে আদেশ করা হয়েছে তা পালন কর।* তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার রবকে ডাক, সেটার রং কি, তা যেন আমাদেরকে বলে দেন। মূসা বললেন, তিনি বলেছেন, সেটা হলুদ বর্ণের গাভী, উজ্জ্বল গাঢ় রং বিশিষ্ট, যা দর্শকদের আনন্দ দেয়'।* তারা বলল, তোমার রবকে আহবান কর, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, সেটা কোনটি? নিশ্চয় গাভীটি আমাদের জন্য সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেছে। আর আল্লাহ ইচ্ছে করলে আমরা নিশ্চয় দিশা পাব'।* মূসা বললেন, তিনি বলেছেন, সেটা এমন এক গাভী যা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি, সুস্থ ও নিখুঁত। তারা বলল, 'এখন তুমি সত্য নিয়ে এসেছ। অবশেষে তারা সেটাকে যবেহ করল, যদিও তারা তা করতে প্রস্তুত ছিল না।* আর স্মরণ কর, যখন তোমরা একজনকে হত্যা করলে অতঃপর সে ব্যাপারে একে অপরকে দোষারোপ করলে। আর আল্লাহ প্রকাশ করে দিলেন তোমরা যা গোপন করছিলে।* অতঃপর আমি বললাম, 'তোমরা তাকে আঘাত কর গাভীটির কিছু অংশ দিয়ে। এভাবে আল্লাহ জীবিত করেন মৃতদেরকে। আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখান, যাতে তোমরা বুঝ।*]* (আয়াত নং ৬৭-৭৩)।

এরপর আয়াতগুলো মুসা (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের একটি ঘটনা বর্ণনা করে। বনি ইসরাইলের মধ্যে একজন নিহত হওয়ার পর তারা হত্যাকারী নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকে। এই বিতর্ক এতটাই তীব্র হয়ে উঠে যে, তাদের মধ্যে বড় ধরনের সংঘাত হওয়ার উপক্রম হয়। আল্লাহ

তাআলা তাদের এই বিতর্কের সমাধান দেন। মুসা (আলাইহিস সালাম) হত্যাকারী চিহ্নিত করার লক্ষ্যে তাদেরকে বললেন: **"তোমরা একটি গাভী জবাই কর।"**

এরপর এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে তাদের নবীর প্রতি তাদের আপত্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মুসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী তাদের সাথে কথা বলছিলেন, কিন্তু তারা বলল: **"তুমি কি আমাদেরকে উপহাস করছ?"** এখানে তাদের উচিত ছিল মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর আনুগত্য করা, কারণ তিনি আল্লাহর নবী ও রাসূল ছিলেন। নবী কখনও মিথ্যা বলবেন না বা উপহাস করবেন না। বিশেষত যখন মুসা (আলাইহিস সালাম) তাদের বলছিলেন: **"আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা একটি গাভী জবাই কর।"** তিনি এটা বলেননি যে, "আমি তোমাদেরকে গাভী জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছি।" বরং তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে এটি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। এটি নবীদের প্রতি ভালো ধারণা পোষণ এবং আনুগত্যের গুরুত্বকে তুলে ধরে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মানার ক্ষেত্রে কেবল বুদ্ধি বা ইচ্ছার উপর নির্ভর করা উচিত নয়, বরং আনুগত্য ও বিনয়ের সাথে তা মেনে চলা উচিত, এর পেছনের হিকমত (প্রজ্ঞা) আমাদের বুদ্ধিতে ধরা পড়ুক বা না পড়ুক। মুসা (আলাইহিস সালাম) তাদের জবাবে বললেন: **"আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, আমি যেন অজ্ঞদের মধ্যে না পড়ি।"** মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর এই উত্তরের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলো মন্দ ধারণাকে নম্র ও মার্জিত ভাষায় প্রত্যাখ্যান করা। এটি ইঙ্গিত দেয় যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি অজ্ঞদের মতো আচরণ বা কথা বলে না, বরং সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা বলে এবং মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে। অজ্ঞ ব্যক্তিই গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল পরিস্থিতিতে উপহাস করে, যা থেকে বোঝা যায় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে অজ্ঞতা বা হালকাভাব দেখানো উচিত নয়। মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর এই বক্তব্য: **"আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, আমি যেন অজ্ঞদের মধ্যে না পড়ি।"** এটি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার গুরুত্বকেও তুলে ধরে। এটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম, যা দ্বারা

বান্দা নিজেকে অত্যাচার, জুলুম এবং মন্দ গুণাবলি থেকে রক্ষা করতে পারে। বিশেষত যখন কেউ এমন কিছু দ্বারা অভিযুক্ত হয় যা তার মধ্যে নেই, তখন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা তার জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

মুসা (আলাইহিস সালাম) যখন বনি ইসরাইলকে একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ দিলেন, তারা খুটিনাটি অতিরিক্ত প্রশ্ন করে জটিলতা সৃষ্টি করল। প্রথমে তারা জানতে চাইল গাভীর বয়স কী হবে। মুসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, এটি মাঝামাঝি বয়সের গাভী হবে, না খুব বড়, না খুব ছোট। তারপর তারা গাভীর রং জানতে চাইল। মুসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, এটি উজ্জ্বল সুদর্শন হলুদ রঙের হবে। এরপর তারা গাভীর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য জানতে চাইল। মুসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, এটি জমি চাষ বা পানি সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়নি এবং এতে কোনো দাগ বা ত্রুটি নেই। শেষ পর্যন্ত তারা গাভীটি জবাই করল, কিন্তু তারা এত প্রশ্ন করে কাজকে কঠিন করে তুলেছিল। এই ঘটনা থেকে আমরা শিখি যে, আল্লাহর নির্দেশ পালনে সহজ ও সরল পথ অবলম্বন করা উচিত, অপ্রয়োজনীয় জটিলতা এড়ানো উচিত। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা সহজ পথ বেছে নিতেন, যখন তাকে দুটি পথের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো। এটি মুসলিম জীবনের একটি আচরণগত নীতি।

তারপর মুসা (আলাইহিস সালাম) তাদেরকে নির্দেশ দিলেন গাভীর একটি হাড় নিয়ে নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করতে। তারা তা করতেই নিহত ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠল এবং তার হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করল, এরপর আবার মৃত অবস্থায় ফিরে গেল। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাদের গোপন করা বিষয় প্রকাশ করে দিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **"যখন তোমরা একজনকে হত্যা করেছিলে এবং তা নিয়ে বিবাদ করেছিলে, আর আল্লাহ প্রকাশ করেছিলেন যা তোমরা গোপন করছিলে।"** এই ঘটনা তাদের এবং অন্যদের জন্য প্রমাণ যে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম এবং তাঁর জন্য কিছুই

অসম্ভব নয়। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। গাভীর হাড় দিয়ে মৃতকে আঘাত করার মাধ্যমে তিনি তার প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। এটি আল্লাহর একটি নিয়ম যে তিনি কারণ-কার্য নীতির মাধ্যমে কাজ করেন, যদিও তিনি চাইলে শুধু "হও" বললেই তা হয়ে যেত। এই ঘটনা আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টান)দের কাছে প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়ত সত্য এবং এই কুরআন সত্য, কারণ এটি তাদের অতীতের ঘটনা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। অথচ তিনি ছিলেন উম্মি, পড়তে বা লিখতে জানতেন না।

এই ঘটনা থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো সূরা আল-বাকারার নামকরণের সাথে এই অলৌকিক ঘটনার সম্পর্ক। এই ঘটনাটি আল্লাহ তাআলার একটি মহান নিদর্শন, যা তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ করে যে তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন এবং জীবিত করে তার জ্ঞান ও স্মৃতি ফিরিয়ে দিতে পারেন, যাতে সে সবকিছু বলতে পারে। এটি আরও প্রমাণ করে যে সবকিছুর সিদ্ধান্ত আল্লাহ তাআলার হাতে। তিনি যেমন চান, তেমনই করেন। এই ঘটনায় তিনি গাভীর হাড়কে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন মৃতকে জীবিত করার জন্য। তাই এই সূরার নাম "সূরা আল-বাকারা" হওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। বস্তুত সবকিছুর আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ তাআলার হাতে, আগেও এবং পরেও।

﴿ثُمَّ قَسَتۡ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَٱلۡحِجَارَةِ أَوۡ أَشَدُّ قَسۡوَةٗۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلۡحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنۡهُ ٱلۡأَنۡهَٰرُۚ وَإِنَّ مِنۡهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخۡرُجُ مِنۡهُ ٱلۡمَآءُۚ وَإِنَّ مِنۡهَا لَمَا يَهۡبِطُ مِنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّهِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ٧٤﴾

অর্থ: *[***এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, যেন পাথর কিংবা তার চেয়েও কঠিন। অথচ কোন কোন পাথর তো এমন যা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, আর কিছু এরূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর তা হতে পানি নির্গত হয়, আবার কিছু এমন যা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়ে, আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।***]* (আয়াত নং ৭৪)।

এই পবিত্র আয়াতটি বনি ইসরাইলের হৃদয়ের কঠোরতা প্রকাশ করে, যারা আল্লাহর মহান নিদর্শন দেখার পরও তাদের হৃদয় নরম হয়নি। তারা এমন সব অলৌকিক ঘটনা দেখেছে যা দেখে সাধারণত হৃদয় কেঁপে ওঠে এবং মানুষ আল্লাহর নির্দেশ ও হিদায়াত মেনে নেয়। আল্লাহ তাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়েছেন, যেমন মান্ন ও সালওয়া (আকাশ থেকে খাবার) পাঠানো, ফেরাউনের হাত থেকে উদ্ধার করা, তাদের শত্রুকে তাদের চোখের সামনে ডুবিয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করানো। এই সমস্ত অনুগ্রহ তাদেরকে আল্লাহর ভালোবাসা ও আনুগত্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সমুদ্র দু'ভাগ হয়ে যাওয়া, ফেরাউনের ডুবে যাওয়া, পাহাড়কে তাদের উপর উঠানো এবং মৃতকে জীবিত করা—এসব ঘটনা তাদের মধ্যে ভয়, আনুগত্য ও আদেশ পালনের মনোভাব সৃষ্টি করার কথা ছিল। কিন্তু এরপরও তাদের হৃদয় কঠোর হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **"এরপরও তোমাদের হৃদয় পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল, বরং তার চেয়েও বেশি শক্ত।"**

এটি প্রমাণ করে যে, কিছু মানুষ এমনই যে, তারা সত্যের কাছে কখনোই মাথা নত করে না, যতই প্রমাণ তাদের সামনে উপস্থাপন করা হোক না কেন। কিছু হৃদয় এতটাই কঠোর হয়ে যায় যে, আল্লাহ তাদের যত নিয়ামতই দেন বা যত ভয়ই দেখান, তারা কোনোভাবেই পরিবর্তন হয় না। যদি কখনো তারা সাময়িকভাবে সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তবুও তাদের স্বভাবগত প্রবণতা তাদের আগের পথেই ফিরিয়ে নেয়। এটি তাদের অন্তরের কঠোরতা ও সত্যের প্রতি উদাসীনতার একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ।

এখানে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো: মানুষের দায়িত্ব শুধুমাত্র সত্যের পথে আহ্বান করা ও দিকনির্দেশনা দেওয়া। কিন্তু কারও অন্তর পরিবর্তন করে তাকে সত্য গ্রহণ করানোর ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাঃ-কে স্পষ্টভাবে বলেন **"আপনি যাকে ভালোবাসেন, তাকে হিদায়াত দিতে পারবেন না; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকেই সঠিক পথে পরিচালিত করেন।"** (সুরা আল-কাসাস: ৫৬)।

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, যখন কোনো মানুষের হৃদয় কঠোর হয়ে যায়, তখন তা পাথরের চেয়েও বেশি কঠিন হয়ে ওঠে। বরং কিছু পাথর থেকেও পানি প্রবাহিত হয়, কিছু পাথর ফেটে গিয়ে পানি বের হয়, আবার কিছু পাথর আল্লাহর ভয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে। অথচ কিছু মানুষের হৃদয় এতটাই কঠোর হয়ে যায় যে, তারা কোনোভাবেই সত্য গ্রহণ করে না।

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, প্রকৃতির বহু বস্তু পর্যন্ত আল্লাহর মহিমা ও ভয় অনুভব করে। যেমন, পাহাড়ের ওপর আল্লাহ তাআলার তাজাল্লির প্রকাশ ঘটলে তা ধ্বংস হয়ে যায়, উহুদ পাহাড় কেঁপে ওঠে যখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবিরা তাতে উঠেছিলেন, এমনকি খেজুর গাছের গুঁড়িও রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিচ্ছেদে কেঁদে উঠেছিল।

এই আয়াতটি আমাদেরকে সতর্ক করে যে, কিছু পাথরও আল্লাহর ভয়ে সাড়া দেয় এবং তাঁর নিদর্শন দেখে প্রতিক্রিয়া দেখায়, কিন্তু কিছু মানুষের হৃদয় সত্য জানার পরও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, কিছু পাথরও এমন কিছু মানুষের চেয়ে উত্তম, যারা সত্য জানার পরও ঈমান আনে না।

অতঃপর আয়াতটি আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের ব্যাপকতা ও পূর্ণতা ঘোষণা করে শেষ হয়েছে: **"আর আল্লাহ তোমরা যা কর, তা থেকে গাফিল নন।"** এখানে আল্লাহ

তাআলা নিজেকে গাফিলতি থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন, যা মানুষের স্বভাব। এটি একটি বাচনিক সৌন্দর্য, যেখানে বিপরীত বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করার মাধ্যমে পূর্ণতার গুণ প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে কোনো ত্রুটি বা অভাব নেই, বরং তা সম্পূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত। এই বক্তব্যে আল্লাহ তাআলার পূর্ণতা ও মহিমা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মানুষের গোপন রহস্য এবং তাদের অন্তরের গোপন ইচ্ছা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অবগত। মানুষের প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই তাঁর কাছে সুস্পষ্ট। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা। এই আয়াতটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন এবং তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছুই নেই। এটি আমাদেরকে সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, কারণ আমাদের সকল কাজ ও ইচ্ছা আল্লাহর কাছে গোপন নয়।

﴿أَفَتَطۡمَعُونَ أَن يُؤۡمِنُواْ لَكُمۡ وَقَدۡ كَانَ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ يَسۡمَعُونَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعۡدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٧٥ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ قَالُوٓاْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمۡۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ٧٦ أَوَلَا يَعۡلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ ٧٧﴾

অর্থ: **[তোমরা কি এই আশা করছ যে, তারা তোমাদের প্রতি ঈমান আনবে? অথচ তাদের একটি দল ছিল যারা আল্লাহর বাণী শুনত অতঃপর তা বুঝে নেয়ার পর তা তারা বিকৃত করত জেনে বুঝে।* আর যখন তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। আর যখন একে অপরের সাথে একান্তে মিলিত হয় তখন বলে, 'তোমরা কি তাদের সাথে সে কথা আলোচনা কর, যা আল্লাহ তোমাদের উপর উম্মুক্ত করেছেন, যাতে তারা এর মাধ্যমে তোমাদের রবের নিকট তোমাদের**

বিরুদ্ধে দলীল পেশ করবে? তবে কি তোমরা বুঝ না'?* তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, তা আল্লাহ জানেন?] (আয়াত নং ৭৪)।

এরপর আলোচনার প্রসঙ্গ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবাদের দিকে চলে যায়, যেখানে একপ্রকার নিন্দাসূচক প্রশ্ন করা হয়েছে-তোমরা কি আশা করো যে মদিনার ওই ইহুদি সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করবে? **(তোমরা কি এই আশা করো যে তারা তোমাদের প্রতি ঈমান আনবে?)** এটি মুমিনদের ইসলাম প্রচারে আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবাদের দাওয়াতি প্রচেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত করে। এতে বোঝা যায়, একজন কাফেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করা এবং তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করাকে অবহেলা বা দাওয়াত না দেওয়ার চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, বিশেষত যারা মুমিনদের প্রতিবেশী বা তাদের নিকটবর্তী। অর্থাৎ, মানুষের কল্যাণ কামনায় তাকে ইসলামের পথে ডাকা তাকে কুফরের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে উত্তম। এই নির্দেশনা থেকে বোঝা যায় যে, মুমিনরা ইহুদিদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন না, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। এটি অন্যদের হিদায়াতের প্রতি মুমিনদের আগ্রহকেও প্রকাশ করে। আনসারগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ইহুদিদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, কারণ তাদের মধ্যে চুক্তি ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক ছিল। এটি আনসারদের চুক্তি ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের প্রতি তাদের আনুগত্য ও ভালোবাসাকে প্রকাশ করে। তবে আল্লাহ তাআলা সেই সত্য জানেন, যা মানুষ জানে না। তিনি সবকিছুর জ্ঞানী।

এই আয়াতটি ইহুদিদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আশা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **" তোমরা কি এই আশা করছ যে, তারা তোমাদের প্রতি ঈমান আনবে? অথচ তাদের একটি দল ছিল যারা আল্লাহর বাণী শুনত অতঃপর তা বুঝে নেয়ার পর তা তারা বিকৃত করত জেনে বুঝে।"** এই আয়াতটি তাদের ঈমান

আনতে অস্বীকার করার কারণ ব্যাখ্যা করে। তাদের পূর্বপুরুষদের একটি দল আল্লাহর কালাম শুনে তা বুঝে নেওয়ার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে তা বিকৃত করত, আর তারা তা জেনে শুনেই করত। অর্থাৎ, তাদের পূর্বপুরুষরা সত্য জানার পরও জেদ ও অহমিকা দেখিয়েছে। তাই, যারা সত্য জানার পরও জেদ ধরে রাখে, তাদের ইসলাম গ্রহণের আশা কীভাবে করো?

এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, সে তা অজ্ঞতাবশত প্রত্যাখ্যান করে না; বরং অনেকেই নিশ্চিত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যকে বিকৃত করে, যদিও তারা তা নিশ্চিতভাবে জানে ও বোঝে। এটি আমাদের সতর্ক করে যে, প্রবৃত্তির অনুসরণ, বিদ্বেষ ও অহংকার মানুষের জন্য সত্য গ্রহণের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যদি কেউ নিজের সম্পদের ব্যাপারে সত্যের বিরোধিতা করতে পারে, তবে দুনিয়ার অন্যান্য বিষয়ে—যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশাজীবীদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সাধারণ ও ব্যক্তিগত প্রশাসনিক কার্যক্রম যেখানে মানুষের স্বার্থ জড়িত, এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে- সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া তো আরও সহজতর হয়। তাই অহংকার, হিংসা ও প্রবৃত্তির খেয়ালখুশির প্রভাব থেকে সতর্ক থাকা জরুরি। এগুলোই জিন বা মানবরূপী শয়তানদের প্রধান অস্ত্র, যা মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে।

এরপর আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের অবস্থান স্পষ্ট করেন—তাদের মুমিনদের প্রতি আচরণ এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ছিল। **“আর যখন তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’। আর যখন একে অপরের সাথে একান্তে মিলিত হয় তখন বলে, ‘তোমরা কি তাদের সাথে সে কথা আলোচনা কর, যা আল্লাহ তোমাদের উপর উম্মুক্ত করেছেন, যাতে তারা এর মাধ্যমে তোমাদের রবের নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করবে? তবে কি তোমরা বুঝ না’?”** আল্লাহ তাআলা এখানে মুনাফিকদের আসল চেহারা উন্মোচন করেছেন- তারা

মুমিনদের সামনে নিজেদের ঈমানদার বলে প্রকাশ করত, কিন্তু যখন নিজেদের মধ্যে একান্তে মিলিত হতো, তখন একে অপরকে মুসলমানদের সামনে সত্য কথা বলার জন্য ভর্ৎসনা করত। তারা পরস্পর বলত: তোমরা কি তাদের (মুসলমানদের) এমন তথ্য দিচ্ছ, যা আল্লাহ তোমাদের ওপর প্রকাশ করেছেন, যাতে তারা তা তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সামনে দলিল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে? তোমাদের কি এতটুকু বোধশক্তি নেই? এটি বোঝায় যে, মুনাফিকরা ভালোভাবেই জানত যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্য নবী এবং ইসলামই সত্য ধর্ম, কারণ তারা পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব থেকে এ সম্পর্কে অবগত ছিল। কিন্তু তারা ঈমান আনার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য সত্যকে গোপন রাখার চেষ্টা করত। তাদের এই অবস্থার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, তারা সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল না, বরং ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের মূর্খ বানিয়ে রাখছিল এবং অজ্ঞতার ভান করছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন: **(তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাদের গোপন কথাগুলো এবং যা তারা প্রকাশ করে, সবই জানেন?)** এটি তাদের জন্য একপ্রকার ভর্ৎসনা এবং কঠোর তিরস্কার, যা তাদের ভণ্ডামি এবং আত্মপ্রবঞ্চনাকে প্রকাশ করে দেয়।

এটি আল্লাহ তাআলার বিশাল জ্ঞান এবং তাঁর সর্ববিষয়ে অবগত থাকার ক্ষমতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। তিনি মানুষ যা প্রকাশ করে বা গোপন রাখে- সবকিছুই জানেন, কিছুই তাঁর দৃষ্টির বাইরে থাকে না। পূর্ববর্তী আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায় যে, মুনাফিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- তারা ইসলামকে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করে, কিন্তু অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখে। তাই মুমিনদের উচিত, কাফেরদের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং তাদের নৈতিকতা ও কৌশল অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকা। কারণ এসব পদ্ধতি মূলত মুনাফিকদের এবং শয়তানের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য, যা একজন প্রকৃত মুমিনের জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক।

﴿وَمِنۡهُمۡ أُمِّيُّونَ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ ٧٨ فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ يَكۡتُبُونَ ٱلۡكِتَٰبَ بِأَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشۡتَرُواْ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلٗاۖ فَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا يَكۡسِبُونَ ٧٩ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَةٗۚ قُلۡ أَتَّخَذۡتُمۡ عِندَ ٱللَّهِ عَهۡدٗا فَلَن يُخۡلِفَ ٱللَّهُ عَهۡدَهُۥٓۖ أَمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٨٠ بَلَىٰۚ مَن كَسَبَ سَيِّئَةٗ وَأَحَٰطَتۡ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٨١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٨٢﴾

অর্থ: ***[আর তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যারা মিথ্যা আশা ছাড়া কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে।* কাজেই দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে অতঃপর সামান্য মূল্য পাওয়ার জন্য বলে, "এটা আল্লাহর কাছ থেকে। অতএব, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের ধ্বংস এবং যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের ধ্বংস।* আর তারা বলে, 'গোনা-কয়েকদিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না'। বল, 'তোমরা কি আল্লাহর নিকট ওয়াদা নিয়েছ, ফলে আল্লাহ তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না? নাকি আল্লাহর উপর এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না'?* হ্যাঁ, যে পাপ উপার্জন করেছে এবং তার পাপরাশি তাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।* আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।]*** (আয়াত নং ৭৮-৮২)।

আল্লাহ তাআলা ব্যাখ্যা করেছেন যে, আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা নিরক্ষর, লিখতে-পড়তে জানে না। ফলে তারা আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি যে কিতাব নাজিল করেছেন, সে সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান রাখে না। বরং তারা কেবল অনুমানভিত্তিক ধারণা ও মনগড়া কথা বলে। তারা আল্লাহর কাছে এমন কিছু আশা

করে, যার কোনো ভিত্তি নেই এবং যা তাদের পাওয়ার যোগ্যতাও নেই। এটি স্পষ্টভাবে বোঝায় যে, আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে কথা বলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। মানুষ যদি কোনো নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া কুরআন সম্পর্কে মন্তব্য করে—যেমন, এটি সম্ভব নয়, এটি ভুল, এটি বৈধ বা অবৈধ—তাহলে সে গুরুতর ভুলের মধ্যে নিপতিত হয়। অনেকেই মনে করে যে, তারা যা বলছে, তা সঠিক; অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা কেবল অনুমান ও অজ্ঞতার ভিত্তিতে কথা বলে। এ কারণে মুমিনদের এ সতর্কতা অবলম্বন জরুরি- আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে কথা বলার আগে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা এবং নিশ্চিত না হয়ে কোনো মন্তব্য না করা। কারণ আল্লাহর বিধান ও নির্দেশনা সম্পর্কে মনগড়া কথা বলা মারাত্মক গুনাহ এবং পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ।

এই নিন্দা থেকে বিপরীত গুণের প্রশংসা বোঝা যায়, অর্থাৎ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার গুরুত্ব। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সত্যিকারের জ্ঞান থাকা অবস্থায় কথা বলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি এতে আল্লাহভীরু, যোগ্য ও বিশ্বস্ত আলেমদের মর্যাদা প্রকাশ পায়—যারা যথাযথ জ্ঞান ও উপলব্ধির ভিত্তিতে কথা বলেন, অনুমান বা কল্পনার ওপর ভিত্তি করে নয়। এটি বোঝায় যে, কিছু মানুষ আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে মনগড়া কথা বলার দুঃসাহস দেখায়, যা খুবই বিপজ্জনক। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এই পথ থেকে বিরত থাকা, এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া যেন সে না জেনে কিছু না বলে। তদুপরি, এমন ব্যক্তির কাছে ফতোয়া চাওয়া থেকে বিরত থাকা, যার কাছে প্রকৃত জ্ঞান নেই, এবং দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির নির্দেশনা গ্রহণ না করা। আল্লাহ তাআলার এই বাণী **"إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ"** (তারা কেবল অনুমান করে) থেকে বোঝা যায় যে, অনুমান কখনোই প্রকৃত জ্ঞান নয়; বরং এটি কেবল অনুমিত কল্পনা ও ধারণা মাত্র। সঠিক জ্ঞান হলো এমন নিশ্চিত উপলব্ধি, যা বাস্তব সত্যের ওপর নির্ভরশীল এবং কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখে না। তাই দ্বীন সম্পর্কে কথা বলার আগে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক, যেন মানুষ ভুল পথে পরিচালিত না হয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা কঠোর শাস্তির হুমকি দিয়েছেন তাদের প্রতি, যারা কিতাবকে বিকৃত করে, নিজের ইচ্ছামতো লেখে এবং তারপর মিথ্যাভাবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দাবি করে। তারা বলে, **"এই বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে,"** অথচ এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অপবাদ। আল্লাহ বলেন: **(সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা নিজেদের হাতে কিতাব লিখে, তারপর বলে, 'এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে,' যেন তারা এর মাধ্যমে সামান্য মূল্য অর্জন করতে পারে।)** ইবন কাসীর রহঃ বলেন: "এই আয়াতে ইহুদিদের আরেকটি দলকে চিহ্নিত করা হয়েছে- যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করত, আল্লাহর ওপর মিথ্যা রচনা করত এবং অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাস করত।"[১০] যদিও আয়াতটি মূলত বনি ইসরাইলের প্রসঙ্গে এসেছে, তবে এর মধ্যে সমগ্র মানবজাতির জন্য শিক্ষা ও সতর্কতা রয়েছে। কারণ, মানব ইতিহাসে সব যুগেই এমন মানুষ থাকে, যারা একই পথ অনুসরণ করে (আল্লাহর দ্বীনের নাম নিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে, কিতাবকে বিকৃত করে এবং সত্যকে আড়াল করে)।

এরপর আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের জন্য তাঁর শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: **" অতএব, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের ধ্বংস এবং যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের ধ্বংস।"** এখানে উল্লেখিত "الويل" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যা ধ্বংস ও বিনাশের অর্থ বহন করে। কিছু আলেম বলেছেন যে, এটি জাহান্নামের গভীরে অবস্থিত একটি ভয়ানক স্থান, যেখানে পুঁজ ও দুর্গন্ধময় তরল পদার্থ রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এটি জাহান্নামের একটি উপত্যকা, যেখানে পাহাড়গুলোও গলে যাবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: **"ওয়াইল হলো জাহান্নামের একটি উপত্যকা, যেখানে কাফির ব্যক্তি চল্লিশ বছর ধরে পড়তে থাকবে, তার তলদেশে পৌঁছার**

---

(১০) দেখুন: তাফসীর ইবনে কাসীর: (১/১২১)।

পূর্ব পর্যন্ত।" (সুনানে তিরমিযি; হাদিসটি যয়ীফ, তবে নসিহত সংক্রান্ত যয়ীফ হাদিস গ্রহণ করা যায়।)

আল্লাহ তাআলা এরপর তাদের ভিত্তিহীন ধারণার কারণ তুলে ধরেছেন, যারা আল্লাহর কিতাবকে হালকাভাবে নেয় এবং এর মাধ্যমে সামান্য পার্থিব লাভের চেষ্টা করে। তারা বলে, **"আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, কেবল নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্য।"** অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করত যে, তাদের পাপের শাস্তি সীমিত সময়ের জন্য হবে এবং এরপর তারা মুক্তি পাবে। এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, মানুষ নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য মিথ্যা ও ভুল যুক্তি তৈরি করতে পারে। তারা নিজেদেরকে এইভাবে আশ্বস্ত করে যে, শাস্তি সামান্য সময়ের জন্য হবে, কিন্তু তারা কি সেই সামান্য সময়ের শাস্তিও সহ্য করতে পারবে? আল্লাহ তাআলা তাদের এই মিথ্যা ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, **"বলুন, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোনো অঙ্গীকার গ্রহণ করেছ, যা তিনি কখনো ভঙ্গ করবেন না? নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলছ, যার কোনো জ্ঞান তোমাদের নেই?"** অর্থাৎ তাদের এই বিশ্বাসের পেছনে কোনো প্রামাণ্য দলিল নেই, বরং এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অনুমানভিত্তিক। এরপর আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, **"বরং যারা মন্দ কাজ করে এবং যাদের পাপ তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরিবেষ্টন করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।"**

এটি প্রমাণ করে যে, মানুষকে কেবল সেই কথাই বলা উচিত যা সে নিশ্চিতভাবে জানে। তাকে এমন কোনো অজুহাত বা বৈধতার খোঁজ করা উচিত নয়, যা তাকে হারামকে বৈধ মনে করতে সহায়তা করে বা আল্লাহর আয়াতকে সামান্য পার্থিব লাভের বিনিময়ে বিক্রি করতে প্ররোচিত করে। কারণ, আল্লাহর বিধান অত্যন্ত মূল্যবান, এবং এর বিনিময় হলো জান্নাত- যা কেবল তারাই অর্জন করবে, যারা আল্লাহর বিধানকে যথাযথভাবে গ্রহণ করে। আল্লাহ তাআলা মিথ্যাবাদীদের শাস্তির ব্যাখ্যা দেওয়ার পর

সত্যিকারের ঈমানদারদের প্রতিদান সম্পর্কে বলেন: **(আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী; সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।)** কাজেই এটাই সেই ঈমানদার ব্যক্তির প্রতিদান, যে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত সৎকর্ম সম্পাদন করে। সে আল্লাহর আদেশের প্রতি দৃঢ় থাকে এবং তা সামান্য পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করে না। ফলে সে কখনো আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে না এবং তাঁর শাস্তিকে অবহেলা করে না।

অতএব, হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার শাস্তি ও আজাব থেকে রক্ষা করো। তোমার কিতাব ও দ্বীনের বিষয়ে অজ্ঞতাপূর্ণ কথা বলা থেকে আমাদের হিফাজত করো। আমিন।

﴿وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ لَا تَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَانٗا وَذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنٗا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنكُمۡ وَأَنتُم مُّعۡرِضُونَ ٨٣﴾

অর্থ: **[আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না এবং সদাচার করবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে। আর মানুষকে উত্তম কথা বল, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা সকলে উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিলে।]** (আয়াত নং ৮৩)।

এই পবিত্র আয়াতটি বর্ণনা করে যে, আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। তারা পিতামাতার সাথে সদাচরণ করবে, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম ও দরিদ্রদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে এবং মানুষকে উত্তম কথা বলবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। কোমল আচরণ করবে ও

সুন্দরভাবে অন্যকে সম্বোধন করবে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে এবং জাকাত আদায় করবে। এই আয়াতটি আল্লাহ তাআলার শরীয়তের মূলনীতিগুলোকে তুলে ধরে, যা একমাত্র তাঁর ইবাদত ও তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি স্পষ্ট করে যে, ইবাদত কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না। এছাড়াও, এই আয়াতটি নৈতিক সদগুণ ও অন্যের প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব তুলে ধরে: **"পিতামাতার সাথে সদাচরণ কর, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম ও দরিদ্রদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর এবং মানুষকে উত্তম কথা বল।"** এটি ইবাদতের গুরুত্বকেও তুলে ধরে, যেমন নামাজ প্রতিষ্ঠা করা ও জাকাত আদায় করা।

এই পবিত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলার হক বর্ণনা করা হয়েছে, যা তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া তা পূর্ণ হয় না। আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো তাঁর প্রেরিত রাসূলগণ, তাদের নিয়ে আসা কিতাব এবং সেই কিতাব নিয়ে আসা সম্মানিত ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা। এই আয়াতটি ইঙ্গিত দেয় যে, আল্লাহর জন্য খাঁটি ও সঠিক ইবাদত করতে হলে ঈমানের মূল স্তম্ভগুলো বাস্তবায়ন করা আবশ্যক, যদিও এখানে সেগুলো সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, তাওহীদ ও ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা থেকেই সেগুলোর প্রতি ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট। এই আয়াতটি শিরকের ভয়াবহতাকেও তুলে ধরে, যা তাওহীদের বিপরীত। এটি স্পষ্ট করে যে, ইবাদত কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না: **"তোমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে।"** যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে, সে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি যা আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন।

এই মহান আয়াতটি পিতামাতার হক স্পষ্ট করে, যা সাধারণভাবে "ইহসান" বা সদাচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। "ইহসান" শব্দটি এর সমস্ত বিস্তারিত দিক ও বৈশিষ্ট্যকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা পিতামাতার প্রতি খারাপ কথা বা কাজ থেকে বিরত থাকা

এবং তাদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও সেবা প্রদান করা বোঝায়। "ইহসান" শব্দটি ন্যায়বিচারের চেয়েও ব্যাপক এবং এর চেয়ে উচ্চতর। ন্যায়বিচার করা অবশ্যই কর্তব্য, কিন্তু ইহসান হলো ন্যায়বিচারের সীমা অতিক্রম করে অতিরিক্ত সম্মান ও সেবা প্রদান করা। পিতামাতার প্রতি ইহসান করা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এবং এটি একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য। এই নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পিতামাতার মর্যাদা ও সম্মানকে উচ্চ স্থান দিয়েছেন। এটি আমাদেরকে পিতামাতার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও সেবা প্রদানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, যা কোনো সীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। বিশেষত যখন এই নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা ও দয়ালু।

এই পবিত্র আয়াতটি আত্মীয়স্বজনের হক সংক্ষেপে বর্ণনা করেছে। তবে বুদ্ধিমানদের কাছে স্পষ্ট যে, আত্মীয়স্বজন বিভিন্ন স্তরের হতে পারে, তাই সাধারণ বর্ণনা দিয়েই এর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয়েছে। এরপর নৈতিক সদগুণের পরিধি ইয়াতীম ও দরিদ্রদের প্রতি প্রসারিত হয়েছে এবং সর্বশেষে সকল মানুষের প্রতি উত্তম আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: **"মানুষকে উত্তম কথা বল।"** এই নির্দেশটি সমস্ত নৈতিক সদগুণ ও অসদাচরণ ত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে অন্যের অধিকার রক্ষা করা এবং তাদের প্রতি সদাচরণ করা অন্তর্ভুক্ত, কারণ এটি ইহসানের অংশ। অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করা বা তাদের প্রতি খারাপ আচরণ করা ইহসানের বিপরীত। ইয়াতীম ও দরিদ্রদের বিশেষভাবে উল্লেখ করা এবং তাদেরকে সাধারণ মানুষের আগে স্থান দেওয়া তাদের গুরুত্ব ও যত্নের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বিশেষভাবে তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যা তাদের প্রতি অতিরিক্ত যত্ন ও সহানুভূতির প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে। ইয়াতীম ও দরিদ্ররা জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা, যেমন খাদ্য, পানীয়, নির্দেশনা ও যত্ন পূরণে অক্ষম। তাই তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই আয়াতটি তার ভাষাগত সৌন্দর্য ও গভীর

অর্থের জন্য একটি মুজিজা। এটি অল্প শব্দে বিস্তৃত আইন ও নৈতিক নির্দেশনা প্রদান করে, যা ইসলামের সামগ্রিকতা ও গভীরতাকে প্রকাশ করে।

এরপর আল্লাহ তাআলা নামাজ প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন, যা বান্দা ও তার রবের মধ্যে একটি ইবাদত: **"তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা কর।"** তারপর তিনি জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন, যা আল্লাহর ইবাদত হলেও তা বান্দাদের মধ্যে আদায় করা হয়: **"এবং জাকাত আদায় কর।"** জাকাত হলো আল্লাহর অনুগ্রহে ও হিকমতে ধনী ব্যক্তি ও দরিদ্র ব্যক্তির মধ্যে বাস্তবিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার সম্পর্ক। এটি সমাজে সম্পদ বণ্টন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই বিধানটি ইহসান ও রহমতের সমন্বয়ে গঠিত, যা প্রমাণ করে যে এটি কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসতে পারে। এর বিস্তারিত দিকগুলো আল্লাহর হিকমত ও জ্ঞানের প্রতিফলন। এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এর ভাষাগত সৌন্দর্য ও গভীর অর্থ সম্পূর্ণতা ও সঠিকতার সাথে উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। এটি ইসলামের সামগ্রিকতা ও ভারসাম্যকে প্রকাশ করে।

এরপর আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যারা এই শরীয়তের মূলনীতিগুলো প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছিল: **"অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা সকলে উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিলে।"** এই আয়াতটি তাদের ব্যর্থতা ও অবাধ্যতার কথা স্পষ্ট করে, যারা তাদের অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল, অল্প সংখ্যক ছাড়া। এটি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি সতর্কবাণী, যাতে তারা বনি ইসরাইলের মতো না হয়। এটি একটি পরোক্ষ উপদেশও, যা শুনে বা পাঠ করে যে কেউ বুঝতে পারে।

﴿وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَكُمۡ لَا تَسۡفِكُونَ دِمَآءَكُمۡ وَلَا تُخۡرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ ثُمَّ أَقۡرَرۡتُمۡ وَأَنتُمۡ تَشۡهَدُونَ ٨٤ ثُمَّ أَنتُمۡ هَٰٓؤُلَآءِ تَقۡتُلُونَ أَنفُسَكُمۡ وَتُخۡرِجُونَ فَرِيقٗا مِّنكُم مِّن دِيَٰرِهِمۡ تَظَٰهَرُونَ عَلَيۡهِم بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَإِن يَأۡتُوكُمۡ أُسَٰرَىٰ تُفَٰدُوهُمۡ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيۡكُمۡ إِخۡرَاجُهُمۡۚ أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ٨٥ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا بِٱلۡأٓخِرَةِۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ ٨٦﴾

অর্থ: ***[আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা নিজদের রক্ত প্রবাহিত করবে না এবং নিজদেরকে তোমাদের গৃহসমূহ থেকে বের করবে না। অতঃপর তোমরা স্বীকার করে নিলে। আর তোমরা তার সাক্ষী।* অতঃপর তোমরাই তো তারা, যারা নিজদেরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের মধ্য থেকে একটি দলকে তাদের গৃহ থেকে বের করে দিচ্ছ; পাপ ও সমীলঙ্ঘনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে সহায়তা করছ। আর তারা যদি বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আসে, তোমরা মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত কর। অথচ তাদেরকে বের করা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।* তারাই সে লোক, যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন ক্রয় করে; সুতরাং তাদের থেকে আযাব হালকা করা হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।]*** (আয়াত নং ৮৪-৮৬)।

এই পবিত্র আয়াতটি বর্ণনা করে যে, আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তারা একে অপরের রক্ত প্রবাহিত করবে না এবং একে অপরকে তাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেবে না। তারা এই চুক্তি জানত এবং তা

মেনে নিয়েছিল, এমনকি তারা নিজেরাই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিল। এটি তাদের ধর্মের মূলনীতির অংশ ছিল।

এই পবিত্র আয়াতটি মদিনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম-এর সময় ইহুদিদের অবস্থা বর্ণনা করে। তারা আওস ও খাজরাজ গোত্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, যারা ইসলাম গ্রহণের পর নবীর সাহাবী ও সাহায্যকারী হয়ে উঠেছিল। জাহিলিয়্যাতের যুগে আওস ও খাজরাজ গোত্র মূর্তিপূজক ছিল এবং তাদের মধ্যে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এদিকে মদিনার ইহুদিরা তিনটি গোত্রে বিভক্ত ছিল: বনু কাইনুকা, বনু নাযির (যারা খাজরাজের মিত্র ছিল) এবং বনু কুরাইজা (যারা আওসের মিত্র ছিল)। যখন তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যেত, প্রতিটি দল তাদের মিত্রদের পক্ষে যুদ্ধ করত। ফলে এক ইহুদি অন্য ইহুদিকে হত্যা করত, যা তাদের ধর্ম ও কিতাব অনুযায়ী হারাম ছিল। তারা একে অপরকে বাড়িঘর থেকে বের করে দিত এবং তাদের সম্পদ লুট করত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **"যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা একে অপরের রক্ত প্রবাহিত করবে না এবং একে অপরকে বাড়িঘর থেকে বের করে দেবে না। তারপর তোমরা এটা মেনে নিয়েছিলে এবং তোমরা নিজেরাই এর সাক্ষী ছিলে।"** তারপর যুদ্ধ শেষ হলে তারা তাওরাতের নির্দেশ অনুযায়ী বন্দীদের মুক্তিপণ দিত। কিন্তু তারা তাওরাতের নির্দেশ লঙ্ঘন করে একে অপরের রক্ত প্রবাহিত করত এবং একে অপরকে বাড়িঘর থেকে বের করে দিত। আল্লাহ তাআলা তাদের এই আচরণের নিন্দা করেছেন: **"অতঃপর তোমরাই তো তারা, যারা নিজদেরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের মধ্য থেকে একটি দলকে তাদের গৃহ থেকে বের করে দিচ্ছ; পাপ ও সমীলঙ্ঘনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে সহায়তা করছ। আর তারা যদি বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আসে, তোমরা মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত কর। অথচ তাদেরকে বের করা তোমাদের জন্য হারাম ছিল।"** এই আয়াতটি ইহুদিদের দ্বৈত আচরণের প্রতি তিরস্কার ও সতর্কবাণী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তারা তাওরাতের কিছু নির্দেশ মেনে

চললেও অন্য নির্দেশ লঙ্ঘন করত, যা তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয়কে প্রকাশ করে।

এটি আল্লাহ তাআলার শরীয়তের মহানত্ব প্রকাশ করে, যা মানুষের জীবন রক্ষা করে এবং অন্যায়ভাবে রক্তপাত করতে নিষেধ করে। এটি সমাজের শান্তি বজায় রাখতে এবং দুর্বলদের উপর অত্যাচার, তাদের সম্পদ কেড়ে নেওয়া, তাদেরকে বাড়িঘর থেকে বের করে দেওয়া ও তাদের পরিবারের সাথে দুর্ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। এমন কাজ তাদের মাঝে ঐক্য বিনষ্ট করে। এটি আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে কিছু অংশ মানা ও কিছু অংশ উপেক্ষা করে হেয়জ্ঞান করার বিপদকেও তুলে ধরে। বস্তুত এটি অজ্ঞ ইহুদিদের একটি বৈশিষ্ট্য, যারা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মের কিছু অংশ মানে এবং কিছু অংশ উপেক্ষা করে।

কুরআন মজীদে **"তোমরা নিজেদের হত্যা কর"** এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে যা মানুষের হৃদয়কে নাড়া দেয়। এটি এমনভাবে বলা হয়েছে যেন মানুষ নিজেকে হত্যা করছে, শুধু অন্যকে নয়। এই শব্দগুচ্ছটি ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অনুভব করাতে চান যে, যখন কেউ অন্যায়ভাবে অন্যকে হত্যা করে, তখন সে যেন নিজেকেই হত্যা করে। কারণ, নিষ্পাপ প্রাণ হত্যা করা আল্লাহ তাআলার নিষেধ, শুধুমাত্র ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে হত্যা করা যায়। ইবনে কাসীর *(রহ.)* বলেছেন*:* "একই ধর্মের অনুসারীগণ একটি দেহের মতো।" যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম বলেছেন*:* **"মুমিনদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও সহানুভূতি একটি দেহের মতো দেখতে পাবে। যখন দেহের কোনো অংশ ব্যথা পায়, তখন সমস্ত দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় আক্রান্ত হয়।"** সহীহ বুখারী।

এখানে আল্লাহ তাআলার কিতাবের পরবর্তী অংশে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর ভাষাগত অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে, যা বিশাল অপরাধ হিসেবে বিতাড়নের *(*নির্বাসনের*)* ভয়াবহতাকে তুলে ধরে। আল্লাহ তাআলা বলেন*:* **"তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে এক**

দলকে বহিষ্কার করো"। এখানে **"مِّنكُمْ"** শব্দটি এমন এক ভাষাগত সূক্ষ্মতা বহন করে, যা অংশকে পুরো সত্তা থেকে পৃথক করার ধারণা দেয়। অর্থাৎ, তারা যেন নিজেদের দেহেরই একটি অংশকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল, তারপর সেই অংশের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে অপরাধ ও সীমালঙ্ঘন করল। এটি এক নিষিদ্ধ ও জঘন্য কাজ। এই কুরআনিক বর্ণনা হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এটি এমন এক আবেগ জাগিয়ে তোলে, যা মানুষের হৃদয়ে প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ভাষার অলংকার ও গভীরতা এখানে এতটাই শক্তিশালী যে, এর তাৎপর্য ও আবেদন সরাসরি অন্তরে প্রবেশ করে এবং সেখানে স্থায়ী ছাপ ফেলে।

আল্লাহ তাআলা এখানে তাদের তওরাতে যে বিষয়গুলো আছে, তা সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন। এটি তাদের এবং অন্যান্যদের জন্য একটি স্পষ্ট প্রমাণ যে, এই কুরআন আল্লাহর বাণী এবং এটি সত্যিই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে। কারণ, মুহাম্মাদ *(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* কিভাবে তাদের কিতাবে বিদ্যমান সূক্ষ্ম বিবরণসমূহ জানলেন, যদি না তিনি আল্লাহর প্রেরিত নবী হন?

এখান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়: যখন কারও বিরোধিতা করা হয়, তখন তার নিজের জানা সত্য দিয়ে তাকে সম্মুখীন করা অধিক কার্যকর হয়। কারণ, এটি তার জন্য অকাট্য প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়, যা সে চাইলেও অস্বীকার করতে পারে না।

কুরআন মজীদ এই বক্তব্য দিয়েছে বাস্তবতা প্রতিষ্ঠা এবং এই কাজের নিন্দা করার প্রসঙ্গে: **"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ মান এবং কিছু অংশ অস্বীকার কর?"** *(সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৮৫)*

এরপর এই প্রসঙ্গের পরই আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে তা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই শাস্তির বর্ণনা দেওয়ার আগে তিনি একটি প্রশ্ন উত্থাপন

করেছেন, যা মন ও আবেগকে জাগ্রত করে: **"তোমাদের মধ্যে যে এমন কাজ করে, তার শাস্তি কী?"** এরপর তিনি উত্তর দিয়েছেন: **"তাদের শাস্তি হলো দুনিয়ায় অপমান ও লাঞ্ছনা, আর কিয়ামতের দিন তারা সবচেয়ে কঠোর শাস্তির দিকে ফিরে যাবে।"** এই আয়াতটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যারা আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ মানে এবং কিছু অংশ অস্বীকার করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কঠোর শাস্তি রয়েছে। দুনিয়ায় তারা অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হবে, আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে সবচেয়ে কঠোর শাস্তি।

এটি ইঙ্গিত দেয় যে, দুনিয়ায় অপমান ও লাঞ্ছনাও একটি শাস্তি। এটি মানুষের মধ্যে অসম্মান ও বদনাম সৃষ্টি করে, যা তার জীবনকে দুঃখ ও কষ্টে পূর্ণ করে। এটি আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার শাস্তি থেকে সতর্ক করে, যা দুটি দিক থেকে আসতে পারে: দুনিয়ায় অপমান ও লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে কঠোর শাস্তি। দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলা পাপীকে অপমান ও লাঞ্ছনার মাধ্যমে শাস্তি দেন, যা তার জীবনকে অশান্তিতে পূর্ণ করে এবং তার সুখ ও শান্তি নষ্ট করে। এরপর আখিরাতে তার জন্য রয়েছে সবচেয়ে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ তাআলা আয়াতটি শেষ করেছেন এই বলে: **"আর আল্লাহ তোমরা যা কর, তা থেকে গাফিল নন।"** এখানে আল্লাহ নিজেকে গাফিলতি থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন, যা মানুষের স্বভাব। এটি একটি বাচনিক সৌন্দর্য, যেখানে বিপরীত বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করার মাধ্যমে পূর্ণতার গুণ প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **"তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করে না, নিদ্রাও নয়।"** সুতরাং আল্লাহর কিতাব কতই সৌন্দর্য্যপূর্ণ!

এরপর আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিদের গুণা বর্ণনা করেন, যারা এই নিন্দনীয় কাজ করে থাকে: "**তারাই, যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়াকে ক্রয় করে নিয়েছে।**" এই কাজটি তাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, যারা দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতকে বিক্রি করে। এটি এমনভাবে বলা হয়েছে যেন তারা

আখিরাতের স্থায়ী জীবনের বিনিময়ে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন ক্রয় করেছে। এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হতে পারে! যখন একজন ব্যক্তি জেনেশুনে, বুঝেও, জাগতিক মোহের জন্য চিরন্তন সফলতাকে হারায়? এখানে কোনো সৌন্দর্য বা আকর্ষণীয় কিছুই নেই, কেবল ধ্বংসের পথ রয়েছে। এই আয়াত গভীরভাবে বিবেকবানদের মনকে নাড়া দেয়, যেন তারা এই ধ্বংসাত্মক পথ থেকে ফিরে আসে এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখের বিনিময়ে আখিরাতকে বিক্রি না করে।

এটি মু'মিনদেরকে এক গভীর ভাবনার শিক্ষা দেয় যে, তারা যেন গুনাহের ক্ষেত্রে সচেতন থাকে। কেননা, প্রতিটি পাপ মূলত দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতের কোনো না কোনো অংশকে বিসর্জন দেওয়া। এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হতে পারে! বিশেষত, যখন কুরআনের বর্ণনায় এটি ক্রয়-বিক্রয়ের রূপে উপস্থাপিত হয়েছে, তখন বিষয়টি আরও গভীরভাবে বোঝা যায়। এটি একপ্রকার আখিরাতের ব্যবসা; কেউ লাভবান হয়, আর কেউ সম্পূর্ণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এরপর আল্লাহ তাআলা এমন কাজকারীদের পরিণতি ঘোষণা করেন: **(তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং কেউ তাদের সাহায্য করবে না।)** এটি অত্যন্ত কঠোর হুঁশিয়ারি। কিয়ামতের দিন তাদের জন্য শাস্তি লাঘব করা হবে না, কাউকে তাদের সাহায্যে পাঠানো হবে না, কেউ তাদের রক্ষা করতে আসবে না। তারা এক কঠিন, অবর্ণনীয় শাস্তির সম্মুখীন হবে, যা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় থাকবে না।

﴿وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ وَقَفَّيۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِۦ بِٱلرُّسُلِۖ وَءَاتَيۡنَا عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدۡنَٰهُ بِرُوحِ ٱلۡقُدُسِۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمۡ رَسُولُۢ بِمَا لَا تَهۡوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقٗا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقٗا تَقۡتُلُونَ ٨٧ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلۡفُۢۚ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفۡرِهِمۡ فَقَلِيلٗا مَّا يُؤۡمِنُونَ ٨٨ وَلَمَّا جَآءَهُمۡ كِتَٰبٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٞ لِّمَا مَعَهُمۡ وَكَانُواْ مِن قَبۡلُ يَسۡتَفۡتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦۚ فَلَعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٨٩ بِئۡسَمَا ٱشۡتَرَوۡاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡ أَن يَكۡفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغۡيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٖۚ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٞ مُّهِينٞ ٩٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤۡمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيۡنَا وَيَكۡفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلۡحَقُّ مُصَدِّقٗا لِّمَا مَعَهُمۡۗ قُلۡ فَلِمَ تَقۡتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبۡلُ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٩١ * وَلَقَدۡ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ ٱتَّخَذۡتُمُ ٱلۡعِجۡلَ مِنۢ بَعۡدِهِۦ وَأَنتُمۡ ظَٰلِمُونَ ٩٢ وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَكُمۡ وَرَفَعۡنَا فَوۡقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيۡنَٰكُم بِقُوَّةٖ وَٱسۡمَعُواْۖ قَالُواْ سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا وَأُشۡرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡعِجۡلَ بِكُفۡرِهِمۡۚ قُلۡ بِئۡسَمَا يَأۡمُرُكُم بِهِۦٓ إِيمَٰنُكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٩٣﴾

অর্থ: **[অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে পাঠিয়েছি এবং আমি মারইয়াম-পুত্র 'ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি এবং রূহুল কুদুস" দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। তবে কি যখনি কোন রাসূল তোমাদের কাছে এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনি তোমরা অহংকার করেছ? অতঃপর (নবীদের) একদলের উপর মিথ্যারোপ করেছ এবং একদলকে করেছ হত্যা?* আর তারা বলেছিল, 'আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত', বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদেরকে লানত করেছেন। সুতরাং তাদের কম সংখ্যকই ঈমান আনে।* আর যখন তাদের কাছে, তাদের সাথে যা আছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সত্যায়নকারী কিতাব এল, অথচ তারা পূর্বে কাফিরদের উপর বিজয় কামনা করত। সুতরাং যখন তাদের নিকট এল যা তারা চিনত, তখন তারা তা অস্বীকার করল। অতএব কাফিরদের উপর আল্লাহর লানত।* যার বিনিময়ে তারা নিজদেরকে বিক্রয় করেছে তা কত জঘন্য**

(তা এই) যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা তারা অস্বীকার করেছে এই জিদের বশবর্তী হয়ে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার উপর তাঁর অনুগ্রহ নাযিল করেছেন। সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের অধিকারী হল। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।* আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাতে ঈমান আনো, তারা বলে, আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা কেবল তাতে ঈমান আনি। অথচ এর বাইরে যা কিছু আছে সবকিছুই তারা অস্বীকার করে, যদিও তা সত্য এবং তাদের নিকট যা আছে তার সত্যায়নকারী। বলুন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা অতীতে আল্লাহর নবীদেরকে হত্যা করেছিলে?* আর অবশ্যই মূসা তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিলেন, তারপর তোমরা তার অনুপস্থিতিতে গো বৎসকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিলে। বাস্তবিকই তোমরা যালিম।* স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তুর-কে তোমাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম, (বলেছিলাম,) যা দিলাম দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর এবং শোন'। তারা বলেছিল, "আমরা শোনলাম ও অমান্য করলাম"। আর কুফরীর কারণে তাদের অন্তরে গো-বৎস প্রীতি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। বলুন, যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে তোমাদের ঈমান যার নির্দেশ দেয় তা কত নিকৃষ্ট!] (আয়াত নং ৮৭-৯৩)।

আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের কাছে তাঁর কালীম (সরাসরি কথোপকথনকারী) মুসা (আলাইহিস সালাম)-কে প্রেরণ করেছিলেন। এরপর তিনি তাদের কাছে একের পর এক রাসূল প্রেরণ করেন, শেষ পর্যন্ত ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে প্রেরণ করেন, যাকে তিনি রূহুল কুদুস (জিবরীল আলাইহিস সালাম)-এর মাধ্যমে শক্তিশালী ও সাহায্য করেছিলেন।

এটি বনি ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের কাছে মুসা (আলাইহিস সালাম)-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন এবং এরপর একের

পর এক রাসূল প্রেরণ করেন। তাদের শেষ নবী ছিলেন ঈসা (আলাইহিস সালাম)। অনুরূপভাবে এই আয়াতটি ইঙ্গিত দেয় যে, আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাঁর সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে শক্তিশালী করেন। যেমন তিনি ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-এর মাধ্যমে শক্তিশালী করেছিলেন।

এরপর আল্লাহ তাআলা রাসূলগণের সাথে বনি ইসরাইলের আচরণগত অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে কিছু লোক রাসূলগণকে মিথ্যা বলেছিল, এমনকি কিছু লোক নবীগণকে হত্যা করেছিল। এটি তাদের অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কারণে হয়েছিল, যা তাদেরকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছিল। এটি তাগাদা দেয় যে, প্রবৃত্তি মানুষকে অহংকার ও ঔদ্ধত্যের দিকে নিয়ে যায়, যা সত্য গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। এটি মানুষের জন্য একটি সতর্কবাণী যে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করা এবং রাসূলগণের বিরোধিতা করা কতটা বিপজ্জনক। এই আয়াতটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ তাআলার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা এবং তাদের অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমাদেরকে প্রবৃত্তি ও অহংকার থেকে দূরে থাকতে এবং সত্যের পথে অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

এরপর আল্লাহ তাআলা আবারো গুনাহ, কুফর এবং বিপথগামিতার কারণ বর্ণনা করেন, যেমন তাঁর বাণী: **"তারা বলে আমাদের হৃদয় আবৃত।"** অর্থাৎ, তারা দাবি করে যে, তাদের অন্তর ঢেকে দেওয়া হয়েছে, ফলে তারা কিছু উপলব্ধি করতে পারে না, সত্য বুঝতে পারে না। এটি মিথ্যা অজুহাত ও আত্মপ্রবঞ্চনার বিপদকে তুলে ধরে। যখন একজন ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন সে নানা অজুহাত দাঁড় করায়। এর জবাবে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রকৃত পরিণতি ঘোষণা করেন: **"বরং আল্লাহ তাদের কুফরের কারণে অভিশপ্ত করেছেন, ফলে তাদের মধ্যে অল্পই ঈমান আনে।"** অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের কুফরের কারণে তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে

দিয়েছেন, তাই তাদের মধ্যে ঈমান আনার সংখ্যা খুবই কম। কেউ কেউ বলেন, তাদের ঈমান এতটাই সামান্য যে, তা কার্যত মূল্যহীন।

এই কুরআনি বর্ণনা স্পষ্টভাবে বোঝায় যে, বনী ইসরাঈলের এই পথ ছিল এক বিপজ্জনক পথ, যার পরিণতি হলো আল্লাহর রহমত থেকে বিচ্ছিন্নতা। এটি আমাদের জন্যও এক গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা। যদি কেউ সত্যকে অস্বীকার করে, নিজের গুনাহকে বৈধ করার চেষ্টা করে, কিংবা কুরআনের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তার পরিণতিও হবে একই—আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর আল্লাহ ছাড়া কে আছে, যে আমাদের রক্ষা করতে পারে?

এরপর আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলদের অবস্থা বর্ণনা করার পর, তাদের কুরআনের প্রতি মনোভাব স্পষ্ট করেন, যা আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: **(আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কিতাব এলো, যা তাদের কাছে থাকা কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে।)** এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কুরআন মাজীদ তাওরাতের সত্যতা নিশ্চিত করে এবং তার সাথে বিরোধপূর্ণ কিছু বলে না। এটি বনী ইসরাঈলের জন্য এক স্পষ্ট প্রমাণ ছিল যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রকৃতই আল্লাহর প্রেরিত নবী, এবং যে কিতাব তিনি এনেছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। তাওরাতে যে সত্য ছিল, কুরআন তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। বিশেষ করে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের পূর্বে তারা তাঁর আগমনের মাধ্যমে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য পাওয়ার আশা করত। তারা তাদের শত্রুদের বলত যে, শীঘ্রই শেষ যুগে এক নবী আসবেন, যার সঙ্গে আমরা মিলিত হয়ে তোমাদের ধ্বংস করব, যেমন 'আদ ও ইরাম জাতি ধ্বংস হয়েছিল। এটি আল্লাহর এ বাণীর মর্ম: **" وَكَانُواْ مِن قَبۡلُ يَسۡتَفۡتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ "** (আর তারা পূর্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত।) কিন্তু যখন সেই নবী সত্যিই আবির্ভূত হলেন, তখন তারা তাকে অস্বীকার

করল। **(অতঃপর যখন তাদের কাছে সেই ব্যক্তি এল, যাকে তারা চিনত, তখন তারা তাকে অস্বীকার করল।)** এর পরিণামস্বরূপ, আল্লাহ ঘোষণা করেন: **" فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ"** (অতএব, আল্লাহর অভিশাপ কাফিরদের ওপর।) অর্থাৎ, তাদের কুফরের কারণে তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হলো।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের অবস্থানের মূল্যায়ন করেন **"بِئْسَ"** (কত নিকৃষ্ট) শব্দ দিয়ে, যা চূড়ান্ত নিন্দার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন **"نِعْمَ"** (কত উত্তম) শব্দটি প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ বলেন: **" بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ"** **(যার বিনিময়ে তারা নিজদেরকে বিক্রয় করেছে তা কত নিকৃষ্ট, (তা এই) যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা তারা অস্বীকার করেছে)** এই বাক্য তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি প্রবল নিন্দা প্রকাশ করছে। তারা নিজেদের জন্য কুরআনকে মেনে নেওয়া ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনার পরিবর্তে অবিশ্বাসকেই গ্রহণ করল এবং এতে তারা সন্তুষ্ট রইল। তাদের অবিশ্বাসের মূল কারণ ছিল—আল্লাহ তাআলা তাদের জাতির পরিবর্তে অন্য জাতির একজন নবীর ওপর এই কুরআন ও দ্বীন অবতীর্ণ করেছেন। এটি আমাদের জীবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বহন করে। যখন আল্লাহ তাআলা কোনো দায়িত্ব বা পদ কাউকে প্রদান করেন—হোক তা চাকরি, ব্যবসা, নেতৃত্ব বা অন্য কোনো সামাজিক অবস্থান—তখন তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত হয়। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই বিষয়টি শুধুমাত্র নিজের জন্য নির্ধারিত বলে ভাবতে পারে না। এটি মনে করা ভুল যে, কেবল তিনিই এই মর্যাদার যোগ্য, আর অন্য কেউ নয়। বরং এটি মেনে নেওয়া উচিত যে, আল্লাহ যেখানে তাঁর ইচ্ছানুসারে দায়িত্ব অর্পণ করেন, সেটিই সঠিক। অন্যথায়, অহংকার, হীনমন্যতা, বিদ্বেষ ও অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করার মতো গুণ মানুষের মধ্যে জন্ম নেয়, যা সমাজকে বিভক্ত করে, সংঘাত বাড়ায় এবং জাতিকে দুর্বল করে ফেলে। এই দোষটি কত নিকৃষ্ট, তা বোঝার জন্য চিন্তা করা দরকার। যখন এটি আল্লাহর আনুগত্যের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, তখন সাধারণ জীবনের বিষয়েও

এটি কতটা ক্ষতিকর হতে পারে! তাই আমাদের অবশ্যই এই বৈশিষ্ট্য থেকে নিজেকে দূরে রাখা উচিত, কারণ এটি কল্যাণের প্রতিবন্ধক এবং সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি করার কারণ।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁদের আচরণের বাস্তবতা তুলে ধরে বলেন: **(যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তাতে ঈমান আনো', তারা বলে, 'আমরা কেবল সেই কিতাবেই ঈমান আনবো, যা আমাদের ওপর নাজিল করা হয়েছে', অথচ তারা যা পরে এসেছে, তা অস্বীকার করে, যদিও সেটিই সত্য, তাদের কিতাবের সত্যতাকে নিশ্চিত করে।)** এই মনোভাব মূলত এক ধরনের একগুঁয়েমি ও প্রবঞ্চনার প্রতিফলন। যখন ইহুদিদের ও তাদের মতো লোকদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর নাজিলকৃত কুরআনে ঈমান আনতে বলা হয়, তারা তখন বলে, "আমরা শুধু আমাদের ওপর অবতীর্ণ হওয়া তাওরাত ও ইনজিলে বিশ্বাস করি এবং কেবল এটাকেই যথেষ্ট মনে করি।" কিন্তু তারা যা পরে এসেছে—অর্থাৎ কুরআন ও ইসলামের প্রতি—তা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে, যদিও এটি তাদের নিজেদের কিতাবের সত্যতাকে সমর্থন করে যাতে এই নবীর নবুওয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

এখানেই তাদের জন্য আসল পরীক্ষা, যেখান থেকে তারা কোনোভাবেই পালাতে পারবে না। **"বল, 'তবে যদি তোমরা সত্যিই বিশ্বাসী হও, তাহলে এর আগে কেন আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছিলে?"** যদি তারা সত্যিই দাবি করে যে তারা তাদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাসী, তাহলে কেন তারা সেই নবীদের হত্যা করেছিল যারা তাদের জন্য তাওরাতের সত্যতা নিশ্চিত করতে এসেছিলেন? এই প্রশ্ন তাদের ভণ্ডামিকে প্রকাশ করে দেয় এবং তাদের নিজেদের অবস্থানের বিপরীত চিন্তাধারাকে সামনে নিয়ে আসে।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের অতীত ইতিহাসের আরেকটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেন- যখন তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসহ নবী মূসা (আলাইহিস সালাম) এসেছিলেন, কিন্তু তারা তার অনুপস্থিতিতে গরুর বাছুরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং তা

পূজা করেছিল। **"তোমাদের কাছে তো মূসা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এরপরও তোমরা গরুর বাছুরকে (উপাস্য হিসেবে) গ্রহণ করেছিলে, আর তোমরা ছিলে জালিম।"** এইভাবে, সত্য অস্বীকারকারীদের অতীত কৃতকর্মগুলো তাদের সামনে তুলে ধরলে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এটা তাদের এমন এক পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়, যেখানে তারা কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে পারে না। তাদের সব পথ বন্ধ হয়ে যায়, আর তখন হয় তারা সঠিক পথে ফিরে আসে, নয়তো তাদের একগুঁয়েমি আরও বেড়ে যায়।

এরপর আল্লাহ তাআলা আবার তাদেরকে তাদের অতীত অপরাধ ও শাস্তির ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যখন তিনি তাদের ওপর তূর পাহাড়কে উঠিয়ে দিয়েছিলেন, যেন তারা আজীবন আনুগত্যের শপথ নেয়। কিন্তু তবুও তারা সত্যের বিরোধিতা করল এবং বাছুর-উপাসনায় আসক্ত হয়ে পড়ল। আল্লাহ বলেন: **"স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তুর-কে তোমাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম, (বলেছিলাম,) যা দিলাম দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর এবং শোন'। তারা বলেছিল, "আমরা শোনলাম ও অমান্য করলাম"। আর কুফরীর কারণে তাদের অন্তরে গো-বৎস প্রীতি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। বলুন, যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে তোমাদের ঈমান যার নির্দেশ দেয় তা কত নিকৃষ্ট!"** এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের ভণ্ডামি ও সত্য প্রত্যাখ্যানের প্রবণতা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাদের বিশ্বাসের দাবিকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন—এই কেমন ঈমান, যা তাদের অবাধ্যতা, প্রতারণা ও সত্যকে অস্বীকার করার দিকে পরিচালিত করে?

এই আয়াতটি বর্ণনা দেয় যে, কিছু লোক মিথ্যা ঈমানের দাবি করে এবং এর উপর ভিত্তি করে মিথ্যা কথা বলে, যেন তা সত্য। তেমনি এটি আমাদেরকে সতর্ক করে যে, আল্লাহ তাআলার আদেশ মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর আদেশকে হালকাভাবে নেওয়া কতটা বিপজ্জনক। এই আয়াতটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়

যে, কিছু লোক এমন আছে যারা আয়াত ও সতর্কবাণী দ্বারা উপকৃত হয় না। দাঈ যতই চেষ্টা করুক না কেন, তার ইচ্ছা অনুযায়ী সবাই বা কিছু লোককে সৎপথে আনা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই দাঈ ও উপদেশদাতাকে সকল সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলার পথে দাওয়াত দেওয়ার সময় তিনি যেন তার দায়িত্ব পালন করেন এবং লোকদের অবাধ্যতার কারণে হতাশ না হন। কারণ, কিছু লোক দাওয়াত গ্রহণ করবে, যেমন সাহাবাগণ এবং তাদের পরবর্তীগণ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কিছু লোক দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে এবং অহংকার করবে।

﴿قُلۡ إِن كَانَتۡ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةٗ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلۡمَوۡتَ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٩٤ وَلَن يَتَمَنَّوۡهُ أَبَدَۢا بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ٩٥ وَلَتَجِدَنَّهُمۡ أَحۡرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٖ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمۡ لَوۡ يُعَمَّرُ أَلۡفَ سَنَةٖ وَمَا هُوَ بِمُزَحۡزِحِهِۦ مِنَ ٱلۡعَذَابِ أَن يُعَمَّرَۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِمَا يَعۡمَلُونَ ٩٦﴾

অর্থ*: [***বলুন, যদি আল্লাহ্‌র কাছে আখেরাতের বাসস্থান অন্য লোক ছাড়া বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর---যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।* কিন্তু তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা কখনো তা কামনা করবে না। আর আল্লাহ যালিমদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানী।* আর আপনি অবশ্যই তাদেরকে জীবনের প্রতি অন্যসব লোকের চেয়ে বেশী লোভী দেখতে পাবেন, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকে আশা করে যদি হাজার বছর আয়ু দেয়া হত; অথচ দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি হতে নিষ্কৃতি দিতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।*]* (আয়াত নং ৯৪-৯৬)।

কুরআনের আয়াতগুলো ইহুদিদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রেখেছে, যাতে তাদের উপর দলিল প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং অন্যদের জন্য এটি একটি শিক্ষা ও উপদেশ হিসেবে কাজ করে। এই আয়াতগুলো ঈমান, আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর নবী (সা.)-এর সাথে সঠিক আচরণের পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়। এগুলো মানুষের মনে আল্লাহর রহমত ও তাঁর অসীম ধৈর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যাতে তারা তাদের ভুল থেকে ফিরে আসে এবং সত্যকে গ্রহণ করে।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের ঈমান সংক্রান্ত মিথ্যা দাবির মুখোশ উন্মোচন করেছেন এবং তাদেরকে একটি চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। তিনি বলেন, **"বলুন, যদি আল্লাহ্‌র কাছে আখেরাতের বাসস্থান অন্য লোক ছাড়া বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর---যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।"** ইহুদিরা দাবি করত

যে, শুধুমাত্র তারা বা খ্রিষ্টানরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামে তারা কয়েক দিনের বেশি থাকবে না। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, যদি তাদের দাবি সত্য হয়, তবে তারা যেন মৃত্যু কামনা করে, যাতে তারা তাদের দাবির সত্যতা প্রমাণ করতে পারে। এই চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে তাদের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল: ১. তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনতে পারে। ২. অথবা তারা মৃত্যু কামনা করতে পারে, যাতে তারা তাদের দাবি অনুযায়ী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু তারা মৃত্যু কামনা করেনি, যা তাদের মিথ্যাবাদিতা প্রমাণ করে। যদি তারা সত্যবাদী হতো, তবে তারা মৃত্যু কামনা করত। তাদের এই অনীহা প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করছে। আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই জানত যে তারা মিথ্যা ও ভ্রান্ত আকিদার ওপর রয়েছে। কারণ তারা যা কিছু করেছে, তা আসলে অন্যায় ও সত্যবিরোধী। এজন্যই তারা কখনোই মৃত্যুর কামনা করবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, **"কিন্তু তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা কখনো তা কামনা করবে না। আর আল্লাহ যালিমদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানী।"**

এটি ইঙ্গিত দেয় যে, কিছু লোক ধর্মীয় বিষয়ে জেদ ধরে, যদিও তারা জানে যে তারা ভুল পথে আছে। যদি তারা ধর্মীয় বিষয়ে এমন আচরণ করে, তবে দুনিয়াবি বিষয়েও তারা কীভাবে এমন আচরণ করবে না? এটি খুবই সাধারণ ঘটনা। তাই আলেম ও দাঈদের উচিত বিরোধীদের সাথে সঠিক ও কার্যকরভাবে আচরণ করা। তাদের উচিত এমন প্রমাণ উপস্থাপন করা, যা প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। এটি অন্যদেরকে সত্য জানার সুযোগ দেবে এবং তারা যেন মিথ্যাবাদী ও জেদি ব্যক্তির ধোঁকায় না পড়ে। তেমনি এটাও জানা দরকার যে, কিছু লোক অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কারণে সত্য ও ন্যায়কে অস্বীকার করে।

তারপর আল্লাহ তাআলা তাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, তারা শুধু মৃত্যুকেই অপছন্দ করে না, বরং তারা জীবন নিয়ে অত্যন্ত লোভী। তিনি বলেছেন: **"আর আপনি অবশ্যই তাদেরকে জীবনের প্রতি অন্যসব লোকের চেয়ে বেশী লোভী দেখতে পাবেন, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকে আশা করে যদি হাজার বছর আয়ু দেয়া হত।"** এই আয়াতটি তাদের মৃত্যুর প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে। তারা দুনিয়ায় দীর্ঘ জীবন কামনা করে, এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চায় যে সে হাজার বছর বেঁচে থাকুক, কারণ তারা জানে যে তারা আখিরাতের জন্য খারাপ কাজ করেছে এবং তারা জানে যে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে। আল্লাহ বলেন: **"তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না।"** কাজেই তারা তাদের খারাপ কাজের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। দীর্ঘ জীবনও তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা করবে না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **"অথচ দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি হতে নিষ্কৃতি দিতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।"**

এ থেকে বুঝা যায় যে, অপরাধী শাস্তির ভয়ে মৃত্যুকে ভয় পায় এবং জীবন নিয়ে অত্যন্ত লোভী হয়। এটি আরও প্রমাণ করে যে, জীবন যতই দীর্ঘ হোক না কেন, তা একদিন শেষ হবে এবং দীর্ঘ জীবন হিসাব ও শাস্তি থেকে রক্ষা করবে না। এই ধারণা মুমিনদের মধ্যে শক্তিশালী করে যে, তাদের জীবনের ভালোবাসা যেন বেশি বেশি সৎকাজ করার এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য বেশি বেশি ইবাদত ও ইস্তিগফার করার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

এটি কুরআন মজীদের সত্যতা প্রমাণ করে, যা তাদের অন্তরের গোপন বিষয় প্রকাশ করেছে, যেমন মিথ্যা, অহংকার, সত্য জানা ও তা প্রত্যাখ্যান করা। এটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম-এর নবুওয়তের সত্যতাও প্রমাণ করে, যিনি এই মুজিজাপূর্ণ কিতাব নিয়ে এসেছেন।

﴿قُلۡ مَن كَانَ عَدُوّٗا لِّجِبۡرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلۡبِكَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَهُدٗى وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُؤۡمِنِينَ ٩٧ مَن كَانَ عَدُوّٗا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبۡرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوّٞ لِّلۡكَٰفِرِينَ ٩٨﴾

অর্থ: **[বলুন, যে কেউ জিবরীলের শত্রু হবে, এজন্যে যে, তিনি আল্লাহর অনুমতিক্রমে আপনার হৃদয়ে কুরআন নাযিল করেছেন, যা পূর্ববর্তী কিতাবেরও সত্যায়ণকারী এবং যা মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ'।* যে শত্রু হবে আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রাসূলগণের, জিবরীলের ও মীকাঈলের তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের শত্রু।]** *(*আয়াত নং ৯৭-৯৮*)*।

আলোচনার প্রসঙ্গ এখনও ইহুদীদের সম্পর্কেই চলমান। এই আয়াতটি প্রকাশ করে যে, তাদের মধ্যে কিছু লোক ফেরেশতাদেরও শত্রু মনে করে। ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির আত-তাবারী *(*রহ.*)* বলেছেন: "তাফসীরকারকগণ একমত যে, এই আয়াতটি বনি ইসরাইলের ইহুদিদের জবাবে নাযিল হয়েছে, যখন তারা দাবি করেছিল যে জিবরীল তাদের শত্রু এবং মিকাঈল তাদের বন্ধু।"[১১] কেউ বলেছেন: এর কারণ হলো, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম-কে কিছু প্রশ্ন করেছিল। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে, যদি তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন, তবে তারা যেন ইসলাম গ্রহণ করে। তারা সম্মত হয়েছিল। যখন তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন, তখন তাদের সামনে ঈমান আনা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। ফলে তারা জিজ্ঞাসা করল: **"আপনার বন্ধু ফেরেশতা কে?"** নবী সাঃ বললেন: **"আমার বন্ধু জিবরীল। আল্লাহ কোনো নবী প্রেরণ করেননি, যার বন্ধু জিবরীল নয়।"** তারা বলল: **"তাহলে আমরা আপনার থেকে আলাদা হয়ে যাব। যদি আপনার বন্ধু অন্য কেউ হত, তবে আমরা**

---

*(*১১*)* দেখুন: তাফসীর ইবনে কাসীর: *(*১/১৩৩*)*।

আপনাকে অনুসরণ করতাম এবং আপনার প্রতি ঈমান আনতাম।[১২] **তারা বলল: সে তো যুদ্ধ ও সংঘাত নিয়ে আসে, সে আমাদের শত্রু।"**[১৩] এমনকি জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-ও তাদের ঘৃণা থেকে রক্ষা পাননি।

এই আয়াতটি তাদের অত্যাচার, কুফর ও জেদের তীব্রতা প্রকাশ করে, যা তারা সত্য জানার পরও দেখিয়েছে। এটি ইহুদিদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলোও প্রকাশ করে। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রকৃত চরিত্র ও নিকৃষ্ট আচরণ প্রকাশ করেছেন। এটি আমাদেরকে সতর্ক করে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের চরিত্রের যে দিকগুলো প্রকাশ করেছেন, তা থেকে শিক্ষা নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাতে মুসলিমরা তাদের দ্বারা প্রতারিত না হয় বা তাদের উপর আস্থা না রাখে।

এরপর আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদ নাযিল করার একটি মহান বিষয় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: **"নিশ্চয় তিনি (জিবরীল) এটা (কুরআন) আপনার হৃদয়ে নাযিল করেছেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে।"** এটি প্রমাণ করে যে, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) কুরআন মজীদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম-এর হৃদয়ে নাযিল করেছেন। এটি জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-এর মর্যাদা ও সম্মানেরও প্রমাণ। হৃদয়কে এই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা হৃদয়ের গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন। হৃদয় হলো মানুষের শরীরের সবচেয়ে সম্মানিত অঙ্গ, যা যদি সংশোধন হয় তবে সমস্ত শরীর ঠিক থাকে, যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর আয়াতে কুরআনের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে: প্রথমত: **" مصدقاً لما بين يديه"** অর্থাৎ কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ, বিশেষত তাওরাতের সত্যতা নিশ্চিত করে। এটি তাওরাতের বিপরীত নয়, বরং তার সঠিক নির্দেশনাগুলোর সমর্থনকারী।

---

(১২) দেখুন: তাফসীর ইবনে কাসীর: (১/১৩৪)।

(১৩) দেখুন: আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন: (২/২৬)।

দ্বিতীয়ত: **"هدى"** অর্থাৎ এটি এক নিখুঁত পথনির্দেশিকা, যা অনুসরণকারীদের দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্যের পথে পরিচালিত করে এবং জান্নাতে পৌঁছে দেয়। তৃতীয়ত: **"وبشرى للمؤمنين"** অর্থাৎ এটি মুমিনদের জন্য সুসংবাদ বয়ে আনে। যারা ঈমান আনে ও কুরআনের নির্দেশনা অনুসরণ করে, তাদের জন্য এতে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। সুতরাং, কুরআনের চেয়ে মহৎ আর কোনো গ্রন্থ নেই। এটি শুধু সঠিক পথে পরিচালিত করে না, বরং মুমিনদের হৃদয়ে আনন্দ ও আশার সঞ্চার করে, কারণ এতে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে আল্লাহর ইচ্ছায়।

আল্লাহ বলেন: **"যে শত্রু হবে আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রাসূলগণের, জিবরীলের ও মীকাঈলের তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের শত্রু।"** এখানে প্রথমে সাধারণভাবে ফেরেশতাদের উল্লেখ করা হয়েছে, এরপর বিশেষভাবে জিবরাইল ও মিকাইলের নাম নেয়া হয়েছে। এটি **"خاص بعد العام"** (সাধারণের পর বিশেষ উল্লেখ) নীতির উদাহরণ। কারণ, আয়াতটি মূলত এই দুই ফেরেশতার পক্ষ অবলম্বনের জন্য এসেছে। ইহুদিরা বলত: "জিবরাইল আমাদের শত্রু, কারণ সে যুদ্ধ ও ধ্বংসের বার্তা নিয়ে আসে, আর মিকাইল আমাদের বন্ধু, কারণ সে বৃষ্টি ও ফসলের দায়িত্বপ্রাপ্ত।" অথচ বাস্তবতা হলো, জিবরাইল কেবল যুদ্ধের বার্তা নিয়ে আসেন না, বরং তিনি নবীদের প্রতি আল্লাহর কিতাবও অবতীর্ণ করেন, যার মধ্যে কুরআনও রয়েছে। সুতরাং, আল্লাহ এই আয়াত দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে কেউ আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, রাসূলগণ, বিশেষত জিবরাইল ও মিকাইলের শত্রু হবে, আল্লাহও তার শত্রু হবেন। এই আয়াত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়: ফেরেশতাদের সম্মান ও মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। বিশেষত জিবরাইল ও মিকাইল আঃ-এর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। ফেরেশতাদের বা রাসূলদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফরি। ইহুদিদের মতো অহংকার ও নিজেদের মনগড়া মতবাদ অনুসরণ করা অত্যন্ত ভয়ংকর। আল্লাহর সম্পর্কে না জেনে কথা বলা বা অহেতুক মনগড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা পথভ্রষ্টতার কারণ। অনুরূপভাবে অহংকার বিপজ্জনক।

﴿وَلَقَدۡ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ءَايَٰتِۭ بَيِّنَٰتٖۖ وَمَا يَكۡفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقُونَ ٩٩ أَوَكُلَّمَا عَٰهَدُواْ عَهۡدٗا نَّبَذَهُۥ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ١٠٠ وَلَمَّا جَآءَهُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٞ لِّمَا مَعَهُمۡ نَبَذَ فَرِيقٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمۡ كَأَنَّهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ١٠١ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتۡلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلۡكِ سُلَيۡمَٰنَۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلۡمَلَكَيۡنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡۚ وَلَقَدۡ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖۚ وَلَبِئۡسَ مَا شَرَوۡاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ١٠٢ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَمَثُوبَةٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ خَيۡرٞۚ لَّوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ١٠٣﴾

অর্থ: **[আর আমি অবশ্যই তোমার প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নাযিল করেছি, ফাসিকরা ছাড়া অন্য কেউ তা অস্বীকার করে না।* এটা কি নয় যে, তারা যখনই কোন অঙ্গীকার করেছে তখনই তাদের কোন এক দল তা ছুড়ে ফেলেছে? বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।* আর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল আসলেন, তাদের কাছে যা রয়েছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে, তখন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবকে পিছনে ছুঁড়ে ফেলল, যেন তারা জানেই না।* আর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করেছে। আর সুলাইমান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে শিক্ষা দিত জাদু ও (সে বিষয় শিক্ষা দিত) যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর নাযিল হয়েছিল। তারা উভয়েই এই কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, 'আমরা নিছক একটি পরীক্ষা; কাজেই তুমি কুফরী করো না'। তা সত্ত্বেও তারা ফিরিশতাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে**

বিচ্ছেদ ঘটাতো। অথচ তারা আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারত না। আর তারা তা-ই শিখত যা তাদের ক্ষতি করত এবং কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিত জানে যে, যে কেউ তা খরিদ করে, (অর্থাৎ জাদুর আশ্রয় নেয়) তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানত!* আর যদি তারা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে (তাদের জন্য) প্রতিদান উত্তম হত। যদি তারা জানত।] (আয়াত নং ৯৯-১০৩)।

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন: **"আর আমি অবশ্যই তোমার প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নাযিল করেছি, ফাসিকরা (পাপাচারীরা) ছাড়া অন্য কেউ তা অস্বীকার করে না।"**। এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর কিতাব সম্পর্কে একটি ঘোষণাস্বরূপ যে, এই কিতাবের আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট ও স্পষ্টতই সত্যের প্রমাণ বহন করে। এ আয়াতসমূহের মাধ্যমে প্রত্যেকের প্রতি দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়- সে তা শুনুক, পড়ুক, বা অন্যের মাধ্যমে তা জানুক। কারণ, এই কিতাবের মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা, বিধান, হিকমত, পুরস্কার ও শাস্তির বিবরণ, যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর কাহিনি, তাদের নবীদের সাথে আচরণ, তাদের কৃতকর্ম ও তার ফলাফল সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও এতে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই তাদের সাথে বিরোধপূর্ণ নয়। ফলে, এই কিতাব যে ব্যক্তি নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার নবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুতরাং, তার আনুগত্য করা, তাকে সাহায্য করা, তার অনুসরণ করা এবং তাকে ভালোবাসা প্রত্যেকের জন্য অবশ্যকর্তব্য। অতএব, যে ব্যক্তি এই সুস্পষ্ট সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, সে প্রকৃতপক্ষে কুফরি করেছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে, যা তাকে ঈমানের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, **"এটা কি নয় যে, তারা যখনই কোন অঙ্গীকার করেছে তখনই তাদের কোন এক দল তা ছুড়ে ফেলেছে? বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।"** এটি ইহুদিদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের পুনরাবৃত্তি বোঝায়। "كلما" শব্দটি পুনরাবৃত্তির প্রতি ইঙ্গিত দেয়, অর্থাৎ তারা বারবার চুক্তি করেছিল এবং পরে তা ভঙ্গ করেছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের আসল অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন যে তাদের বেশিরভাগই বিশ্বাসী নয়, বরং বেশিরভাগই ঈমান আনেনি। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, ঈমান বিশ্বাসীকে তার চুক্তি পূর্ণ করতে বাধ্য করে, আল্লাহ তাআলার ভয় এবং তার শাস্তির ভয় থেকে। আর যাদের ঈমান নেই, তারা চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে যতবার সুযোগ পায়, কিন্তু ঈমান একজন মানুষকে চুক্তি ভঙ্গ থেকে বিরত রাখে এবং তাকে পাপ থেকে দূরে রাখে।

এরপর আল্লাহ তাদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন, তা হলো তারা যে সত্য জানে সেটাকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, যেন তারা কিছুই জানে না। আল্লাহ বলেন, ***(আর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল আসলেন, তাদের কাছে যা রয়েছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে, তখন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবকে পিছনে ছুঁড়ে ফেলল, যেন তারা জানেই না।)***।

এই আয়াতের একটি নির্দেশনা হলো, কুরআন তাদের কাছে থাকা কিতাবের বিরোধিতা করে না, বরং তা সেটাকে সত্যায়ন করে। তবুও তারা কুরআনকে অস্বীকার করেছে, কারণ এতে তাদের মধ্যে একটি নবীর আগমনের সুসংবাদ ছিল, এবং তারা তা অগ্রাহ্য করেছে যেন তারা কিছুই জানে না। এরপর তারা যাদুকরের অনুসরণ করেছে, যেটি পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে।

এটি ইঙ্গিত করে যে ইহুদিরা কেবল চুক্তি ভঙ্গ করে না, বরং তারা যে সত্য জানে, তা গোপনও করে। এই প্রসঙ্গ থেকে এটিও নির্দেশিত হয় যে, কিছু মানুষ কিতাবের কিছু অংশ গ্রহণ করে, আর কিছু অংশ উপেক্ষা করে। তারা কিছু বিশ্বাস করে এবং কিছু অস্বীকার করে, বা অজ্ঞতার কারণে বা ইচ্ছাকৃতভাবে তা গোপন করে; বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন যে তারা তাদের কাছে যা ছিল তা ত্যাগ করে যাদু ও যাদুকরদের অনুসরণ করেছিল। এভাবেই একজন ব্যক্তি যদি সত্যকে ত্যাগ করে, তবে সে মিথ্যার অনুসরণ করবে। যদি সে সুন্নত ত্যাগ করে, তবে সে বিদআত অনুসরণ করবে। আর যদি সে সত্যকে ত্যাগ করে, তবে সে মিথ্যার দিকে ঝুঁকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "**এবং তারা সেই তা অনুসরণ করেছে যা শয়তানেরা সুলায়মানের রাজত্ব সম্পর্কে পাঠ করেছিল।**" যেখানে শয়তানরা মানুষকে যাদু শেখাতো এবং তারা দাবি করেছিল যে সু সুলায়মান আঃ এটি ব্যবহার করতেন এবং এর মাধ্যমে তাকে মহান রাজত্ব লাভ হয়েছিল। কিন্তু তারা মিথ্যা বলেছিল, বরং আমাদের প্রতিপালক সুলায়মান আঃ-কে পবিত্র রেখেছেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন: "**আর সুলাইমান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে শিক্ষা দিত জাদু।**" এ থেকে বুঝা যায় যে, কাফেররা অন্যদেরকে কুফর (অবিশ্বাস) শিখানোর জন্য আগ্রহী থাকে, ঠিক যেমন শয়তানরা করে। এটি শয়তানের জন্য একজন মানুষকে প্রলোভিত করার এবং মিথ্যা প্রচারের চেষ্টা করার প্রতিও ইঙ্গিত করে। আর এমনকি নবী সুলায়মান আঃ-এর উপরও মিথ্যা অভিযোগ উঠেছিল যে, তার রাজত্বের শক্তি যাদুর কারণে ছিল। এটি প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক সফল ও ধন্য ব্যক্তির প্রতি মিথ্যাবাদী ও ঈর্ষান্বিতদের থেকে আক্রমণ থাকে, যারা সফলতার প্রকৃত কারণকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে।

এর ফায়েদার মধ্যে একটি হলো আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সুলায়মানকে কুফর এবং যাদু ব্যবহার থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন, যেমন আল্লাহ বলেন, **(এবং সুলায়মান কুফর করেননি)** এটি প্রমাণ করে যে যাদু কুফর। এটি আল্লাহ তাআলার সুলেমান আঃ-

এর প্রশংসা করার আরও একটি শক্তিশালী প্রমাণ, কারণ তিনি তাঁর কুফরকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করেছেন, ফলে তাঁর কাছে কুফরের কোনও গুণ নেই। আল্লাহ তাআলা তাকে কুফর থেকে পবিত্র করেছেন, বরং তিনি একজন সৎ নবী, যিনি সৎভাবে প্রেরিত। এমনকি আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাঃ-ও যাদু, কবিতা ও ভবিষ্যদ্বাণী করার মিথ্যা অভিযোগ থেকে রক্ষা পাননি, নাঊযুবিল্লাহ। যদি এমনটি নবী মুহাম্মদ সাঃ-এর সাথে করা হয়, তবে যারা তার চেয়ে সাধারণ, যেমন বিজ্ঞানী, আলেম, ইবাদতগোজার ও সৎ মানুষ, তারা কীভাবে এই ধরনের অভিযোগ থেকে রক্ষা পাবে!

এই আয়াতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শয়তানরা জাদু শেখায়। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: "অর্থাৎ যা হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আর তারা মানুষকে জাদু থেকে সতর্ক করার শেখাতো, জাদুর দিকে আহ্বান করার জন্য নয়।" ইমাম যুজাজ বলেছেন: "এই ব্যাখ্যাটি অধিকাংশ ভাষাবিদ ও গবেষকদের মতে সঠিক।" এর অর্থ হলো, তারা মানুষকে নিষেধ করতে শেখায়, যেমন তারা বলে: "তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে এটি করো না, এরকম কৌশল ব্যবহার করো না।" এটি ইঙ্গিত করে যে, মানুষের জীবনে পরীক্ষা ও বিপদ ঘিরে থাকে, যাতে আল্লাহ তাআলা তাকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, সে এই পরীক্ষাগুলোর সামনে দৃঢ় থাকবে নাকি সত্য থেকে বিচ্যুত হবে। বস্তুত আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, পরীক্ষা করেন। যেমন তিনি তালুতের সাথে থাকা লোকদের নদীর মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন। আরও উদাহরণ হলো শূকরের মাংস খাওয়া; আল্লাহই এটি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই এটি নিষিদ্ধ করেছেন। বস্তুত তিনি যা করেন, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না, কিন্তু তারা জিজ্ঞাসিত হবে।

যে ব্যক্তি দুই ফেরেশতার কথাগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, সে বুঝতে পারবে যে জাদু এক মহা অনিষ্ট এবং তা কুফরি। আর জাদুকর ও জাদু একটি ফিতনা। যে ব্যক্তি এটিকে শেখে, সে তার দ্বীনে ফিতনায় পড়ে। এটি প্রমাণ করে যে ফিতনা

অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাই তা থেকে বাঁচার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, বরং একেবারে দূরে থাকা আবশ্যক। আল্লাহ আমাদের ও সকল মুসলমানকে এ থেকে রক্ষা করুন।

কিছু তাফসিরবিদ উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াহুদিরা সেই জাদু অনুসরণ করেছিল যা ইরাকের বাবেল অঞ্চলে থাকা দুই ফেরেশতার ওপর নাজিল করা হয়েছিল। এই জাদু আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য একটি পরীক্ষা ও বিপদ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিল, ফলে সেই দুই ফেরেশতা মানুষকে জাদু শেখাত।[১৪]

আল্লাহ বলেন: **"তারা সেই জাদু শেখে, যার মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়"**। এটি প্রমাণ করে যে, জাদুর একটি প্রভাব রয়েছে, তবে এটি কেবলমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় কার্যকর হয়। কেননা আল্লাহ আরও বলেন: **"তারা কাউকে কোনো ক্ষতি করতে পারে না, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া"**। এটি আমাদের শেখায় যে, আমাদের একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর করা উচিত এবং দৃঢ়ভাবে তার ওপর ভরসা করা উচিত। কারণ, কোনো কিছুই আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। তাই একজন মুমিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ওপর ভরসা রাখবে এবং তাঁর সাহায্য কামনা করবে। শাইখ ইবন সা'দী রহঃ বলেন: "যেকোনো কারণ, তা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তা সর্বদা আল্লাহর তাকদির ও ফয়সালার অধীনস্থ; কখনোই তা স্বাধীনভাবে কার্যকর হয় না।"[১৫]

আল্লাহ তা'আলা জানান যে, এই জাদু যা তারা শিখে, তা তাদের জন্য ক্ষতিকর, বিশেষ করে তাদের দ্বীনের জন্য, এবং এতে এমন কোনো উপকার নেই যা তার ক্ষতির

---

(১৪) দেখুন: তাফসীরে সা'দী: (১/৮১)।

(১৫) দেখুন: তাফসীরে সা'দী: (১/৮২)।

সমান হতে পারে। তিনি বলেন: **"وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ"** (তারা এমন কিছু শেখে যা তাদের ক্ষতি করে, কিন্তু কোনো উপকার করে না)।

আল্লাহ আরও বলেন: **"তারা অবশ্যই জেনে গেছে যে, যে ব্যক্তি এটিকে গ্রহণ করেছে, তার জন্য আখিরাতে কোনো অংশ নেই"**। এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ইহুদিরা জানত যে তারা যে জাদুকে বেছে নিয়েছে এবং নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর অনুসরণকে ছেড়ে দিয়েছে, তার পরিণাম হলো আখিরাতে কোনো কল্যাণ না পাওয়া। তাদের জাদুর প্রতি আকর্ষণ এমন ছিল যেন তারা এটি একটি মূল্যবান বস্তুর মতো ক্রয় করছে, যার বিনিময়ে তারা নবী সাঃ-এর অনুসরণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তারা জেনেও স্বেচ্ছায় এটিকে গ্রহণ করেছে, এবং বুঝতে পারছিল যে, এর ফলে তাদের আখিরাতে কোনো অংশ থাকবে না। এটি আমাদের শেখায় যে, কখনো কখনো মানুষ সত্য জেনেও তার বিরুদ্ধে চলে যায়, এবং মন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যদিও সে জানে যে তা তার জন্য ক্ষতিকর।

এরপর আল্লাহ এই কাজ ও এই নির্বাচনকে কঠোরভাবে নিন্দা করেন। তিনি বলেন: "তারা নিজেদের বিনিময়ে যা কিনেছে, তা কতই না নিকৃষ্ট, যদি তারা জানত"। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাজের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার প্রকাশ করে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, তারা এ নির্বাচন করার মাধ্যমে মূর্খের পর্যায়ে নেমে গেছে, যদিও তারা জানত যে জাদুকে ঈমানের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ফলে তাদের আখিরাতে কোনো অংশ থাকবে না। এটি সেই ব্যক্তির মতো, যে ভালো জানার পরও তার বিপরীত কাজ করে। সাধারণত বুদ্ধিমান কেউ ভুল করলে তার সম্পর্কে বলা হয়: "যদি সে বুদ্ধিমান হতো, তবে এমন করত না।" এর অর্থ হলো, তার কাজটি ছিল অবিবেচনাপ্রসূত, যদিও সে বাস্তবে বুদ্ধিমান। কারণ, যদি সে প্রকৃত অর্থেই নির্বোধ হতো, তবে তাকে দোষারোপ করা যেত না। ফলে তাদের এই কাজ ছিল একেবারেই মূর্খতার কাজ, যদিও তারা সত্য জানত।

এরপর আল্লাহ তাদের জন্য উত্তম নির্বাচন স্পষ্ট করে দেন, যা তাদের গ্রহণ করা উচিত ছিল। তিনি বলেন: **“যদি তারা ঈমান আনতো ও আল্লাহকে ভয় করতো, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান আরও উত্তম হতো, যদি তারা জানত”**। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের প্রকৃত নির্বাচন হওয়া উচিত ছিল ঈমান ও তাকওয়া গ্রহণ করা। যদি তারা এটি গ্রহণ করত, তাহলে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান লাভ করত, যা তাদের জন্য অনেক ভালো ছিল।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرۡنَا وَٱسۡمَعُواْۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٠٤ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَلَا ٱلۡمُشۡرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ خَيۡرٖ مِّن رَّبِّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَخۡتَصُّ بِرَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ١٠٥﴾

অর্থ: ***[হে মুমিনগণ, তোমরা 'রা'ইনা'* বলো না; বরং বল, 'উনজুরনা' আর শোন, কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।* আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে, তারা চায় না যে, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর কোন কল্যাণ নাযিল হোক। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর রহমত দ্বারা খাস করেন এবং আল্লাহ মহান অনুগ্রহের অধিকারী।]*** (আয়াত নং ১০৪-১০৫)।

মুসলমানরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে **"راعنا"** (আমাদের অবস্থা বিবেচনা করুন) বলতেন, যা একটি সঠিক অর্থ বহন করত। কিন্তু ইহুদিরা এই সুযোগ গ্রহণ করে, তারা এই শব্দটি ব্যবহার করত বিকৃত অর্থে, যা খারাপ উদ্দেশ্য প্রকাশ করত। এ কারণে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের এই শব্দ ব্যবহারে নিষেধ করেছেন, যাতে এই অনৈতিক ব্যবহারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, যদি কোনো বৈধ বিষয় হারাম কিছুর মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়, তবে তা থেকেও বিরত থাকা উচিত। এছাড়াও, এটি সুসভ্য আচরণ ও শালীন ভাষা ব্যবহারের নির্দেশনা দেয়। অর্থাৎ, এমন শব্দ ব্যবহার করা উচিত যা শুধুই ভালো অর্থ বহন করে, কুরুচিপূর্ণ ও অনৈতিক সম্ভাবনাযুক্ত শব্দ এড়িয়ে চলা উচিত। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন: **"وقولوا انظرنا"** (তোমরা বলো: আমাদের দিকে দৃষ্টি দিন)। এই শব্দটি একই অর্থ প্রকাশ করে, কিন্তু এতে কোনো বিভ্রান্তির সুযোগ নেই। এরপর আল্লাহ বলেন: **"واسمعوا"** (শুনো), এখানে "শোনা" শব্দটি নির্দিষ্ট কিছু শোনার জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়নি, বরং এটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। এর মধ্যে কুরআন শ্রবণ, হাদিস শ্রবণ, ও তা মান্য করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াত থেকে আরেকটি শিক্ষা পাওয়া যায়: কোনো শব্দ বা বক্তব্যকে বিকৃত অর্থে

ব্যবহার করে অন্যকে কষ্ট দেওয়া, অপমান করা বা বিদ্রূপ করা হারাম। কারণ, উত্তম শিষ্টাচার ও সুন্দর আচরণ ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য অংশ।

এ থেকে বোঝা যায় যে, ফকিহগণ কিছু মুবাহ (বৈধ) বিষয়কে নিষিদ্ধ করেন, যদি তা কোনো ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ, যদি কোনো কাজ নিজে থেকে হারাম না হয়, তবে সেটি হারাম হতে পারে যদি তা ক্ষতিকর পরিণতির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, কোনো কিছু নিষিদ্ধ করা হয় তা নিজে থেকে হারাম হওয়ার কারণে নয়, বরং তার সঙ্গে যুক্ত বিপদ ও ক্ষতির জন্য। এই কারণেই ইসলামি বিধানে বলা হয়: "الوسائل لها حكم المقاصد" (যে মাধ্যম কোনো কিছুর দিকে নিয়ে যায়, তার বিধান সেই লক্ষ্য অনুযায়ী নির্ধারিত হবে)।

এরপর আল্লাহ তাআলা ইহুদি ও মুশরিকদের মুসলিমদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ও হিংসার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, **"আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা চায় না যে, তোমাদের উপর তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কোনো কল্যাণ অবতীর্ণ হোক।"** (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১০৫)। এই বিদ্বেষ ইসলামের কল্যাণ ও মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, ইহুদি ও মুশরিকরা জানে যে, মুসলিমদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণকর। এখানে **"خير"** (কল্যাণ) শব্দটি ব্যাপক অর্থ বহন করে, যা কুরআন, সুন্নাহ, আদব-কায়দা, ইবাদত, পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা থেকে ঐক্য ও ভালোবাসার পরিবর্তন, বিজয়, ক্ষমতা, উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানসহ আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল প্রকার কল্যাণকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি নির্দেশ করে যে, মুসলিমদের কল্যাণ কাফেরদের হিংসার কারণ হয়। যখন এটি জানা যায়, তখন আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জানানো এবং ধর্মের শত্রুদের থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক। কারণ তারা মুসলিমদের জন্য কোনো কল্যাণ চায় না, তাই তাদের সাথে এই ঐশী বাণীর আলোকে আচরণ করা উচিত।

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা একটি মহান বিষয় স্পষ্ট করেছেন, তা হলো তিনি তাঁর অনুগ্রহ ও রহমত যাকে ইচ্ছা দান করেন। তিনি বলেন, **"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমত দান করেন, এবং আল্লাহ মহান অনুগ্রহের অধিকারী।"** এটি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ তাআলা হলেন প্রকৃত মালিক, তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমত দান করেন। তাই মুসলিমের উচিত আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করা, যাতে তিনি তাকে আরও বেশি অনুগ্রহ দান করেন। এটি আরও নির্দেশ করে যে, মুসলিমের উচিত, যে কোনো কল্যাণ বা সাফল্য আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে স্বীকার করা। যেমন বলা উচিত: "আল্লাহর অনুগ্রহে আমি এটি অর্জন করেছি, আল্লাহর অনুগ্রহে আমি সফল হয়েছি।" এটি নিজের বুদ্ধি, চিন্তা বা বোঝার ক্ষমতার জন্য নয়, বরং আল্লাহই তাকে বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন, জ্ঞান অর্জন, লেখা, বুঝা ও মুখস্থ করা সহজ করেছেন। তিনি ব্যবসা, লাভ ও অন্যান্য নেয়ামত সহজ করেছেন। এইভাবে প্রতিটি নেয়ামতের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহের ব্যাপকতা উল্লেখ করেছেন: **"আল্লাহ মহান অনুগ্রহের অধিকারী।"** এটি নির্দেশ করে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ অপরিসীম, এর কোনো সীমা নেই। তাই মুসলিমের উচিত সেই মহান অনুগ্রহের অধিকারী আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণ প্রার্থনা করা।

﴿مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ١٠٦ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٧ أَمۡ تُرِيدُونَ أَن تَسۡـَٔلُواْ رَسُولَكُمۡ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبۡلُۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلۡكُفۡرَ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٨﴾

অর্থ: **[আমি যে আয়াত রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই, তার চেয়ে উত্তম কিংবা তার মত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।***

তুমি কি জান না যে, নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহর? আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।* তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও যেরূপ প্রশ্ন পূর্বে মূসাকে করা হয়েছিল? আর যে ঈমানকে কুফরে পরিবর্তন করবে, সে অবশ্যই সরল পথ হারাল।] *(*আয়াত নং ১০৬-১০৮*)*।

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞা ও ধীরে ধীরে বান্দাদের সাথে আচরণের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, যাতে তাদের জন্য পর্যায়ক্রমে ও ধারাবাহিকভাবে কল্যাণ অর্জিত হয়। তিনি বলেন, **"আমি কোনো আয়াত রহিত করলে বা ভুলিয়ে দিলে, তার চেয়ে উত্তম বা তার সমতুল্য আয়াত আনয়ন করি।"** এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে, আল্লাহ তাআলা কোনো আয়াত রহিত *(*نسخ*)* করতে পারেন, অর্থাৎ একটি বিধানকে অন্য বিধান দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে পারেন। তিনি আয়াত ভুলিয়েও দিতে পারেন, অর্থাৎ তা হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে পারেন। ইবনে কাসীর *(*রহ.*)* নবী *(*সা.*)*-এর কিছু আয়াত ভুলে যাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞা অনুযায়ী করেছেন। আল্লাহ তাআলা রহিত বা ভুলিয়ে দেওয়ার উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন, কারণ তিনি এর চেয়ে উত্তম বা সমতুল্য কিছু দান করেন। এটি মানুষের জন্য কল্যাণ ও উপকারিতা নিশ্চিত করে। রহিত করা হয় সেই সব বিধানকে যা শুরুতে উপযুক্ত ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন বিধানটি উম্মতের জন্য বেশি উপযোগী। এটি আল্লাহ তাআলার রহমত ও প্রজ্ঞার প্রকাশ, যা সৃষ্টির অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে। কাজেই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ও দয়ালু। এই আলোচনা থেকে আমরা শিখতে পারি যে, কোনো আলিম বা গবেষক কুরআন ও সুন্নাহর নসখ *(*نسخ*)* ও মানসুখ *(*منسوخ*)* সম্পর্কে জ্ঞান ছাড়া ফতোয়া দিতে বা ইসলামী বিধান ব্যাখ্যা করতে পারেন না। যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়া এ ধরনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সে অজানা বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে। এটি আমাদেরকে সতর্ক করে যে, ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও গবেষণায় গভীরতা ও সতর্কতা অপরিহার্য।

এরপর আল্লাহ তাআলা একটি মহান বিষয় উল্লেখ করেছেন: **"তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান?"** এটি একটি স্পষ্ট প্রশ্ন: তুমি কি স্বীকার কর না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান? তাহলে তুমি কেন নসখ (نسخ) বা বিধান পরিবর্তনকে অস্বীকার কর বা এর বিরোধিতা কর? এই আয়াতটি ইহুদিদের জবাব দেয়, যারা কিবলা পরিবর্তনকে বা অন্যান্য বিষয়কে অস্বীকার করে। এই আয়াতটি সন্দেহকারী, মিথ্যাবাদী ও মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে বলে: **"তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান?"** হে সন্দেহকারী, হে মিথ্যাবাদী, হে মুনাফিক, আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে জেনে রাখো। আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছার মধ্যে কোনো বাধা নেই। আয়াতগুলো তাঁর কাছ থেকে, রহিতকরণও তাঁর কাছ থেকে এবং বিধান নির্ধারণও তাঁর কাছ থেকে। যখন কোনো মুমিন আল্লাহর বাণী **"তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান?"** শোনে, তখন সে বলে: **"হ্যাঁ, হে রব, আমি জানি।"**

এরপর আবারও একটি স্পষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, যা আরেকটি মহান বিষয় নির্দেশ করে: "তুমি কি জান না যে, আল্লাহই আসমান ও জমিনের মালিক?" যিনি আসমান ও জমিনের মালিক, তিনি যা ইচ্ছা তা নির্ধারণ করার অধিকারী এবং তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ দান করেন। সবকিছুর ফয়সালা তাঁরই হাতে। কাজেই যারা জানে যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং আসমান ও জমিনের মালিক, তাদেরকে এটি বলতে আবশ্যক করে: "আমি শুনেছি, জানি ও মান্য করি, হে রব।" সেই সাথে আল্লাহ তাআলার ব্যবস্থাপনা ও বিধানের উপর কোনো আপত্তি বা প্রশ্ন উত্থাপন করবে না। এ থেকে আরেকটি ফায়েদা হলো, স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রশ্নের পদ্ধতি (أسلوب تقريري) মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রভাব ফেলে। এটি মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে, দাওয়াত দিতে এবং শিক্ষা দিতে কার্যকর। এটি আমাদেরকে আল্লাহর ক্ষমতা ও মালিকানার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতে এবং তাঁর নির্দেশনা মেনে চলতে

উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিনয়ের শিক্ষা দেয় এবং তাঁর বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে সাহায্য করে।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।" এই আয়াতটি স্পষ্ট ও সতর্কবাণী তাদের জন্য, যারা আল্লাহর প্রজ্ঞা ও তাঁর শরীয়তের বিরোধিতা করে। এটি তাদেরকে সতর্ক করে যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই, যিনি প্রকৃত ক্ষমতা ও সাহায্যের মালিক। এটি আমাদেরকে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা ও আস্থা রাখতে শিক্ষা দেয়। কাজেই আমরা বলি: "হে আল্লাহ, আপনিই আমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী। আপনার সাহায্য ছাড়া আমাদের কোনো সাহায্য নেই। আপনি যাকে সম্মান দেন, তাকে কেউ অপমান করতে পারে না, এবং আপনি যাকে অপমান করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না।"

এরপর আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে নবী (সা.)-এর সাথে আচরণের ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্ম আদব শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে নিষেধ করেছেন যে, তারা যেন নবী (সা.)-কে কোনো বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে প্রশ্ন না করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, **"তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেইভাবে প্রশ্ন করতে চাও, যেমন মূসাকে আগে প্রশ্ন করা হয়েছিল?"** এটি একটি সতর্কবাণী, যা তাদেরকে জানান দেয় যে, এটি ইহুদিদের পদ্ধতি ছিল, যারা মূসা (আ.)-কে অতিরিক্ত প্রশ্ন করত। হাদীসে এসেছে, **"তোমরা আমাকে সেই সব বিষয়ে ছেড়ে দাও, যা আমি তোমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছি। কারণ তোমাদের আগের সম্প্রদায় তাদের নবীদেরকে অতিরিক্ত প্রশ্ন ও তাদের সাথে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই আমি যখন তোমাদের কোনো বিষয়ের আদেশ করি, তখন তা যথাসাধ্য পালন করো। আর যখন তোমাদের কোনো বিষয় থেকে নিষেধ করি, তখন তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করো।"** (সহীহ মুসলিম)। এই হাদীসটি অতিরিক্ত প্রশ্ন থেকে নিষেধ করার কারণ ব্যাখ্যা করে। এটি মানুষের

বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে, যা শরীয়তের মাধ্যমে সংশোধন ও পথনির্দেশনা পায়। হাদীসটি স্পষ্ট করে যে, অতিরিক্ত প্রশ্ন মতবিরোধের দিকে নিয়ে যায়। একজন প্রশ্ন করতে পারে, অন্যজন অনুমান করতে পারে, এবং তৃতীয়জন প্রশ্নের শাখা-প্রশাখা তৈরি করতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত মতবিরোধ সৃষ্টি করে। বস্তুত আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তিনি তাদের কল্যাণের জন্যই রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন। তিনি তাদেরকে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করেছেন এবং অকল্যাণ থেকে সতর্ক করেছেন। তাই অতিরিক্ত প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। কখনও কখনও কোনো বিষয়ে প্রশ্ন না করাই উত্তম। যেমন সাহাবায়ে কেরাম হজ্জ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন: ***"হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি প্রতি বছর হজ্জ করব?"*** নবী *(সা.)* চুপ থাকলেন, এমনকি সাহাবী তিনবার প্রশ্ন করলেন। তখন নবী *(সা.)* বললেন: ***"যদি আমি হ্যাঁ বলতাম, তবে তা অবশ্যকর্তব্য হয়ে যেত, এবং তোমরা তা পালন করতে পারতে না।"*** *(সহীহ মুসলিম)*।

এটি থেকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তাআলার নিষেধ ও আদেশে মহান কল্যাণ রয়েছে, যদিও মানুষ তা পুরোপুরি বুঝতে পারে না। এর ফলে মানুষের উচিত আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বলা: ***"আমি শুনেছি এবং মান্য করেছি।"*** যদি কেউ আল্লাহর প্রজ্ঞা বুঝতে পারে, তবে তা একটি বড় নেয়ামত। আর যদি না বুঝে, তবে তার উচিত শুধুমাত্র ভালো কথা বলা।

এই আয়াতটি মূসা *(আ.)*-এর সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত প্রশ্নের বিষয়টিও স্পষ্ট করে, যেমন এই সূরার পূর্বের অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা মূসা *(আ.)*-কে এমনকি আল্লাহকে সরাসরি দেখানোর জন্যও অনুরোধ করেছিল। এটি তাদের অতিরিক্ত প্রশ্ন ও দাবির একটি উদাহরণ, যা তাদেরকে বিপদে ফেলেছিল।

ইবনে সা'দী *(রহ.)* উল্লেখ করেছেন যে, এখানে নিষেধ করা হয়েছে জিদপূর্ণ ও আপত্তিকর প্রশ্ন থেকে। কিন্তু পথনির্দেশনা ও শিক্ষার জন্য প্রশ্ন প্রশংসনীয়। কিছু

মুফাসসির এর সমর্থনে দলিল উল্লেখ করেছেন, যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: **"তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।"** (সূরা আল-বাকারা), **"তারা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।"** (সূরা আল-বাকারা), এবং **"তারা আপনাকে এতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।"** (সূরা আল-বাকারা)। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন: **"আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীদের চেয়ে উত্তম কোনো সম্প্রদায় দেখিনি। তারা নবী (সা.)-কে শুধুমাত্র তেরোটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, যা তাদের জন্য উপকারী ছিল।"**[১৬] এটি নির্দেশ করে যে, সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর নিষেধকৃত প্রশ্ন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত ছিলেন। তারা শুধুমাত্র কুরআনে উল্লেখিত বিষয়গুলোর মধ্যেই প্রশ্ন করতেন এবং তাদের প্রশ্নগুলো তাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। ইবনে আব্বাস (রা.) তাদের এই সীমিত ও গণনাযোগ্য প্রশ্নের জন্য প্রশংসা করেছেন। তারা জিদ বা আপত্তিকর প্রশ্নে লিপ্ত হননি।

তারপর আল্লাহ সতর্ক করে বলেন, **"যে ব্যক্তি ঈমানের বদলে কুফরিকে বেছে নেয়, সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।"** এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঈমানের মূল্য ও মর্যাদা স্পষ্ট করেছেন। ঈমান হলো একটি মজবুত দুর্গ ও সঠিক পথ। যে ব্যক্তি ঈমানের বদলে কুফরি গ্রহণ করে, সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়। কারণ কুফরি হলো পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহির পথ, আর ঈমান হলো সঠিক পথ, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং এমন জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান।

এটি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ তাআলা যাকে কোনো নেয়ামত দান করেছেন, তার উচিত নয় সেই নেয়ামতকে গুনাহ বা অবাধ্যতার বিনিময়ে পরিবর্তন করা। যেমন কেউ যদি রিজিক পায়, তবে তা অপচয় করা বা আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যয় করা উচিত নয়। অথবা কেউ যদি কোনো নেয়ামত পায়, তবে তা অহংকার বা উদ্ধত আচরণে ব্যবহার

---

(১৬) দেখুন: আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন: (৩/২৮)।

করা উচিত নয়। বরং নেয়ামতকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যবহার করা উচিত, যেভাবে তা দেওয়া হয়েছে।

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾ وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَىٰ ۚ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَٰرَىٰ عَلَىٰ شَىْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾﴾

অর্থ: **[কিতাবীদের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কাফেররূপে ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষবশতঃ (তারা এটা করে থাকে)। অতএব, তোমরা ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তার কোন নির্দেশ দেন নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত দাও এবং তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু নিজেদের জন্য পেশ করবে আল্লাহর কাছে তা পাবে। নিশ্চয় তোমরা যা করছ আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।আর তারা বলে, ইয়াহুদী অথবা নাসারা ছাড়া অন্য কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এটা তাদের মিথ্যা আশা। বলুন, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর"। হ্যাঁ, যে কেউ আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মশীল হয় তার প্রতিদান তার রব-এর কাছে রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। আর ইয়াহুদীরা বলে, 'নাসারাদের কোন ভিত্তি নেই' এবং 'নাসারারা বলে ইয়াহুদীদের কোন ভিত্তি নেই' অথচ তারা কিতাব পড়ে। এভাবে যারা কিছুই জানেনা তারাও একই কথা বলে। কাজেই যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে (সে বিষয়ে) মীমাংসা করবেন।]** (আয়াত নং ১০৯-১১৩)

আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদেরকে তাদের সাথে থাকা আহলে কিতাবের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছেন, যা তাদের কাছে গোপন ছিল। তিনি বলেন, ***(কিতাবীদের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কাফেররূপে ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষবশতঃ।)*** এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাবের অন্তরে লুকিয়ে থাকা মুসলিমদের প্রতি হিংসার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন, যা তারা আল্লাহর সতর্কবার্তা ছাড়া কখনও জানতে পারত না। এভাবে তিনি তাদের কাছে আহলে কিতাবের প্রকৃত অবস্থা উন্মোচন করেছেন। কেননা হিংসা তার থেকেই প্রকাশ পায় যে কারো উপর আল্লাহর নেয়ামত দেখতে পেয়ে তা সহ্য করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টি সাব্যস্ত করেছেন এই বলে, **(সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও)**। এ থেকে বুঝা যায় যে, তারা জানে মুসলিমরা সত্যের উপর আছে, তাদের নবী সত্য এবং আল্লাহর কিতাব সত্য। যদি তা না হতো, তাহলে তারা মুসলিমদের ঈমানের নেয়ামত দেখে হিংসা করত না। কারণ হিংসা কেবল নিয়ামতের ওপরই করা হয়। অনুরুপভাবে আয়াতটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে যে, তারা মুসলিমদের কুফরে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, আহলে কিতাব মুসলিমদেরকে তাদের ধর্ম থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কোনো প্রচেষ্টাই বাদ দেবে না যা সন্দেহ তৈরি, প্রবৃত্তি ও বাসনাকে উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে হবে। যা একজন মুসলিমের বিশ্বাসকে দুর্বল করে দিতে পারে এবং তাকে তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারে। তদুপরি, তারা এমন বিষয় প্রচার করবে যা মুসলিমদের তাদের ধর্মকে হালকাভাবে নিতে ও অবশেষে তা পরিত্যাগ করতে উৎসাহিত করবে। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাবের গোপন উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুসলিমদের জানিয়ে দেওয়ার পর তা থেকে সতর্ক থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে মুসলিমদের আচরণ কেমন হবে সে সম্পর্কে আদেশ করে বলেন: ***"অতএব, তোমরা ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তার কোন নির্দেশ দেন।"*** ইমাম ইবনু কাসির *(রহঃ)* উল্লেখ করেছেন যে, এই আয়াতটি পরবর্তীকালে যুদ্ধের নির্দেশ দ্বারা রহিত হয়েছে। মদিনায় নবী করিম *(সাঃ)* ও

মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্তের পর, তাদের সাথে যুদ্ধ অবধারিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও সহনশীলতার নির্দেশের মাঝে হিকমত রয়েছে। ফলে ক্ষমা ও অপেক্ষার মাধ্যমে তাদের ওপর প্রমাণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে তারা সঠিক পথে ফিরে আসার সুযোগ পায়। কিন্তু তারা অবিরতভাবে নবী *(সাঃ)* ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। এরপর, আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের কাছে অনড় এক বাস্তবতার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন *:* ***(নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।)*** অতএব, তিনি তাদের বিজয় দান করতে সক্ষম। তবে আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী, সবকিছুর নির্দিষ্ট কারণ, নির্ধারিত সময় ও শর্ত রয়েছে। যেমন*:* বিজয়ের কারণ, এর সময় ও ধরন এবং যে পরিস্থিতিতে তা কার্যকর হবে তা বিদ্যমান হওয়া। তাই অপেক্ষা করতে হবে **(যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে আসেন।)**

"যে ব্যক্তি **(যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে আসেন।)** এই বাক্যটি গভীরভাবে চিন্তা করে, সে এটিকে মুমিনের জন্য শক্তি হিসেবে পাবে। তাই সে ধৈর্য ধারণ করে (যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে আসেন।), চেষ্টা করে এবং নিরাশ হয় না (যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে আসেন।) যদি সে অসুস্থ হয়, তাহলে চিকিৎসা করে (যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে আসেন।) সে প্রতিটি বিষয়ে উপায় অবলম্বন করে (যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে আসেন।) এটি এমন একটি শক্তি যা দ্বারা মুমিন তার সমস্ত বিষয়ে শক্তিশালী হয় **(যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে আসেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।)**

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন*,* ***(আর তোমরা সালাত কায়েম করো ও যাকাত দাও এবং তোমরা নিজেদের জন্য যে ভালো কাজ অগ্রিম পাঠাও, তা আল্লাহর কাছে পাবে।)*** সালাত কায়েম করা এবং যাকাত দেওয়া অবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে এটি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ। পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন*,* কোন মুসলিম ভালো কাজসমূহের মধ্য হতে যা কিছু করে তা তার নিজের জন্যই হয়, এবং সে তা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়

আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত অবস্থায় পাবে। এর অর্থ হল, মুসলিম যে ভালো কাজ করে তা আল্লাহর কাছে নষ্ট হবে না, বরং সে তা পরকালে চিরস্থায়ী নিয়ামত হিসাবে পাবে। আল্লাহ তায়ালা আয়াতের শেষে বলেন, ***(নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা যা কর তা দেখেন।)*** তিনি প্রত্যেকের কাজ দেখেন। তাঁর কাছে কিছুই গোপন নয়, যদিও তা অণু পরিমাণ বা তার চেয়েও ছোট জিনিস হয়। এই কুরআনিক প্রসঙ্গে মুমিনের জন্য উৎসাহের একটি দিক রয়েছে। তা হলো, দুনিয়াতে সে যা ভালো কাজ করে তা নষ্ট হবে না, বরং তা পরকালে সম্পূর্ণরূপে পাবে। 'خير' (ভালো) শব্দটি সব ধরনের ভালো কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা ভালো কাজের সব ধরন ও ক্ষেত্রকে ধারণ করে। আর 'من' (থেকে) শব্দটি এখানে বিভিন্ন ভালো কাজের অংশ বোঝায়। অর্থাৎ, ভালো কাজ সমূহ থেকে যে অংশই তুমি অগ্রিম পাঠাবে, (**তা আল্লাহর কাছে পাবে।**)

এরপর আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাবের মিথ্যা ও সত্য বিকৃত কথা উল্লেখ করে বলেন, ***(তারা বলে, জান্নাতে কেবল তারাই প্রবেশ করবে, যারা ইহুদি বা খ্রিস্টান। এটি তাদের কল্পনামাত্র।)*** তারা অন্যদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নিজেদের জন্যই জান্নাত দাবী করে। অর্থাৎ, যে জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, সে যেন ইহুদি হয়—যেমন ইহুদিরা মনে করে, অথবা সে যেন খ্রিস্টান হয়—যেমন খ্রিস্টানরা মনে করে। এভাবে প্রত্যেকে মনে করে, জান্নাত কেবল তাদের জন্যই নির্ধারিত। এ থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি তার আক্বীদায় বিভ্রান্ত, সে মনে করে যে সত্য কেবল তার পক্ষেই রয়েছে এবং তার পথই তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে। সে বাস্তবতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, বরং তা জানলেও, সত্যকে এড়িয়ে চলে। কারণ মিথ্যা তার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। এছাড়াও, সে ভয় পায় যে, যদি সত্য গ্রহণ করে, তবে তার সম্প্রদায় ও মতবাদ অনুসারীদের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে। তবে একমাত্র সেই ব্যক্তি ব্যতিক্রম, যার কাছে সত্য তার খেয়াল-খুশির চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই বক্তব্য সেই ব্যক্তিদের অবস্থা উন্মোচন করে, যারা নিজেদেরই ধোঁকায় রাখে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, তাদের অবস্থা হলো মিথ্যা আশা ও কল্পনার মতো ***(এটি তাদের কল্পনামাত্র)*** যার কোনো বাস্তবতা নেই, কোন মূল্যও নেই। একমাত্র দলিল ও সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই এর মূল্য রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ***(বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে তোমাদের প্রমাণ উপস্থাপন করো)***। অতঃএব প্রমাণ হলো এমন একটি বিষয়, যা মিথ্যাবাদী, জেদী, অহংকারী এবং অন্যায়ভাবে ব্যাখ্যাকারীদের পক্ষে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। কারণ তাদের নিজেদের কিতাবেই এমন দলিল রয়েছে, যা তাদের উপর নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুসরণকে আবশ্যক করে, বিশেষ করে যখন কুরআন মজীদ তাদের কাছে থাকা তাওরাতের সত্যতা স্বীকার করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মিথ্যা দাবি, নাম ব্যবহার বা সম্প্রদায়গত পরিচয়ের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা সম্ভব নয়। বরং তা সম্ভব শুধুমাত্র সত্যকে অনুসরণ করার মাধ্যমে, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন। এই অকাট্য দলিল থেকে এটিও বোঝা যায় যে, ইসলাম ধর্ম সুস্পষ্ট প্রমাণ ও দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্যুত, তাদের কাছে কোনো সঠিক প্রমাণ নেই, যা দিয়ে তারা তাদের বাতিল মতকে সাব্যস্ত করতে পারে। এজন্যই তারা সঠিক যুক্তি ও সুস্পষ্ট প্রমাণের পরিবর্তে অপবাদ ও অভিযোগের মাধ্যমে দলিলওয়ালা লোকদের মোকাবেলা করে, কারণ তাদের কাছে কোনো দলিল নেই।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের দাবির জবাবে বলেছেন, ***(হ্যাঁ)*** তোমাদের দাবি সঠিক নয়। জান্নাত লাভ করা তোমাদের মিথ্যা আশা বা দাবির উপর নির্ভর করে না। বরং ***(যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে এবং সৎকর্মশীল হয়)*** তারাই জান্নাতের অধিকারী। অতএব, যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর নির্দেশনা মেনে চলে, নিজের কাজে ইখলাস বজায় রাখে, হৃদয় দিয়ে প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করে, এবং কর্মে সদাচারী তারাই জান্নাত পাবে। ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, এখানে "মুখ" শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, এটি মানুষের দেহের সবচেয়ে সম্মানিত অংশ। সুতরাং, এরাই সেসকল লোক যাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ***(হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজেকে সমর্পণ করে এবং***

সৎকর্মশীল হয়, তার রবের কাছে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না"*)*। তাদের প্রতিদান হলো জান্নাত। তারা সকল প্রকার ভয় থেকে মুক্ত। তাদেরকে দুঃশ্চিন্তা কখনও গ্রাস করবে না। কারণ মানুষের দুঃখ ও ভয়ের মূল কারণ হলো ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা এবং অতীতের হারানো সুযোগগুলোর জন্য আফসোস যার ফিরে আসা অসম্ভব। সুতরাং এ সমস্ত উদ্বেগ জান্নাতে দূর হয়ে যাবে। সেখানে বাসিন্দাদের কোন ভয় বা দুঃখ স্পর্শ করবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ***(তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না)***। বরং তাদের জন্য থাকবে স্থায়ী আনন্দ ও সুখ। হে আল্লাহ*!* আপনি আমাদেরকে জান্নাত দান করুন এবং সে সকল কথা ও কর্ম করার তাওফীক দান করুন, যা আমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা আল্লাহর প্রতি ইখলাস এবং রাসূলুল্লাহ *(*সাঃ*)*-এর অনুসরণ থেকে বিচ্যুত, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। কাজেই মুক্তির একমাত্র পথ হলো আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া এবং রাসূল *(*সাঃ*)*-এর সুন্নাহকে অনুসরণ করা।

এরপর আল্লাহ তায়ালা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। ***(ইহুদীরা বলে, খ্রিস্টানরা সঠিক পথের উপর নেই এবং খ্রিস্টানরা বলে, ইহুদীরা কোনো সঠিক পথে নেই। অথচ তারা তাদের কিতাব তিলাওয়াত করে।)*** আল্লাহ তায়ালা এখানে আহলে কিতাবের অবস্থা তুলে ধরেছেন। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে বিদ্বেষ, বিরোধ, শত্রুতা এবং জেদ বিদ্যমান, অথচ তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিধান সম্পর্কে জানে। তাওরাত ও ইঞ্জিল উভয়ই তাদের সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বিধান ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে জেদ ও কুফরের মাধ্যমে এবং ভ্রষ্টতার সাথে ভ্রষ্টতা দিয়ে মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। তারা তাওরাত ও ইঞ্জিল তিলাওয়াত করে, তবুও তাদের এই অবস্থা। অথচ তারা সবাই বনি ইসরাইলের সন্তান। তাহলে রাসূলুল্লাহ *(*সা.*)*-এর সাথে তাদের আচরণ কেমন হবে, যিনি ইসমাঈল *(*আ.*)*-এর বংশধর*?* এ থেকে এটিও স্পষ্ট হয় যে, জেদ ও বিদ্বেষের পথ সত্যিকারভাবে আহলে কিতাবের জন্য উপযুক্ত নয়, কারণ তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞান রাখে। আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তারা তাদের কিতাব তিলাওয়াত করে। এটি প্রকাশ করে যে, মানুষ যদি আল্লাহর আয়াতসমূহের

প্রতি সতর্ক না হয়, তাহলে সে সত্যকে মিথ্যা বলতে পারে এবং নিজের ভুলের পক্ষ নিতে পারে। যা প্রত্যেক ব্যাপারে তার বিজয় লাভের প্রতি আকর্ষণ ও নিজকে নিয়ে গর্ববোধ করা থেকেই হয়। এটি কিছু মানুষের মানসিকতার প্রতিফলনও তুলে ধরে, যা থেকে ব্যক্তির সতর্ক থাকা আবশ্যক, যাতে করে সে তাদের মতো ভুলের মধ্যে পতীত না হয়। অতঃএব, প্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষকে সত্য থেকে দূরে নিয়ে যায় এবং ভ্রষ্টতার দিকে টেনে নেয়। এরপর ধীরে ধীরে জেদ ও মিথ্যার মাধ্যমে সত্যের উপর বিজয় লাভের আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয়। এরপর তারা ভ্রষ্টতার পক্ষে ভুল ব্যাখ্যা ও যুক্তি উপস্থাপন করতে থাকে। সত্য থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর কাছে দুআ করা, তাক্বওয়া অবলম্বন করা এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহকে আকড়ে ধরা।

আর এই দুটি শ্রেণির (ইহুদী ও খ্রিস্টান) সঙ্গে আরও একটি শ্রেণি যুক্ত হয়, যার ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন: **(অজ্ঞ ব্যক্তিরাও ঠিক এভাবেই বলেছে, যেমন তারা বলেছে)** এটি তৃতীয় একটি শ্রেণি। ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন: জনসাধারণের মতে, তারা হলো আরবের কাফিররা, কারণ তাদের কোনো কিতাব নেই। ফলে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কিতাবপ্রাপ্তরা (ইহুদি ও খ্রিস্টান) তাদের সঙ্গে এক স্তরে এসে দাঁড়ায়, যারা ছিল অজ্ঞ— অর্থাৎ আরবের কাফিররা।

এ থেকে বুঝা যায় যে, জ্ঞান ও অধ্যয়ন যদি মানুষকে আল্লাহর প্রতি তাকওয়া ও আনুগত্যের দিকে ধাবিত না করে, তবে তা প্রবৃত্তির শিকার হয়ে যায়। তখন জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পূর্ণ অজ্ঞের মতোই হয়ে যায়, কারণ সে তার জ্ঞান থেকে উপকৃত হয়নি। বরং সে তার প্রবৃত্তি অনুসারে সত্য ও সত্যের অনুসারীদের বিরোধিতা ও শত্রুতা করে। **(অতএব, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন সেই বিষয়ে, যাতে তারা মতভেদ করত।)**

এই বিবৃতির মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া, পারস্পরিক বিদ্বেষ পোষণ করা ও অন্যকে কাফের সাব্যস্ত করার মতো ভয়ঙ্কর পথে অগ্রসর হওয়া থেকে সতর্ক করেছেন এবং মুসলমানদের ও নিরপরাধ ব্যক্তিদের রক্তপাত বৈধ মনে করা থেকেও সতর্ক করেছেন, যা অজ্ঞতা ও ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবের কারণে ঘটে। এই অজ্ঞতা ইসলামের সঠিক জ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং আল্লাহর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাঁর বিধান ভুলভাবে বোঝার দিকে নিয়ে যায়। এটি শুধু ধর্মীয় বিভ্রান্তির ক্ষেত্রেই নয়, বরং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তখন নিজের স্বার্থে অন্যের প্রতি জুলুমকে বৈধ মনে করে, লেনদেন ও সমাজের স্বার্থ বিনষ্ট করে, ইচ্ছামতো ভুল ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে বা শয়তানের প্ররোচনায় অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। এমনকি ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে জুলুম ও সীমালঙ্ঘন করে, যা সমাজে বিশৃঙ্খলা, বিদ্বেষ ও দুর্নীতি সৃষ্টি করে। এই সমস্ত কর্মকাণ্ড কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ।

কুরআনের আয়াতগুলো কেউ পর্যবেক্ষণ করলে সে বুঝতে পারে যে, সেগুলোর উপস্থাপনায় রয়েছে আকর্ষণীয় শৈলী, চিন্তার দরজা উন্মুক্ত করার ক্ষমতা, এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির দিকে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান। এসব আয়াত ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সামষ্টিক কল্যাণ, সমষ্টিগত একতা এবং জাতির অভিন্ন সত্তার ধারণাকে গুরুত্ব দেয়। একই সঙ্গে, অজ্ঞতা ও কুচিন্তার কুফল এবং সত্যের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে। আয়াতগুলো আমাদের শেখায় যে কুচিন্তা ও অহংকার ধর্মীয় ও সামাজিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়, যা মানুষকে একে অপরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ করে তোলে এবং অবশেষে বিভক্তি ও সংঘাতের জন্ম দেয়। এতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, উম্মাহর স্বার্থ তার ঐক্যেই নিহিত, আর এই ঐক্য কেবল তখনই সম্ভব যখন মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ ও আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হবে। এজন্য, ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া ও অহংকার থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেওয়া এবং প্রকৃত ঈমান ও তাকওয়া অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। এই উপলব্ধি কেবল আল্লাহর প্রকৃত অভিপ্রায়কে জানার মাধ্যমে সম্ভব, এবং সেই অনুযায়ী একান্ত

আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমল করার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে। পাশাপাশি, রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর সুন্নাহ অনুসরণ করাও এই পথের অপরিহার্য অংশ।

﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمۡ أَن يَدۡخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَۚ لَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١١٤ وَلِلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ١١٥﴾

অর্থ: ***[আর তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর মসজিদগুলোতে তার নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং এগুলো বিরাণ করার চেষ্টা করে? অথচ ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে তাদের জন্য সেগুলোতে প্রবেশ করা সঙ্গত ছিল না। দুনিয়াতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও আখেরাতে রয়েছে মহাশাস্তি।* আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই; সুতরাং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহর দিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।]*** (আয়াত নং ১১৪-১১৫)।

আল্লাহ তায়ালা মসজিদের মহত্ত্ব, পবিত্রতা, মর্যাদা ও অবস্থান বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: **(আর তার চেয়ে বড় অত্যাচারী কে যে আল্লাহর মসজিদগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলো ধ্বংসের চেষ্টা করে?।)** সুতরাং, তার চেয়ে বড় অত্যাচারী কেউ নেই যে আল্লাহর বান্দাদের মসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয়, যেমন নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, ইতিকাফ করা বা অন্যান্য ইবাদত করা থেকে বাধা দেয় ও মসজিদ ধ্বংসের চেষ্টা করে। এই ধ্বংস হতে পারে ভাঙচুর করার মাধ্যমে বা এমন কিছু নিক্ষেপ করে যা মসজিদের জন্য অনুচিত এবং নিষিদ্ধ। এ থেকে বোঝা যায় যে, এমন বাধা সৃষ্টি করা থেকে সতর্ক থাকা উচিত, যা আল্লাহর স্মরণকারীদের মসজিদ থেকে দূরে রাখে বা মসজিদকে খালি করে দেয়। এই সতর্কতা মসজিদের মর্যাদা, আল্লাহর স্মরণকারীদের মর্যাদা এবং বিশেষভাবে মসজিদে আল্লাহর স্মরণের গুরুত্ব ও

মর্যাদা প্রমাণ করে। যে ব্যক্তি তাদের বাধা দেয়, সে জালিম এবং এমন জুলুম করেছে যা তার শাস্তি অবধারিত করে।

অনুরুপ আরেকটি ফায়েদা হলো, এই আয়াতটি বিস্ময়পূর্ণ নির্দেশনা দ্বারা পরিপূর্ণ। যদি আল্লাহর ঘর মসজিদ এর উপর জুলুম করার চেয়ে বড় কোনো জুলুম থাকে, যেমন মানুষকে মসজিদে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে বাধা দেওয়া বা মসজিদ ধ্বংস করা এবং এর অপমান করা, তবে এই বাক্যটিতে সতর্কতা ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। পাশাপাশি, মসজিদে আল্লাহর নাম স্মরণ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মসজিদের যত্ন নেয়, সংরক্ষণ করে, নির্মাণ করে এবং এর উন্নতি সাধন করে, তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও মহান অবস্থান। কারণ আল্লাহ তায়ালা মসজিদের কাজে বাধা দানকারীদেরকে জালিম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, বরং সবচেয়ে বড় ও নিকৃষ্ট ধরনের জুলুমের শামিল করেছেন।

আয়াত নাযিলের কারণসমূহ ও এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করার পর ইমাম কুরতুবি *(রহ.)* বলেন*:* এখানে মসজিদে প্রবেশে বাধা দেওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কিয়ামত পর্যন্ত সব মসজিদে প্রবেশে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য। এই মতটিই সঠিক। কারণ, উল্লেখিত আয়াতে মসজিদ শব্দটির বহুবচন শব্দ এসেছে।

এরপর এই অপরাধের পরিণতি বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, *(*অথচ ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে তাদের জন্য সেগুলোতে প্রবেশ করা সঙ্গত ছিল না। দুনিয়াতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও আখেরাতে রয়েছে মহাশাস্তি।*)* সুতরাং, তাদের জন্য উপযুক্ত হলো, তারা যে ক্ষতি ও বাধা সৃষ্টি করেছিলো তার শাস্তি স্বরুপ তাদেরকে মসজিদে প্রবেশ করতে না দেওয়া এবং তা থেকে বিরত রাখা।

যারা এই ধ্বংস ও বিপর্যয় ঘটায়, তাদের জন্য দুনিয়াবী শাস্তি হলো ভয় ও অপমান। যখন মুসলিমরা মসজিদসমূহের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং তা তাদের নিয়ন্ত্রণে আসবে, তখন কাফিররা এতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যদি তারা প্রবেশও করে, তবে মুসলিমরা তাদের বের করে দেবে এবং তাদের শাস্তি দেবে—এই ভয়ে তারা ভীত থাকে। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, মসজিদ ধ্বংসের চেষ্টাকারীদের কাজ কতটা ভয়ানক ও গুরুতর। আল্লাহ তাদের কাছ থেকে সকল মসজিদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কেড়ে নেবেন, যেমন মুশরিকদের কাছ থেকে বায়তুল হারাম কেড়ে নিয়েছিলেন, যারা সেখানে মূর্তি স্থাপন করে তা ধ্বংস করেছিল। এরপর আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মক্কা বিজয় করালেন, এবং মুশরিকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। একইভাবে, বাইতুল মুকাদ্দাস আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু জয় করেছিলেন। আর আল্লাহ তায়ালা আবরাহা ও তার সাথীদের শাস্তি দিয়েছিলেন, যখন তারা কাবা ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল।

আর আখিরাতের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, *(*তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে রয়েছে মহাশাস্তি।*)* এ থেকে বোঝা যায় যে, মসজিদের সাথে অবাধ্যতা করা, অকার্যকর করার চেষ্টা করা বা অপমানিত করা এবং তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করা অত্যন্ত ভয়ানক কাজ। যে ব্যক্তি এমন কাজ করে, তার জন্য আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ থেকে ভয় পাওয়া উচিত। অন্যদিকে, মসজিদের যত্ন নেওয়া এবং এর উন্নয়নে সর্বাত্মক চেষ্টা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে মসজিদ নির্মাণ করা, মেরামত করা, সংস্কার করা, পুনর্নির্মাণ করা, তাতে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, ইতিকাফ করা, এবং কুরআন তিলাওয়াত ও তা মুখস্ত করার মাধ্যমে আল্লাহর জিকির করা। এছাড়াও, আল্লাহ তায়ালার স্মরণের সাথে সম্পর্কিত সকল কাজই এর অন্তর্ভুক্ত।

কিবলার তাৎপর্য ও তা নির্ধারণ করা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, (আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই)। যার কাছে দিকনির্দেশনার মালিকানা রয়েছে তার কথা উল্লেখ করে কুরআনের এই মহান আয়াতটি শুরু হয়েছে, যাতে শ্রোতা এ থেকে অনুপ্রেরণা নেয় যে, এটি একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই বিষয়। এভাবে প্রথম বক্তব্যে পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি একটি বর্ণনামূলক ও শিক্ষামূলক ধারা, যা থেকে কুরআনের জ্ঞান প্রদর্শনের সৌন্দর্য ফুটে উঠে এবং আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য সুন্দর ও সৃজনশীল বাচনভঙ্গির সাথে প্রকাশ পায়। পূর্ব ও পশ্চিমকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যাকে চান তাকে সম্মানিত করেন। তিনিই প্রথমে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরে তা পরিবর্তন করে মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করার আদেশ দেন। ফলে কাবা মুসলিমদের কিবলা হয়ে যায়। সমগ্র মহাবিশ্ব তাঁরই মালিকানাধীন, তাই তিনি যেমন চান, যেভাবে চান এবং যখন চান, তেমনভাবে নির্দেশ দানের অধিকারী। তাঁর সিদ্ধান্তের কোনো প্রতিবাদকারী নেই। এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, (সুতরাং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহর দিক।) অতঃএব, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে যে দিকনির্দেশনা দেন, সেদিকে তোমাদের মুখ ফিরালেই তোমরা তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়েছো। যেমন, কিবলার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা বা পশু জবাই করা। তবে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর সময় কিবলার দিকে মুখ না করা। (নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।) অর্থাৎ, তিনি স্বীয় জ্ঞানে প্রাচুর্যময় এবং তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য ধর্মীয় ও প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয়তায় প্রশস্ততা দান করেন। তাদের কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়ে সংকীর্ণতা আরোপ করেন না।

এই আয়াতটি আলেম ও ফকীহদের চিন্তাকে প্রসারিত করেছে এবং তাদের বোঝার ক্ষেত্রে বহুমুখী দিক উন্মোচন করেছে যা কিবলা সম্পর্কে অজ্ঞতা বা অন্ধকারের

কারণে ভুল দিকে নামাজ আদায় করলে (তা নফল হোক বা ফরজ) এবং নামাজ শেষ করার পর কিবলা নির্ধারণে ভুল বুঝতে পারলে এরপর কী করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তৃত দিকনির্দেশনা দিয়েছে। যদি নামাজের সময় শেষ না হয়ে থাকে, তাহলে পুনরায় নামাজ আদায় করতে হবে কি না এ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। (**সুতরাং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহর দিক**।) এই মহান আয়াতটি নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে ফিকহের নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে, এবং তাদের মস্তিষ্ক আলোচনা ও প্রমাণ সংগ্রহে প্রসারিত হয়েছে। এই আয়াত সহ অন্যান্য আয়াত ও রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহর মাধ্যমে জ্ঞান ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে অগণিত কল্যাণ অর্জিত হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলোর ফিকহ বুঝতে চায়, তার উচিত তাফসীর ও ফিকহের গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করা।

﴿وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدٗاۗ سُبۡحَٰنَهُۥۖ بَل لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ كُلّٞ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ ١١٦ بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ١١٧ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ لَوۡلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوۡ تَأۡتِينَآ ءَايَةٞۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِم مِّثۡلَ قَوۡلِهِمۡۘ تَشَٰبَهَتۡ قُلُوبُهُمۡۗ قَدۡ بَيَّنَّا ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ١١٨﴾

অর্থ: **[আর তারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন'। তিনি (তা থেকে) অতি পবিত্র। বরং আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। সবকিছু তারই একান্ত অনুগত। তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের উদ্ভাবক। আর যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার জন্য শুধু বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। আর যারা কিছু জানে না তারা বলে, 'আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? অথবা আমাদের কাছে কেন আসে না কোন আয়াত? এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের মত কথা বলতো। তাদের অন্তর একই রকম। অবশ্যই আমরা আয়াতসমূহকে স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি, এমন কওমের জন্য, যারা দৃঢ়বিশ্বাস রাখে।]** (আয়াত নং ১১৬-১১৮)

এরপর ইহুদী ও খ্রীস্টানদের মিথ্যাচার ও স্রষ্টার গুণাবলীর প্রতি তাদের স্পর্ধার (তারা বলেছে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন) চিত্র তুলে ধরতে এখানে কুরআনের বক্তব্য পুনরায় ফিরে এসেছে। নাসারারা বলেছে, ঈসা মসীহ (আঃ) আল্লাহর পুত্র। ইহুদিরা বলেছে, উজাইর আল্লাহর পুত্র। আর মুশরিকরা বলেছে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। তাহলে কোন বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহর উপর সন্তান আরোপ করার চেয়ে বড় মিথ্যা চিত্র আর কী হতে পারে? সে কীভাবে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়? অথচ তিনি বলেছেন, (তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি।) এ থেকে বুঝা যায় যে, যদি মানুষ তার আচরণ, জ্ঞান এবং চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ না করে, তবে সে ভয়ানক বিপদে পতিত হবে। তাই এ বিপদ থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজন, মানুষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মতো দোয়া করবে: (হে হৃদয় পরিবর্তনকারী, আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর স্থির রাখো।) উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা

করলাম: আপনি সবচেয়ে বেশি কোন দোয়া করেন? তিনি বললেন: হে উম্মে সালামা, এমন কোন মানুষ নেই যার হৃদয় আল্লাহর দুটি আঙ্গুলের মধ্যে নেই। তিনি চাইলে তা স্থির রাখেন, আর চাইলে বিচ্যুত করেন।

এরপর মহিমান্বিত আল্লাহ নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করতে (সুবহানাহু) বলেছেন। এটি তাদের বক্তব্য **(আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন)** থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি, পবিত্রতা এবং দূরত্ব বুঝায়। এরপর তিনি তাঁর মহান রাজত্বের কথা উল্লেখ করেন, যা তাদের মিথ্যা অপবাদকে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করে **(বরং আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর)**। সুতরাং, যিনি এই সমগ্র বিশাল রাজত্বের অধিকারী এবং সবকিছুকে অস্তিত্বে এনেছেন, তাঁকে সাহায্য করার জন্য তাঁর কোনো সন্তানের প্রয়োজন নেই। বরং সবকিছুই তাঁর ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধীনে রয়েছে। সবকিছুই তাঁর কাছে অনুগত। সুতরাং, যিনি সমস্ত রাজত্বের মালিক এবং তাঁর রাজত্ব তাঁর কাছে অনুগত, তাঁর ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের অধীন এবং তাঁর জ্ঞান ছাড়া কিছুই ঘটে না, তিনি সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র। এর ফলে সমস্ত পূর্ণতা একমাত্র তাঁরই।

এরপর পরবর্তী আয়াতটি তাঁর রাজত্ব ও ক্ষমতার আরও বর্ণনা দেয় **(আসমান ও জমিনের স্রষ্টা)**। তিনি আসমান ও জমিনকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, পূর্বে এর কোনো নমুনা ছিল না এবং তাঁর সব সৃষ্টিই এমন। বরং তাঁর ক্ষমতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাঁর বাণীতে **(আর যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার জন্য শুধু বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।)**। তাহলে এর চেয়ে মহান ও বিস্ময়কর ক্ষমতা আর কী হতে পারে? এটি আল্লাহ তায়ালাকে পবিত্র ও মহিমান্বিত ঘোষণা করা এবং তাঁর স্মরণে অবিচল থাকা, ভালো কাজের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা এবং মন্দ থেকে বাঁচার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করা অপরিহার্য করে তোলে। তিনি এমন সত্তা যার জন্য কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি সবকিছু 'হও' বলেই সৃষ্টি করেন।

এরপর আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাবের মধ্য থেকে অজ্ঞ লোকদের বা আরবের মুশরিকদের অতিরিক্ত জেদের কথা উল্লেখ করেছেন ***(এবং যারা জ্ঞানহীন তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বললেন না কেন বা আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন এলো না কেন?)***। তারা বলে, আল্লাহ কেন আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলেন না যাতে আমরা বুঝতে পারি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী, এবং আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনতে পারি, অথবা আমাদের কাছে এমন কোনো নিদর্শন আসলো না কেন যা তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ দেবে? এটি তাদের জেদি আবদার, সত্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা জবাবে বলেন, ***(তাদের আগের লোকেরাও তাদের মতোই বলেছে)***। এটি সেই জেদী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের চিরাচরিত আচরণ, যারা পূর্ববর্তী লোকদের মতো স্পষ্ট ও প্রকাশ্য সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। যেমন মুসা আলাইহিস সালাম এর সম্প্রদায় বলেছিল, ***(যখন তোমরা বলেছিলে, হে মুসা, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে পাই)***। এটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবং অনুরূপ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তিকে নির্দেশ করে। অতীতের ঘটনা আজও ঘটতে পারে, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ***(তাদের হৃদয় একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ)***। এটি ইঙ্গিত করে যে, কিছু হৃদয় রয়েছে যা মিথ্যায় সাদৃশ্যপূর্ণ এবং প্রাচীন কালে ও আধুনিক যুগে পুনরাবৃত্তি হয়। আবার কিছু হৃদয় রয়েছে যা আনুগত্য ও সত্য অনুসরণে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে হিদায়াতের জন্য উপযুক্ত ছিল, তা প্রতিটি যুগের জন্যই উপযুক্ত। যে সত্য অবলম্বন করতে চায়, সে সর্বদা তা দ্বারা হিদায়াত পাবে। আর যে জেদী, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও অবাধ্য, সে প্রতিটি যুগেই একই রকম হবে। তাই ইমাম মালিক *(রহিঃ)* যেমন বলেছেন, "এই উম্মতের শেষ অংশকে শুধুমাত্র সেই জিনিসই সংশোধন করতে পারে যা এর প্রথম অংশকে সংশোধন করেছিল।"

এরপর আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন, যে সমস্ত আয়াত ঈমান গ্রহণ করাকে আবশ্যক করে ইতিমধ্যে সেগুলোর আলোচনা গত হয়েছে। ***(আমি নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি তাদের জন্য যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে)***। ইবনে সাদী রহিঃ

বলেছেন: “প্রতিটি নিশ্চিত বিশ্বাসী আল্লাহর স্পষ্ট নিদর্শন থেকে এমন জ্ঞান লাভ করে যা দ্বারা তার বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং সব সন্দেহ দূর হয়।” অতঃএব প্রত্যেক রাসুল স্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন নিয়ে এসেছেন, যা প্রমাণ করে যে তিনি আল্লাহর নবী ও রাসুল। আর তাদের মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যিনি স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। যার ফলে অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম সকলের মাঝে ছড়িয়েছে। কিন্তু জেদী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তি এমন সব দাবিতে লিপ্ত হয় যা তাকে ক্ষতির দিকেই নিয়ে যায়। এ থেকে বুঝা যায় যে, জেদী আচরণ থেকে দূরে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তা মানুষকে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনে কল্যাণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এ থেকে আরও বুঝা যায় যে, জেদি আচরণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সত্য থেকে দূরে সরে যায় এবং যাদের সাথে সে এমন আচরণ করে তাদের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় ও দূরত্ব বাড়ে। এমনকি এটি তার জন্য নিন্দার কারণ হতে পারে। এটি আরও স্পষ্ট করে যে, জানতে চাওয়ার ক্ষেত্রে একগুঁয়েমী স্বভাব থাকা ব্যক্তির জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। এমনকি তার সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রেও নয় বা যারা তার চারপাশে থাকে ও তার সাথে চলাফেরা করে তাদের সাথেও নয়।

﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۖ وَلَا تُسۡـَٔلُ عَنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡجَحِيمِ ١١٩ وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٖ ١٢٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَتۡلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ١٢١ يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٢٢ وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ ١٢٣﴾

অর্থ: **[নিশ্চয় আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সত্যসহ সুসংবাদদাতা সতর্ককারীরূপে আর জাহান্নামীদের সম্পর্কে আপনাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না। আর ইয়াহুদী ও নাসারারা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন। বলুন নিশ্চয় আল্লাহর হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত। আর যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান আসার পরও, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং থাকবে না কোন সাহায্যকারীও। যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তাদের মধ্যে যারা যথাযথভাবে তা তিলাওয়াত করে, তারা তাতে ঈমান আনে। আর যারা তার সাথে কুফরী করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। হে ইসরাঈল-বংশধররা! আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। আর নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি (তৎকালীন) সৃষ্টিকুলের সবার উপর। আর তোমরা সেদিনের তাকওয়া অবলম্বন কর যেদিন কোন সত্তা অপর কোন সত্তার কোন কাজে আসবে না। কারো কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ হবে না এবং কোন সুপারিশ কারো পক্ষে লাভজনক হবে না। আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।]** (আয়াত নং ১১৯-১২৩)

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাঃ কে এই আয়াতের মাধ্যমে সম্বোধন করে: **(নিশ্চয় আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি সত্যসহ সুসংবাদদাতা সতর্ককারীরূপে আর জাহান্নামীদের সম্পর্কে আপনাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না)**

মুহাম্মাদী রিসালাতের সত্যতা বর্ণনা করেছেন। উক্ত আয়াতটি মুহাম্মাদী রিসালাতের বিভিন্ন সত্য দিক প্রত্যেক মানুষের কাছে তুলে ধরেছে:

প্রথম সত্য: তিনি আল্লাহর রাসূল **(নিশ্চয় আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি)**। উক্ত আয়াতাংশে রাসূল (সাঃ)-এর জন্য বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কারণ, রাসূল প্রেরকের (আল্লাহ) পক্ষ থেকে নির্বাচিত হন। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের জন্য একটি বিশেষ অনুগ্রহ ও মর্যাদা। তিনি এই রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব বহন করেছেন এবং তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত। তার নির্দেশনার মাঝে অসংখ্য কল্যাণ ও মহৎ গুণাবলী নিহিত রয়েছে।

দ্বিতীয় সত্য: তাঁর রিসালাতের বিষয়বস্তু হলো সত্য **(নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছি)**। সুতরাং নবী (সাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সত্য, এতে কোনো সন্দেহ বা সংশয় নেই। তাই পবিত্র কুরআন সত্য এবং তাঁর সুন্নাহ সত্য। (بالحق) শব্দটি প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ গুণের দিকে ইঙ্গিত করে এবং প্রতিটি ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত। কুরআন ও সুন্নাহ হতে নবী (সাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা যে ব্যক্তি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, সে দেখতে পাবে যে এটি এক শরীয়ত যা সম্পূর্ণ সত্য। এর লক্ষ্য সত্য, পদ্ধতি সত্য, পন্থা সত্য, এর সহজীকরণ সত্য, ফিতরাতের সাথে এর সামঞ্জস্যতা সত্য এবং এটি সত্য হিদায়াত। এটি কেবল ভালোর আদেশ দেয় এবং মন্দ থেকে নিষেধ করে। এটি ভালো অর্জনের পদ্ধতি এবং মন্দ দূর করার পদ্ধতি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে। মানুষ এই ধরনের স্থায়ী ও সুস্পষ্ট হিদায়াতের অনুরূপ কিছু নিয়ে আসতে অক্ষম, যা প্রতিটি সময় ও স্থানের জন্য উপযোগী। মানুষ যে মানবসৃষ্ট আইন তৈরি করেছে, তা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে পরিবর্তিত হয়, কারণ তারা তাতে ভুল ও অপূর্ণতা দেখতে পায়। এতে ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং এটি নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি, ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। এছাড়াও আরও অসংখ্য ত্রুটি রয়েছে যা গণনা করা যায় না।

তৃতীয় সত্য: এটি সুসংবাদময় রিসালাত। সুতরাং, রাসূল (সাঃ) হলেন সুসংবাদদাতা। তিনি জান্নাত ও চিরস্থায়ী নিয়ামতের সুসংবাদদাতা।

চতুর্থ সত্য: এটি সতর্কময় রিসালাত। সুতরাং, রাসূল (সাঃ) হলেন আমাদের জন্য সতর্ককারী। তিনি অবাধ্যদেরকে জাহান্নামের সতর্কবার্তা দেন।

পঞ্চম সত্য: যারা কুফরি করেছে তিনি তাদের জন্য দায়ী নন (আর আপনি জাহান্নামীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না)। এতে বোঝা যায় যে, তিনি কারও জন্য হিদায়াত দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন না। কেবলমাত্র সঠিক পথে আহ্বানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি তার কুফরী কাজে অনঢ় হয় তিনি তাকে হিদায়াত দিতে সক্ষম নন। সুতরাং, তিনি তাদের কাজকর্ম এবং তাদের জাহান্নামে প্রবেশের জন্য জিজ্ঞাসিত হবেন না। ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "তোমাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না, কারণ তারা এক ভয়াবহ অবস্থায় রয়েছে।" এটি তাদের অবস্থার গুরুত্ব ও ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে। জাহিম হলো জাহান্নাম। বলা হয়, এটি হলো সেই আগুন যখন তার জ্বালানী খুবই তীব্রমাত্রার হয়।

এই আয়াতটি তার অল্প সংখ্যক শব্দের মাঝে গভীর অর্থ প্রকাশ করেছে এবং তার স্পষ্ট বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেছে। আর রাসূল (সাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা একটি শব্দে সংক্ষেপে প্রকাশ করেছে যে, তিনি সত্য নিয়ে এসেছেন (بالحق)। আর এই সত্য দুটি বিষয় ধারণ করে: প্রথমত, যারা আনুগত্য করে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ, যা একটি শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে (بشيراً)। দ্বিতীয়ত, যারা অবাধ্যতা করে তাদের জন্য জাহান্নামের সতর্কবাণী, যা একটি শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে (نذيرا)। এছাড়াও, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্বের সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে, যারা কুফরি করেছে তিনি তাদের জন্য জিজ্ঞাসিত হবেন না, তাদের কাজকর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবেন না, এবং তাদের পরিণতি জাহান্নাম, যা শাস্তির ধরন বোঝায়। এ সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার বাণীতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে (আর আপনি

জাহান্নামীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না)। এর আগে আয়াতের শুরুতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব ও ভূমিকা দুটি শব্দে স্পষ্ট করা হয়েছে (إنا أرسلناك) **(নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি)**। অতঃএব তিনি আল্লাহর রাসূল। কাজেই এর চেয়ে অধিক স্পষ্ট ও বর্ণনা আর কী হতে পারে!

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনদের জন্য ইহুদি ও নাসারাদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: **(আর ইয়াহুদী ও নাসারারা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন।)**। এতে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের উদ্দেশ্য ও প্রস্তাব যা তারা চায় এবং দাবি করে, তা এই নয় যে তারা ঈমান আনবে, বরং এটি একধরনের হঠকারিতা। এ আয়াতে তাদের হৃদয়ের অবস্থার একটি অলৌকিক বর্ণনা রয়েছে যে, তারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনার কোনো ইচ্ছা রাখে না, বরং তারা আশা করে যে তিনি তাদের মিল্লাত অনুসরণ করবেন। তবে এটা অস্বীকার করা যায় না যে, মদিনায় তাদের কিছু ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যেমন সম্মানিত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু। কিন্তু এখানে ব্যাপক অবস্থা বোঝানো হয়েছে। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (যদি ইহুদিদের মধ্যে দশজনও আমার প্রতি ঈমান আনত, তাহলে সমস্ত ইহুদি ঈমান আনত)। এর অর্থ হলো, যদি তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ঈমান আনত। কারণ তাদের অনেক প্রভাব রয়েছে। তবে প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর একটি বিশেষ হিকমত রয়েছে।

এই আয়াতটি তাদের ঈমান আনার অসম্ভবতা স্পষ্ট করে দেয়, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাত অনুসরণ করেন। অনেক ফকীহ আল্লাহর বাণী **(যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন)** থেকে দলিল দিয়েছেন যে, সমস্ত কুফর একই মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ তায়ালা মিল্লাত শব্দটি একবচনে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ ইহুদি ও নাসারাদের মিল্লাত। তাঁর বাণীতে (ملتهم) এটিকে একই মিল্লাত হিসেবে

গণ্য করেছেন। কারণ রাসূল সাঃ-এর প্রেরণের পর তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা ছাড়া অন্য কোনো বৈধ মিল্লাত নেই।

এরপর আল্লাহ তায়ালা নবী মুহাম্মদ সাঃ-কে তাদের ও অন্যদের উদ্দেশ্যে কী বলতে হবে তা জানিয়ে দিয়েছেন: **(বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর হিদায়াতই হল প্রকৃত হিদায়াত)**। এটি হিদায়াত সম্পর্কিত খুব সংক্ষিপ্ত, সীমাবদ্ধ ও অকাট্য বক্তব্য যে, কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার হিদায়াতের মধ্যেই প্রকৃত হিদায়াত সীমাবদ্ধ। আল্লাহর হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত। সুতরাং, তা ছাড়া অন্য সব কিছু বাতিল। কারণ, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, আল্লাহ তায়ালা তা দিয়ে পূর্বের সকল ঐশী গ্রন্থকে রহিত করেছেন। তেমনিভাবে মানুষ ধর্মের নামে যা উদ্ভাবন করেছে, তার সবই ভ্রষ্টতা। কারণ হিদায়াত কেবলমাত্র সেই বিষয়েই সীমাবদ্ধ, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে নিয়ে এসেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা সূরা আলে ইমরানে বলেছেন: **(যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, তা কখনই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না)**।

যে ব্যক্তি (বলুন নিশ্চয় আল্লাহর হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত) এই বাক্যটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, সে দেখতে পাবে যে এটি মুমিনের জন্য একটি শক্তি। কারণ এর মাধ্যমে সে প্রতিটি পথভ্রষ্টতার সামনে থেমে যায় এবং বলে, "নিশ্চয়ই আল্লাহর হিদায়াতই হল প্রকৃত হিদায়াত"। সে প্রতিটি বিদআতের সামনে থেমে যায় ও সতর্ক হয় এবং বলে, "নিশ্চয়ই আল্লাহর হিদায়াতই হল প্রকৃত হিদায়াত"। সে প্রতিটি আচরণগত বিচ্যুতির সামনে থেমে যায় এবং বলে, "নিশ্চয়ই আল্লাহর হিদায়াতই হল প্রকৃত হিদায়াত"। আর সে প্রতিটি কামনা-বাসনার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, "নিশ্চয়ই আল্লাহর হিদায়াতই হল প্রকৃত হিদায়াত"। সুতরাং, এটি একটি নীতিমালা, আলোকবর্তীকা ও অস্ত্র, যা দ্বারা মুমিন নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয় যখন শয়তান তাকে প্রলুব্ধ করে। সে আল্লাহ তায়ালার কাছে হিদায়াত ও দৃঢ়তা প্রার্থনা করে। এরপর সে

অন্যদেরকেও এটি স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর পক্ষে যুক্তি দেয় প্রতিটি পথভ্রষ্টতা থেকে।

এরপর আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইহুদি ও নাসারারা প্রবৃত্তির অনুসারী (আর যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান আসার পরও, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং থাকবে না কোন সাহায্যকারীও)। এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, তারা প্রবৃত্তির অনুসারী (আর যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন)। এতে ইহুদি ও নাসারাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে এবং তাদের অনুকরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বিশেষত তাদের পদ্ধতি ও রীতিনীতির ক্ষেত্রে। যদিও এই বক্তব্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তবুও তাঁর উম্মতও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ এখানে সমগ্র অর্থের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, শুধুমাত্র সম্বোধনকারীর প্রতি নয়। তেমনিভাবে শব্দের সাধারণ অর্থের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, নির্দিষ্ট কারণের প্রতি নয়। ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "এতে উম্মতের জন্য কঠোর সতর্কবাণী ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, তারা যেন কিতাব ও সুন্নাহ থেকে জ্ঞান লাভ করার পরও ইহুদি ও নাসারাদের পদ্ধতি অনুসরণ না করে। কারণ, এই সম্বোধন যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তবে এর নির্দেশ তাঁর উম্মতের জন্যও প্রযোজ্য।"

এই সম্বোধন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে হওয়ায় এটি নিষেধাজ্ঞার গুরুত্ব ও মর্যাদা বোঝায়। কারণ, যখন কোনো মহান ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে কোনো নির্দেশ বা নিষেধের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়, তখন তা সেই বিষয়ের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা প্রকাশ করে। এমনকি যদি তা তার পক্ষে অসম্ভবও হয়। যেমন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (সেই সত্তার শপথ, যার হাতে

মুহাম্মাদের প্রাণ, যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম)। এটি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়নের প্রতি অটল অবস্থান প্রকাশ করে। এমনকি যদি শরীয়তের শাস্তি তার নিকটতম ব্যক্তিকেও স্পর্শ করে। তবে আল্লাহ তায়ালা তার উপর সন্তুষ্ট, তিনি কখনই এমন কাজ করবেন না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: (যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তাদের মধ্যে যারা যথাযথভাবে তা তিলাওয়াত করে, তারা তাতে ঈমান আনে)। সুতরাং, যারা আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত কিতাবের হক যথাযথভাবে আদায় করে, তারা শীঘ্রই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনবে। কারণ, তাদের কিতাবে যা আছে তার প্রতি তাদের ঈমান রয়েছে, এবং তারা এতে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন, তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য, তাঁর অনুসরণ, সাহায্য ও সমর্থনের নির্দেশ খুঁজে পায়। এটি তাদেরকে সত্যের দিকে নিয়ে যায় এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার দিকে পরিচালিত করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, সত্যের অনুসরণ ব্যক্তিকে সত্যের দিকে নিয়ে যায়। আর প্রবৃত্তির অনুসরণ তাকে প্রবৃত্তির দিকে টেনে নেয়। এভাবে সত্যকে জেনে তা আঁকড়ে ধরা আর প্রবৃত্তি ও তার অনুসারীদের থেকে দূরে থাকার গুরুত্ব বোঝা যায়। কারণ, প্রবৃত্তি বিদআতের দিকে নিয়ে যায়। অনুরুপ একটি বিদআত আরেকটি বিদআতের দিকে টেনে নেয়, যতক্ষণ না পথভ্রষ্টতা বেড়ে যায় এবং সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়। আমরা আল্লাহর কাছে এর থেকে আশ্রয় চাই। তেমনিভাবে নৈতিক বিচ্যুতি ধীরে ধীরে আরও বিচ্যুতির দিকে নিয়ে যায়, যতক্ষণ না বিচ্যুতি প্রধান আচরণে পরিণত হয়।

একইভাবে সৎগুণ আঁকড়ে ধরা আরও সৎগুণের দিকে নিয়ে যায়, যেমন রাসূল সাঃ বলেছেন: (একজন ব্যক্তি সত্য বলতে ও সত্যের অনুসরণ করতে থাকে, যতক্ষণ

না আল্লাহর কাছে সে সিদ্দীক হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়)। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে কুফরি করার শাস্তি বর্ণনা করেছেন: (আর যারা তার সাথে কুফরী করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত)। সুতরাং, আজকের দিনে আল্লাহ তায়ালার দ্বীন ছাড়া কোনো সত্য দ্বীন নেই, যা তিনি তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাঃ-এর উপর নাযিল করেছেন।

এরপর আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের উদ্দেশ্যে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য পুনরায় বলেছেন: (হে ইসরাঈল-বংশধররা! আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। আর নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি (তৎকালীন) সৃষ্টিকুলের সবার উপর। আর তোমরা সেদিনের তাকওয়া অবলম্বন কর যেদিন কোন সত্তা অপর কোন সত্তার কোন কাজে আসবে না। কারো কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ হবে না এবং কোন সুপারিশ কারো পক্ষে লাভজনক হবে না। আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না)। এই সূরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইলকে তাদের উপর যে নিয়ামত দান করেছেন তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এখানে এটি পুনরায় বলা হয়েছে জোর দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে রাসূলের অনুসরণ করতে উৎসাহিত করার জন্য। যার গুণাবলী, নাম, নির্দেশ ও উম্মতের কথা তারা তাদের কিতাবে পাবে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সতর্ক করেছেন তারা যেন এটি গোপন না করে। অনুরুপভাবে সতর্ক করেছেন তার যেন দুনিয়াবী ও দ্বীনী নিয়ামতও গোপন না করে। আর তারা যেন তাদের চাচার বংশধর আরবদের প্রতি ঈর্ষা না করে, যাদের মধ্য হতে আল্লাহ তায়ালা শেষ নবী প্রেরণ করেছেন। আর এই হিংসা যেন তাদেরকে তাঁর বিরোধিতা, তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ এবং তাঁর আনুগত্য থেকে বিচ্যুত না করে। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

কুরআনুল কারীমে এই পুনরাবৃত্তি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। আর এর পুনরাবৃত্তির মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। এর অন্যতম হলো, পুনরায় দলিল প্রতিষ্ঠা করা। কারণ, মানব আত্মা পুনরায় স্মরণ করানোর প্রয়োজন অনুভব

করে। কখনও কখনও সে এর মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। আর যারা ইতোমধ্যে অভ্যস্ত, তাদের জন্য স্মরণ করানো হলো সতর্কবাতা এবং সংশোধনের উপায়। যেন তারা বিচ্যুতি, দুর্বলতা এবং বিস্মৃতির শিকার না হয়। কারণ, মানুষ যত উঁচ্চতায়ই পৌঁছাক না কেন, সর্বদা তার মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে।

আর কুরআনুল কারীমে পুনরাবৃত্তি কিছু নির্দেশনার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন এই আয়াতের ক্ষেত্রে ঘটেছে। আবার পূর্বে অনুল্লেখিত অতিরিক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমেও প্রকাশ পায়। যেমন কুরআনের কাহিনীগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়। এর উদ্দেশ্য হলো, কুরআনের পাঠককে বিভিন্ন পরিস্থিতির কথা স্মরণ করানো এবং তাদের পরস্পরের সাথে সংযোগ স্থাপন করিয়ে দেওয়া যাতে করে জ্ঞানের ওপর আরও নতুন জ্ঞান সংযোজন হয়। এতে মনকে সক্রিয় রাখা হয় এমন এক শৈলীতে, যা পাঠক ও শ্রোতার জন্য কখনো ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে না।

﴿وَإِذِ ٱبۡتَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٖ فَأَتَمَّهُنَّۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامٗاۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ ١٢٤ وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلۡبَيۡتَ مَثَابَةٗ لِّلنَّاسِ وَأَمۡنٗا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗىۖ وَعَهِدۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ١٢٥ وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنٗا وَٱرۡزُقۡ أَهۡلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنۡ ءَامَنَ مِنۡهُم بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلٗا ثُمَّ أَضۡطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ١٢٦﴾

অর্থ: **[আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন, অতঃপর তিনি সেগুলো পূর্ণ করেছিলেন। আল্লাহ্ বললেন, নিশ্চয় আমি আপনাকে মানুষের ইমাম বানাবো। তিনি বললেন, 'আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও?' (আল্লাহ) বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি যালিমদেরকে পাবে না। আর স্মরণ করুন, যখন আমরা কাবাঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো। আর ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ দিয়েছিলাম তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকু' ও সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে। আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, হে আমার রব! এটাকে নিরাপদ শহর করুন এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান করুন। তিনি (আল্লাহ) বললেন, যে কুফরী করবে তাকেও কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিব, তারপর তাকে আগুনের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!]** (আয়াত নং ১২৪-১২৬)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী ও বন্ধু ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলেন: (আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন, অতঃপর তিনি সেগুলো পূর্ণ করেছিলেন। আল্লাহ্ বললেন, নিশ্চয় আমি আপনাকে মানুষের ইমাম বানাবো।) উক্ত আয়াতে কারীমা এ কথা উল্লেখের মাধ্যমে শুরু হয়েছে যে, রিসালাতের দায়িত্ব পালন হলো একটি পরীক্ষা। এখানে আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে পরীক্ষা করেছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যে সকল আদেশ

ও নিষেধ দিয়েছিলেন, তা দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: (আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন) এখানে "কথা" বলতে শরীয়তের বিধান, আদেশ ও নিষেধ বোঝানো হয়েছে। এ বিষয়ে আলেমদের বিভিন্ন মত রয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যদি নবী তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পরীক্ষিত হন, তবে যাদের কাছে তিনি প্রেরিত হয়েছেন, তারাও ঈমান, ইবাদত এবং শরীয়তের বিধান পালনের মাধ্যমে পরীক্ষিত। সুতরাং, শরীয়তের যেকোনো বিধানের সাথে যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিই পরীক্ষার সম্মুখীন। তাকে দেখতে হবে সে শরীয়তের বিধান অনুসারে কাজ করবে নাকি তা থেকে বিচ্যুত হবে। এর ভিত্তিতেই সে পুরস্কৃত বা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। প্রতিটি মানুষই কোনো না কোনোভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন। সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হলো আল্লাহর দীনকে গ্রহণ করা, তা আঁকড়ে ধরা অথবা তা পরিত্যাগ করা ও তা থেকে দূরে সরে যাওয়া। দায়িত্বের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক একজন বাবাকে তাঁর অধীনস্ত সন্তান, স্ত্রী, সেবক এবং অন্যান্যদের বিষয়ে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা পালনের মাধ্যমে তিনি পরীক্ষিত হন। একইভাবে মা ও জনগণের শাসকও তাদের দায়িত্বে পরীক্ষিত হন। শাসককে দেখতে হবে তিনি ন্যায়বান ও আমানতদার হবেন নাকি বিশ্বাসঘাতকতা ও জুলুম করবেন। যদি তিনি ন্যায়বান হন, তবে তিনি সেই সাত ব্যক্তির মধ্যে একজন হবেন, যাদের আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন। যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিই পরীক্ষার সম্মুখীন। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: (তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং তোমরা তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে)। এমনকি ব্যক্তি নিজ সত্ত্বার ক্ষেত্রেও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে পরীক্ষিত। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ সমপূর্ণরূপে আদায় করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্পর্কে বলেছেন: (অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করলেন)।

দায়িত্ব পূর্ণ করার মর্যাদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আল্লাহ তায়ালা প্রথমে এ কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর বিস্তারিত দায়িত্বের কথা বলেছেন, যা হলো: (নিশ্চয় আমি আপনাকে মানুষের ইমাম বানাবো)।

এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ হলো পরীক্ষা, যাতে তিনি জানতে পারেন কে তাঁর আনুগত্য করে এবং কে অবাধ্য হয়, যদিও তাদের উপর স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষের মধ্যে আনুগত্য ও অবাধ্যতার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। একইভাবে প্রতিদান ও পুরস্কারও স্তরভেদে দেওয়া হবে, এমনকি পুলসিরাত পার হওয়ার সময়ও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এটি আমাদেরকে আল্লাহর বিধান পূর্ণ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে এবং তাঁর সাহায্য ও দৃঢ়তা কামনা করতে উৎসাহিত করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:(নিশ্চয় আমি আপনাকে মানুষের ইমাম বানাবো)। এর অর্থ হলো, মানুষ আপনাকে অনুসরণ করবে এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে আপনার থেকে আদর্শ গ্রহণ করবে, যা হলো হিদায়াত বা আল্লাহ তায়ালার পথনির্দেশ। এটি অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার। যে ব্যক্তি মানুষের জন্য ভালো কাজে নেতা বা ইমাম হয়, তার প্রতিদান তার অনুসারীদের সংখ্যা অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়, এবং এতে অনুসারীদের নেকী থেকে কিছু কম হয় না। যেমন হাদিসে এসেছে: "যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো ভালো পদ্ধতি চালু করবে, সে এর প্রতিদান পাবে এবং যারা তার পরে তা অনুসরণ করবে তাদের প্রতিদানও পাবে, এতে তাদের প্রতিদান থেকে কিছুই কমবে না।" কাজেই আদর্শ বা নেতৃত্বের গুরুত্বের কারণে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এদিকে নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন সূরা ফুরকানে তিনি রহমানের বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: (এবং যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আমাদের চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দিন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য নেতা বানিয়ে দিন)। এ বিষয়টি একজন মুমিনকে তার দ্বীন ও আখলাক বাস্তবায়নে আগ্রহী হওয়ার জন্য আহ্বান জানায়। মুমিনকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে, যেন সে আদেশ-নিষেধে শিথিলতা প্রদর্শনকারীদের দ্বারা কখনও

প্রতারিত না হয়। বিশেষ করে অমুসলিমদের এমন বিষয়ে অনুকরণ করবে না, যেখানে তাদের অনুসরণ করা বৈধ নয়।

এই মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ও তার মধ্যে থাকা কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর রবের কাছে তাঁর বংশধরদের জন্য দোয়া করেছিলেন: (এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও) এটি ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীন ও তাঁর বংশধরদের মঙ্গলের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে। তিনি চেয়েছিলেন যে, আল্লাহর আনুগত্য অব্যাহত থাকুক, তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত থাকুক এবং তাঁর বংশধরদের মধ্যেও নেতৃত্ব ও আদর্শের ধারা অব্যাহত থাকুক।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বন্ধু ও নবী ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের প্রার্থনার জবাবে বলেছেন: (আল্লাহ বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি যালিমদেরকে পাবে না)। এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে শুধুমাত্র সেই প্রতিবন্ধকতার কথা জানিয়েছেন যা এই প্রার্থনা পূরণে বাধা সৃষ্টি করে। এই প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করার মাঝে আল্লাহর উদ্দেশ্যের অন্তর্নিহীত গভীর তাৎপর্য ও কল্যাণ রয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দ্বীনের উপর অবিচল থাকবে, সে অন্যদের জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয় হবে। আর যে ব্যক্তি পাপ ও আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার মাধ্যমে নিজের উপর জুলুম করবে, সে এই উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। কারণ, সে মানুষের জন্য ভালো কাজে নেতা হতে পারবে না। এটি হলো শর্ত।

এ থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, সন্তানদের সঠিক পথে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে করে তারা মুত্তাকীদের জন্য নেতা হতে পারে। তারা যেন আল্লাহর ইচ্ছায় দ্বীন, ভালো কাজ, আচরণ, চরিত্র ও সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে অন্যদের জন্য অনুসরণীয় হতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা কাবাঘরের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন: (আর স্মরণ করুন, যখন আমরা কাবাঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম) আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য ধর্মীয় ও পার্থিব উদ্দেশ্যে এই পবিত্র ঘরের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। তার প্রথমটি হলো, এটি প্রত্যাবর্তনের স্থান। অর্থাৎ, এটি এমন একটি স্থান যেখানে মানুষ তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজন পূরণের জন্য বারবার ফিরে আসে। তারা বারবার ফিরে আসে অগণিত কল্যাণ হাসিলের জন্য যা কখনও বন্ধ হয় না। এতে হজ, উমরা, তাওয়াফ ইত্যাদি ইবাদত করা হয়। এছাড়াও, এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ রয়েছে। যেমন এখানে শীত ও গ্রীষ্মকালীন ব্যবসায়িক সফর হয়ে হতো। এরপর এটি নিরাপত্তার কেন্দ্রস্থল। অর্থাৎ, এটি এমন একটি স্থান যেখানে সবাই তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়ে নিরাপত্তা অনুভব করে। মক্কার মুশরিকরা কাবাকে অত্যন্ত সম্মান করত। এমনকি কেউ যদি তার পিতার হত্যাকারীকে কাবা চত্বরে দেখতো তবুও তাকে ভয় দেখাতো না। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর কাবার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি আমাদেরকে কাবাঘরের সম্মান, এর উদ্দেশ্যে সফর করা, এর হক আদায় করা, এর নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং এর মর্যাদায় কোনো প্রকার অবমাননা না করার গুরুত্ব শিক্ষা দেয়। গুনাহকারীর দৃষ্টিতে গুনাহ যতই ছোট হোক না কেন তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে কাবাঘরের মর্যাদা বজায় রখতে হবে। কারণ, কারাঘরের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে।

কাবা শরীফের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ তায়ালা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন: (তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান বানাও)। ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেছেন, মাকামে ইব্রাহীম হলো সেই স্থান যেখানে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পায়ের চিহ্ন রয়েছে। এটি সেই স্থান যেখানে তাওয়াফকারীরা তাওয়াফের পর দু'রাকাত সালাত আদায় করে। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য

নবীদের পিতা ও আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসীদের ইমাম ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের মর্যাদা তুলে ধরে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীম ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল আলাইহিমাস সালামকে একটি মহান কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন: (আর ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ দিয়েছিলাম তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকু' ও সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে) এই পবিত্রতা সাধনের আদেশটি ব্যাপক অর্থে দেওয়া হয়েছে, যা দৃশ্যমান অপবিত্রতা দূর করা যেমন: মূর্তি, নোংরা ও অপবিত্র বস্তু দূর করা বুঝায় এবং অদৃশ্য অপবিত্রতা দূর করাও বুঝায়। যেমন: শিরক, কুফর ও গুনাহের কাজ। এর উদ্দেশ্য হলো, কাবাঘরকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী এবং নামাজ আদায়কারীদের জন্য সম্পূর্ণ পবিত্র ও নির্মল রাখা। এটি মাসজিদুল হারামের জন্য, এতে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও নামাজ আদায়কারীদের জন্য বিশাল মর্যাদা। আল্লাহ তায়ালা এই ইবাদতগুলোর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কাবাঘরের যত্ন নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। শাইখ ইবনে সাদী (রহ.) বলেছেন: "তাওয়াফের কথা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ এটি শুধুমাত্র মসজিদুল হারামের সাথে সম্পর্কিত।" কাবাঘর পবিত্র করার আদেশ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মুসল্লি ও ইতিকাফকারীদের জন্য যা কষ্টদায়ক, বিরক্ত কারণ হয় বা নামাজ ও ইতিকাফ থেকে বিরত রাখে এমন সবকিছু থেকে অন্য সব মসজিদও পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। কারণ, পবিত্রতা রক্ষার এই নির্দেশ সকল মসজিদের জন্য প্রযোজ্য। এ থেকে আমরা যে উপকারগুলি পাই তম্মধ্যে হলো: ১. আল্লাহর আদেশ পালনের সাওয়াব। যে ব্যক্তি মসজিদ পবিত্র রাখে, সে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে দেওয়া আল্লাহর আদেশ পালন করে। ২. হাদিসের নির্দেশনা বাস্তবায়ন। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ পরিষ্কার করা ও তাতে সুগন্ধি ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। ৩. তিনি নিজেও এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা কাবাঘরকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করে বলেছেন: (আমার ঘর)। এটি কাবাঘরের জন্য বিশাল সম্মান ও মর্যাদা। এটি আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা যাকে সম্মানিত করেছেন, মুমিনদেরও তার সম্মান করা উচিত। তাই মুমিনের উচিত কাবাঘরকে তার উচ্চ মর্যাদা অনুপাতে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা। ইবনে সাদী (রহ.) এ সম্পর্কিত কিছু উপকারিতা উল্লেখ করেছেন: ১. কাবা আল্লাহ তায়ালার ঘর হওয়ায় তা পবিত্র রাখার জন্য ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালামের সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ ছিলো। ফলে তারা এ লক্ষ্যে তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করেছেন। ২. কাবাঘরকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করার মাঝে সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের দিক ফুটে উঠেছে। বিধায় এর সাথে সম্পৃক্ত হলো, এই ঘরের ইবাদত অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন। ৩. এই সম্পৃক্ততা মানুষের হৃদয়কে কাবা শরীফের প্রতি আকৃষ্ট করে।

অতঃপর এই আয়াতটি আমাদের পিতা ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আকাঙখার কথা তুলে ধরেছে: (আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, হে আমার রব! এটাকে নিরাপদ শহর করুন এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান করুন।) ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের এই প্রার্থনা তাঁর গভীর চিন্তা, দূরদর্শিতা, আকাঙখা ও যত্নশীলতার পরিচয় দেয়। তিনি শুধু নিজের কথা চিন্তা করেননি, বরং এই স্থানের বাসিন্দা এবং যারা এখানে আগমন করে, তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের দিক নিয়েও চিন্তা করেছেন। যাতে করে এই স্থানের বাসিন্দা ও আগত ব্যক্তিরা নিরাপদে থাকতে পারে এবং কোনো ভয় বা আতঙ্ক ছাড়াই জীবনযাপন করতে পারে। অনুরুপভাবে এই স্থানের বাসিন্দাদের ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান করা হয় সেজন্যও দোয়া করেছেন। তিনি এই দোয়া শুধুমাত্র মুমিনদের জন্যই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আর আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের সম্পর্কে বলেন: (তিনি (আল্লাহ) বললেন, যে কুফরী করবে তাকেও কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিব, তারপর তাকে আগুনের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। আর তা কত

নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!) আল্লাহ তায়ালা তাঁর রিজিকের মাঝে মুমিন, কাফির, গুনাহগার ও আনুগত্যশীল সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা তিনি কাফিরদের ক্ষেত্রে অল্প সময়ের জন্য ভোগ-বিলাসের সুযোগ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন: (তিনি (আল্লাহ) বললেন, যে কুফরী করবে তাকেও কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিব)। সুতরাং, মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে তাঁর আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করে এবং এর মাধ্যমে জান্নাত লাভ করে। অন্যদিকে কাফির ব্যক্তি অল্প সময়ের জন্য এই নিয়ামত ভোগ করে। কিন্তু অবশেষে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে ঠেলে দিবেন। এটি কাফিরদের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতি।

﴿وَإِذۡ يَرۡفَعُ إِبۡرَٰهِـۧمُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡبَيۡتِ وَإِسۡمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ١٢٧ رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةٗ مُّسۡلِمَةٗ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبۡ عَلَيۡنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٨ رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١٢٩ وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَقَدِ ٱصۡطَفَيۡنَٰهُ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٣٠ إِذۡ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسۡلِمۡۖ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٣١ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعۡقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٣٢ أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلۡمَوۡتُ إِذۡ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ بَعۡدِيۖ قَالُواْ نَعۡبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗا وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ١٣٣ تِلۡكَ أُمَّةٞ قَدۡ خَلَتۡۖ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَلَكُم مَّا كَسَبۡتُمۡۖ وَلَا تُسۡـَٔلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٣٤﴾

অর্থ: **[আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবাঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন, (তারা বলছিলেন) হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'হে আমাদের রব। আর আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর হতে আপনার এক অনুগত জাতি উত্থিত করুন। আর আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি দেখিয়ে দিন এবং আমাদের তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনিই বেশী তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। হে আমাদের রব! আর আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসূল পাঠান, যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করবেন; তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। আর যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ছাড়া ইবরাহীমের মিল্লাত হতে আর কে বিমুখ হবে! দুনিয়াতে তাকে আমরা মনোনীত করেছি; আর আখেরাতেও তিনি অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্যতম। আর ইবরাহীম ও ইয়াকুব তাদের পুত্রদেরকে এরই নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, হে পুত্রগণ! আল্লাহই তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করেছেন।**

কাজেই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে তোমরা মারা যেও না।ইয়াকুবের যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? তিনি যখন সন্তানদের বলেছিলেন, "আমার পরে তোমরা কার ইবাদাত করবে? তারা বলেছিল, 'আমরা আপনার ইলাহ ও আপনার পিতৃ পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ - সেই এক ইলাহরই ইবাদাত করবো। আর আমরা তার কাছেই আত্মসমর্পণকারী"। তারা ছিল এমন এক জাতি, যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের, তোমরা যা অর্জন করেছো তা তোমাদের। আর তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না।] (আয়াত নং ১২৭-১৩৪)।

এরপর কুরআনের বর্ণনা ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) এর কাবা ঘর নির্মাণ এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া ও আশ্রয় প্রার্থনার দিকে স্থানান্তরিত হয়: 'যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিল, তখন তারা দোয়া করল: হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে এটি গ্রহণ করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' এই মহান আয়াতে ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) এর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যখন তারা পবিত্র কাবা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছিলেন যেন তিনি তাদের এই ইবাদত গ্রহণ করেন। এটি প্রমাণ করে যে, একজন মুমিন ব্যক্তির উচিত সর্বদা দোয়া করা যেন আল্লাহ তাআলা তার ইবাদত ও সব ধরনের আনুগত্য কবুল করেন। এটা মনে করা উচিত নয় যে, সে তার কাজ সম্পূর্ণ ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছে এবং তা গ্রহণযোগ্য হয়েছে। কারণ, সে জানে না তার কাজের পরিণতি কী। ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) বলেছেন: তারা একটি নেক কাজ সম্পাদন করছিলেন, আর এর মধ্যেই তারা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছিলেন যেন তিনি তা গ্রহণ করেন। বর্ণিত আছে যে, ওহাইব ইবনুল ওয়ার্দ (রহ.) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করার সময় কেঁদে ফেলেন এবং বললেন: 'হে রহমানের বন্ধু! তুমি রহমানের ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছ, আর তুমি ভয় করছ যে, আল্লাহ তা গ্রহণ

করবেন না।' এটি আল্লাহ তাআলার বাণীর মতো, যেখানে তিনি খাঁটি মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন: 'এবং যারা তাদের প্রদান করে এবং তাদের হৃদয় ভয়ে কেঁপে ওঠে।' (সূরা আল-মুমিনুন) অর্থাৎ, তারা সদকা, খরচ ও কুরবানি দেয়, কিন্তু তাদের হৃদয় ভীত থাকে এই জন্য যে, আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন কিনা।

তারপর ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) বললেন: 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে আপনার অনুগত মুসলিম বানান।'অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করলেন যেন তিনি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী, বিনয়ী ও আনুগত্যশীল মুসলিম বানান। তারা আল্লাহ তাআলার কাছে ঈমান ও নেক আমল উপর অবিচল থাকার জন্য প্রার্থনা করলেন। এ থেকে শিক্ষা হলো যে, একজন মুমিন ব্যক্তির উচিত আল্লাহ তাআলার কাছে অবিচলতা চাওয়া এবং ইবাদতের ব্যাপারে আত্মতুষ্টি না করা। বরং ইবাদতের সময় আল্লাহ তাআলার কাছে তা গ্রহণ করার জন্য দোয়া করা এবং সত্যের উপর অবিচল থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। যেমন ইবরাহীম (আ.) এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.) দোয়া করতেন: ' يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك/হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে আপনার দ্বীনের উপর অবিচল রাখুন।'

ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) এর দোয়া শুধু তাদের নিজেদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তাদের বংশধরদের জন্যও ছিল: 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে আপনার অনুগত মুসলিম বানান এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে একটি মুসলিম উম্মাহ বানান।' এটি আমাদেরকে সন্তানদের জন্য দোয়ার আদর্শ জানায় এবং পিতার সাথে সন্তানকে নেক কাজে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে, যেমন ইসমাঈল (আ.) তার পিতার সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সন্তান যেন তার পিতার কাছ থেকে শিক্ষা নেয়, তার অনুসরণ করে এবং তার আদর্শকে অনুসরণ করে। তাদের দোয়া অব্যাহত

ছিল: 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি দেখান এবং আমাদের তাওবা গ্রহণ করুন। নিশ্চয় আপনি তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।' তারা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করলেন যেন তিনি তাদেরকে হজ্জের রীতিনীতি ও এর চিহ্নসমূহ দেখান এবং শিক্ষা দেন। কিছু তাফসীরবিদ বলেন, এটি সব ধরনের ইবাদতকে অন্তর্ভুক্ত করে। এরপর তারা আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে তাঁর কাছে তাওবা চাইলেন, কারণ তিনি তাওবা গ্রহণকারী ও পরম দয়ালু। 'নিশ্চয় আপনি তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।' এটি আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে দোয়া করার গুরুত্ব প্রকাশ করে এবং তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে দোয়া করতে নিষেধ করে। যদিও তারা ইবাদত ও আনুগত্যের কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তবুও তারা আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা চাইলেন। কারণ, মানুষ যতই নেক আমল করুক না কেন, তার মধ্যে ত্রুটি থাকবেই। যদি আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর পুত্র আল্লাহর কাছে তাওবা কামনা করেন, তাহলে অন্যদের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত? এটি প্রমাণ করে যে, মানুষ যেন তার ইবাদত নিয়ে আত্মতুষ্ট না হয়, বরং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যেন তিনি তার ইবাদত গ্রহণ করেন এবং তার ত্রুটিগুলো ক্ষমা করেন।

তাদের দোয়া অব্যাহত রয়েছে: 'হে আমাদের রব! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' এই দোয়াটি আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ.) এর আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, আল্লাহ যেন তার বংশধরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেন। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ.) এর এই দোয়া কবুল করলেন এবং তার বংশধর ইসমাঈল (আ.) এর মাধ্যমে নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা.) কে প্রেরণ করলেন। যেমন নবী (সা.) বলেছেন: 'আমি আমার পিতা ইবরাহীম (আ.) এর দোয়ার ফল। আর ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) ছিলেন শেষ নবী যিনি আমার আগমনের

সুসংবাদ দিয়েছিলেন।' (মুসনাদে আহমাদ।) এই দোয়ায় রাসূলের দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে: ১. 'তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন': অর্থাৎ, তিনি আল্লাহর আয়াতগুলো তাদের কাছে পাঠ করবেন, মুখস্থ করাবেন এবং তা সংরক্ষণ করাবেন। ২. 'তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেবেন': অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে কিতাব (কুরআন) ও হিকমাহ (সুন্নাহ) বুঝাবেন এবং তা বাস্তবায়ন করাবেন। কারণ, শিক্ষা দেওয়ার অর্থ হলো বুঝানো ও বাস্তবায়ন করানো। ৩. 'তাদেরকে পবিত্র করবেন': অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে নেক আমলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেবেন এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখবেন। এটি আলেমদের দায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে, যারা নবীদের উত্তরাধিকারী। ধর্মীয় শিক্ষার দায়িত্বে রয়েছে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, বুঝা ও বাস্তবায়ন করা। একইভাবে নববী সুন্নাহ শিক্ষা দেওয়া, তা বুঝা ও বাস্তবায়ন করা এবং এর উপর আমল করা আবশ্যক। এছাড়াও, তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি) এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যা আনুগত্য ও আল্লাহ তাআলার প্রতি ইখলাসের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা যা পছন্দ করেন ও যা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে, তার উপর আমল করা এবং নিজেকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা ও ইচ্ছার বিরোধী সব কিছু থেকে পবিত্র করা।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: 'আর যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ছাড়া ইবরাহীমের মিল্লাত হতে আর কে বিমুখ হবে!' অর্থাৎ, ইবরাহীম (আ.) এর মিল্লাত থেকে কেবল সেই ব্যক্তিই বিমুখ হয়, যে নিজেকে হেয় করেছে, নিজেকে অজ্ঞ করেছে এবং নিজেকে অপমান ও লাঞ্ছনার জন্য প্রস্তুত করেছে। সুতরাং, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার দ্বীন ও শরীয়ত জানার পরেও তা ত্যাগ করে এবং তার পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণ করে, তার অবস্থা হলো সেই মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তির মতো, যে আলো ও কল্যাণ দেখেও তা ত্যাগ করে এবং তার চেয়ে নিকৃষ্ট কিছু গ্রহণ করে। এটি হলো নিকৃষ্ট মানসিকতা।

'কেবল সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে হেয় করেছে' এই বাক্যটি ইঙ্গিত করে যে, মানুষ নিজেই নিজের ক্ষতি করতে পারে। সে নিজেকে হেয়, লাঞ্ছিত ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এছাড়াও, সে নিজেকে দুর্বল করতে পারে এবং সত্য ও কল্যাণ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। কারণ, 'সাফাহ' (মূর্খতা) হলো ক্ষতি থেকে সতর্ক না হওয়া এবং কল্যাণ ত্যাগ করা। এটি আরও প্রমাণ করে যে, মানুষ নিজের দায়ভার নিজেই বহন করবে, কারণ সে নিজেই তার নিজের জন্য দায়ী। অন্যদিকে, আল্লাহ তাআলার তাওফিকের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে উন্নত করতে পারে, কল্যাণ ও সৎকর্মের দিকে অগ্রসর হতে পারে, তার ক্ষমতাগুলো বিকশিত করতে পারে, গুনাহ থেকে বিরত থাকতে পারে, ইবাদত ও কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করতে পারে এবং কল্যাণ ও সৎকর্মের পথে যে বাধাগুলো আসে, তা অতিক্রম করার চেষ্টা করতে পারে।

এরপর আল্লাহ তাআলা এই মহান নবীর দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: 'আমি তাকে দুনিয়াতে মনোনীত করেছি এবং নিশ্চয়ই আখিরাতে তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।' আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন এবং তাকে এমন কাজের জন্য সাহায্য করেছেন, যা তিনি পছন্দ করেন এবং যা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে। আর আখিরাতে তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। সৎকর্মশীল ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার মহান প্রতিদান লাভ করে বিজয়ী হয়। 'الاصطفاء' (মনোনীত করা) শব্দটি অন্য সব কিছু থেকে বেছে নেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। এটি আল্লাহ তাআলার সেই ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে, যাকে তিনি মনোনীত করেছেন। এটি তাঁর বিশেষ যত্ন ও মনোযোগেরও ইঙ্গিত দেয়। এটি বান্দাদের জন্য আবশ্যক করে তোলে যে, তারা আল্লাহ তাআলা যাকে মনোনীত করেছেন, তাকে সম্মান করবে, ভালোবাসবে এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। এই আয়াতে ইবরাহীম (আ.) এর প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ মর্যাদা ও প্রশংসা প্রকাশ পেয়েছে- তার বুদ্ধিমত্তা, সৃষ্টি, চরিত্র, নবুওয়ত এবং এর সাথে সম্পর্কিত সব বিষয়ে। আল্লাহ

তাআলার বাণী 'নিশ্চয়ই আখিরাতে তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন' এতে ইবরাহীম (আ.) এর আখিরাতে মর্যাদা ও অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আল্লাহ তাআলার মহান প্রতিদান ও মর্যাদা লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ.) এর আল্লাহর আদেশে দ্রুত সাড়া দেওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেন:'যখন তাঁর রব তাকে বললেন: আত্মসমর্পণ কর। তিনি বললেন: আমি বিশ্বজগতের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।' ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তাআলার আদেশে অবিলম্বে সাড়া দিলেন। এই আয়াতের বর্ণনায় প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ তাআলার আদেশ ছিল মাত্র একটি শব্দে: 'আত্মসমর্পণ কর'। অথচ এই একটি শব্দে বহু অর্থ ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে: আল্লাহ তাআলার আনুগত্য, তাঁর আদেশ মেনে চলা, তা বাস্তবায়ন করা, তাঁর দিকে ফিরে আসা, এবং একত্ববাদ ও ইবাদত। এই একটি শব্দে ইবরাহীম (আ.) এর কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সমস্ত অর্থ ও তাৎপর্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটি কুরআনের বাগ্মীতা ও বর্ণনার একটি অলৌকিক দিক। এছাড়াও, এই আয়াতে ইবরাহীম (আ.) এর দ্রুত সাড়া দেওয়া ও আল্লাহ তাআলার আদেশ মেনে নেওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মাত্র একটি শব্দে বললেন: 'আমি আত্মসমর্পণ করলাম', যাতে কোনো দ্বিধা বা বিলম্ব ছিল না। এটি সমস্ত অর্থ ধারণ করে: গ্রহণ, আনুগত্য ও আদেশ পালন। এমনকি যখন তাকে তার পুত্রকে কুরবানি করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তখনও তিনি কোনো দ্বিধা, ব্যাখ্যা বা চিন্তা না করে তা পালন করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তবে আল্লাহ তাআলা তার উপর থেকে এই কুরবানি প্রত্যাহার করে নেন এবং একটি মহান কুরবানির মাধ্যমে তা প্রতিস্থাপন করেন। এটি আল্লাহ তাআলার আনুগত্যকারীদের জন্য একটি আদর্শ ও নমুনা। একজন মুসলিমের উচিত আল্লাহ তাআলার আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে এভাবেই আচরণ করা। আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে কোনো দ্বিধা বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা উচিত নয়। ইবরাহীম (আ.) এর বাণী 'আমি বিশ্বজগতের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম' এতে খাঁটি একত্ববাদ প্রকাশ

পেয়েছে। তিনি অন্য কারও কাছে আত্মসমর্পণ করেননি বা অন্য কাউকে শরিক করেননি, বরং একমাত্র বিশ্বজগতের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এটি একত্ববাদের দুটি দিক প্রতিষ্ঠা করে: ১. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ (প্রভুত্বের একত্ব): আল্লাহ তাআলাই সব কিছুর রব ও মালিক। ২. তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ (ইবাদতের একত্ব): ইবরাহীম (আ.) এর আত্মসমর্পণ শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই ছিল। এই বাক্যে 'বিশ্বজগতের রব' বলতে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর 'আমি আত্মসমর্পণ করলাম' বলতে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, তার ভয়, ভক্তি, ভালোবাসা, আশা, আনুগত্য, জীবন, মৃত্যু, ঈমান ও ইবাদত সবই একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। তিনি তার ইবাদতের কোনো অংশই অন্য কারও জন্য নির্ধারণ করেননি, যেমনটি এই আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং, 'আমি আত্মসমর্পণ করলাম' এই শব্দটি বান্দার জন্য তার রবের প্রতি যা কিছু করা উচিত, তা সবই অন্তর্ভুক্ত করেছে। এটি কুরআনের অলৌকিক বাগ্মীতা ও অর্থের গভীরতার একটি উদাহরণ, যা আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশনা পূর্ণরূপে প্রকাশ করে।

ইবরাহীম (আ.) এর তার বংশধরদের প্রতি গভীর আন্তরিকতা ও আল্লাহ তাআলার দ্বীনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা অব্যাহত ছিল। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ.) এর তার সন্তানদের সাথে আচরণ বর্ণনা করেন: 'ইবরাহীম তার সন্তানদেরকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন।' আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ.) এর দোয়া কবুল করলেন, এবং তার সন্তানরা এই পথ অনুসরণ করলেন। এমনকি তার নাতি ইয়াকুব (আ.)ও তার সন্তানদেরকে ইবরাহীম (আ.) এর মতোই উপদেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: 'ইয়াকুব বললেন: হে আমার সন্তানরা! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম অবস্থায় ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না।' এই নির্দেশনামূলক পদ্ধতিতে আল্লাহ তাআলার মনোনয়ন ও তাঁর দ্বীনকে বেছে নেওয়ার অনুগ্রহ বর্ণনা করা হয়েছে। এটি তাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে

দেয়, যা হৃদয়কে এই দ্বীনের প্রতি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে উদ্বুদ্ধ করে। তবে তিনি তাদেরকে সতর্ক করার মাধ্যমে মৃত্যুর পরিণতির কথা স্মরণ করিয়েছেন, যাতে তা আরও বেশি প্রভাব ফেলতে পারে এবং তারা মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। ইমাম ইবনে সাদী (রহ.) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি কোনো অবস্থায় জীবনযাপন করে, সে আল্লাহর অনুমতিক্রমে সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আর যে ব্যক্তি কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে সেই অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।'

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: 'তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যু এসেছিল? যখন তিনি তার সন্তানদেরকে বললেন: আমার পরে তোমরা কাকে ইবাদত করবে? তারা বলল: আমরা আপনার ইলাহ, আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহর ইবাদত করব, যিনি একক ইলাহ। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।' ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেছেন: এই বক্তব্য ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি, যারা ইবরাহীম (আ.) এর নামে এমন কিছু দাবি করেছিল যা তিনি তার সন্তানদেরকে বলেননি, এবং তারা নাকি ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাদেরকে তিরস্কার করে বলেছেন: 'তোমরা কি ইয়াকুবের কাছে উপস্থিত ছিলে? তোমরা কি জানো তিনি কী উপদেশ দিয়েছিলেন? তাহলে তোমরা জেনেশুনে দাবি করছ?' অর্থাৎ, তোমরা সাক্ষী ছিলে না, বরং তোমরা মিথ্যা বলছ।

ইয়াকুব (আ.) এর সন্তানরা এমন উত্তর দিয়েছিলেন, যা তার চোখ জুড়িয়ে দিয়েছিল। তারা একত্ববাদের ঘোষণা দিয়েছিলেন, যাতে কোনো শিরক নেই। তারা বললেন: 'আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।' তারা একত্ববাদ ও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে, তার প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করলেন: ঈমান, ইবাদত ও নৈতিকতা। এটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ উত্তরে, যা সব

ধরনের কল্যাণ ধারণ করে এবং সব ধরনের বিরোধিতাকে প্রতিহত করে। এটি এই দ্বীনের প্রতি শিক্ষামূলক আগ্রহ ও এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার গুরুত্ব প্রকাশ করে। সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতে হবে যেন তারা আল্লাহ তাআলার দ্বীন দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে, এমনকি জীবনের শেষ মুহূর্তেও। আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)ও এমনই ছিলেন। তিনি তার জীবনের শেষ মুহূর্তে সালাত কায়েম ও দাস-দাসীদের প্রতি সদাচরণের উপদেশ দিয়েছিলেন। আর তিনি তার সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তারা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর পিছনে সালাত আদায় করছেন।

এটি প্রমাণ করে যে, পিতা, আলেম ও দাঈদের জন্য ইসলামের বিষয়ে যত্নশীল হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে তাদের সন্তানদের জন্য, যারা তাদের দায়িত্বে রয়েছে। তাদেরকে এই দ্বীনের বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এছাড়াও, এটি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মিথ্যা দাবির বিষয়ে সতর্ক করে, যারা পূর্ববর্তী নবীদের নামেও মিথ্যা দাবি করে। আল্লাহ তাআলা তাদের মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, তারা ইয়াকুব (আ.) এর উপদেশের সময় উপস্থিত ছিল না। তারা ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের দাবি করে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, ইয়াকুব (আ.) এর সন্তানরা একত্ববাদ ও ইসলামের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: 'সে সম্প্রদায় অতীত হয়ে গেছে। তাদের জন্য তারা যা অর্জন করেছে এবং তোমাদের জন্য তোমরা যা অর্জন করেছ। তোমরা তাদের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে না।' এটি প্রমাণ করে যে, প্রত্যেকে তার নিজের কাজের জন্য দায়ী। তোমাদেরকে তাদের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। তাই তোমাদের উচিত তোমাদের নিজেদের অবস্থা ও অর্জন সম্পর্কে চিন্তা করা।

এটি আরও প্রমাণ করে যে, যারা সত্যের বিরোধিতা করে, তাদেরকে সত্য, সঠিক পথ ও বাস্তবতা দেখানো উচিত। তাদের দাবিগুলোর জবাব দেওয়া উচিত। যদি তারা

তা গ্রহণ করে, তবে ভালো। অন্যথায়, তারা তাদের অর্জনের জন্য দায়ী হবে। কাউকে সঠিক পথে বাধ্য করা যায় না, বরং সঠিক পথ দেখানোই যথেষ্ট।

﴿وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰ تَهۡتَدُواْۗ قُلۡ بَلۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِـۧمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٣٥ قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ١٣٦ فَإِنۡ ءَامَنُواْ بِمِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهۡتَدَواْۖ وَّإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّمَا هُمۡ فِي شِقَاقٖۖ فَسَيَكۡفِيكَهُمُ ٱللَّهُۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ١٣٧ صِبۡغَةَ ٱللَّهِ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبۡغَةٗۖ وَنَحۡنُ لَهُۥ عَٰبِدُونَ ١٣٨ قُلۡ أَتُحَآجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡ وَلَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُخۡلِصُونَ ١٣٩ أَمۡ تَقُولُونَ إِنَّ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰۗ قُلۡ ءَأَنتُمۡ أَعۡلَمُ أَمِ ٱللَّهُۗ وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ١٤٠ تِلۡكَ أُمَّةٞ قَدۡ خَلَتۡۖ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَلَكُم مَّا كَسَبۡتُمۡۖ وَلَا تُسۡـَٔلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾

অর্থ: **[আর তারা বলে, ইয়াহুদী বা নাসারা হও, সঠিক পথ পাবে। বলুন, বরং একনিষ্ঠ হয়ে আমরা ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করব এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা ইবরাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তার বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছে, এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের রব এর নিকট হতে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর আমরা তারই কাছে আত্মসমর্পণকারী। অতঃপর তোমরা যেরূপ ঈমান এনেছ তারাও যদি সেরূপ ঈমান আনে, তবে নিশ্চয় তারা হেদায়াত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা বিরোধিতায় লিপ্ত, সুতরাং তাদের বিপক্ষে আপনার জন্য আল্লাহই**

যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। আল্লাহর রং এ রঞ্জিত হও। আর রং এর দিক দিয়ে আল্লাহর চেয়ে কে বেশী সুন্দর? আর আমরা তারই ইবাদতকারী। বলুন, 'আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? অথচ তিনি আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব! আমাদের জন্য আমাদের আমল। আর তোমাদের জন্য তোমাদের আমল, এবং আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ। তোমরা কি বল যে, অবশ্যই ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণ ইয়াহুদী বা নাসারা ছিল? বলুন, তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ? তার চেয়ে বেশী যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর কাছ থেকে তার কাছে যে সাক্ষ্য আছে তা গোপন করে? আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল নন। তারা এমন এক উম্মাত, যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। আর তোমরা যা অর্জন করেছে তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।] *(*আয়াত নং ১৩৫-১৪১*)*

কুরআনের প্রসঙ্গটি আবারও আহলে কিতাবের দিকে এসেছে। এই মহান আয়াতটি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অহংকার ও সত্য প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি স্পষ্ট করে, যদিও সত্য তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। বরং তাদের অহমিকা আরও এগিয়ে যায় এবং নবীজি *(*সা.*)* ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদেরকে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান করে *(*ইহুদিরা*)* এবং খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান করে *(*খ্রিস্টানরা*)*। এটি প্রমাণ করে যে, বাতিলের অনুসারীরা সুস্পষ্ট সত্য গ্রহণ করতে পারে না এবং তারা সত্যের অনুসারীদেরকে তাদের বাতিল পথে অনুসরণ করতে আহ্বান করতে পারে, যদিও তারা জানে যে, তাদের পথ বাতিল। তারা দাবি করে যে, তাদের পথই সঠিক পথ*:* **'তারা বলল*:* ইহুদি বা খ্রিস্টান হয়ে যাও, তাহলে তোমরা সঠিক পথ পাবে।'** এখানে সত্য ও বাস্তবতা ঘোষণার গুরুত্ব প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী *(*সা.*)* কে নির্দেশ দেন*:* **'বলুন*:* বরং আমরা ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসারী, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।'** এটি প্রমাণ করে যে, এই দ্বীন হলো নবীদের পিতা ইবরাহীম *(*আ.*)* এর মিল্লাতের ধারাবাহিকতা। আল্লাহ তাআলার দ্বীন হলো সঠিক পথ ও খাঁটি একত্ববাদ *(*হানিফ*)*, শিরক ও বিদআত নয়। এটি প্রমাণ করে যে, বিদআত ও

শিরক দ্বীনকে মিল্লাত থেকে বের করে দেয় এবং মুশরিক তার শিরকের মাধ্যমে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, যা একত্ববাদের মূলনীতির বিরোধী। আল্লাহ তাআলার বাণী **'বরং আমরা ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসারী, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন'** এতে বাতিলের সামনে দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। এই মহান আয়াতে মিল্লাতের প্রতিষ্ঠা ও শিরকের অস্বীকার করা হয়েছে: **'বরং আমরা ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসারী, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।'** এতে শিরককে মুশরিকের জন্য অপমান ও নিন্দনীয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ এটি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার বিরোধী।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের ও অন্যদের জন্য আরও স্পষ্ট বক্তব্য বর্ণনা করেন: **তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদেরকে তাদের রবের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।'** অতএব এই দ্বীনের ভিত্তি হলো আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ *(সা.)* এর প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তা হলো কুরআন ও সুন্নাহ- এর প্রতি বিশ্বাস। এছাড়াও, রাসূলগণ ও তাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তা হলো ঐশী গ্রন্থসমূহ। তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাবে না। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আত্মসমর্পণকারী এবং তাঁর নাযিলকৃত বিধানের অনুগত। এটি প্রমাণ করে যে, এই দ্বীন পূর্ববর্তী নবীদের দ্বারা আনা দ্বীনের ধারাবাহিকতা। একজন মুসলিম আল্লাহ তাআলাতে বিশ্বাস করে, আমাদের নবী মুহাম্মদ *(সা.)* এর প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করে এবং পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তাতেও বিশ্বাস করে।

এটি ইসলামের স্পষ্টতা প্রমাণ করে। এটি পূর্বে আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন, তা সত্যায়ন করে এবং এটি নবীদের দ্বারা আনা দ্বীনের ধারাবাহিকতা। ইসলাম সব নবীর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দেয় এবং তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে না।

এটি ঈমানের মূল অংশ। যে ব্যক্তি তাদের মধ্যে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করে, সে তার ঈমানকে বিনষ্ট করে।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যে শর্ত নির্ধারণ করেছেন, তা স্পষ্ট করেন: **'যদি তারা তোমাদের মতোই ঈমান আনয়ন করে, তবে তারা সঠিক পথ পাবে।'** এটি প্রমাণ করে যে, হিদায়াত শুধুমাত্র এই সঠিক ইসলামী দ্বীনেই সীমাবদ্ধ। এটি আরও প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনো সঠিক পথ নেই। এটি প্রমাণ করে যে, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.) এর দ্বারা আনা দ্বীন ছাড়া অন্য সব দ্বীন বাতিল। সুতরাং, যদি তারা তোমাদের মতো বিশ্বাস না করে, তবে তারা তাদের বিরোধ, তর্ক ও শত্রুতায় অবিচল থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: **'আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা শুধু বিরোধিতায় লিপ্ত হবে।'** এটি প্রমাণ করে যে, তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং তারা এই দ্বীনের বিরুদ্ধে তর্ক, জিদ ও শত্রুতা পোষণ করে। তবে আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা.) ও মুমিনদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি এই জিদকারীদের থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন। তিনি সব কিছু শোনেন ও জানেন: **'যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা শুধু বিরোধিতায় লিপ্ত হবে। সুতরাং তাদের বিপক্ষে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'** যদি তারা সেই সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যা তোমাকে দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, তবে তারা তোমাদের সাথে বিরোধ ও মতবিরোধে লিপ্ত হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের বিরোধিতা ও মতবিরোধ থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন। তিনি সব কিছু শোনেন ও জানেন, তোমরা এবং তারা কী অবস্থায় রয়েছ। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল (সা.) এর প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাদের মধ্যে অনেককে হত্যা করা হয়েছে এবং বনি নাযিরকে নির্বাসিত করা হয়েছে।

এটি আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলি জানার গুরুত্ব প্রকাশ করে, যেমন **'আস-সামী' (সর্বশ্রোতা)** ও **'আল-আলীম (সর্বজ্ঞ)**। এটি মুসলিমদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার প্রতি ভয় ও লজ্জা সৃষ্টি করে, যিনি তাঁর সব সৃষ্টির অবস্থা শোনেন ও জানেন। এটি

মুসলিমদেরকে শিক্ষা দেয় যে, তারা যেন শুধুমাত্র সেই সত্তার উপর আশা, সাহায্য, বিজয় ও ভরসা করে, যিনি সব সময় তাদের অবস্থা শোনেন ও জানেন। 'তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনকে উত্তম হিসেবে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, এর চেয়ে উত্তম কোনো দ্বীন নেই: 'আল্লাহর রং। আর আল্লাহর চেয়ে উত্তম রং কার?' এই আয়াতের শুরুতে 'আল্লাহর রং' বলা হয়েছে, যা এই দ্বীনকে আল্লাহ তাআলার দ্বীন হিসেবে সংজ্ঞায়িত ও প্রতিষ্ঠিত করে। এরপর একটি অসম্ভব প্রশ্ন করা হয়েছে, যা বিশ্বাস ও ঈমানের দিকে পরিচালিত করে: 'আর আল্লাহর চেয়ে উত্তম রং কার?' এই দ্বীনের চেয়ে উত্তম কোনো দ্বীন আছে কি? একত্ববাদ, ইবাদত, সহজতা ও নৈতিকতার দিক থেকে এর সমকক্ষ কোনো দ্বীন নেই। এই দ্বীন প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক, পারিবারিক ও পেশাগত সুখ অর্জিত হয়। এছাড়াও, এটি ব্যক্তির মধ্যে এমন গুণাবলি সৃষ্টি করে, যা শুধুমাত্র এই দ্বীনের মাধ্যমেই সম্ভব। যে ব্যক্তি গভীরভাবে চিন্তা করে, সে নিশ্চিত হবে যে, এটি আল্লাহ তাআলার দ্বীন, যা সত্যায়ন ও বিশ্বাস করা আবশ্যক, যাতে আখিরাতের সুখ অর্জন করা যায়, যা প্রতিটি মুমিনের কাম্য।

তারপর কুরআনের বর্ণনা একটি প্রশ্নের মাধ্যমে এসেছে: **'আর আল্লাহর চেয়ে উত্তম রং কার?'** এটি তাদেরকে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে বলে যে, এর চেয়ে উত্তম কোনো দ্বীন নেই। যদি তোমরা এমন দ্বীন দাবি করো, তবে তা উপস্থাপন করো এবং তুলনা করো, যাতে তোমরা প্রমাণ করতে পারো যে, এর চেয়ে উত্তম দ্বীন আছে। কিন্তু বাস্তবে এমন দ্বীন নেই, যা সত্য। সুতরাং, তোমাদের সামনে শুধুমাত্র একটি পথ রয়েছে, তা হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তার অনুসরণ করা।

এরপর এই মহান আয়াতের সমাপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, নবীজি (সা.) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনরা এই দ্বীনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করেন: **'আর আমরা তাঁরই ইবাদতকারী।'** এতে **'আল্লাহর চেয়ে উত্তম রং কার?'** এই বক্তব্যের ফলাফল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এই দ্বীনের চেয়ে উত্তম কোনো দ্বীন নেই। এটি থেকে

বোঝা যায় যে, আমরা এই দ্বীনের প্রতি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে আছি। আর তোমাদের বিষয়টি তোমাদের নিজেদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এই দ্বীন গ্রহণ করতে চায়, তার জন্য তা উন্মুক্ত। আর যে ব্যক্তি তা প্রত্যাখ্যান করে, তার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মদ *(সা.)* কে ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বলতে নির্দেশ দেন*:* ***'বলুন: তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের সাথে তর্ক করবে? অথচ তিনি আমাদের রব এবং তোমাদের রব। আমাদের কাজ আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আর আমরা তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ।'*** কুরআনের অনেক আয়াতের প্রেক্ষাপট পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, তা কাফিরদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করে, অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তির মাধ্যমে, যা কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখে না। এটি বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষণীয়, শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি ছাড়া, যার হৃদয়ে জিদ ও অহংকার রয়েছে।

এই মহান আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী *(সা.)* কে আহলে কিতাবকে বলতে নির্দেশ দেন*:* ***'তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের সাথে তর্ক করবে?'*** অর্থাৎ, তোমরা কি আল্লাহ তাআলার দ্বীন সম্পর্কে আমাদের সাথে তর্ক করবে, এই দাবিতে যে, তোমরা আমাদের চেয়ে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী? তারা এই দাবি করে যে, তারা আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়পাত্র। এছাড়াও, তারা তাদের পূর্বপুরুষ ও তাদের কিতাবের প্রাচীনতার দাবি করে। তোমরা কি আমাদের সাথে তর্ক করবে, অথচ আমাদের রব ও তোমাদের রব একই? প্রত্যেকে তার কাজের জন্য প্রতিদান পাবে। তাহলে দ্বীনের প্রাচীনতার কী প্রভাব রয়েছে? আমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। সুতরাং, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করা যাবে শুধুমাত্র তাঁর আনুগত্য ও তাঁর প্রতি ইখলাসের মাধ্যমেই। এটি আল্লাহ তাআলার প্রতি ইখলাসের গুরুত্ব প্রকাশ করে এবং ইবাদতকে শিরক ও রিয়া *(লোক দেখানো)* থেকে মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে। এটি আরও প্রমাণ করে যে, বাতিলের অনুসারীদের সাথে বিতর্ক করতে হবে উত্তম পদ্ধতিতে, সহিংসতা ও শক্তি

প্রয়োগ করে নয়। **'আমাদের কাজ আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য।'**

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন যে, নবীরা ইহুদি বা খ্রিস্টান ছিলেন: **'তোমরা কি বল যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধররা ইহুদি বা খ্রিস্টান ছিলেন?'** এই দাবি শুধুমাত্র জ্ঞানের ভিত্তিতেই করা যেতে পারে। আর এই জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছ থেকেই আসে: **'বলুন: তোমরা কি বেশি জান, নাকি আল্লাহ?'** এটি একটি প্রতিষ্ঠামূলক ও প্রত্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন। এই বক্তব্য তাদের দাবিকে দুটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ করে: ১. হয় তোমরা বলবে: আল্লাহ বেশি জানেন। তাহলে তোমরা নিজেরাই নিজেদের মিথ্যা প্রমাণ করেছ। সুতরাং, তোমাদের উচিত তা থেকে ফিরে আসা। ২. অথবা তোমরা বলবে: তোমরা আল্লাহ তাআলার চেয়ে বেশি জান। আর এটি অসম্ভব। সুতরাং, তোমাদের সামনে শুধুমাত্র একটি পথ রয়েছে, তা হলো আল্লাহ তাআলা যা বলেছেন, তার অনুসরণ করা। আল্লাহ তাআলা তাঁর খলীল ইবরাহীম (আ.)-কে ইহুদি বা খ্রিস্টান হওয়া থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন: **'ইবরাহীম ইহুদি বা খ্রিস্টান ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম।'** (সূরা আলে ইমরান) এ থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, দাঈদের জন্য আহ্বানকৃত ব্যক্তির অবস্থা জানা, তার সংশয় সম্পর্কে জানা এবং তার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর আরেকটি পর্যায় আসে, যা বাতিলের অনুসারীদের দাবি খণ্ডন ও তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি প্রকাশ করে: **'আর তার চেয়ে বেশি জালিম কে, যে আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্য গোপন করে?'** এটি একটি প্রতিষ্ঠামূলক ও প্রত্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন, যা তাদের নিজেদের সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করে। তারা তাদের কিতাবে যা জানে, তা গোপন করে। হাসান বসরী (রহ.) বলেছেন: তারা আল্লাহ তাআলার কিতাবে পড়ত যে, ইসলামই সঠিক দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। তারা আরও পড়ত যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধররা ইহুদি বা খ্রিস্টান ছিলেন না। তারা আল্লাহর কাছে এই সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং নিজেদের

উপর তা স্বীকার করেছিল, কিন্তু তারা আল্লাহর এই সাক্ষ্য গোপন করেছিল। এটি আহলে কিতাবের দ্বীন ও তাদের চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা দেয়, যাতে মুসলিমরা তাদের বিষয়ে সচেতন হতে পারে। এটি তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিও প্রকাশ করে। এছাড়াও, এটি আলেমদেরকে জিদকারী, বিরোধী ও সংশয়বাদীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি জানতে সাহায্য করে।

এরপর আল্লাহ তাআলার এই বর্ণনার পর আয়াতের সমাপ্তিতে সতর্কতা ও হুমকি দেওয়া হয়েছে: **'আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে অজ্ঞ নন।'** এটি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা প্রকাশ করে, তাঁর অসম্পূর্ণতা অস্বীকার করে এবং তাঁর সৃষ্টির জ্ঞান ও কাজ সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করে। এটি প্রমাণ করে যে, যিনি তাঁর সৃষ্টির কাজ সম্পর্কে অজ্ঞ নন, তাঁর সৃষ্টির উচিত তাঁকে ভয় করা, তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতার কারণে। আর তাঁর সৃষ্টির উচিত তাঁর কাছে আশা করা ও দোয়া করা, কারণ তিনি তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জানেন।এরপর আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী উম্মতদের সাথে সম্পর্কের সত্যতা নিশ্চিত করেন: **'সে সম্প্রদায় অতীত হয়ে গেছে। তাদের জন্য তারা যা অর্জন করেছে এবং তোমাদের জন্য তোমরা যা অর্জন করেছ। তোমরা তাদের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে না।'** এই আয়াতটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি নিশ্চিত করে যে, মানুষ শুধুমাত্র দাবি করে উপকৃত হবে না, বরং তার কাজই তার প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থান প্রমাণ করবে। সুতরাং, প্রত্যেকে তার অর্জিত ভালো ও মন্দ, আনুগত্য ও অবাধ্যতার জন্য প্রতিদান পাবে।

﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمۡ عَن قِبۡلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيۡهَاۚ قُل لِّلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ١٤٢ وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقِبۡلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيۡهَآ إِلَّا لِنَعۡلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِۚ وَإِن كَانَتۡ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٤٣﴾

অর্থ: **[মানুষের মধ্য হতে নির্বোধরা অচিরেই বলবে যে, এ যাবত তারা যে কেবলা অনুসরণ করে আসছিল তা থেকে কিসে তাদেরকে ফিরালো? বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথের হিদায়াত করেন।* আর এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর স্বাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন। আর আপনি এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করছিলেন সেটাকে আমি এ উদ্দেশ্যে কেবলায় পরিণত করেছিলাম যাতে প্রকাশ করে দিতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে পিছনে ফিরে যায়? আল্লাহ্ যাদেরকে হিদায়াত করেছেন তারা ছাড়া অন্যদের উপর এটা নিশ্চিত কঠিন। আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরম দয়ালু।]** (আয়াত নং ১৪২-১৪৩)

কুরআনের আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতা এখন কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কে মূর্খদের কথার দিকে এগিয়েছে। আল্লাহ তাআলা পূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরে তাঁর হুকুমে কিবলা মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত পবিত্র কাবা শরীফের দিকে পরিবর্তন করা হয়। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন: **"মানুষের মধ্য হতে নির্বোধরা অচিরেই বলবে যে, এ যাবত তারা যে কেবলা অনুসরণ করে আসছিল তা থেকে কিসে তাদেরকে ফিরালো?'** এখানে আল্লাহ তাআলা কিবলা পরিবর্তনের বিরোধিতা কারীদের 'মূর্খ' বলে আখ্যায়িত করেছেন, যা দুর্বল ও হালকা বুদ্ধির লোকদের জন্য ব্যবহৃত হয়। এরা ছিল মদিনার ইহুদি এবং অন্যান্য যারা এমন

কথা বলে। মূর্খরা হলো তারা যাদের বুদ্ধি দুর্বল ও অপরিপক্ক, যাদের চিন্তা ক্ষীণ এবং যারা প্রবৃত্তিকে যুক্তি ও প্রমাণের উপর প্রাধান্য দেয়। এরা সবাই যারা কিবলা পরিবর্তনের বিরোধিতা করে, তা তারা আহলে কিতাব হোক, আরব হোক, মুনাফিক হোক বা মুশরিক হোক। যদিও তাদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার জ্ঞান রয়েছে এবং তারা বস্তু ও সত্য উপলব্ধি করতে পারে, তবুও তাদের চিন্তাধারা প্রবৃত্তি, অহংকার বা জিদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে তাদের চিন্তাধারা এমন ব্যক্তির মতো যার বুদ্ধি অপরিপক্ক ও দুর্বল, তারা অপ্রাপ্তবয়স্কদের মতো আচরণ করে এবং তাদের চিন্তাধারা মূর্খদের অনুরূপ।

এটি প্রমাণ করে যে, কিছু লোক ঘটনাবলিকে কাজে লাগিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করতে চায়, তা জাতীয় পর্যায়ে হোক বা সামাজিক বিভিন্ন স্তরে। তারা মানুষের মধ্যে এমন সন্দেহ সৃষ্টি করে যেমন আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন: **'কোন জিনিস তাদেরকে তাদের পূর্ববর্তী কিবলা থেকে ফিরিয়ে নিল?'** এই প্রশ্নের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, বিশ্বাসকে নড়বড়ে করে দেয় এবং ফিতনা ছড়ায়। এটি এমন প্রশ্নের বিপদ প্রকাশ করে যা ফিতনা ও অশান্তি বহন করে। একটি প্রশ্নের মাধ্যমেও ক্ষতি করা সম্ভব এবং প্রশ্নটি হতে পারে অশুভ ও ফিতনাপূর্ণ। তাই প্রশ্নের পরিণতি ও তা থেকে সৃষ্ট ভালো-মন্দ সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি। কিন্তু আসমান ও জমিনের রব তাদেরকে একটি দৃঢ় জবাব দিয়েছেন। তিনি তাঁর নবী (সা.)-কে নির্দেশ দেন: **'বলুন: পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই।'** বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, যিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক, তিনি ইচ্ছামতো যে কোনো দিক পরিবর্তন করতে পারেন। তাহলে সমস্যা কোথায়? তিনি তাঁর রাজত্ব ও বান্দাদের সম্পর্কে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

এটি সাধারণভাবে, সন্দেহ ও ফিতনা সৃষ্টিকারী প্রশ্ন উত্থাপনের ভয়াবহতা প্রকাশ করে, বিশেষত বিভিন্ন ঘটনার সময়। যখন মৌলিক বিষয়গুলোতে সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়, তখন স্বাভাবিক বিষয়কে তার প্রকৃত অবস্থা থেকে বিচ্যুত করে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে তা অগ্রহণযোগ্য ও অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। এতে মূর্খরা বিভ্রান্ত হয় এবং শত্রুরা এটাকে কাজে লাগিয়ে বিবাদ সৃষ্টি করে। এখানে উপকারিতাগুলোর মধ্যে

রয়েছে: ১. আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে বৈজ্ঞানিক উত্তরদানের পদ্ধতি শিখিয়েছেন যা: মূর্খকে নিয়ন্ত্রণ করে, অজ্ঞকে সঠিক পথ দেখায় ও মুমিনের ঈমান বৃদ্ধি করে। ২. প্রজ্ঞা ও ভারসাম্যপূর্ণ জবাবের মাধ্যমে ফিতনা সৃষ্টিকারীদের জবাব দেওয়ার গুরুত্ব, যাতে মানুষ সঠিক পথে ফিরে আসে এবং ফিতনা সৃষ্টিকারী মূর্খ নিবৃত্ত হয়। ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেছেন: "এতে প্রমাণ রয়েছে যে আল্লাহর বিধানে নাসেখ (রদকারী) ও মানসুখ (রদকৃত) রয়েছে। উম্মত এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছে (নগণ্য কিছু লোক ব্যতীত)। যার কাছে নাসেখ পৌঁছেনি সে প্রথম বিধান অনুযায়ী আমল করবে। এতে দলিল রয়েছে যে, কুরআন ধীরে ধীরে নাযিল হয়েছে।"[১৭] এতে প্রমাণ রয়েছে যে কুরআন উম্মতের বিষয়াবলি সমাধান করেছে, কল্যাণ ও উপকার আনার জন্য: **'নিশ্চয় এই কুরআন সর্বোত্তম পথের দিকে পরিচালিত করে'** (সূরা বনি ইসরাঈল)

এরপর মহান আল্লাহ তাআলা হিদায়াত ও সঠিক পথপ্রদর্শনের বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন: **'তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন'**। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহই এই উম্মতকে এই কিবলার দিকে হিদায়াত করেছেন। এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর শরীয়তই হলো সত্য ও সোজা পথ, যাতে কোনো বক্রতা নেই। হিদায়াত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে, তাই মানুষের উচিত দোয়া, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তা প্রার্থনা করা।

এরপর আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনের কিছু বিশেষ গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি এই উম্মতকে অন্যান্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন: **'এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষ্য দাও এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষ্য দেন'**। এই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীনের মাধ্যমে এই উম্মত 'মধ্যপন্থী' হিসেবে বিশেষিত হয়েছে। এটি এই উম্মতের প্রশংসা ও মর্যাদা প্রকাশ করে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা এই বিশেষণে ভূষিত করেছেন-ন্যায়পরায়ণ, উত্তম ও সর্বোত্তম। এই উম্মতের 'মধ্যপন্থী' বিশেষণটি প্রশংসাসূচক। যেমন: কুরাইশ গোত্র ছিল

---

(১৭) আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন: (২/১০২)।

আরবদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বংশে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যপন্থী ছিলেন, কাবা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: **'সর্বোত্তম বিষয় হলো মধ্যপন্থা অবলম্বন'**।

এ থেকে শিক্ষা লাভ করা যায় যে, মুমিনের কর্তব্য তার স্রষ্টার শুকরিয়া আদায় করা, যিনি তাকে এই গুণে ভূষিত উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই শরীয়তের প্রতি অটল থাকা আবশ্যক, যাতে এর মধ্যপন্থার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত থাকে। কারণ এটি সর্বাঙ্গীণভাবে পরিপূর্ণ, যা: কষ্টদায়ক নয়, স্বভাবধর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সহজ-সরল নীতি ও লক্ষ্যে সমৃদ্ধ, সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধ করে, ধাপে ধাপে পরিবর্তনের নীতি অনুসরণ করে, ন্যায়বিচারকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে, যুলুমকে নিষিদ্ধ করে এবং কোমলতার নির্দেশ দেয়।

এই বিশেষ মর্যাদার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ সমগ্র মানবজাতির উপর সাক্ষী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একদা এক জানাযা অতিক্রম করলে সাহাবায়ে কেরাম তার প্রশংসা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: 'তা আবশ্যক হয়ে গেল'। আরেক জানাযা অতিক্রম করলে কেউ বলল: 'এ কত নিকৃষ্ট ব্যক্তি!' রাসূল (সা.) বললেন: 'এটিও আবশ্যক হয়ে গেল'। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন: "**কিয়ামতের দিন একজন নবী আসবেন তার সাথে একজন অনুসারী নিয়ে, আরেক নবী আসবেন দুইজন নিয়ে, কেউ কেউ আসবেন আরো বেশি সংখ্যক নিয়ে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে: 'এই নবী কি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছে?' তারা বলবে: 'না'। তখন নবীকে জিজ্ঞাসা করা হবে: 'তুমি কি তাদের কাছে পৌঁছিয়েছ?' তিনি বলবেন: 'হ্যাঁ'। বলা হবে: 'কে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে?' তিনি বলবেন: 'মুহাম্মাদ ও তার উম্মত'। তখন মুহাম্মাদের উম্মত সাক্ষ্য দেবে যে রাসূলগণ তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। জিজ্ঞাসা করা হবে: 'তোমরা কীভাবে জানলে?' তারা বলবে: 'আমাদের নবী আমাদের জানিয়েছেন যে রাসূলগণ তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন, আর আমরা তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি'। এটাই আল্লাহর বাণী: 'যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষ্য দাও'।**"

আর রাসূলুল্লাহ (সা.) তোমাদের আমলের উপর সাক্ষী হবেন। এটি সাক্ষ্যদানের গুরুত্ব, সৎগুণাবলী অর্জনের তাৎপর্য ও দ্বীন প্রচারের মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। এখানে আরেকটি উপকারিতা হলো: সাক্ষ্যদাতা ব্যক্তি প্রশংসনীয়, আর যার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় সে ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত। তাহলে কত মহান সেই মর্যাদা যখন আল্লাহ নিজেই এই উম্মতকে অন্যান্য জাতির উপর সাক্ষী নিযুক্ত করেছেন, তাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাক্ষ্যের মাধ্যমে! এটি একটি অতীব মহান ও সম্মানজনক বৈশিষ্ট্য।

এরপর আল্লাহ তাআলা কিবলা পরিবর্তনের হিকমত বর্ণনা করেছেন: **'আর আপনি এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করছিলেন সেটাকে আমি এ উদ্দেশ্যে কেবলায় পরিণত করেছিলাম যাতে প্রকাশ করে দিতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে পিছনে ফিরে যায়? আল্লাহ্ যাদেরকে হিদায়াত করেছেন তারা ছাড়া অন্যদের উপর এটা নিশ্চিত কঠিন।'** এখানে আল্লাহ তাআলা কিবলা পরিবর্তনের মাধ্যমে পরীক্ষা ও বিশুদ্ধিকরণের কথা বর্ণনা করেছেন, যাতে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য করে ও মেনে চলে আর যারা পিছনে সরে যায় ও ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় তাদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়। এই কিবলা পরিবর্তন একটি মহান পরীক্ষা ছিল, তবে একদল লোকের জন্য নয়- যাদের আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন, যারা রাসূল (সা.)-এর সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন এবং যাদের হৃদয় তাঁর সব আদেশ-নিষেধ ও রদবদল সম্পর্কে প্রশান্ত ছিল।

এটি প্রমাণ করে যে, পরীক্ষা হলো ঈমানের মাপকাঠি- কে অবিচল থাকে আর কে পিছনে সরে যায়। সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরীক্ষিত হয়েছেন এবং তাদের পরবর্তীরাও পরীক্ষিত হবেন, যেমন এই মোবারক সূরায় আল্লাহ বলেছেন: **'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করব'** (সূরা আল-বাকারা)। এভাবে মুমিনের আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা ও ফকীরি প্রকাশ পায়, যেমন কিবলা সংক্রান্ত আয়াতে বলা হয়েছে: **'তাদের জন্য নয় যাদের**

আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন'। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই বলে দোয়া করতেন: **'হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর স্থির রাখ'**। এখানে আরেকটি শিক্ষণীয় বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলার জন্য এই লোকদের চেনা কোনো কঠিন বিষয় নয়, কারণ তিনি তাঁর বান্দাদের হৃদয় ও তাদের ভবিষ্যৎ কাজ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। কিন্তু এটা প্রমাণ প্রতিষ্ঠার জন্য যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিজগৎকে তাঁর নির্ধারিত বিধান ও সুবিন্যস্ত ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী পরিচালনা করেন।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কিবলা পরিবর্তন নবী (সা.)-এর নবুয়তের স্পষ্ট প্রমাণ। যদি তিনি নবী না হতেন, তবে তিনি কিবলা পরিবর্তন থেকে বিরত থাকতেন যাতে কোনো বিরোধিতার সম্মুখীন না হতে হয় এবং এর সম্ভাব্য নেতিবাচক পরিণতি এড়ানো যায়। কিন্তু তিনি (সা.) ছিলেন আল্লাহর অনুগত বান্দা, যিনি আল্লাহর সব আদেশ বাস্তবায়ন করতেন- এমনকি যদি তা কিছু মানুষের জন্য কঠিন হতো। এখানে আরেকটি শিক্ষণীয় বিষয় হলো, শরয়ী বিধানের সামনে যুক্তি-অযুক্তির কোনো স্থান নেই। আল্লাহর বাণী **'যদিও এটি একটি বড় পরীক্ষা'** ইঙ্গিত করে যে, এটি সেইসব মানুষের জন্য কঠিন ছিল যারা অসম্পূর্ণ যুক্তির ভিত্তিতে পরিপূর্ণ শরয়ী বিধানের সাথে আচরণ করতে চায়। কিন্তু যারা নিজের প্রবৃত্তি ও অসম্পূর্ণ যুক্তির উপর শরয়ী দলিলকে প্রাধান্য দেয়, তাদের জন্য এটি কঠিন ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই বিধানের ব্যতিক্রম করেছেন: **'তাদের জন্য নয় যাদের আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন'**। তারা আনুগত্য করেছে এবং তাদের মনে কোনো সংকীর্ণতা অনুভব করেনি, কারণ তারা জানত এটি আল্লাহর বিধান এবং কেউই আল্লাহ তাআলার বিরোধিতা করতে পারে না। যেমন সূরা আল-আম্বিয়ায় আল্লাহ বলেছেন: **'তিনি যা করেন, সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন না, বরং তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করা হবে'**। তাই আল্লাহর কোনো কাজ, সিদ্ধান্ত বা বিধানের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা উচিত নয়- কেন তিনি এটা করলেন, কেন এটাকে অগ্রাধিকার দিলেন, কেন এটা ঘটল, কেন এটা দিলেন বা কেন এটাকে মর্যাদা দিলেন। এসব প্রশ্ন অশুভ ও আত্মসমর্পণের পরিপন্থী। কখনোই যুক্তিকে নবীর বাণীর উপর প্রাধান্য দেয়া

যাবে না। আল্লাহ তাআলার আদেশ, কাজ, সিদ্ধান্ত ও ভাগ্যের ব্যাপারে কোনো আপত্তি উত্থাপন করা যায় না।

তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি নিজের ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ করে বলেছেন: **"আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন না"**। অর্থাৎ, যারা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করত এবং কিবলা পরিবর্তনের আগেই ইন্তেকাল করেছে, আল্লাহ তাদের সাওয়াব নষ্ট করবেন না। সাহাবী বারা (রা.) বর্ণনা করেন, কিছু লোক বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে নামাজ পড়া অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। মানুষ প্রশ্ন করল, "তাদের অবস্থা কী হবে?" তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেন: **"আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন না"**। সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর এই প্রশ্নটি তাদের গভীর আন্তরিকতা, দ্বীনের ব্যাপারে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং পূর্বে ইন্তেকালকারী মুসলিম ভাইদের প্রতি তাদের অগাধ ভালোবাসার প্রমাণ দেয়। এটি পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা যে, কোনো মুসলিম তার ভাইদের জন্য দোয়া ও রহমত কামনা করবে—এমনকি যদি তাদের সাথে সরাসরি দেখা না-ও হয়। আল্লাহ তাআলা সূরা আল-হাশরে আমাদের এ শিক্ষাই দিয়েছেন: **"আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের হৃদয়ে ঈমানদারদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি অতি স্নেহশীল, দয়াময়।'"** (সূরা আল-হাশর)

তারপর আল্লাহ তাআলা এই পবিত্র আয়াতটি তাঁর অসীম রহমত ও মমতার দিকটি বর্ণনা দিয়ে সমাপ্ত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: **"নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষদের প্রতি অতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু"**। এটি আল্লাহর একটি মহান গুণ যে, তিনি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ও দয়াবান। তাঁর রহমত ও মমতারই প্রকাশ হলো এই যে, তিনি মানুষের হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন, পৃথিবীকে তাদের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং সর্বপ্রকার কল্যাণময় রিজিক দান করেছেন। তিনি মানুষের গুনাহের শাস্তি ত্বরান্বিত করেন না, যাতে তারা ফিরে আসে,

সঠিক পথ পায় এবং তাওবা করে। যদি তিনি এমন না করতেন, তাহলে গুনাহ ও নাফরমানির কারণে পৃথিবীতে কেউ অবশিষ্ট থাকত না। মানুষ তাঁর যিকির ও শুকরিয়া কমই আদায় করে, তবুও তিনি ধৈর্য ধারণ করেন- এটি সমস্ত মানুষের প্রতি তাঁর সাধারণ রহমত। অতএব, মুমিনদের প্রতি তাঁর রহমত কত বিশাল হতে পারে! নিশ্চয়ই তিনি পরম দয়ালু, পরম দয়ার্দ্র। তবে কিভাবে তাঁর অবাধ্যতা করা হয়, অথচ তিনি মানুষের প্রতি পরম দয়ালু ও দয়ার্দ্র? কিভাবে তাঁর সঙ্গে শরিক করা হয়, অথচ তিনিই পরম দয়ালু ও দয়ার্দ্র? কিভাবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় না, অথচ তিনি পরম দয়ালু ও দয়ার্দ্র? কিভাবে তিনি যিকির ও তাসবীহ পাঠ করা হয় না, অথচ তিনি পরম দয়ালু ও দয়ার্দ্র? কিভাবে বান্দা তাঁর সামনে বিনীত ও বিনয়ী হয় না, অথচ তিনি পরম দয়ালু ও দয়ার্দ্র? কিভাবে তাঁকে ডাকা হয় না, অথচ তিনি পরম দয়ালু ও দয়ার্দ্র? কিভাবে তাঁর কাছে আশা করা হয় না, অথচ তিনি পরম দয়ালু ও দয়ার্দ্র? কিভাবে তাঁর কাছ থেকে কিছু লাভের আশা করা হয় না, অথচ তিনি পরম দয়ালু ও দয়ার্দ্র? কিভাবে তাঁর সামনে লজ্জাবোধ করা হয় না, অথচ তিনি পরম দয়ালু ও দয়ার্দ্র? যদি কোনো বান্দা অন্য কোনো বান্দার প্রতি দয়া করে, তবে সে তার সামনে লজ্জিত হয়। তাহলে সেই মহান সত্তার সামনে কেমন হওয়া উচিত, যার দয়া ও করুণা-ই মানুষের পারস্পরিক দয়ার মূল উৎস! এগুলো এমন গুণাবলী, যা বান্দাকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে বাধ্য করে। **"নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষদের প্রতি অতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।"** এ প্রসঙ্গে সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে এক নারীকে দেখলেন, যার স্তন থেকে দুধ ঝরছিল। সে বন্দীশিবিরে একটি শিশু পেয়ে তাকে কোলে নিয়ে দুধ পান করাচ্ছিল। নবী (সা.) সাহাবাদের জিজ্ঞাসা করলেন, **"তোমরা কি মনে কর এই নারী তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারবে?"** আমরা বললাম, "না, যখন সে তা এড়ানোর ক্ষমতা রাখে।" তখন রাসূল (সা.) বললেন, **"আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চেয়েও বেশি দয়ালু।"** (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

﴿قَدۡ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجۡهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبۡلَةٗ تَرۡضَىٰهَاۚ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ لَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعۡمَلُونَ ١٤٤ وَلَئِنۡ أَتَيۡتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٖ مَّا تَبِعُواْ قِبۡلَتَكَۚ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٖ قِبۡلَتَهُمۡۚ وَمَا بَعۡضُهُم بِتَابِعٖ قِبۡلَةَ بَعۡضٖۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ إِنَّكَ إِذٗا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٤٥﴾

অর্থ: **[অবশ্যই আমি আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানো লক্ষ্য করি। সুতরাং অবশ্যই আমি আপনাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব যা আপনি পছন্দ করেন। অতএব আপনি মসজিদুল হারামের দিকে চেহারা ফিরান। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের চেহারাসমূহকে এর দিকে ফিরাও এবং নিশ্চয় যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই জানে যে, এটা তাদের রব এর পক্ষ হতে হক। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ গাফেল নন। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে আপনি যদি তাদের কাছে সমস্ত দলীল নিয়ে আসেন, তবু তারা আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না; এবং আপনিও তাদের কিবলার অনুসারী নন। আর তারাও পরস্পরের কিবলার অনুসারী নয়। আপনার নিকট সত্য-জ্ঞান আসার পরও যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন, তাহলে নিশ্চয় আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।]** *(আয়াত নং ১৪৪-১৪৫)*

তারপর আল্লাহ বলেন: **"অবশ্যই আমি আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানো লক্ষ্য করি। সুতরাং অবশ্যই আমি আপনাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব যা আপনি পছন্দ করেন। অতএব আপনি মসজিদুল হারামের দিকে চেহারা ফিরান। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের চেহারাসমূহকে এর দিকে ফিরাও।"** রাসুলুল্লাহ সাঃ বারবার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশনার অপেক্ষায়। কারণ, তিনি প্রায় ষোলো বা সতেরো মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেছিলেন। কিন্তু তিনি এমন একটি কিবলার

আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, যা তাঁকে ইহুদিদের থেকে স্বতন্ত্র করবে এবং মক্কার দিকে নির্দিষ্ট করবে, যা ইবরাহিম আঃ-এর কিবলা ছিল। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, ইসলামের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে মুসলিমরা তাদের দ্বীনকে কাফেরদের কোনো ধর্মীয় ব্যাপার, এমনকি এমন রীতি-নীতি ও সংস্কৃতির অনুসরণ থেকে মুক্ত রাখে, যা মুসলমানদের জন্য কোনো উপকার বয়ে আনে না বা তাদের শত্রুদের শক্তি ও মনোবল বৃদ্ধির কারণ হয়। আল্লাহ তাঁর এই মহাসম্মানিত নবীর সাঃ প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন, তাঁর অবস্থা জানতেন, তাঁর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়াকে উপলব্ধি করতেন। এ কারণে তিনি বলেন: **"অবশ্যই আমি আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানো লক্ষ্য করি।"** আল্লাহ সকল সৃষ্টির অবস্থাই দেখেন, তবে এখানে নবী সাঃ-এর সম্মান ও তাঁর প্রার্থনার প্রতি সাড়া দেওয়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ বলেন: **"অবশ্যই আমি তোমাকে এমন একটি কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব, যা তোমার পছন্দনীয়।"** এটি এক মহিমান্বিত সম্মান, যা রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর মর্যাদাকে মুসলমানদের অন্তরে আরও সুদৃঢ় করেছে। এই কেবলার স্বতন্ত্রতা মুসলমানদের জন্য এক বিশেষ সম্মান এবং ইসলামের জন্য এক বৈশিষ্ট্য। এটি প্রমাণ করে যে, এই পবিত্র গৃহ—কাবা, মুসলমানদের কিবলা হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে এবং একমাত্র এই উম্মতই তার অধিকারী। **"সুতরাং তুমি তোমার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফিরিয়ে নাও। আর তোমরা যেখানে থাকো, তোমরা তোমাদের মুখ তার দিকেই ফিরিয়ে নাও।"** অর্থাৎ মুসলমান পৃথিবীর যে স্থানেই থাকুক, তাদের নামাজের সময় মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। আর যারা মসজিদুল হারামের ভেতরে থাকবে, তারা কাবার দিকে মুখ করবে। এটি আল্লাহর এক মহান ও মূল্যবান অনুগ্রহ। আর যেসব ক্ষেত্রে কিবলার দিকে মুখ করা সম্ভব হয় না, যেমন—মুসাফিরদের জন্য নফল নামাজ, অজ্ঞতা, কিংবা এমন পরিস্থিতি যেখানে কিবলা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়—এসব বিষয়ে ফিকহ ও তাফসিরের গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, যা সেখানে দেখা যেতে পারে।

তারপর আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদের অবস্থার বর্ণনা করেন কিবলার পরিবর্তনের প্রসঙ্গে: **"আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তারা অবশ্যই জানে যে এটি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য।"** এটি আল্লাহ তাআলার এক সুস্পষ্ট ঘোষণা, যিনি তাদের গোপন জ্ঞান সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁরা ভালোভাবেই জানে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যিই আল্লাহ তাআলার নবী ও রাসুল। ফলে তারা এ-ও জানে যে, তিনি যা কিছু আদেশ করেন বা পরিবর্তন করেন, তা আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই করেন। ইবন কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন: "যেসব ইহুদিরা কাবার দিকে মুসলমানদের কিবলা পরিবর্তন করাকে অস্বীকার করেছিল এবং বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াকে নিন্দা করেছিল, তারা জানত যে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাঁর রাসুলকে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছেন। কারণ, তাদের কিতাবসমূহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলি ও পরিচিতি সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে।

তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁর মহান সত্তার একটি বাস্তবতা স্পষ্ট করেছেন, যা মুমিনদের আকীদার এক মৌলিক স্তম্ভ। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কখনোই গাফিল নন।"** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তারা যা কিছু করছে, তা তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নয়। ফলে, তারা যে অন্যায় ও অপরাধ করছে এবং যে অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যে লিপ্ত রয়েছে, তার জন্য তিনি অবশ্যই তাদের প্রতিফল দেবেন। এখানে গাফিল থাকার অস্বীকৃতি দ্বারা বিপরীত বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা নিজ সত্তা থেকে মানুষের মতো গাফিলতি ও বিস্মৃতির বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করেছেন, যাতে কোনো অসম্পূর্ণতার ধারণা না থাকে। বরং, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রতিটি বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞানের অধিকারী এবং সমস্ত কিছুকে পরিপূর্ণভাবে পরিবেষ্টনকারী। যেমন আল্লাহ তাআলা সুরা ইউনুস-এ বলেন: **"তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে অণু পরিমাণ কিছুই অদৃশ্য নয়—না পৃথিবীতে, না আকাশে; আর তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছুই নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।"**

তারপর আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদের গভীরভাবে প্রোথিত অবাধ্যতা ও বিরোধিতার বিষয়টি স্পষ্ট করেন: **"আর যদি তুমি আহলে কিতাবদের কাছে প্রত্যেকটি নিদর্শনও উপস্থিত করো, তবুও তারা কখনোই তোমার কিবলা অনুসরণ করবে না।"** অর্থাৎ, তুমি যদি তাদের সামনে সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থিত করো, তবুও তারা তোমার প্রতি ঈমান আনবে না। মদীনা ও নজরানে আহলে কিতাবদের কয়েকটি গোত্র বসবাস করত, এবং কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণী তাদের সম্পর্কে এক অলৌকিক সত্যের প্রকাশ করে। তারা বাস্তবেই কুরআনে বর্ণিত এই সত্যকে প্রতিফলিত করেছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন: **"আর তুমি তাদের কিবলা অনুসরণকারী নও।"** এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কিবলা অনুসরণ করবেন না, এবং তারাও তার কিবলা অনুসরণ করবে না। সুতরাং তাদের সাথে আপস বা সমঝোতার কোনো সুযোগ নেই। এমনকি ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও পরস্পরের কিবলা অনুসরণ করে না। **"তাদের কেউই অপরের কিবলা অনুসরণ করে না।"** ইহুদিরা তাদের কিবলা হিসেবে বায়তুল মুকাদ্দাসকে গ্রহণ করেছে, আর খ্রিস্টানরা পূর্ব দিকে মুখ করে উপাসনা করে, যা তাদের নবী ঈসা আলাইহিস সালামের কিবলার বিপরীত। কারণ, ঈসা আলাইহিস সালামের কিবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে। যখন তারা নিজেদের মধ্যেই কিবলার ব্যাপারে একমত নয়, তখন তারা কি করে এক আরব নবীর কিবলা মেনে নেবে!

তারপর আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেন যে, আহলে কিতাবরা কেবল নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর কেউ যদি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, তবে সে নিজের উপরই অত্যাচার করে। **"আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো, এর পরেও যে তোমার কাছে জ্ঞান এসে গেছে, তাহলে তুমি অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"** এতে সতর্ক করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যে সত্য স্পষ্ট করেছেন, তা থেকে বিচ্যুত হওয়া সম্পূর্ণ অন্যায়। যে তা লঙ্ঘন করবে, সে নির্দ্বিধায় জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এখানে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা সম্পর্কে কঠোর সতর্কতা রয়েছে, বিশেষত যখন এই সতর্কবাণী সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে এসেছে।

যদিও তিনি কখনোই এমন কিছু করবেন না, যা তাকে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করবে; বরং এটি তার উম্মতের জন্য এক গুরুতর সতর্কতা। এ সতর্কবাণী এসেছে এই বাক্যের পর: **"এর পরেও যে তোমার কাছে জ্ঞান এসে গেছে।"** এটি নির্দেশ করে যে, নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কতা জ্ঞানের পরে আসে। এতে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম একটি জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সত্য ধর্ম। কারণ, এতে রয়েছে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, ইবাদত, ঈমান, নৈতিকতা, সমস্ত রোগব্যাধির চিকিৎসা, আত্মার পরিশুদ্ধি, শক্তিশালী দুর্গ এবং দৃঢ় বন্ধন। এর মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্খা প্রকাশ করেন, অতীত জাতিসমূহের রহস্য উদ্ঘাটন করেন এবং সত্য ও কল্যাণের সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ করেন। এর গুণাবলি ও নেয়ামত এত ব্যাপক যে, মানব চিন্তা তা পরিমাপ করতে অক্ষম, আর কলম তা লিপিবদ্ধ করতে অপারগ। সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি পরম বরকতময় ও মহান।

আল্লাহ তাআলার বাণী **"তুমি তখন জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে"**—এর মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, আহলে কিতাবরা যে পথ অবলম্বন করেছে, তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও চরম অন্যায়। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, তারা রয়েছে সঠিক হিদায়াত, সত্য, জ্ঞান, সুস্পষ্ট দিশা এবং এক মহৎ দ্বীনের ওপর। আর আহলে কিতাবরা রয়েছে বিভ্রান্তি ও চরম অন্যায়ের মধ্যে। কেউ যদি তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে সে তাদেরই অংশ হয়ে যাবে। এতে প্রতিটি মুসলমানের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক নির্দেশনা রয়েছে- ইহুদিবাদ, খ্রিস্টবাদ, কিংবা ইসলামের বাইরে যে কোনো ধর্ম থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে। কারণ, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তা ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করবেন না, বিশেষত যখন তিনি বলেছেন: "এর পরেও যে তোমার কাছে জ্ঞান এসে গেছে।"

﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمۡۖ وَإِنَّ فَرِيقٗا مِّنۡهُمۡ لَيَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٤٦ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ ١٤٧ وَلِكُلّٖ وِجۡهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَاۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٤٨﴾

অর্থ: ***[আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ জানে যেরূপ তারা নিজেদের সন্তানদেরকে চিনে। আর নিশ্চয় তাদের একদল জেনে-বুঝে সত্য গোপন করে থাকে। সত্য আপনার রব-এর কাছ থেকে পাঠানো। কাজেই আপনি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আর প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে, যে দিকে সে চেহারা ফিরায়। অতএব তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।]*** *(আয়াত নং ১৪৬-১৪৮)*

এরপর আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু সত্য প্রকাশ করেছেন যা কেবল ওহীর মাধ্যমেই জানা সম্ভব: ***"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে (নবীকে) চিনে যেমন তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে। আর নিশ্চয় তাদের একটি দল সত্য গোপন করে, অথচ তারা জানে।"*** আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টানরা) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অবগত ছিল, কারণ তাদের কাছে তাঁর সঠিক বিবরণ সংরক্ষিত ছিল, যা তাদের অজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে দূর করে দিয়েছিল। এমনকি তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিচয় তাদের নিজ সন্তানদের চেনার মতোই নিখুঁত ছিল। এটি কুরআনের সেই সূক্ষ্ম বর্ণনা যা কেবল ওহীর মাধ্যমেই জানা সম্ভব—কোনো মানুষের পক্ষে নিজ থেকে এ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। অতএব, কিবলা পরিবর্তনের সত্যতা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল পরিপূর্ণ ওহী-ভিত্তিক, যা কোনোভাবেই খণ্ডনযোগ্য নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল আল্লাহর ওহী অনুযায়ীই কথা বলেন। তবে তাদের একটি দল এই সুস্পষ্ট সত্য জেনেও তা গোপন করে। এটি প্রমাণ করে যে, বিদ্বেষ ও অহংকার মানুষকে সত্য প্রত্যাখ্যানে বাধ্য করতে পারে, এমনকি সে সত্যকে গোপন করতেও পারে যা সে নিশ্চিতভাবে জানে।

এ থেকে মুসলিমদের জন্য শিক্ষা হলো এই মারাত্মক ব্যাধির ভয়াবহতা উপলব্ধি করা। যদি ধর্মীয় বিষয়ে এর প্রভাব এতটা নিকৃষ্ট হয়, তবে সামাজিক কর্মকান্ড ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে এর প্রভাব কতটা ভয়ংকর হতে পারে! মানুষ কখনো স্বার্থ বা অহংকারের কারণে সত্য চেপে যায়, অথবা এমন পরিস্থিতিতে পড়তে ভয় পায় যা তার কাম্য নয়। সুতরাং, এই ভয়াবহ ব্যাধি থেকে সতর্ক থাকতে দুটি বিষয় অপরিহার্য: **১. আল্লাহর কাছে এই ব্যাধি থেকে আশ্রয় চাওয়া, ২. নফসকে বিনয় ও সত্য মেনে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা,** যাতে তা সত্যের কাছে নতি স্বীকার করে এবং অবাধ্যতায় লিপ্ত না হয়। এই বিদ্বেষ যা অহংকার ও হিংসার সমন্বয়ে গঠিত- আহলে কিতাবদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সত্য গোপন করতে বাধ্য করেছিল। এই সত্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত হোক অথবা বাইতুল্লাহ (কাবা)-র দিকে ফিরে সালাত আদায়ের নির্দেশ হোক- উভয়ই ওহী-নির্ভর, যা তারা জেনেও অস্বীকার করেছিল।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন, এর বিপরীত থেকে নিষেধ করার মাধ্যমে: **"অতএব, আপনি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।"** অর্থাৎ, দৃঢ় বিশ্বাসে অটল থাকুন এবং উম্মত যেন নিশ্চিত জ্ঞানের সাথে বুঝে নেয় যে তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। শয়তানী সংশয়—যা মানব ও জিন শত্রুদের প্ররোচনায় মুসলিমের হৃদয়ে ঢুকে পড়তে পারে—তা দূর করতে হবে। কেননা সত্যের বিপরীত থেকে নিষেধ করা হলো সত্যের উপর অবিচল থাকার আদেশ। এটি থেকে বোঝা যায় যে, বিপদ থেকে সতর্ক হওয়া এবং দৃঢ়তা অর্জন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত এমন পরিস্থিতিতে যেখানে আহলে কিতাবদের সাথে মেলামেশা ও লেনদেনের ঝুঁকি রয়েছে। মদিনায় আহলে কিতাবরা মানুষের সাথে তাদের দৈনন্দিন জীবনে, যেমন বাজারে, মিশে থাকত।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আহলে কিতাবদের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন এবং মুসলিমদেরকে কী নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত তা বর্ণনা করেছেন: **" আর প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে, যে দিকে সে চেহারা ফিরায়। সুতরাং তোমরা সৎকর্মে**

প্রতিযোগিতা করো।" এখানে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিমদের উচিত নয় আহলে কিতাবদের নিয়ে অযথা বিতর্কে সময় নষ্ট করা, কারণ তারা জেনেশুনেই সত্যের বিরোধিতা করে। বরং মুসলিমদের কর্তব্য হলো নেক আমলের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং সৎকাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করা। **"সৎকাজ"** (الخيرات) শব্দটি বহুবচনে ব্যবহার করে ইসলামের বহুমুখী নেক আমলের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে— যার মূল্য ও মর্যাদা যারা বুঝে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করে। দ্বীনী কাজ, কথা ও বিশ্বাসসমূহকে **"সৎকাজ"** বলে আখ্যায়িত করার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, এই দ্বীনের সমস্ত বিধানই কল্যাণকর। মুসলিমের দায়িত্ব হলো এগুলো অর্জনে সচেষ্ট হওয়া।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর মহান আয়াতের সমাপ্তিতে বলেন: **"তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একত্র করবেন"।** এখানে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেদিন তিনি মুসলিম ও কাফির সবাইকে একত্র করবেন। এই বাণী একদিকে যেমন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সতর্কবাণী, অন্যদিকে মুমিনদের জন্য পরকালীন প্রস্তুতির প্রেরণা। এর কতিপয় ফায়েদা হলো: **১. "আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একত্র করবেন"** - এতে আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার প্রমাণ রয়েছে। এটি মানুষের পক্ষে এই সমাবেশ এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। ২. এ আয়াতে মৃত্যুপরবর্তী পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকেই তার রবের সামনে হাজির হবে। ৩. এতে একইসাথে রয়েছে: গুনাহ থেকে সতর্ক করা, ইবাদত ও সৎকর্মে উৎসাহিত করা। ৪. আয়াতের শেষাংশ **"নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান"** - এতে পুনরুত্থান, হিসাব ও প্রতিদান দানের বিষয়ে আল্লাহর সক্ষমতার পূর্ণ নিশ্চয়তা ব্যক্ত হয়েছে।

﴿وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۖ وَإِنَّهُۥ لَلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ١٤٩ وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيۡكُمۡ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِي وَلِأُتِمَّ نِعۡمَتِي عَلَيۡكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٠﴾

অর্থ: **[আর যেখান থেকেই আপনি বের হন না কেন মসজিদুল হারামের দিকে চেহারা ফিরান। নিশ্চয় এটা আপনার রব-এর কাছ থেকে পাঠানো সত্য। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল নন। আর আপনি যেখান থেকেই বের হন মসজিদুল হারামের দিকে চেহারা ফিরান এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন এর দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও, যাতে তাদের মধ্যে যালিম ছাড়া অন্যদের তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের কিছু না থাকে। কাজেই তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় কর। আর যাতে আমি তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করি এবং যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর।]** (আয়াত নং ১৪৯-১৫০)।

আল্লাহ তাআলা কিবলা সম্পর্কিত আলোচনা অব্যাহত রেখে বলেন: **"আর তুমি যেখান থেকেই বের হও (নামাজের জন্য), সেখান থেকেই তোমার মুখ মসজিদে হারামের** দিকে **ফিরাও"**। এটি মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফেরানোর তৃতীয় স্পষ্ট আদেশ: প্রথম আদেশ ছিল: **"আমি তোমার আকাশের দিকে মুখ ফেরানো দেখছি, অতএব আমি তোমাকে এমন কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দেব যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে। সুতরাব তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও"**। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তর্নিহিত ইচ্ছার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয় আদেশ এসেছে: **"আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও। আর নিশ্চয় এটা তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য"**। এখানে এই কিবলা পরিবর্তন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য ও নির্ভুল তা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় ও বর্তমান আদেশে বলা হচ্ছে: **"আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে**

ফেরাও। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের মুখ সেদিকেই ফেরাও"। এটি সমস্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি সার্বজনীন নির্দেশনা।

এরপর আল্লাহ তাআলা এই নির্দেশনার একটি গুরুত্বপূর্ণ হিকমত বর্ণনা করেন: **"যাতে মানুষেরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারে"**। এতে করে: ১. ইহুদিদের সেই দাবির অবসান ঘটল যারা বলত যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কিবলার অনুসরণ করেন ২. অন্যদিকে, মক্কার মুশরিকরা খুশি হলো যেহেতু নবীজী এখন কাবা শরীফের দিকে মুখ করছেন যা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর প্রতিষ্ঠিত কিবলা ৩. এটি ইহুদিদের বিরুদ্ধে একটি স্পষ্ট প্রমাণ যে নবীজী তাদের অনুসারী নন, বরং তিনি ইবরাহীমী ঐতিহ্যের অনুসারী। ফলে: এটি মুমিনদের জন্য শক্তি ও সম্মানের কারণ হয়েছে, অন্তরে রোগযুক্ত লোকদের জন্য এটি একটি পরীক্ষা হয়েছে, এবং আদেশ, নিষেধ ও নির্দেশনা রদ করার মধ্যে আল্লাহর মহান হিকমত প্রকাশ পেয়েছে।

এভাবে ইহুদি ও আরবের মুশরিকদের সকল যুক্তি-প্রমাণ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, শুধুমাত্র তাদের জন্য ব্যতিক্রম হলো যাদের অন্তরে রোগ ছিল। তারা নিজেদের উপরই জুলুম করল সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে। আল্লাহর বাণী: **"যাতে মানুষেরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারে, তবে তাদের মধ্যে যারা জালিম তারা ছাড়া"**। এদের সম্পর্কে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন: **"সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর"**। এখানে মুমিনদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ ও মানসিক শান্তি: **ভয়ের অবকাশ নেই**, ইহুদি ও মুশরিকদের হীন চেষ্টা ও জিদ মুমিনদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, বরং তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। আর সমস্ত ভয়-ভীতি একমাত্র সৃষ্টিকর্তার প্রতি নিবেদিত হবে, কোনো সৃষ্টির ভয় মুমিনের হৃদয়ে স্থান পাবে না। কাজেই এ নির্দেশ মুমিনদের মনোবল বৃদ্ধি করে, ইহুদিদের উপর বিজয়ের ইঙ্গিত বহন করে।

এছাড়াও, এর অন্যতম উপকারিতা হলো নির্দেশনার ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া এবং মানসিক দিকগুলোর যত্ন নেওয়া, যা বারবার জোর দেওয়া এবং পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে আরও উপকারী হয়ে ওঠে। ইমাম কুরতুবী *(রহ.)* বলেন: "এটি কাবার দিকে মুখ করার আদেশের পুনরায় নিশ্চিতকরণ এবং এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা, কারণ দিক পরিবর্তনের বিষয়টি তাদের মনে অত্যন্ত কঠিন ছিল।"[১৮]

আরও একটি উপকারিতা হলো- উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে ইবন কাসির *(রহ.)* ও অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন যে[১৯], এই আয়াতগুলো বিভিন্ন অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রথম আয়াত তাদের জন্য, যারা কাবা শরিফ প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছে। দ্বিতীয়টি তাদের জন্য, যারা মক্কায় অবস্থান করছে, কিন্তু কাবাকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছে না। আর তৃতীয়টি হলো অন্যান্য শহরে বসবাসকারীদের জন্য। কাজেই যারা কাবা শরিফ দেখতে পাচ্ছে, তারা সরাসরি সেটির দিকে মুখ করবে। যারা মক্কায় আছে কিন্তু মসজিদের বাইরে, তারা মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করবে। আর যারা অন্যান্য শহরে রয়েছে, তারা মক্কার দিকে মুখ করবে- আল্লাহ তাআলা এটিকে নিরাপদ রাখুন।

এমনভাবে এই কিবলার মাধ্যমে এক মহান ও স্পষ্ট নিয়ামত পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **"আর আমি আমার অনুগ্রহ তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করবো এবং আশা করা যায় যে তোমরা সঠিক পথ পাবে।"** বস্তুত মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত কিবলা এক বিরাট নিয়ামত, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমত ও তৌফিক দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন, যাতে মুমিনরা এই মহান বিধানের মাধ্যমে আরও অধিক হেদায়েত ও সফলতা লাভ করতে পারে। এই কিবলার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে বহু নিয়ামত ও বরকত নেমে এসেছে, যার জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। এটি আমাদের জন্য কাবার দিকে মুখ করার নিয়ামত উপলব্ধিরও আহ্বান জানায়—সেই

---

(১৮) আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন: (২/১১৩)।

(১৯) তাফসীর ইবনে কাসীর: (১/২০০)।

ঘর, যা মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম স্থাপন করা হয়েছে, এবং যাকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ বরকত ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো: সালাতের প্রতিদান বহুগুণ, জমজমের পানি পান করার মাধ্যমে শারীরিক ও আত্মিক সুস্থতা লাভ, এবং এই মহান ঘরের অন্যান্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ফজিলত।

﴿كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ١٥١ فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ١٥٢﴾

অর্থ: ***[যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি যিনি তোমাদের কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন। আর তা শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না। কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ে না।]*** (আয়াত নং ১৫১-১৫২)।

আল্লাহ তাআলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদের উপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রেরণের নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং বলেন: **"যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি যিনি তোমাদের কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন। আর তা শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না। কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ে না।"** সুতরাং যেভাবে আমি তোমাদের মাঝে এই রাসুল প্রেরণ করেছি যা এক মহান নিয়ামত, তোমাদেরকে এই দ্বীন শিক্ষা দিয়েছি ও তোমাদের অজ্ঞতা দূর করেছি- তোমরাও আমার একনিষ্ঠ ইবাদত করো, যেমনিভাবে আমি তোমাদের আদেশ

দিয়েছি ও বিধিবদ্ধ করেছি। আর আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো, যেসব মহান নিয়ামত আমি তোমাদের প্রদান করেছি, তার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করো, অস্বীকার করো না। আল্লাহ তাআলার বাণী **"আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।"** থেকে বোঝা যায় যে, কৃতজ্ঞতা না করা কুফরীর একটি রূপ। কারণ কৃতজ্ঞতা না করা মানে নিয়ামতের মর্যাদা না বোঝা, তার মূল্য অনুভব না করা। পক্ষান্তরে, কৃতজ্ঞতা মানুষের হৃদয়ে নিয়ামতের উপলব্ধি জাগিয়ে তোলে এবং আল্লাহর প্রতি প্রশংসা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে। যতবার একজন মুমিন আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করে, তার অন্তরে প্রশান্তি, স্বস্তি ও সুখের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। যখন সে ইসলাম গ্রহণের নিয়ামত স্মরণ করে, তখন দুনিয়ার কঠিন বাস্তবতা ও বিপদ-আপদ তার জন্য সহনীয় হয়ে যায়। যখন সে সন্তানদের নিয়ামত স্মরণ করে, তখন দারিদ্র্যের কষ্ট বা অন্যান্য অভাব-অনটন কিছুটা লাঘব হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামত থেকে গাফিল থাকে, সে ক্রমেই দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত হয়। যখন সে স্বাস্থ্য নামক নিয়ামত ভুলে যায়, তখন অন্যান্য নিয়ামতের ব্যাপারেও সে উদাসীন হয়ে পড়ে, এবং তার জীবনে অসীম লোভ-লালসার ভার এসে পড়ে। এ জন্য একমাত্র সমাধান হলো—নিয়ামতের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা, যা মানুষকে কৃতজ্ঞতার দিকে পরিচালিত করে। কেননা কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে নিয়ামত স্থায়ী হয় এবং আরও বৃদ্ধি পায়।

এছাড়াও, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—আল্লাহ তাআলা কৃতজ্ঞ বান্দাদের ভালোবাসেন, এবং বান্দার উপর তাঁর অনুগ্রহের নিদর্শন প্রকাশ পাওয়া উচিত। তবে এটি আত্মম্ভরিতা, অহংকার বা বাড়াবাড়ির জন্য নয়, বরং নিছক আল্লাহর নিয়ামতের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য হওয়া উচিত। ইমাম ইবন কাসির *(রহ.)* বলেন: আল্লাহ তাআলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের প্রতি যে নিয়ামত দান করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো—রাসূল *(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর প্রেরণ। তিনি তাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে পাঠ করেন, তাদের আত্মাকে পবিত্র করেন—অর্থাৎ তাদের খারাপ চরিত্র, মনের অপবিত্রতা ও জাহেলি যুগের নিকৃষ্ট অভ্যাস থেকে মুক্ত করেন, এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে

আলোতে নিয়ে আসেন। তিনি তাদের **"কিতাব"** (কুরআন) এবং **"হিকমত"** (হাদিস ও সুন্নাহ) শিক্ষা দেন, এবং এমন জ্ঞান দান করেন যা তারা আগে জানত না। ফলে, এই নবুওয়াত ও রিসালাতের বরকতে তারা আল্লাহর নেক বান্দাদের স্তরে উন্নীত হয় এবং বিদ্বানদের গুণাবলী অর্জন করে। তারা জ্ঞানে সবচেয়ে গভীর, অন্তরে সবচেয়ে পবিত্র, কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত এবং কথায় সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।[২০]

এর আরেকটি ফায়েদা হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে, আল্লাহ তাআলাও তাকে স্মরণ করেন। কুদসী হাদিসে আল্লাহ তাআলা বলেন: **"আমি বান্দার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমি তাকে একান্তভাবে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে কোনো জমায়েতে স্মরণ করে, আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম এক সমষ্টিতে স্মরণ করি।"** (সহীহ বুখারী) আল্লাহ তাআলাকে হৃদয়, জিহ্বা ও কর্মের মাধ্যমে স্মরণ করার উপকারিতা ও ফজিলত অত্যন্ত মহান, বিস্তৃত ও গভীর। হাদিসের গ্রন্থগুলোতে এ বিষয়ে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। এমনকি কিছু বিদ্বান এ বিষয়ে স্বতন্ত্র অধ্যায় ও বই রচনা করেছেন, যেখানে তারা আল্লাহর জিকিরের বিভিন্ন দিক ও উপকারিতা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

এর অন্যতম উপকারিতা হলো—তাওহিদের প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে, অন্তরে, জিহ্বায় ও কর্মে। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"সুতরাং আমাকে স্মরণ করো"** এবং **"আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো"**। আল্লাহর স্মরণ মানুষের মনে তাঁর নিয়ামতকে স্মরণ করিয়ে দেয়, আর নিয়ামত স্মরণ করা আল্লাহর জিকিরের দিকে ধাবিত করে। এরপর এটি মানুষকে শুকরিয়া আদায়ে উদ্বুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে, নিয়ামত ভুলে গেলে মানুষ আল্লাহর শুকরিয়া আদায়েও গাফিল হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলার স্মরণের সঙ্গে একত্ববাদের সংযোগ স্থাপন করার মধ্যে রয়েছে তাওহিদের দৃঢ়ীকরণ। বান্দা যেন তাঁর প্রতিপালককে নিয়ামতের মাধ্যমে স্মরণ করে এবং বাহ্যিক কারণগুলোর আড়ালে নিয়ামতের প্রকৃত দাতা—আল্লাহ তাআলাকে ভুলে না যায়। বরং সে যেন বলে: "আমি আল্লাহর অনুগ্রহে

---

(২০) তাফসীর ইবনে কাসীর: (১/২০১)।

লাভ করেছি," "আল্লাহ আমাকে অমুক ব্যক্তিকে অনুকূল করে দিয়েছেন, ফলে সে আমাকে সাহায্য করেছে," "আল্লাহর তৌফিকেই এটি সম্ভব হয়েছে," কিংবা "আল্লাহর কৃপায় এটি সম্পন্ন হয়েছে।" এভাবে বান্দা যখন তার জিহ্বায় আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পার স্বীকৃতি প্রকাশ করে, তখন তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় এবং সেই সকল মানুষের প্রশংসা করা হয়, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ কোনো নিয়ামত পৌছে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী **"আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না"**—এর মধ্যে এক শক্তিশালী শিক্ষা রয়েছে, যা একজন মুমিনকে আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামত উপলব্ধি করার শক্তি জোগায়; এমন নিয়ামত, যা অকৃতজ্ঞরা উপেক্ষা করে কিংবা ভুলে যায়। যখন একজন বিশ্বাসী তার ইসলাম গ্রহণের কথা স্মরণ করে, তখন সে এই নিয়ামতের মহত্ব গভীরভাবে অনুভব করে যে, সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে, তার সমস্ত দারিদ্র্য, কষ্ট ও অভাব-অনটন এই মহান নিয়ামতের তুলনায় তুচ্ছ মনে হয়। এভাবেই তার হৃদয়ে সর্বদিক থেকে প্রশান্তি ও সুখের অনুভূতি প্রবাহিত হয়। যদি সে তার স্বাস্থ্য ও সুস্থতার দিকে লক্ষ্য করে, তাহলে সে উপলব্ধি করে যে, সে অসুস্থদের অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে, তার অন্য যেকোনো অভাব, দুঃখ বা বিপদ তার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র হয়ে যায়। এর ফলে তার হৃদয়ে প্রশান্তি, আত্মতৃপ্তি ও সুখের অনুভূতি জন্ম নেয়। এভাবেই প্রতিটি নিয়ামতের ক্ষেত্রে মুমিনের মনোভাব হয়, সে সবকিছুর মধ্যে আল্লাহর অনুগ্রহ খুঁজে নেয় এবং এর মাধ্যমে তার অন্তরে শান্তি, স্থিরতা ও আনন্দ লাভ করে।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٣ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقۡتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتُۢۚ بَلۡ أَحۡيَآءٞ وَلَٰكِن لَّا تَشۡعُرُونَ ١٥٤ وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ١٥٧﴾

অর্থ: *[***হে ঈমানদারগণ! তোমরা সাহায্য চাও সবর ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথে আছেন। আর আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। আর আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরিক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে। যারা তাদের উপর বিপদ আসলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের রব-এর কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত।***]*** *(*আয়াত নং ১৫৩-১৫৭*)*।

আল্লাহ তাআলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদের জীবনসংগ্রামে সহায়ক এক শক্তির দিকে নির্দেশ করেন, যা তাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় ধৈর্যশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাখে। আল্লাহ বলেন: ***"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সাহায্য চাও সবর ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথে আছেন।"*** এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সরাসরি মুমিনদের কল্যাণকর বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাদেরকে ঈমানের সম্মানসূচক সম্বোধন ***(يا أيها الذين آمنوا)*** দ্বারা সম্বোধন করেন। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য এক বিরাট মর্যাদার ঘোষণা এবং তাদের ঈমানের স্বীকৃতি। এই সম্মান ও মর্যাদা এক মহান নিয়ামত, যা তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এবং কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফেরানোর জন্য দেওয়া হয়েছে। এটি শিক্ষাগত ও দাওয়াতি দৃষ্টিকোণ থেকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার বার্তা বহন করে—যেমন, শিষ্য বা আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে সর্বোত্তম উপায়ে সম্বোধন করা। যখন স্বয়ং আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এত সম্মানসূচক সম্বোধন ব্যবহার করেন, তখন একজন মানুষকেও তার সহধর্মী মানুষের প্রতি সদাচার ও

সম্মানের আচরণ করা উচিত। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এখানে **"يا"** সম্বোধনসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা শোনার মনোযোগ আকর্ষণের শক্তিশালী মাধ্যম। এটি স্পষ্ট করে যে, আয়াতে আলোচিত বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে গভীর মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য। এটি দাওয়াত ও শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল, যা শ্রবণকারী ব্যক্তির মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে এবং বিষয়টি হৃদয়ে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদের আহবান করে এমন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখিয়ে দেন, যা তাদের জীবনের প্রতিটি পরীক্ষায় সহায়তা করবে। তিনি বলেন: **"তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও।"** এখানে আল্লাহ তাআলা সাহায্য চাওয়ার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র উল্লেখ করেননি, বরং ব্যাপকভাবে বলেছেন, যাতে মুমিন বুঝতে পারে যে, জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া উচিত। কারণ, মানুষের চাহিদা দুটি বিষয়ের মধ্যেই আবর্তিত—কল্যাণ অর্জন করা এবং অনিষ্ট দূর করা। ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার অর্থ হলো- আনুগত্য পালন ও কল্যাণ সাধনে অবিচল থাকা, অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকা ও তা দূর করা, আত্মাকে পাপ থেকে বিরত রাখা এবং কল্যাণের দিকে পরিচালিত করা, এবং যে কষ্ট ও বিপদ-আপদ আসে, তা সহ্য করা।

ধৈর্য মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করে, তাকে সহনশীল করে তোলে এবং কর্মোদ্যম বাড়িয়ে দেয়। এটি মানসিক প্রশান্তি দেয়, হতাশা থেকে রক্ষা করে এবং অলসতা ও অক্ষমতার ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে বাঁচায়। উপরন্তু, ধৈর্যের বিনিময়ে বিরাট প্রতিদান ও সওয়াব রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—ধৈর্যশীল ব্যক্তির জন্য আল্লাহর বিশেষ সঙ্গ, যেমন আল্লাহ বলেন: **"নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"** এ এক অপার সম্মান ও মর্যাদা! যদি ধৈর্যের একমাত্র ফলাফল আল্লাহর সান্নিধ্যই হতো, তাহলেও তা যথেষ্ট ছিলো সম্মান, শক্তি, সমর্থন ও বিজয়ের জন্য। দ্বিতীয় উপায় হলো **নামাজ**। প্রিয়

নবী সাঃ যখন কোনো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাইতেন।

নামাজের মধ্যে বান্দার সঙ্গে তার প্রভুর একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এতে রয়েছে আল্লাহর সঙ্গে একান্ত কথা বলা (মুনাজাত), রুকুতে বিনম্রতা প্রদর্শন, সিজদায় নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করা, ফাতিহাসহ আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করা, তাসবিহ, তাহমিদ ও তাকবিরের মাধ্যমে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করা। এতে আল্লাহ তাআলার সম্মুখে দাঁড়ানো, নবী সাঃ-এর প্রতি দরুদ পাঠ, নবীদের পিতা ইবরাহিম আঃ-এর ওপর সালাম পাঠ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নামাজের মধ্যে রয়েছে দোয়া, আর বান্দা যখন সিজদায় থাকে, তখন সে তার প্রভুর সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থায় থাকে। অতএব, সত্যিই নামাজ এমন একটি শক্তি যা একজন মুমিন তার সকল বিষয়ে সাহায্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। সময়মতো নামাজ আদায় করা, সুন্নত ও নফল নামাজ আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়া, আর যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসে পড়ে, তখন নফল নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া—এগুলোই একজন মুসলিমের জন্য প্রকৃত আশ্রয়।

এরপর আয়াতগুলো শহীদের অবস্থার বর্ণনায় চলে যায়, যে শহীদ হয়েছে আল্লাহর পথে: **"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো না।"** আল্লাহ তাআলার এই কুরআনিক বর্ণনা শহীদের সংজ্ঞা স্পষ্ট করে দেয়—যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয়, সে-ই শহীদ। এটি আরও বোঝায় যে, শহীদ জীবিত, এমন এক জীবন যা আমরা অনুভব করতে পারি না। এই আয়াত শহীদদের মর্যাদা ও আল্লাহর পথে জিহাদের ফজিলত প্রকাশ করে। শহীদরা তাদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তারা দুনিয়ার কোনো লালসায় প্রাণ দেননি, মিথ্যার পক্ষ অবলম্বন করেননি, কিংবা লোক দেখানো বা খ্যাতির জন্য লড়াই করেননি। বরং শুধুমাত্র আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জন করাই প্রকৃত শহীদের শর্ত। অতএব, আমরা তাদের মৃত মনে করব না; বরং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে, যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে, তারা জীবিত। রাসূল ﷺ বলেছেন:

"শহীদের আত্মাগুলো সবুজ পাখির রূপ ধারণ করে এবং জান্নাতের ফলমূল ও গাছপালা থেকে আহার করে।" (সুনানে তিরমিযি) এই হাদিস থেকে কবরের নেয়ামতের প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং এর বিপরীতে কবরের শাস্তিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় আমরা তাদের প্রকৃত অবস্থা অনুভব করতে পারি না। সুতরাং, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল, পরম জ্ঞানী, যার হাতে সমস্ত বিধান ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

কুরআনের বর্ণনাশৈলীতে নির্দেশনা, আদেশ-নিষেধ, ব্যাখ্যা ও প্রতিউত্তরের ক্ষেত্রে চমকপ্রদ রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। এই বৈচিত্র্য অত্যন্ত মহান, মনোমুগ্ধকর ও বিস্ময়কর, যা পাঠকের শ্রবণেন্দ্রিয়কে আনন্দিত করে, হৃদয়কে বিনম্র করে তোলে, মনকে গভীরভাবে চিন্তাশীল করে এবং বোধশক্তিকে উজ্জীবিত করে। যে ব্যক্তি কুরআনের আয়াত পাঠ করে, সে তার বর্ণনার সুমধুরতা, শব্দের সুষম বিন্যাস ও বাক্যগঠনের অনুপম সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়। এতে মস্তিষ্ক আলোকিত হয়, হৃদয়ে ভাবোদয় সৃষ্টি হয়, অনুভূতি আন্দোলিত হয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মানুষের বোধশক্তিকে অভিভূত করেছেন, এর অপার বর্ণনা ও গভীর অর্থবোধ দিয়ে মানব ও জিনজাতিকে অসহায় করে দিয়েছেন। তিনি এই কিতাবের মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন—মানব ও জিন যদি পরস্পরের সহায়তা নিয়ে একত্রিত হয়, তবু তারা এর অনুরূপ কিছু রচনা করতে সক্ষম হবে না। পূর্ববর্তী আয়াতে শহীদের অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে, তার আগের আয়াতে বলা হয়েছে মুসলমান কীভাবে ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাইবে। এরপর এখানে কুরআনের বর্ণনা পরীক্ষার বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করেছে, যা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে মোকাবিলা করা হয়। এটি এমন এক রূপান্তর, যা অনন্য সৌন্দর্য ও আকর্ষণে পরিপূর্ণ। পাঠক এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে প্রবেশ করে বিস্ময়ে নিমজ্জিত হয়। অতএব, পবিত্র কুরআনের অসামান্য বর্ণনাশৈলী দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে চিরকালীন বিস্ময়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের দুনিয়াতে যা ঘটবে সে সম্পর্কে জানিয়ে বলেন, **"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ, প্রাণ ও ফলফলের ঘাটতির মাধ্যমে।"** এই পরীক্ষা যা মুমিনদের উপর আপতিত হয়, তাতে বোঝা যায় যে এটি পূর্বের **"ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও"** আয়াতটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এবং একই সঙ্গে আল্লাহর পথে জিহাদের আয়াতের সঙ্গেও সম্পর্কিত, কারণ জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের ধৈর্যের প্রয়োজন হয়, চাই তা যুদ্ধক্ষেত্রে হোক বা তার পূর্বে।

এছাড়াও, এই পরীক্ষার ঘোষণার মধ্যে রয়েছে মুমিনদের জন্য এক সুসংবাদ ও শিক্ষা যে, তা আল্লাহর ইচ্ছায়, যাতে তারা বুঝতে পারে যে এই দুনিয়া একটি পরীক্ষার স্থান, যার পরে আসল ঠিকানা অপেক্ষা করছে। কোনো পরীক্ষা উদ্দেশ্যহীন হয় না, এবং পরীক্ষার পর ফলাফল আসে যাতে বিজয়ীরা উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে। সুতরাং, মুমিন এই পরীক্ষাকে আল্লাহ তায়ালার দেওয়া জ্ঞান ও উপলব্ধি দ্বারা গ্রহণ করবে এবং এমনভাবে এর মোকাবিলা করবে যা আল্লাহকে চেনার যোগ্য বান্দার জন্য উপযুক্ত। মূলত, পরীক্ষা শুধু কষ্ট ও বিপদের মাধ্যমেই আসে না, বরং কল্যাণ ও সমৃদ্ধির মাধ্যমেও হতে পারে, যেমন আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন, **"আমি তোমাদেরকে ভালো ও মন্দের মাধ্যমে পরীক্ষা করি।"** *(*সূরা আল-আম্বিয়া*)*।

এই মহিমান্বিত আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে পরীক্ষার ধরন ও স্তর বিভিন্ন রকম হতে পারে- কখনো তা প্রকাশ্য হয়, আবার কখনো গোপন থাকে। সেই বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে একটি হলো **ভয়**, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন*:* **"কিছুটা ভয় দ্বারা"**, অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভয় নয়, বরং এর কিছু অংশ। তাই আল্লাহর জন্য প্রশংসা, যিনি সম্পূর্ণ ভয় দেননি। ভয় হলো এমন একটি অবস্থা, যা মানুষের মানসিক শান্তি ও স্থিরতাকে নষ্ট করে দেয় এবং অস্থিরতা সৃষ্টি করে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এটি দেখা যায়-হত্যা, লুটপাট ও গৃহহীন হওয়ার ফলে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আবার শান্তির সময়েও ভয় আসতে পারে- শত্রুর কারণে, প্রিয় কিছু হারানোর আশঙ্কায়, কিংবা অপ্রিয় কিছু আসার ভয়ে, অথবা নিরাপত্তাহীনতার কারণে। এতে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা রয়েছে- নিরাপত্তার গুরুত্ব

উপলব্ধি করা, কারণ এটি ভয়ের বিপরীত এবং এর অনুপস্থিতিতেই ভয় সৃষ্টি হয়। তাই নিরাপত্তা পাওয়া আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত, যা কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার দাবি রাখে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: **"যে ব্যক্তি সকালে তার পরিবার-পরিজনের মাঝে নিরাপদ থাকে, শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে, এবং তার এক দিনের খাবার থাকে, তার জন্য যেন পুরো দুনিয়া একত্রিত করে দেওয়া হলো।"** *(*তিরমিজি*)*

এই আয়াতে উল্লেখিত পরীক্ষার আরেকটি ধরন হলো **"ক্ষুধা"**, যার ফলে মানুষ প্রয়োজনীয় আহার থেকে বঞ্চিত হয়। এটি হতে পারে খাবারের অভাবের কারণে, আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায়, অথবা পরিবহন ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটায়। আগের হাদিসেও এই বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে- **"যার এক দিনের খাবার রয়েছে"**, অর্থাৎ যার খাবার নেই, সে অভাবে পড়বে। পরীক্ষার আরেকটি ধরন হলো **সম্পদের ঘাটতি**। যখন সম্পদ কমে যায়, তখন মানুষের মৌলিক ও অতিরিক্ত চাহিদা পূরণের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। আরেকটি পরীক্ষা হলো **জীবনের ক্ষতি**, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, যা মানুষের হৃদয়ে গভীর কষ্টের সৃষ্টি করে। এছাড়া আরেকটি পরীক্ষা হলো **"ফল-ফসলের ক্ষতি"**। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন **সন্তান**, কারণ সন্তান পিতামাতার হৃদয়ের ফলস্বরূপ। আবার কেউ বলেছেন, এটি **শস্যহানি ও বরকতের কমতি** বোঝায়। উভয় অর্থেই এটি একটি পরীক্ষা। যখন একজন মুমিন এই বিষয়গুলোকে আল্লাহর দেওয়া পরীক্ষার অংশ হিসেবে বোঝে, তখন সে ধৈর্য ধারণ করতে পারে, পরিস্থিতি সুন্দরভাবে সামাল দিতে পারে এবং অন্যদের তুলনায় মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে।

আল্লাহ তাআলার এই ব্যাখ্যা জানার ফলে মুমিনের হৃদয়ে পরীক্ষার সময় কিছুটা প্রশান্তি সৃষ্টি হয়। তবে যদি সে আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী আচরণ করে, তবে তার অবস্থা দুনিয়া ও আখিরাতে আরও ভালো হবে। আল্লাহ বলেন: **"আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও- যারা বিপদে পড়লে বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব।"** এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই মুমিনদের জন্য সুসংবাদ, যারা

পরীক্ষার সময় দুটি গুণ অবলম্বন করে: **১. ধৈর্য ধারণ করা ২. বলা: 'আমরা আল্লাহর এবং আমরা তাঁর দিকেই ফিরে যাব।'** ধৈর্য হলো—নিজেকে হতাশা ও অস্থিরতা থেকে বিরত রাখা এবং হৃদয়কে স্থির রাখা। এই সুসংবাদ নির্দিষ্ট কোনো পুরস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যা প্রমাণ করে যে এর প্রতিদান অত্যন্ত মহান। আর যখন কেউ বলে, **"নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর"**, তখন সে স্বীকার করে যে সে আল্লাহর মালিকানাধীন। এতে সে আল্লাহর রবুবিয়াত ও উলুহিয়াত স্বীকার করে এবং আল্লাহর ভাগ্য নির্ধারণের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে। যেমন হাদিসে এসেছে: **"আপনার সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত।"** আর যখন কেউ বলে, **"আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব"**, তখন সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ করে। এটি একটি বিশাল শক্তি, যা আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের শিখিয়েছেন, যেন তারা যেকোনো বিপদ-আপদে এই শব্দগুলোর মাধ্যমে শক্তি ও প্রশান্তি লাভ করতে পারে।

এরপর আল্লাহ তাআলা সেই মহান প্রতিদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন, যা সেই ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত, যে এই আল্লাহর নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে। **"এদের জন্য তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রয়েছে সালাত (অনুগ্রহ), দয়া, আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।"** এই ধৈর্যশীল ও **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন'** বলা ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তাআলা তিনটি বিশেষ অনুগ্রহ দিয়েছেন: **১. "তাদের ওপর তাদের রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ রয়েছে"**— অর্থাৎ, আল্লাহর ক্ষমা, তাঁর বরকত, এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি। **২. "রহমত"**— অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ, যা তাঁদের জন্য কল্যাণকর বিষয় দান করে এবং ক্ষতিকর বিষয় দূর করে। এটি জান্নাতে প্রবেশকেও বোঝায়। **৩. "এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত"**— অর্থাৎ, তারা সেই পথের অনুসারী যাকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখান এবং যারা ইহকাল ও পরকালে সফলতা অর্জন করবে। এতে বোঝা যায় যে, বিপদের সময় ধৈর্য ও **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন'** বলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি জানা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা মুমিনকে পরীক্ষা করেন এবং এই পরীক্ষা তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হতে পারে। আবার, এটি পাপের শাস্তি

বা ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যমও হতে পারে। সর্বোপরি, সকল বিষয় আল্লাহর হাতে—তিনি যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করেন, এবং তাঁর সকল সিদ্ধান্ত হিকমতপূর্ণ ও সুবিবেচিত।

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١٥٨﴾

অর্থ*: [***নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে কেউ (কা'বা) ঘরের হজ বা উমরা সম্পন্ন করে, এ দু'টির মধ্যে সাঈ করলে তার কোন পাপ নেই। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন সৎকাজ করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ, সর্বজ্ঞ।*]* (আয়াত নং ১৫৮)

এরপর প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাঈ করার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে মুসলিমদের মধ্যে যে ভুল ধারণা ছিল, তা দূর করা যায়। কারণ জাহেলি যুগে এই দুই পাহাড়ের চারপাশে মূর্তি স্থাপন করে তাওয়াফ করা হতো। আল্লাহ তাআলা বলেন*:* **"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে কেউ (কা'বা) ঘরের হজ বা উমরা সম্পন্ন করে, এ দু'টির মধ্যে সাঈ করলে তার কোন পাপ নেই। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন সৎকাজ করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ, সর্বজ্ঞ।"** এই আয়াত দ্বারা সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করার বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে দুটি মূল শিক্ষা রয়েছে*:* **১. "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত"**— অর্থাৎ, এটি আল্লাহর দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকগুলোর অন্তর্ভুক্ত এবং এটি একটি শরিয়তসম্মত ইবাদত। **২. জাহেলি যুগের ভুল ধারণা দূর করা**— ইসলামের আগমনের পর মুসলিমরা ভাবতে পারে যে, পূর্ববর্তী যুগে এখানে মূর্তিপূজা হতো, তাই সাঈ করা ভুল হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, এটি ইসলামেরই অংশ এবং এতে কোনো গুনাহ নেই। এতে আমাদের জন্য একটি শিক্ষাও রয়েছে*:* **প্রথমে ভুল ধারণা দূর করতে হবে, তারপর সঠিক জ্ঞান গ্রহণ করতে হবে।** কারণ, ভুল ধারণার ওপর সঠিক জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় না। "বস্তুত যে ব্যক্তি ভুলভাবে কোনো বিষয় বুঝে নেয়, সেটিই 'জটিল অজ্ঞতা'।"

এরপর আল্লাহ তাআলা জাহেলি যুগের ভুল ধারণা দূর করার পর স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সাঈ (সাফা ও মারওয়ার মাঝে চলাচল) হজ ও ওমরাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। তিনি বলেন: **"যে ব্যক্তি আল্লাহর গৃহের হজ বা ওমরাহ পালন করে, তার জন্য কোনো দোষ নেই যে সে এ দুটির মধ্যে সাঈ করবে।"** এখানে "কোনো দোষ নেই" বলে বোঝানো হয়েছে যে, যারা পূর্ববর্তী যুগের মূর্তিপূজার কারণে সাঈ করা নিয়ে সংশয়ে ছিল, তাদের জন্য এটি কোনো পাপ নয়, বরং এটি হজ ও ওমরাহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ আয়াত থেকে আমরা শিখতে পারি, নাজিল হওয়ার কারণ জানার গুরুত্ব- ইসলামী বিধান বোঝার জন্য এর অবতীর্ণ হওয়ার পটভূমি জানা প্রয়োজন। এতে আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও বিধান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। তাছাড়া শরিয়তের বিধান আল্লাহর একক সিদ্ধান্ত- আল্লাহ তাআলাই একমাত্র নির্ধারক যে, কোন কাজ ইবাদত হবে এবং কোনটি বাতিল হবে। যদি কোনো ইবাদতকে বিদআতপন্থীরা বিকৃতও করে, তবু সেই ইবাদত পরিত্যাগ করা যাবে না। বরং, সেটিকে শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে পালন করতে হবে, যাতে মানুষ ইসলামের সঠিক বিধান সম্পর্কে জানে।

এরপর আল্লাহ তাআলা হজ ও ওমরাহর অতিরিক্ত ইবাদতের বিষয়ে বলেন: **"আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো সৎকাজ করে, তবে আল্লাহ তো অত্যন্ত গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ।"** এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ফরজ হজ ও ওমরাহর পর অতিরিক্ত নফল ইবাদত করাও অত্যন্ত কল্যাণকর। অতিরিক্ত নেক আমল আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্যতম মাধ্যম এবং এতে রয়েছে অশেষ পুরস্কার। আয়াত থেকে নফল ইবাদতের গুরুত্ব বুঝা যায়; আল্লাহ তাআলা ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি নফল ইবাদতের জন্যও বিশেষ প্রতিদান রাখেন। আর আল্লাহ তাআলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন- অর্থাৎ, বান্দা যখন নেক আমল করে, আল্লাহ তাকে এর উপযুক্ত পুরস্কার দেন। অপরদিকে মানুষকেও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত; যদি আল্লাহ তাআলা বান্দার অতিরিক্ত আমলের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পুরস্কার দেন, তবে মানুষেরও উচিত অন্যের উপকারের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। চিন্তা করে দেখুন বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অসীম দয়ার কথা— কিভাবে তিনি তাদের প্রতি স্নেহের সাথে কথা বলেন এবং উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন। আল্লাহর দয়া তার বান্দাদের প্রতি

মানুষের পারস্পরিক দয়ার চেয়েও অনেক বেশি। বরং, **মায়ের সন্তানের প্রতি যে ভালোবাসা, আল্লাহর দয়া তার চেয়েও অসীম ও গভীর,** যেমনটি হাদিসে উল্লেখ রয়েছে।

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ١٥٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيۡهِمۡ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَةُ ٱللَّهِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ ١٦١ خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ يُنظَرُونَ ١٦٢ وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٣﴾

অর্থ: ***[নিশ্চয় যারা গোপন করে আমরা যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হেদায়াত নাযিল করেছি, মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পর, তাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেন এবং লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত করেন। তবে যারা তাওবা করেছে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করেছে এবং সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। অতএব, এদের তাওবা আমি কবুল করব। আর আমি অধিক তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। নিশ্চয়ই যারা কুফর করেছে এবং কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও সকল মানুষের লা'নত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। তাদের শাস্তি শিথিল করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, দয়াময়, অতি দয়ালু তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই।]*** (আয়াত নং ১৫৯-১৬৩)

এরপর কুরআনের মর্যাদাপূর্ণ বর্ণনা আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টান) এর আচরণ ও কর্মকাণ্ডের দিকে ইঙ্গিত করে, যাতে তা তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ হয় এবং যাতে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। আর মুসলিমরা যেন তাদের ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা নিতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"যারা আমার নাযিল করা সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হিদায়াত গোপন করে, অথচ আমি তা মানুষের জন্য কিতাবে ব্যক্ত করে দিয়েছি, তাদের উপর আল্লাহর লানত এবং লানতকারীদের লানত।"** মুফাসসিরগণ বলেছেন: যদিও এই আয়াতের প্রেক্ষাপট আহলে কিতাব সম্পর্কে, তবে এর বিধান সকলের জন্য প্রযোজ্য, যারা আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন তা গোপন করার বৈশিষ্ট্য ধারণ

করে। আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যারা কিতাবে নাযিল করা সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হিদায়াত গোপন করে- যা এমন জ্ঞান যা দ্বারা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যা মানুষকে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার দিকে পৌঁছায়- তাদের উপর আল্লাহ তাআলার লানত। অর্থাৎ, তারা আল্লাহর রহমত ও নৈকট্য থেকে বিতাড়িত ও বঞ্চিত হবে। এছাড়াও, ফেরেশতা ও মানুষসহ অন্যান্য সৃষ্টিও তাদেরকে লানত করে। কারণ তারা মানুষের কাছ থেকে সেই সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হিদায়াত গোপন করে, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্য করতে পারে, তাঁর আদেশ পালন করতে পারে এবং তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকতে পারে। ইমাম কুরতুবি *(রহ.)* উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতে উল্লিখিত **'কিতাব'** বলতে সমস্ত ঐশী গ্রন্থকে বোঝানো হয়েছে।

এটি প্রমাণ করে যে, জ্ঞান গোপন করা শুরু থেকেই অত্যন্ত বিপজ্জনক। এর গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় যখন মানুষের তা প্রয়োজন হয়, এবং আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায় যখন মানুষ এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। এ কারণে জ্ঞানকে মানুষের সামনে প্রকাশ করা এবং তা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা যা পছন্দ করেন এবং যা পছন্দ করেন না, তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে। এতে কারও তুষ্টি অর্জনের জন্য বা কারও সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞানের কোনো অংশ গোপন করা যাবে না। আবার কেউ যেন আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্য সাধন বা ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য ন্যায়ের অপব্যাখ্যা না করে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এটি আলেমদের উপর অর্পিত মহান দায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে। আল্লাহ তাআলা তাদের সহায়তা করুন। এটি রব্বানী আলেমদের সমর্থন করা, সত্যের পক্ষে তাদের সাহায্য করা এবং তাদের সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক করে তোলে, কারণ তারা একটি মহান ধর্মীয় দায়িত্ব বহন করেন।

তবে আল্লাহ তাআলার রহমত তার বান্দার প্রতি অব্যাহত থাকে, যে তার গুনাহ ও ভুল থেকে তাওবা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন*:* **'তবে যারা তাওবা করে, সংশোধন করে এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে (তাদের জন্য ক্ষমা রয়েছে)।'** এখানে তিনটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে*:* **১. তাওবা:** তারা যা করছিল তা থেকে ফিরে আসা। এর জন্য

প্রয়োজন সেই কাজ বন্ধ করা এবং ভবিষ্যতে তা না করার দৃঢ় সংকল্প করা। **২. সংশোধন:** তারা যা নষ্ট করেছে তা ঠিক করা। এর জন্য প্রয়োজন হতে পারে যে, তারা তাদের ভুল স্বীকার করে এবং মানুষের সামনে সত্য প্রকাশ করে। তারা তাদের ক্ষমতানুযায়ী যা নষ্ট করেছে তা মেরামত করার চেষ্টা করবে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সংশোধনের পদক্ষেপ নেবে। ৩. **স্পষ্ট প্রকাশ:** কোনো প্রকার অস্পষ্টতা ছাড়াই সত্য প্রকাশ করা। **'আমি তাদের তাওবা গ্রহণ করব।'** এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করেন, যদি সে ফিরে আসে, পাপ ত্যাগ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাওবা করে। পাপী ব্যক্তির জন্য এর চেয়ে বড় কোনো কল্যাণ হতে পারে না, যার তাওবা আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেন।

এটি ইঙ্গিত করে এবং প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি তার পথভ্রষ্টতা ত্যাগ করে, তাকে সামাজিকভাবে গ্রহণ করা এবং তাকে এমনভাবে ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ, যেন সে কিছুই করেনি। তার অতীত ভুলের জন্য তাকে আর শাস্তি দেওয়া উচিত নয়, কারণ আল্লাহ তাআলা তার তাওবা গ্রহণ করেছেন। এটি সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেয় যে, ক্ষমাপ্রার্থীকে গ্রহণ করতে হবে এবং তার প্রতি কঠোর হওয়া উচিত নয়। এটি আরও ইঙ্গিত করে যে, যদি কেউ কোনো ভুল করে, এমনকি যদি কেউ তা না জানে, তবুও তার উচিত আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করা এবং যা করা হয়েছে তা সংশোধন করা। এরপর এই মহান নির্দেশনা ও পরিপূর্ণ রহমতে পূর্ণ আয়াতটি শেষ হয়েছে এ কথা বলে: **'আর আমি তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।'** এতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি তাওবা গ্রহণকারী এবং পরম দয়ালু। যারা তাওবা করে, তাদের জন্য তাঁর ক্ষমা ও রহমত একত্রিত হয়। আর রহমত হলো তাওবাকারীর উপর অতিরিক্ত অনুগ্রহ। কাজেই মহান সেই আল্লাহ, যিনি সর্বাধিক দয়ালু, সকল রহমতের অধিকারী।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যারা কুফরি (অবিশ্বাস) বেছে নিয়েছে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে: **'নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে এবং**

কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের লানত। তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। তাদের শাস্তি কখনও লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।' এই আয়াতে তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা ইসলামের পরিবর্তে কুফরি বেছে নিয়েছে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে—আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুফরি থেকে রক্ষা করুন। আল্লামা ইবনে সাদী *(রহ.)* এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: **'তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের লানত।'** কারণ, যখন তাদের কুফরি একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়, তখন তাদের উপর লানতও একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়, যা কখনও দূর হয় না। কারণ, বিধান তার কারণের সাথে সম্পর্কিত—যখন কারণ বিদ্যমান থাকে, বিধানও বিদ্যমান থাকে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের শাস্তিকে চিরস্থায়ী হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, তাদের শাস্তি কখনও লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে কোনো অবকাশও দেওয়া হবে না। এটি প্রমাণ করে যে, দুনিয়া হলো তাওবা এবং আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আসার জন্য অবকাশের স্থান। কিন্তু আখিরাত হলো প্রতিদান ও শাস্তির স্থান।

এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার বান্দাদের জন্য একটি স্পষ্ট বর্ণনা, সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শন যে, কাফিরদের পরিণতি হলো জাহান্নাম। এটি স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দেয় এবং বর্ণনা করে যে, মানুষের মনে যে ধারণা আসতে পারে—যে হয়তো তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে বা ফিরে আসার সুযোগ দেওয়া হবে—তা সম্পূর্ণরূপে ভুল। কিয়ামত ও প্রতিদানের দিনে কোনো অবকাশ বা সুযোগ থাকবে না। এ বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও চূড়ান্ত।

এরপর কুরআনের বর্ণনা আল্লাহ তাআলার সেই মহান গুণের দিকে স্থানান্তরিত হয়, যা বান্দার জন্য জানা ও বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক। আল্লাহ তাআলা বলেন: **'আর তোমাদের ইলাহ (উপাস্য) একমাত্র ইলাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।'** এই মহান আয়াতটি আল্লাহ তাআলার সেই গুণাবলি

স্পষ্ট করে, যা বান্দার জন্য জানা, বিশ্বাস করা এবং এর উপর আমল করা আবশ্যক। এর মধ্যে রয়েছে বহু গভীর ও মহান তাৎপর্য: **'তোমাদের ইলাহ':** অর্থাৎ, তিনিই তোমাদের উপাস্য, যার দিকে তোমরা ইবাদতের জন্য মুখ ফিরাও। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য সব উপাস্যকে বাতিল করা হয় এবং তাঁর ব্যতীত অন্য সব কিছু অস্বীকার করা হয়। **'তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ':** এটি আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের ঘোষণা। **'তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই':** এই বাক্যটি নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় দিক ধারণ করে। এটি প্রমাণ করে যে, তাঁর সৃষ্টির জন্য সত্যিকার অর্থে তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। এভাবে তিনি ব্যতীত অন্য সব উপাস্য ও ইলাহকে অস্বীকার করা হয় এবং এটি প্রমাণ করে যে, তিনি একমাত্র ইলাহ, যিনি এক ও অদ্বিতীয়। এর অর্থ হলো, বান্দার উচিত একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা, তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি হলেন রব, স্রষ্টা এবং সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। তাঁর প্রতিটি গুণ আমাদের মধ্যে ভয়, বিনয়, সাহায্য প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করার অনুভূতি জাগ্রত করে। এরপর আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেন যে, **'তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।'** এটি আমাদের রব, আল্লাহ তাআলার সেই রহমতের বর্ণনা, যা সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। তাঁর রহমতের মাধ্যমেই তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য রাসূল প্রেরণ করেছেন, কিতাব নাযিল করেছেন এবং আসমান ও জমিনের সব কিছুকে তাদের জন্য কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর রহমতের কারণেই তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা গ্রহণ করেন। যদি তিনি এত দয়ালু না হতেন, তবে কাফির যখন কুফরি ত্যাগ করে, তখন তিনি তার তাওবা গ্রহণ করতেন না। অথবা যারা তাঁর জন্য সন্তানের দাবি করে, তাদের তাওবা গ্রহণ করতেন না। তিনি তাদের বর্ণনা ও কথন থেকে পবিত্র ও মহান। এছাড়াও, তিনি তাঁর বান্দাদের অন্যান্য গুনাহ থেকেও তাওবা গ্রহণ করেন। সুতরাং, আল্লাহ তাআলার জন্য সমস্ত প্রশংসা, যার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।

আল্লাহ তাআলার বাণী **'তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।'** এতে তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ যিনি 'রহমান' ও 'রহীম' নাম ও গুণাবলি ধারণ করেন এমন ধারণাকে অস্বীকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা

ছাড়া অন্য সব উপাস্য তাঁর মতো রহমতের মালিক নয় এবং তারা 'রহমান' এর নাম ও গুণাবলি ধারণ করতে সক্ষম নয়। ফলে, তারা 'রহমান' ও 'রহীম' এর মতো দান বা অনুগ্রহ প্রদান করতে পারে না। এ আয়াতটি আল্লাহ তাআলার একত্ববাদও প্রতিষ্ঠা করে এবং 'রহমান' ও 'রহীম' নাম দুটির সত্যতা ঘোষণা করে। এই মহান আয়াতটি তাওহীদের তিনটি বিভাগকে সমন্বিত করে: **১. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ (প্রভুত্বে একত্ব):** আল্লাহ তাআলাই একমাত্র স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও পরিচালক। **২. তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ (ইবাদতে একত্ব):** একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা উচিত। **৩. তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত (নাম ও গুণাবলির একত্ব):** আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলি একক ও অদ্বিতীয়।

﴿إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلۡفُلۡكِ ٱلَّتِي تَجۡرِي فِي ٱلۡبَحۡرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٖ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٖ وَتَصۡرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلۡمُسَخَّرِ بَيۡنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ ١٦٤﴾

অর্থ: ***[নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের উপকারী দ্রব্যবাহী চলমান সামুদ্রিক জাহাজে এবং আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মূধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠকে তার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন সকল প্রকার বিচরণশীল প্রাণী এবং বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে বিবেকবান কওমের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে।]*** *(*আয়াত নং ১৬৪*)*

এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেনন তাঁর মহান সৃষ্টিজগতের দিকে, যা তাঁর রুবুবিয়্যাহ *(*প্রভুত্ব*)* ও উলুহিয়্যাহ *(*ইলাহ হওয়া*)* এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা, মালিক এবং তাঁর মহাজ্ঞান দ্বারা সব কিছু পরিচালনা করেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাদের চারপাশের দিকে তাকাতে এবং চিন্তা করতে নির্দেশ দেন*:* আকাশের উচ্চতা, এর সূক্ষ্মতা ও বিশালতা সম্পর্কে এবং আকাশে ছড়িয়ে থাকা গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে, যা গণনাকারীদের পক্ষে গণনা করা সম্ভব নয়। কে এই সব কিছুকে এত নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন*?* তিনি কি এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা নন*?* তিনি কি এই মহাবিশ্বের রব নন*?* তাছাড়া এই পৃথিবী- এর ঘনত্ব, নিচুতা, সুউচ্চ পর্বত, সমুদ্র, মরুভূমি, উপত্যকা ও জনবসতি, এবং এর মধ্যে থাকা অসংখ্য উপকারিতা সম্পর্কে- কে এই পৃথিবীকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, এর মধ্যে পথ ও নদীর স্রোত সৃষ্টি করেছেন*?* তিনি কি এই মহাবিশ্বের মালিক ও স্রষ্টা নন*?* এরপর দিন ও রাতের পরিবর্তন- একটি আসে, অন্যটি চলে যায়, একটি অন্যটিকে অনুসরণ করে এক নিখুঁত ধারাবাহিকতায়। কখনও একটি দীর্ঘ হয়, অন্যটি সংক্ষিপ্ত হয়, কখনও একটি অন্যটি থেকে সময় নেয়, আবার তারা একে অপরের সাথে ভারসাম্য বজায় রাখে। তিনি কি তাঁর সৃষ্টিতে সেরা নৈপুণ্যের অধিকারী নন*?* তিনি কি সব কিছু নিয়ন্ত্রণকারী নন*?* তিনি কি আল্লাহ তাআলা নন, যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা*?* এছাড়াও, তিনি আমাদের দৃষ্টি, বুদ্ধি ও

ইন্দ্রিয়কে সমুদ্রের দিকে আকর্ষণ করেন- যা জাহাজ বহন করে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগুলো মানুষের মালামাল ও রিজিক বহন করে, যাতে তারা আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন অনুগ্রহ বিনিময় করতে পারে। কে সমুদ্রগুলিকে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করেছে? কে তাদের দূরত্ব নির্ধারণ করেছে? কে তাদেরকে স্থলভাগ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে নিচু করে রেখেছে, যাতে পানি স্থলভাগে ছড়িয়ে না পড়ে এবং তা ডুবিয়ে না দেয়? তিনি কি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহ নন?

এরপর আল্লাহ তাআলা বান্দাদের চিন্তাকে তাদের চোখের সামনে যা দেখতে পায় এবং তাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা যা অনুভব করে, তার দিকে পরিচালিত করেন। মেঘকে আসমান ও জমিনের মধ্যে কাজে লাগানোর মাধ্যমে এর উপকারিতা ও ক্ষতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বৃষ্টি বর্ষান ঠিক সেই পরিমাণে, যা পৃথিবী ও মানুষের প্রয়োজন মেটায় এবং তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। এরপর ধীরে ধীরে মেঘ সরে যায় এবং বাতাসের মাধ্যমে অন্য স্থানে চলে যায়। যদি আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হতো, তবে মানুষ, ফসল ও পশুপাখি ধ্বংস হয়ে যেত। কে এই পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন? তিনি কি এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা নন, যিনি তাঁর পরাক্রমে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন? এরপর তিনি এই পানি দ্বারা মৃত পৃথিবীকে পুনর্জীবিত করেন, ঘাস গজায়, পৃথিবী সবুজ হয়ে ওঠে এবং মানুষ এই অনুগ্রহে আনন্দিত হয়। তিনি পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রাণী সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরকে মানুষের ব্যবহারের জন্য উপযোগী করেছে- যেমন বাহন হিসেবে, সৌন্দর্যের জন্য এবং খাদ্যের জন্য।

এরপর আল্লাহ তাআলা বাতাসের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যা মেঘ বহন করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। এছাড়াও, বাতাস মাটির ধূলিকণা বহন করে, যদিও মানুষ বাতাসকে দেখতে পায় না- কারণ এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তবে মানুষ তা অনুভব করতে পারে যখন তা তার মুখ ও ত্বকের উপর বয়ে যায়, এর কোমলতা অনুভব করে। কখনও মানুষ বাতাসের প্রভাব দেখতে পায়- যা কিছু বহন

করে, নড়াচড়া করে, ক্ষতি করে বা উপড়ে ফেলে। মানুষ বাতাসের প্রভাব দেখতে পায়, কিন্তু বাতাসকে দেখতে পায় না। আল্লাহ তাআলা বাতাসকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী পরিচালনা করেন: কখনও তা রহমত নিয়ে আসে, কখনও তা আযাব নিয়ে আসে, কখনও তা মেঘের আগে সুসংবাদ বহন করে, কখনও তা মেঘকে ঠেলে নিয়ে যায়, কখনও তা মেঘকে একত্রিত করে, কখনও তা মেঘকে ছড়িয়ে দেয়, কখনও তা মেঘকে অন্য দিকে নিয়ে যায়। কখনও বাতাস উত্তর দিক থেকে আসে, কখনও দক্ষিণের দিক থেকে আসে, কখনও পূর্ব দিক থেকে আসে, আবার কখনও পশ্চিম দিক থেকে আসে। কিন্তু কে এই বাতাসকে কাজে লাগিয়েছেন? কে এগুলিকে বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্য সহকারে প্রবাহিত করেন? তিনি কি এই মহাবিশ্বের পরিচালক ও স্রষ্টা নন? তিনি কি সত্যিকার অর্থে ইবাদতের যোগ্য নন? তিনি কি পরম দয়ালু, অতি দয়ালু নন? তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলাই সব কিছুর স্রষ্টা ও পরিচালক। এই মহান আয়াতটি শেষ হয়েছে আল্লাহ তাআলার এ বাণী দ্বারা: **'নিশ্চয় এগুলিতে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।'** কাজেই আয়াতে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো নিদর্শন ও প্রমাণ, যা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও মহিমা প্রকাশ করে- যারা গভীরভাবে চিন্তা করে এবং বুদ্ধি ব্যবহার করে তাদের জন্য। এটি প্রমাণ করে যে, মানুষের চারপাশের বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করা কত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তার মধ্যে ঈমান ও আল্লাহ তাআলার আনুগত্য বৃদ্ধি পায়।

এটি ইঙ্গিত করে যে, শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম এবং দাওয়াতের পদ্ধতিতে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গভীর অনুধাবন অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মহাবিশ্ব ও এর মধ্যে থাকা সব কিছুই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির নিদর্শন, যা তাঁর একত্ববাদ, স্রষ্টা হওয়া এবং সব কিছুর রব ও মালিক হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١٦٥ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ١٦٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٦٧﴾

অর্থ: **[আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তারা তাদেরকে ভালবাসে আল্লাহ্‌র ভালবাসার মতই; পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে সর্বাধিক ভালবাসে। আর যারা যুলুম করেছে যদি তারা আযাব দেখতে পেত, (তবে তারা নিশ্চিত হত যে,) সমস্ত শক্তি আল্লাহরই। আর নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।* যখন, যাদেরকে অনুসরণ করা হয়েছে, তারা অনুসারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং তারা আযাব দেখতে পাবে। আর তাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।* আর যারা অনুসরণ করেছে, তারা বলবে, 'যদি আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হত, তাহলে আমরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে যেতাম, যেভাবে তারা আলাদা হয়ে গিয়েছে'। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের আমলসমূহ দেখাবেন, তাদের জন্য আক্ষেপস্বরূপ। আর তারা আগুন থেকে বের হতে পারবে না।]** (আয়াত নং ১৬৫-১৬৭)।

এরপর আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে তাঁর মহান সৃষ্টিজগতের নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা করেছেন, যা তাঁর রুবুবিয়্যাহ (প্রভুত্ব) ও উলুহিয়্যাহ (ইলাহ হওয়া) এর প্রমাণ। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা, মালিক এবং তাঁর মহাজ্ঞান দ্বারা সব কিছু পরিচালনা করেন। তবে কিছু মানুষ তাঁর সাথে কুফরি ও শিরক করে: **'আর কিছু মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে।'** অর্থাৎ, কিছু মানুষ আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, প্রভুত্ব ও ইলাহ হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেও তাঁর সাথে শরিক স্থাপন করে। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আশা, ভয়, ভক্তি, দোয়া ও ফরিয়াদ ইত্যাদি ইবাদতের জন্য গ্রহণ করে। তারা যেন আল্লাহ তাআলার সমকক্ষ ও সমমান হিসেবে এই শরিকদের ইবাদত করে। বরং তারা এই উপাস্যগুলোকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ তাআলার

ভালোবাসার সাথে এই উপাস্যগুলোর ভালোবাসাকে সমান করে: **'আর কিছু মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে, তারা তাদেরকে আল্লাহর মতো ভালোবাসে।'** এটি কিছু মানুষের চিন্তাধারার ত্রুটি, বিশ্লেষণের ত্রুটি ও সিদ্ধান্তের ত্রুটি প্রকাশ করে। এটি তাকলিদ বা অন্ধ অনুকরণ, তাদের তারবিয়্যাত অথবা আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তাকে কাজে না লাগানোর ফল। এরপর তারা গাছ, পাথর, মাজার ইত্যাদি থেকে ভয় পেতে শুরু করে এবং এগুলোর প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা পোষণ করে, যা আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার সমান হয়ে যায়। এটি প্রমাণ করে যে, শিক্ষামূলক ও দাওয়াতের প্রক্রিয়ায় চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত, যা পথভ্রষ্ট ব্যক্তির ভ্রান্তি স্পষ্ট করে।

এটি প্রমাণ করে যে, প্রতিটি সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার বান্দা। তাহলে কীভাবে একজন সৃষ্টি তার মতো অন্য সৃষ্টিকে তার স্রষ্টার পরিবর্তে শরিক বা উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে, যিনি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই মহাবিশ্ব ও এর মধ্যে থাকা সুস্পষ্ট নিদর্শনের দিকে, যা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের প্রমাণ। যেহেতু প্রতিটি সৃষ্টির ইচ্ছা অসম্পূর্ণ, তাহলে কীভাবে একজন সৃষ্টি অন্য অসম্পূর্ণ ইচ্ছার সৃষ্টির কাছে প্রার্থনা করে যে, সে তার ক্ষতি দূর করবে বা তার জন্য কল্যাণ আনবে? এমনকি নবীরাও আল্লাহ তাআলার বান্দা। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সা.)-কে সূরা আল-আরাফে বলেছেন: **'বলুন: আমি আমার নিজের জন্য কোনো উপকার বা ক্ষতি করার মালিক নই, শুধুমাত্র আল্লাহ যা চান। যদি আমি গায়েব জানতাম, তবে আমি প্রচুর কল্যাণ অর্জন করতাম এবং কোনো অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করত না।'** যদি নবী (সা.) নিজের জন্য কোনো উপকার বা ক্ষতি করার মালিক না হন, তবে তার চেয়ে নিম্ন স্তরের সৃষ্টি কীভাবে নিজের বা অন্যের জন্য কোনো উপকার বা ক্ষতি করার মালিক হবে?

এরপর আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের ভালোবাসা ও মুমিনদের আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেন: **'আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।'** এটি ইঙ্গিত করে যে, মুমিনরা আল্লাহ তাআলার চেয়ে বেশি

কোনো কিছুকে ভালোবাসে না। আল্লাহ তাআলার চেয়ে নিচে যা কিছু রয়েছে, তা তাঁর ভালোবাসার চেয়েও নিচে। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর শরীয়তের প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর আনুগত্যকে ভালোবাসা হলো তাঁর আনুগত্যের অংশ এবং ঈমানের লক্ষণ। মুমিনরা আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করতে ঘৃণা করে, অসম্পূর্ণ ইবাদত করতে ঘৃণা করে এবং ইবাদতের জন্য ব্যাকুল হয়। কারণ, যে ব্যক্তি কিছুকে ভালোবাসে, সে তার জন্য ব্যাকুল হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে, সে তাঁর আনুগত্যকে ভালোবাসে এবং ত্রুটি ও গুনাহ থেকে লজ্জা পায়। কারণ সে লজ্জা পায় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন অবস্থায় দেখবেন, যা তিনি পছন্দ করেন না।

ফলে মুমিনদের আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা তাদেরকে শিরক ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত রাখে। তারা আল্লাহ তাআলাকে মহান মনে করে, তাঁর উপর ভরসা করে এবং আশা ও ভয়ের সাথে তাঁর কাছে দোয়া করে। তাঁর ভালোবাসা তাদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, তাই তারা তাঁর চেয়ে বেশি কোনো কিছুকে ভালোবাসে না। তারা শুধুমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে এবং শুধুমাত্র তাঁর কাছেই আশ্রয় নেয়। তারা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করে না।

আল্লাহ তাআলার বাণী **'আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।'** এটি মুসলিমের ইচ্ছাশক্তিকে শক্তিশালী করে, যা তার সামনে আসা সব বাধাকে অতিক্রম করতে সাহায্য করে। যদি তার সামনে দুটি পছন্দ থাকে, তবে সে সেই পছন্দটি বেছে নেবে, যা আল্লাহ তাআলার বাণী **'আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে'** এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি তার সামনে কোনো প্রলোভন আসে, তবে সে আল্লাহ তাআলার বাণী **'আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।'** দ্বারা তা অতিক্রম করবে। যদি তার ইবাদত করতে ইচ্ছা না হয়, তবে সে আল্লাহ তাআলার বাণী **'আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।'** দ্বারা নিজেকে জাগ্রত করবে। যদি তার প্রবৃত্তি তাকে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি অর্জনকারী কিছু করার দিকে টানে, তবে সে আল্লাহ

তাআলার বাণী **'আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে'** দ্বারা শক্তি অর্জন করবে এবং তা প্রতিহত করবে। যদি তার সামনে কোনো ফিতনা আসে, তবে সে আল্লাহ তাআলার বাণী **'আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।'** দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করবে। যদি তার দৃষ্টি ভুল পথে যায়, তবে সে আল্লাহ তাআলার বাণী **'আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।'** দ্বারা তা আড়াল করবে। যদি তার চিন্তা ভুল পথে যায়, তবে সে আল্লাহ তাআলার বাণী **'আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।'** দ্বারা তা সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবে। সুতরাং, প্রতিটি মানবীয় দুর্বলতার বিরুদ্ধে সে আল্লাহ তাআলার সাহায্য নেবে এবং আল্লাহ তাআলার ভালোবাসাকে তার সব আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি ও ভ্রান্তির আগে স্থান দেবে। এভাবে আল্লাহ তাআলার প্রতি তার ভালোবাসা পর্বতের মতো শক্তিশালী হবে, যা জীবনের ফিতনাগুলোকে প্রতিহত করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

এরপর আল্লাহ তাআলা, যিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়, স্পষ্ট করেছেন যে, শিরক হলো জুলুম: **'যারা জুলুম করেছে, তারা যদি আযাব দেখতে পেত...'** আল্লাহ তাআলা শিরককে জুলুম হিসেবে চিত্রিত করেছেন। সুতরাং, মুশরিক তার শিরকের মাধ্যমে নিজের উপর জুলুম করেছে। এছাড়াও, শিরক হলো ঘন অন্ধকার, যা মুশরিককে নূর (আলো) থেকে আড়াল করে। যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে, তারা যদি এই শিরকের অন্ধকারে প্রবেশ করার সময় আযাব দেখতে পেত, তবে তারা কখনও এতে প্রবেশ করত না। এটি প্রমাণ করে যে, শিরক হলো জুলুম ও অন্ধকার, যা তার অনুসারীকে একত্ববাদ ও ইবাদতের এমন নূর থেকে বঞ্চিত করে, যা হৃদয়কে আলোকিত করে এবং অন্তরকে প্রশান্তি দেয়।

পক্ষান্তরে শিরক তাকে জালিম বানায়, যে শাস্তি ও প্রতিদানের যোগ্য। আল্লাহ তাআলা মানুষের ভালোবাসার অবস্থা বর্ণনা করার পর এই শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন: **'যদি যারা জুলুম করেছে, তারা আযাব দেখতে পেত, তবে তারা জানত যে, সব শক্তি**

আল্লাহর। আর আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।' এটি একটি ভয়ানক সতর্কতা ও হুমকি, যা হৃদয়কে কাঁপিয়ে দেয়। যখন তারা আযাব দেখবে, তখন তারা জানবে যে, সব শক্তি আল্লাহ তাআলার। **'جميعاً' (সমস্ত)** শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, সমস্ত শক্তি তাঁরই। মানুষের শক্তি দুর্বল, কারণ তা অসম্পূর্ণ, সমস্ত নয়। তাদের উপাস্যদের শক্তি আরও দুর্বল ও নগণ্য, কারণ তা সমস্ত নয়। মুশরিক তার উপাস্যদের থেকে কৌশলে পালাতে বা অজুহাত দিতে পারে, কিন্তু যিনি সমস্ত শক্তির মালিক, তাঁর থেকে পালানো বা অজুহাত দেওয়া সম্ভব নয়। **'যদি যারা জুলুম করেছে, তারা আযাব দেখতে পেত, তবে তারা জানত যে, সব শক্তি আল্লাহর।'**

এরপর কুরআনের বর্ণনা অনুসারী ও নেতাদের অবস্থার দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে: **'যখন, যাদেরকে অনুসরণ করা হয়েছে, তারা অনুসারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে।'** ফেরেশতারা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, যারা তাদের ইবাদত করত। রাসূল ও নেককার ব্যক্তিরাও তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, যাদের কবরে ইবাদত করা হত। যেমন আল্লাহ তাআলা ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) সম্পর্কে সূরা আল-মায়িদায় বলেছেন: **'যখন আল্লাহ বললেন: হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি মানুষদেরকে বলেছিলে যে, তারা আমাকে ও আমার মাকে আল্লাহ ছাড়া ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করবে? তিনি বললেন: আপনি পবিত্র, আমার জন্য এ কথা বলা সঙ্গত নয়, যা আমার অধিকার নেই।'**

যাদের আল্লাহ ছাড়া ইবাদত করা হত, তারা কখনও তাদেরকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য বলেনি। এতে আল্লাহ তাআলার ন্যায়বিচার প্রকাশ পায়, কারণ তিনি কাউকে তাঁর ইবাদত করতে বাধ্য করেন না। তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হবে তাদের কাজের মাধ্যমে, যা তারা করত: **'তারা আযাব দেখবে এবং তাদের সব উপায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।'** তারা আল্লাহ তাআলার আযাব প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সব কৌশল, যুক্তি ও মুক্তির উপায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তির কোনো পথ পাবে না। অনুসারীরা, যারা মুশরিক, বলবে: **'আর যাদের অনুসরণ করা হয়েছিল,**

তারা বলবে: যদি আমাদের জন্য একটি সুযোগ থাকত, তবে আমরা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতাম, যেমন তারা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।' এখানে তারা দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করছে, যাতে তারা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ঘোষণা করতে পারে, যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করেছে। এতে তাদের মধ্যে আফসোস ও অনুতাপ দেখা দেবে, সেই শিরক ও জুলুমপূর্ণ ইবাদতের জন্য। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের কাজগুলো দেখাবেন, যা তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে: **'আর তারা জাহান্নাম থেকে বের হবে না।'** এই মহান আয়াতগুলো পরিণতি স্পষ্ট করে শেষ হয়েছে, যাতে তা প্রতিটি মুশরিকের জন্য একটি সতর্কবাণী হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার আযাবের প্রমাণ হয়, যারা কুফরির উপর মৃত্যুবরণ করেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি কাফিরের জন্য সবচেয়ে বড় আফসোস। এটি কুরআনের একটি মহান উপদেশ। যে ব্যক্তি কুরআন ও এর উপদেশ থেকে শিক্ষা নেয় না, সে অন্য কোনো বক্তব্য থেকে কীভাবে শিক্ষা নেবে? আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার উপর অবিচল থাকার জন্য সাহায্য, হিদায়াত ও তাওফিক চাই।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨ إِنَّمَا يَأۡمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلۡفَحۡشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ١٦٩﴾

অর্থ: ***[হে মানুষ, যমীনে যা রয়েছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু।* নিশ্চয় সে তোমাদেরকে আদেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলতে, যা তোমরা জান না।]*** (আয়াত নং ১৬৮-১৬৯)।

আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহ ও রহমতে পৃথিবী থেকে যা উৎপন্ন হয়, তা সব মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: **'হে মানুষ! পৃথিবীতে যা আছে, তা থেকে হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করো।'** এই আয়াতের এই অংশটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলার রিজিক সব মানুষের জন্য, মুমিন ও কাফির উভয়ের জন্য: **'হে মানুষ!'** এটি আল্লাহ তাআলার উদারতার প্রমাণ। তিনি হলেন রিজিকদাতা, যিনি তাঁর রহমত, ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে পৃথিবীকে স্থিতিশীল করেছেন এবং মানুষের প্রয়োজনীয় সব ধরনের খাদ্য উৎপন্ন করেছেন। এখানে পৃথিবীতে যা আছে, তা থেকে খাদ্য গ্রহণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যা পরিমাণ ও ধরনের দিক থেকে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী। এটি এমন প্রশ্ন উত্থাপন করে, যা ঈমানের দিকে পরিচালিত করে।

মানুষের প্রয়োজন ও আল্লাহ তাআলার দানের মাঝে কে এই পরিমাণগত ও গুণগত সামঞ্জস্য নির্ধারণ করেছেন? পৃথিবী ও তার উপর যা আছে, তার মধ্যে? কে এই অনুর্বর পৃথিবী থেকে বিভিন্ন আকার ও আয়তনের গাছপালা ও ঘাস উৎপন্ন করেছেন, যার পাতা ও ফল বিভিন্ন ধরনের ও বৈচিত্র্যময়? কে এই স্বাদের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে কিছু টক, কিছু মিষ্টি, এবং প্রতিটি স্বাদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে, যদিও সবই একই মাটি ও একই পানি থেকে উৎপন্ন হয়েছে? এটি মানুষকে চিন্তা করতে ও প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করে: কে এই সব কিছু উৎপন্ন করেছেন ও নির্ধারণ করেছেন? অবশ্যই একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি শক্তিশালী, ক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময় ও দয়ালু। তিনি তাদের জন্য একই মাটি থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উৎপন্ন করেছেন, যা তাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর ইবাদত করা ও একত্ববাদ ঘোষণা করতে বাধ্য করে- যিনি একক, যার কোনো শরিক নেই।

আল্লাহ তাআলা এই খাদ্য গ্রহণের বিধানকে হালাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন: **'হালাল'** এটি হারামের বিপরীত বিধান। এই বিধান শুধুমাত্র সেই সত্তাই দিতে পারেন, যার বিধান দেওয়ার অধিকার রয়েছে। সুতরাং, এটি মহান স্রষ্টার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, তিনিই এই রিজিক উৎপন্ন করেছেন ও প্রদান করেছেন, যা হালাল ও পবিত্র, যাতে

কোনো ক্ষতি নেই। এটি নিঃসন্দেহে তাঁর অনুগ্রহ ও মহানুভবতার জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করা আবশ্যক করে। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে এই মহান ও বিশাল নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যেহেতু এটি মূলত হালাল, তাই চুরি, জবরদখল বা হারাম লেনদেনের মাধ্যমে তা গ্রহণ করা যাবে না। আর যেহেতু এটি পবিত্র, তাই তা মূল অবস্থায় গ্রহণ করতে হবে, হালাল ও পবিত্র থেকে হারাম ও নাপাক অবস্থায় পরিবর্তন করে নয়। যেমন, মাদক তৈরি করে হালাল ও পবিত্র খাদ্যকে হারাম ও নাপাক করা, বা এতে এমন কিছু যোগ করা, যা কোনোভাবে ক্ষতিকর।

এরপর এই নিয়ামত বর্ণনা করার পর, আরেকটি মহান নিয়ামতের প্রতি সতর্ক করা হয়েছে, তা হলো শত্রু সম্পর্কে সচেতনতা: **'আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'** শয়তান সব মানুষের জন্য প্রকাশ্য শত্রু। কারণ, সে মানুষের কাছে কামনা-বাসনা ও সংশয়কে সুন্দর করে উপস্থাপন করে। সে মুমিনের শত্রু, কারণ সে মন্দ কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং কুমন্ত্রণা দেয়, যেমন ইবাদতকে বিলম্বিত করা বা সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া। এটি কাফিরেরও শত্রু, কারণ সে সংশয় সৃষ্টি করে, যা তাদেরকে সত্য অনুসরণ থেকে বিরত রাখে, এবং কামনা-বাসনাকে সুন্দর করে দেখায়, যা তাদেরকে তাতে নিমজ্জিত করে, ফলে তারা সত্যের দিকে ফিরে তাকায় না। আল্লাহ তাআলা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, যা হলো তার পদ্ধতি। শয়তান ধাপে ধাপে কাজ করে। যখন মানুষ এক ধাপে তার অনুসরণ করে, তখন সে তাকে আরেক ধাপে টেনে নিয়ে যায়, যতক্ষণ না সে তার স্বার্থ, সাফল্য ও মুক্তি থেকে দূরে সরে যায় এবং এমন কিছুতে পতিত হয়, যা তার জন্য ক্ষতিকর: **'সে তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়।'** অর্থাৎ, সে তোমাদেরকে এমন কাজের নির্দেশ দেয়, যার পরিণতি মন্দ, দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষেত্রে। আর সে অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, যা শরীয়ত নিষেধ করেছে।

আল্লাহ তাআলার বাণী **'সে তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়।'** এখানে ফাহিশা (অশ্লীল) হলো এমন কাজ, যার জঘন্যতা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেমন হত্যা, মদ্যপান, ব্যভিচার ও অপবাদ।

শয়তানের সবচেয়ে বিপজ্জনক পদক্ষেপগুলোর মধ্যে একটি হলো আল্লাহ তাআলার নামে মিথ্যা বলা ও তা সুন্দর করে উপস্থাপন করা: **'এবং তোমরা আল্লাহর নামে এমন কিছু বলো না, যা তোমরা জানো না।'** এটি হলো আল্লাহ তাআলার নামে জ্ঞান ও জ্ঞানের অভাবের ভিত্তিতে কথা বলা। এটি প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নামে জ্ঞানের অভাবের ভিত্তিতে কথা বলে, সে শয়তানের পথ অনুসরণ করেছে এবং শয়তান তাকে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন ও সতর্ক করেছেন, তাতে ফেলে দিয়েছে। এটি মানুষকে আল্লাহ তাআলার নামে জ্ঞানের অভাবের ভিত্তিতে কথা বলার বিষয়ে সতর্ক করে। যেমন, ইবাদত ও বিধানে হারামকে হালাল করা, হালালকে হারাম করা বা নতুন কিছু উদ্ভাবন করা। শয়তান তাকে মন্দ কাজকে সুন্দর করে দেখিয়ে সাহায্য করে। এটি জ্ঞান প্রদর্শনের ভান করা, বুদ্ধিকে নকলের উপর প্রাধান্য দেওয়া, কল্পনা ও অনুমানের উপর নির্ভর করা এবং আল্লাহ তাআলার উপর স্পর্ধা দেখানোর বিপদ প্রকাশ করে। শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার শপথ নিয়েছে, যেমন আল্লাহ তাআলা সূরা আল-আরাফে তার উক্তি উল্লেখ করেছেন: **'আমি অবশ্যই তোমার সরল পথে তাদের জন্য বসব।'** আল্লাহ কর্তৃক আমাদেরকে এই গোপন শত্রু সম্পর্কে সচেতন করার চেয়ে বড় আর কী নিয়ামত হতে পারে? যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার সম্পর্কে সচেতন না করতেন, তবে আমরা তাকে চিনতাম না। এটি এমন একটি নিয়ামত, যা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক করে।

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ ١٧٠ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنۡعِقُ بِمَا لَا يَسۡمَعُ إِلَّا دُعَآءٗ وَنِدَآءٗۚ صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ١٧١﴾

অর্থ: ***[আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর', তারা বলে, 'না, বরং আমরা অনুসরণ করবো তার, যার উপর আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে পেয়েছি'। যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছু বুঝতো না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তবুও কি?* আর যারা কুফরী করেছে তাদের উদাহরণ তার মত, যে এমন কিছুর জন্য চিৎকার করছে, হাঁক-ডাক ছাড়া যে কিছু শোনে না। তারা বধির, বোবা, অন্ধ। তাই তারা বুঝে না।]*** (আয়াত নং ১৭০-১৭১)।

আল্লাহ তাআলা শয়তানের পদ্ধতি ও তার পদক্ষেপগুলি বর্ণনা করার এবং তা থেকে সতর্ক করার পর, সেই কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যারা সুস্পষ্ট প্রমাণ ও সতর্কবাণী আসার পরও কুফরিতে অবিচল থাকে। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করার অজুহাত দেয়: **'যখন তাদেরকে বলা হয়: আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার অনুসরণ করো, তখন তারা বলে: বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে অবস্থায় পেয়েছি, তার অনুসরণ করব।'** তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতাকে নবী (সা.) এর আনিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রাধান্য দেয়। এটি জ্ঞান ছাড়া দ্বীনের নামে অন্ধ অনুকরণের বিপদ প্রকাশ করে। এটি আরও প্রমাণ করে যে, বুদ্ধিমত্তার জ্ঞান সঠিক পথের জ্ঞান এর বিকল্প নয়। বুদ্ধিমত্তার জ্ঞান হলো পাগলামির বিপরীত, যা দ্বারা মানুষ আকার, রং ও দৈর্ঘ্য বুঝতে পারে। এটি সব মানুষের মধ্যে রয়েছে, মুসলিম ও কাফির উভয়ের মধ্যে। আর সঠিক পথের জ্ঞান হলো সেই বুদ্ধিমত্তা, যা দ্বারা ভালো ও মন্দ, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা যায়। যখন মানুষ সঠিক পথের জ্ঞানকে সত্য অনুসন্ধান ও জানা থেকে বিরত রাখে, তখন সে নিজেকে ধ্বংস করে এবং তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তাই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **'যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা কিছুই বুঝত না এবং সঠিক পথ পেত না, তবুও কি?'** এটি

প্রশ্ন, প্রত্যাখ্যান ও বিস্ময়ের মাধ্যমে এসেছে যে, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করে, যদিও তারা সত্যের কিছুই বুঝত না। কারণ, সঠিক পথের প্রমাণ হলো সত্যকে বেছে নেওয়া, তার অনুসরণ করা এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুকরণ করা। আর মিথ্যার অনুকরণ হলো মূর্খতা ও অপরিপক্কতার প্রমাণ, বিশেষ করে যখন সত্য সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়, যা সঠিক পথ ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে পার্থক্য করে। তখন মিথ্যার অনুকরণ শুধুমাত্র মূর্খতা।

সত্য সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, অজ্ঞদের অন্ধ অনুকরণ মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে সঠিক পথ ও সাফল্য চাই। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন, যা মানুষকে সুস্পষ্ট আয়াত ও প্রমাণের মাধ্যমে সম্বোধন করে, তাকে অজ্ঞতা থেকে জ্ঞান ও জ্ঞানের দিকে এবং মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তার চারপাশের সব কিছুর দিকে, যাতে সে সত্য উপলব্ধি করে এবং তার অনুসরণ করে। এমনকি পৃথিবী ও তার উপর যা আছে, তা থেকে যা সে প্রতিদিন খায় ও পুষ্টি লাভ করে, তা সম্পর্কেও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এই মহান আয়াতটি দাঈদের জন্য অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান প্রদান করে, যা তারা দাওয়াতের পথে সম্মুখীন হতে পারে। এটি ধর্মীয় ও পার্থিব সব বিষয়ে সচেতনতা ও বুদ্ধিমত্তার সঠিক ব্যবহারের গুরুত্ব প্রকাশ করে। মানুষের সুবিধাবাদি হওয়া উচিত নয়। বরং মানুষের উচিত নিজেকে সুসংহত করা। কিছু কাফির ব্যক্তির ইসলামে প্রবেশ করতে বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণ হলো তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে, যা তাদেরকে এমন সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা থেকে বিরত রাখে, যা তাদেরকে সত্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং, অনুকরণ হয় অজ্ঞতার ভিত্তিতে, নয়তো জ্ঞান ও জ্ঞানের ভিত্তিতে। অজ্ঞতার ভিত্তিতে তাকলিদ হলো অনুকরণকারীর জন্য ধ্বংস। আর ভালোর জন্য ও ভালো লোকদের জন্য সচেতনতা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুকরণ কাম্য, যার শীর্ষে

রয়েছে নবী (সা.) এর অনুসরণ। ইমাম কুরতুবী (রহ.) আলেমদের মতামত বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, তাকলিদের প্রকার ও বিধান সম্পর্কে। যে ব্যক্তি আরও জানতে চায়, সে তা দেখতে পারে। এছাড়াও, ইমাম শাওকানী (রহ.) তাঁর বই **'আদাবুত তালাব ওয়া মুনতাহাল আরব'** গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের পদ্ধতির একটি উদাহরণ দিয়েছেন, যাতে তা আরও স্পষ্ট ও শিক্ষণীয় হয়, যাতে তারা সঠিক পথ পায় এবং অন্যদের জন্য তা একটি উপদেশ হয়। এটি যেন জ্ঞান ও ব্যাখ্যারও মাধ্যম হয়: **'আর যারা কুফরী করেছে তাদের উদাহরণ তার মত, যে এমন কিছুর জন্য চিৎকার করছে, হাঁক-ডাক ছাড়া যে কিছু শোনে না। তারা বধির, বোবা, অন্ধ। তাই তারা বুঝে না।'** এতে শিক্ষা ও বোঝার উপকরণ অকার্যকর করার বিপদ প্রকাশ পায়। মানুষ তার কানকে সত্য শোনা থেকে, তার জিহ্বাকে প্রশ্ন করা ও ভালো কথা বলা থেকে এবং তার চোখকে তার চারপাশের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণ দেখা থেকে বিরত রাখে। তারা নবী (সা.)-কে দেখে এবং কুরআন শোনে, কিন্তু তা থেকে উপকৃত হয় না। বস্তুত যারা কুফরি করেছে, তাদের উদাহরণ হলো পশুর মতো, যাকে রাখাল ডাকে, কিন্তু পশুর রাখালের কথার অর্থ ও তাৎপর্য বোঝার কোনো জ্ঞান বা বুদ্ধি নেই। তারা শুধুমাত্র শব্দ শোনে, কিন্তু এর অর্থ জানে না। কাফিররাও সত্যের আহ্বানের শব্দ শোনে, কিন্তু তারা তাদের কান, জিহ্বা ও চোখকে তা থেকে বিরত রাখে, যেন তারা কিছু শুনেনি বা দেখেনি। তারা শুধুমাত্র এমন একটি শব্দ শোনে, যা তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু তারা তা থেকে উপকৃত হয় না। তারা বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে না, যা হলো সঠিক পথের জ্ঞান, নয়তো বুদ্ধিমত্তার জ্ঞান, যা দ্বারা তাদের থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়। এই উদাহরণটি তাদের জন্য প্রযোজ্য, যারা এমন কিছুকে ইবাদত করে, যা শোনে না, দেখে না বা কথা বলে না, যেমন মূর্তি। তারা তাদেরকে ডাকে ও তাদের কাছে প্রার্থনা করে, কিন্তু তারা তাদের কথার কিছুই বুঝে না। এটি প্রমাণ করে যে, উদাহরণ দেওয়া শিক্ষার একটি পদ্ধতি, যা দ্বারা দাঈ ও শিক্ষক তার উদ্দেশ্য সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে পারে এবং শ্রোতার বুদ্ধিমত্তার কাছে তা সহজবোধ্য করতে পারে। এটি বুদ্ধিমত্তাকে জাগ্রত করে ও চিন্তাকে

সক্রিয় করে, উদাহরণের বিষয়বস্তু ও তাৎপর্যের মাধ্যমে। এটি শিক্ষামূলক ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে উদাহরণ দেওয়ার পদ্ধতির গুরুত্ব প্রকাশ করে।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٧٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ مَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٤ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةِۚ فَمَآ أَصۡبَرَهُمۡ عَلَى ٱلنَّارِ ١٧٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَفِي شِقَاقِۭ بَعِيدٖ ١٧٦﴾

অর্থ: ***[হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে খাও এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা শুধু তারই ইবাদাত কর।* নিশ্চয় তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশ্ত এবং যা গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে। সুতরাং যে বাধ্য হবে, অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে, তাহলে তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।* নিশ্চয় যারা গোপন করে আল্লাহ কিতাব হতে যা নাযিল করেছেন তা এবং এর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা তাদের নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই খায় না। আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।* তারাই হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে; সুতরাং আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল!* তা এই কারণে যে, আল্লাহ যথার্থরূপে কিতাব নাযিল করেছেন। আর নিশ্চয় যারা কিতাবে মতবিরোধ করেছে, তারা অবশ্যই সুদূর মতানৈক্যে রয়েছে।]*** (আয়াত নং ১৭২-১৭৬)।

পূর্ববর্তী আয়াতে সব মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে: **'হে মানুষ! পৃথিবীতে যা আছে, তা থেকে হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করো।'** আর এই আয়াতে বিশেষভাবে মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে: **'হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যা রিজিক দিয়েছি, তা থেকে পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করো এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো, যদি**

তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করো।' পূর্ববর্তী আয়াতে সব মানুষকে শয়তান থেকে সতর্ক করা হয়েছে, যে তাদেরকে তাদের স্রষ্টা ও রিজিকদাতা থেকে বিরত রাখে। আর এই আয়াতে মুমিনদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়নি, কারণ তা সব মানুষের জন্য সাধারণ বক্তব্য, মুমিন ও কাফির উভয়ের জন্য। কাফিররা এমন কিছু করেনি, যা তাদেরকে শুকরিয়া আদায় করতে বাধ্য করে। তাই তাদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তাদের শত্রু থেকে সতর্ক করা হয়েছে, যে মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ তাআলার নামে অজ্ঞতার ভিত্তিতে কথা বলে। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সম্বোধন করেছেন, যা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যাতে তারা আল্লাহ তাআলার পবিত্র রিজিক থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। এই বিন্যাস ও সামঞ্জস্য নির্দেশনা ও তার তাৎপর্যে কুরআনের বক্তব্যের সূক্ষ্মতা ও এর অলৌকিক বাগ্মীতার প্রমাণ দেয়। এটি আরও প্রমাণ করে যে, বক্তব্যের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো দাওয়াত, শিক্ষা বা প্রশাসনিক নির্দেশনা তখনই দেওয়া উচিত, যখন শ্রোতা তার পূর্বশর্ত পূরণ করে। তাই সংশ্লিষ্ট পূর্বশর্ত বিবেচনা করা আবশ্যক। এর অর্থ হলো অগ্রাধিকারের ক্রম বিবেচনা করা। যেমন, যদি নামাজের একামত দেয়া হয়, তখন কাফিরকে তা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ না সে এর পূর্বশর্ত পূরণ করে, আর তা হলো শাহাদাতাইন পাঠ করা।

এই আয়াতের মূল বিষয় হলো এই সত্য প্রতিষ্ঠা করা যে, রিজিক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে*:* **'আমি তোমাদেরকে যা রিজিক দিয়েছি, তা থেকে পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করো।'** এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে সাধারণভাবে শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন*:* **'এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো।'** সুতরাং, শুকরিয়া আদায় করতে হবে আল্লাহর, যিনি তোমাদেরকে এই পবিত্র খাদ্য দিয়েছেন। শুকরিয়া হবে হৃদয়ের বিশ্বাস, জিহ্বার উচ্চারণ ও কাজের বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এটি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিমূলক কাজে রিজিক ব্যয় করার মাধ্যমে করা যায়, যেমন সদকা

দেওয়া। আর এই খাদ্যগুলোকে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি অর্জনকারী কাজ থেকে দূরে রাখা, যেমন অপচয় ও অহংকার।

এরপর ইবাদত ও শুকরিয়ার মধ্যে একটি সম্পর্ক ও সংযোগ রয়েছে, যা এই আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে: **'এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো, যদি তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করো।'** এই আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, শুকরিয়া হলো ইবাদত, কারণ এটি থেকে বোঝা যায় যে, যদি তোমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো, তবে তাঁর এই নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করো। শুকরিয়ায় এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, মুমিন বান্দা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে, কারণ শুকরিয়া হলো এই স্বীকারোক্তি যে, এই পবিত্র খাদ্য আল্লাহ তাআলার রিজিক, যা তিনি সাধারণভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং বিশেষভাবে বান্দাকে দিয়েছেন। এটি অর্জন করা বান্দার প্রচেষ্টা, সেচ দেওয়া বা কেনার মাধ্যমে নয়, যেমন আল্লাহ তাআলা সূরা আল-ওয়াকিয়ায় বলেছেন: **'তোমরা কি দেখো না যে, তোমরা যা চাষ করো, তা তোমরা উৎপন্ন করো, নাকি আমি উৎপন্ন করি? যদি আমি চাইতাম, তবে আমি তা ধ্বংস করে দিতাম, তখন তোমরা অবাক হয়ে যেতে।'** (সূরা আল-ওয়াকিয়া) আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এর উপকারিতা সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। এটি প্রমাণ করে যে, শুকরিয়া হলো একটি মহান ইবাদত, যা মুমিনকে পালন করতে হবে এবং এর দায়িত্বগুলি পূরণ করতে হবে।

এরপর আল্লাহ তাআলা যেসব প্রাণীর মাংস খাওয়া হারাম করেছেন, তা বর্ণনা করেছেন: **'তোমাদের জন্য শুধুমাত্র মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে জবাই করা হয়েছে, তা হারাম করা হয়েছে।'** গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, হারাম হওয়ার কারণ হলো এগুলো ক্ষতিকর, যা পবিত্র আত্মা গ্রহণ করে না। মৃত প্রাণী হলো সেই প্রাণী, যা নিজে মারা গেছে, তাই তার প্রাণ বেরিয়ে গেছে জবাই ছাড়াই। এই আয়াতে মৃত্যুর পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু মৃত্যুর মাধ্যম নির্দিষ্ট করা হয়নি। এই অনির্দিষ্টতার মধ্যে একটি মহান উপকারিতা রয়েছে, কারণ নতুন নতুন মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন বৈদ্যুতিক শক। এটি কুরআনের ঐশী

নির্দেশনার অলৌকিকতার একটি উদাহরণ। এই ধরনের হারাম মাংসে রক্ত জমে থাকে, কারণ তা জবাই করা হয়নি। এর থেকে ব্যতিক্রম হলো মাছ ও পঙ্গপাল, যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: **'আমাদের জন্য দুটি মৃত প্রাণী হালাল করা হয়েছে: মাছ ও পঙ্গপাল, এবং দুটি রক্ত: যকৃত ও প্লীহা।'** (মুসনাদে আহমাদ)। আয়াতে উল্লেখিত রক্ত বলতে প্রবাহিত তরল রক্ত বোঝানো হয়েছে। এছাড়াও, শূকরের মাংস হারাম, কারণ তা নাপাক। আর যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে জবাই করা হয়েছে, যেমন মূর্তির নামে জবাই করা প্রাণী, তা হারাম। এই বিষয়গুলো ফিকহের বইগুলিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। তবে বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত ও দয়ার কারণে, তিনি তাদেরকে নিরুপায় অবস্থায় এই হারাম জিনিসগুলো থেকে খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, যাতে তাদের নিরুপায় অবস্থার ক্ষতি দূর হয়। কাজেই যদি কেউ ক্ষুধার কারণে মৃত্যুর আশঙ্কা করে, তবে সে তার প্রয়োজন অনুযায়ী খেতে পারে। এটি এই শর্তে সীমাবদ্ধ যে, সে **'অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে'** এই হারাম জিনিসগুলো খাবে, আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন তা চাওয়া বা কামনা করা ছাড়াই। সে সীমা লঙ্ঘন করবে না, কারণ এর একমাত্র কারণ হলো নিরুপায় অবস্থা, যা হলো ক্ষুধার কারণে মৃত্যুর ভয়। আল্লাহ তাআলা এই নিরুপায় অবস্থার প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু: **'নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।'** তিনি যা ঘটেছে, তা ক্ষমা করেন এবং নিরুপায় অবস্থার সময় তাদের জন্য যা হারাম করা হয়েছে, তা অনুমতি দেওয়ার মাধ্যমে তাদের প্রতি দয়া দেখান। এটি আল্লাহ তাআলার রহমতের একটি উদাহরণ।

এই আয়াতের আরেকটি উপকারিতা হলো: শরীয়ত মানুষের জীবনের প্রতি যত্নশীল, নিষেধ ও অনুমতির মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা তার জন্য যা ক্ষতিকর, তা হারাম করেছেন এবং নিরুপায় অবস্থার সময় তার জন্য যা মৃত্যু থেকে রক্ষা করে, তা অনুমতি দিয়েছেন। এটি ইসলামে মানুষের মর্যাদা ও অবস্থান প্রকাশ করে এবং তার সংরক্ষণ, চিকিৎসা ও মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়ার উপায় বন্ধ করার প্রতি যত্ন প্রকাশ করে।

এটি আইন ও নিয়ম প্রণয়নের ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা ও সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিবেচনার গুরুত্ব প্রকাশ করে। নির্দেশনা দেওয়া এবং সাধারণ আইন ও নিয়ম প্রণয়নের সময় সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিবেচনা করা আবশ্যক। এটি একটি চূড়ান্ত প্রমাণ যে, এই বিধান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, কারণ এটি এমন সব সতর্কতা ও নির্দেশনার সূক্ষ্মতা ধারণ করে, যা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না। এমনকি মানুষ ও জিনের সম্মিলিত জ্ঞানও এর সূক্ষ্মতা উপলব্ধি করতে পারে না। এছাড়াও, লক্ষণীয় যে, কুরআনের শব্দ সংখ্যা কম, কিন্তু এর অর্থ, তাৎপর্য ও বিভিন্ন উপকারিতা ব্যাপক। এটি কুরআনের বুদ্ধি ও মানসিক প্রভাবের শক্তিও প্রকাশ করে।

এরপর কুরআনের বর্ণনা আবারও আহলে কিতাবের দিকে ফিরে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন: **'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নাযিল করা কিতাবের কিছু অংশ গোপন করে এবং তা দ্বারা সামান্য মূল্য গ্রহণ করে...'** এই মহান কুরআনিক বর্ণনায় আহলে কিতাবের দুটি কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: গোপন করা ও ক্রয় করা। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবের আলেমদের কাজের নিন্দা করেছেন, যারা সত্য গোপন করে এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়ত ও বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে রাখে, যা আল্লাহ তাআলা তাদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তারা যা গোপন করে, তা দ্বারা তারা সামান্য মূল্য গ্রহণ করে, যা তার সময়সীমা শেষ হয়ে যায় এবং প্রদত্ত অর্থ হ্রাস পেয়ে শেষ হয়ে যায়। এছাড়াও, এটি একটি সামান্য ও নগণ্য মূল্য, আখিরাতের স্থায়ী প্রতিদানের তুলনায়, যা হ্রাস পায় না বা শেষ হয় না। এটি সতর্ক করে যে, দুনিয়ার সামান্য লাভের আশায় শরীয়তের তাৎপর্য ও প্রমাণ গোপন বা পরিবর্তন করা থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের শাস্তি বর্ণনা করেছেন: **'তারা যা খায়, তা তাদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই নয়। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'** তারা দুনিয়ায় যে সম্পদ খেয়েছে, তা কিয়ামতের দিন তাদের পেটে আগুন হবে। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা যা হুঁশিয়ারি করেছেন তা থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

দ্বিতীয় শাস্তি হলো, তারা আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলা থেকে বঞ্চিত হবে: **'আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না।'** তারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি পাবে না, বরং আল্লাহ তাআলার ক্রোধ পাবে। কিয়ামতের দিন এমন কোনো শাস্তি নেই, যা আত্মার জন্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও তাঁর কথা থেকে বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে কঠোর। তৃতীয় শাস্তি হলো: **'তাদেরকে পবিত্র করবেন না।'** আল্লাহ তাআলা তাদের গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না, কারণ তিনি তাদের উপর ক্রুদ্ধ এবং তাদের থেকে অসন্তুষ্ট। চতুর্থ শাস্তি হলো: **'তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'**

এই লোকদের বৈশিষ্ট্য হলো যে, তারা পথভ্রষ্টতাকে হিদায়াতের বিনিময়ে কিনেছে। তারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতাকে হিদায়াতের পরিবর্তে গ্রহণ করেছে এবং এর জন্য মূল্য দিয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, তারা জানত তারা কী করছে। এটি আহলে কিতাবের আলেমদের অবস্থা প্রকাশ করে ও উন্মোচন করে। অন্য দিক থেকে, এটি দুনিয়ার লোভ থেকে সতর্ক করে, যা মানুষকে তার আখিরাতকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এটি অবহেলা থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক করে। আল্লাহ আমাদের ও সব মুসলিমকে তা থেকে রক্ষা করুন। সুতরাং, তারা যেন শাস্তি কিনেছে এবং এর জন্য মূল্য দিয়েছে। তারা আল্লাহ তাআলার ক্ষমাকে, যা জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়, দুনিয়ার সামান্য সুবিধার বিনিময়ে বিক্রি করেছে: **'তারাই যারা পথভ্রষ্টতাকে হিদায়াতের বিনিময়ে এবং শাস্তিকে ক্ষমার বিনিময়ে কিনেছে। তারা আগুনের উপর কত ধৈর্যশীল!'** এটি কাজকর্মে গভীর চিন্তা, আত্মসমালোচনা ও সত্যের দিকে ফিরে আসা আবশ্যক করে। হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে হিদায়াত ও সাফল্য চাই।

এরপর আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি এই কুরআন সত্য ও প্রমাণ সহকারে নাযিল করেছেন: **'এটি এ কারণে যে, আল্লাহ কিতাব সত্য সহকারে নাযিল করেছেন।'** এটি প্রমাণ করে যে, এটাকে এর উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। এটি একটি সত্য কিতাব, যাতে কোনো বক্রতা নেই। এরপর কুরআনের বর্ণনা আহলে কিতাবের মধ্যে মতবিরোধের দিকে যায়, যা মুমিনদের জন্য একটি উপদেশ ও

নির্দেশনা। আল্লাহ তাআলা বলেন: **'নিশ্চয়ই যারা কিতাব সম্পর্কে মতবিরোধ করেছে, তারা গভীর বিভেদে নিপতিত।'**আহলে কিতাব, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা কিতাব সম্পর্কে মতবিরোধের কারণে গভীর বিভেদে নিপতিত হয়েছে। এটি মতবিরোধের ক্ষতি থেকে সতর্ক করে। সত্যের অনুসারীদের মধ্যে সত্য নিয়ে মতবিরোধ করা উচিত নয়। কিন্তু প্রবৃত্তির অনুপ্রবেশ সত্যের ক্ষেত্রে মতবিরোধ সৃষ্টি করে, ভুল ব্যাখ্যা, অসম্পূর্ণ বোঝাপড়া ও ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির মাধ্যমে। এটি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা থেকে কিছু অংশকে প্রবৃত্তির নির্দেশনার দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এটি প্রমাণ করে যে, প্রবৃত্তিকে সত্যের অধীন করা উচিত, সত্যকে প্রবৃত্তির অধীন করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি সত্যকে প্রবৃত্তির অধীন করে, সে পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদের সাথে বিভেদে নিপতিত হয়। এটি আরও প্রমাণ করে যে, সত্য উম্মাহকে একত্রিত করে। আর যে ব্যক্তি সত্যের বিরোধিতা করে, সে সত্য ও তার অনুসারীদের সাথে বিভেদে নিপতিত হবে। এটি সত্যের দিকে পরিচালিত করার জন্য দাওয়াতের গুরুত্বও প্রকাশ করে এবং প্রমাণের ভিত্তিতে তার অনুসরণ করা আবশ্যক করে।

﴿لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَٰهَدُواْۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ ١٧٧﴾

অর্থ: ***[পূণ্যের কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং পূণ্যের কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে নিজের আসক্তি থাকা সত্ত্বেও অর্থ দান করে নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় এবং যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।]*** *(*আয়াত নং ১৭৭*)*

আয়াতটি এই মর্মে সূচিত হয়েছে যে, কেবল কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ আদায় করাকেই পূণ্যের কাজ মনে করা ভুল। এটি মূলত এই ভুল ধারণার খণ্ডন ও সংশোধনের জন্য উত্থাপিত হয়েছে, যাতে মানুষের মনের ভ্রান্তি দূর হয়ে সঠিক সত্য উপলব্ধি করতে পারে এবং সেই সত্য জানার প্রতি তাদের মনোযোগ আরও গভীর হয়। *(*পূণ্যের কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে*)"* যেন এর মাধ্যমে শ্রোতার মনে প্রশ্ন জাগে*:* তাহলে পূণ্য আসলে কী*?*

এর পরপরই উত্তর এসেছে*: (*বরং পূণ্যের কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে।*)* সুতরাং, পূণ্য হলো

ঈমান, ইবাদত, নৈতিকতা এবং আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখার প্রচেষ্টা, পাশাপাশি অন্যদের প্রতি সেই অধিকারগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া, যা আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন। ফলে এই আয়াতটি একইসাথে জ্ঞান ও শরীয়তের বিধান উপস্থাপন করেছে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুখ-শান্তি অর্জনের পথ নির্দেশ করেছে।

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "পূণ্য হলো সমস্ত কল্যাণের একটি সমষ্টিগত নাম।"[২১] এটি সেই সকল কাজের সমষ্টি যা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং সন্তুষ্ট হন। আমাদের আলেমগণ বলেছেন: "এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত, যা শরীয়তের মূল বিধানগুলোর মধ্যে গণ্য। কারণ এতে ষোলটি মূলনীতি রয়েছে: আল্লাহ এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস, হাশর-নাশর, মীযান, পুলসিরাত, হাউযে কাউসার, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতাগণ, নাযিলকৃত কিতাবসমূহ এবং সেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য হওয়া, নবীগণ, সম্পদের ব্যয়, নামাজের যত্ন, যাকাত আদায়, প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ।"[২২]

এই মহৎ ও সম্মানিত আয়াতটি পূণ্যের ব্যাপকতাকে স্পষ্ট করেছে এবং এটিকে কেবল কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং এটি আরও বিস্তৃত ও গভীর; পূণ্য হলো আল্লাহর জন্য হৃদয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কিছু বিশ্বাস এবং কর্তব্য পালনে নিয়োজিত রাখার নাম।

এ আয়াতটি ঈমানের রূকনগুলো উল্লেখ করেছে: আল্লাহর প্রতি ঈমান, পরকালের দিন, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ (অর্থাৎ সকল আসমানি কিতাব) এবং নবীগণের প্রতি ঈমান। তবে ষষ্ঠ রূকন তথা তাকদিরের প্রতি ঈমান, এটি সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সে বিষয়ে আয়াতটিতে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর এ কথার মাধ্যমে:

---

(২১) আল-জামে লি আহকামিল কুরআন: (২/১৬০)

(২২) পূর্বোক্ত

"আর যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায়।" এই ধৈর্য মূলত তাকদিরের ওপর বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহই ভাল জানেন।

এই আয়াতে সামাজিক সহযোগিতার একটি দিক প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে অন্যদের অবস্থার প্রতি খেয়াল রেখে তাদেরকে সেই অর্থসাহায্য দিতে বলা হচ্ছে, যা একজন সক্ষম ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জন করে, এবং যা তার হৃদয়ে প্রিয় হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা এখানে তার অর্থের প্রতি ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করেননি, বরং এটি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তাকে উৎসাহিত করেছেন, যাতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের প্রিয় অর্থ ব্যয় করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন: (এবং যে নিজের আসক্তি থাকা সত্ত্বেও অর্থ দান করে)— এতে আল্লাহ তাআলা তাকে নিজের অর্থের প্রতি আকর্ষণের বিপরীতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যয় করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

এই ঈশ্বরিক পদ্ধতির শিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হলো যে, শিক্ষার্থীকে এমন কোন বিষয় থেকে বিমুখ করা উচিত নয় যা সত্যের একটি অংশ, কিংবা তাকে এমন কিছু শেখানো উচিত নয় যা বাস্তবতার বিপরীত, শুধুমাত্র তাকে অন্য একটি ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, অথবা একটি কাজ ত্যাগ করে আরেকটি গ্রহণের জন্য যা তুলনায় শ্রেষ্ঠ। বরং তাকে এমন একটি সত্যের প্রতি উৎসাহিত করা উচিত, যা তার প্রকৃতি ও বোধশক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যাতে তার মন সঠিক দিকনির্দেশনা ও পরামর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। এরপর তাকে সঠিক কাজ বা নিষেধ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানানো উচিত, অথবা উচ্চতর কাজের তুলনায় নিম্নতর কাজ বর্জনের গুরুত্ব বুঝানো উচিত।

এই মহৎ আয়াতে দানের ব্যাপারে একটি বিস্তৃত নীতি তুলে ধরা হয়েছে, যা শুধু আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর উপকারিতা সব মানুষের জন্য বিস্তৃত করেছে। যাতে পুরো সমাজ একে অপরকে সহায়তা করে এবং একে অপরকে শক্তি

যোগায়। এই সহযোগিতা ও সহানুভূতির প্রয়াস যেন সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে যেহেতু এটি আল্লাহ তাআলার আদেশ, যিনি দিয়েছেন, অতঃপর নির্দেশ করেছেন এবং যিনি তোমার প্রতি অপরকে মুখাপেক্ষী করেছেন। কাজেই যিনি অন্যকে তোমার প্রতি মুখাপেক্ষী করেছেন- সেই তিনিই তোমাকে তাদের প্রতি সদাচরণ করতে, তাদের সাহায্য করতে এবং তাদের খোঁজ নেওয়া ও প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও আদেশ করেছেন।

একই সঙ্গে, যিনি অভাবী ও দরিদ্র করেছেন, সেই তিনিই আর্থিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তারা তার খোঁজ নেয় এবং তাকে দান করে। বস্তুত এটি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, দাতা ব্যক্তির কোনো বড়ত্ব নয়। এই নির্দেশনা দ্বারা যাকাত উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি যাকাতের বাইরে অন্য দানের ব্যাপারে। কারণ সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও অন্যে অধিকার রয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে "যাকাত" শব্দটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আলেমরা, যেমন ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[২৩]

অনুরূপভাবে এই হকদারদের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণের একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে: প্রথমে আত্মীয়স্বজন, যাদের অধিকার অন্যদের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এরপর এতিম, যে তার বয়সের কারণে এবং উপার্জনের পদ্ধতি জানার অক্ষমতার কারণে অর্থ উপার্জনে সক্ষম নয়। তারপর মিসকীন, যে অর্থ সংগ্রহের পথ জানলেও তা অর্জনে অক্ষম। এজন্য এতিমের অধিকার মিসকীনের ওপর অগ্রাধিকার পেয়েছে। এরপর রয়েছে মুসাফির, যে ভ্রমণকালে অসুবিধায় পড়েছে। তারপর রয়েছে প্রার্থনাকারী, যারা তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য হাত বাড়িয়ে সাহায্য চায়। এবং সর্বশেষে রয়েছে দাস মুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়।

---

(২৩) আল-জামে লি আহকামিল কুরআন: (২/১৬২)

যদি মানুষ এই ক্রমানুসারের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করে, যা তাদের অক্ষমতা ও সক্ষমতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে, তবে তারা এই অনন্য বিন্যাস দেখে মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর প্রজ্ঞার প্রতিফলন দেখে বিস্মিত হবে।

আয়াতে কারীমায় উল্লেখিত ইবাদাতগুলোর মধ্যে রয়েছে সালাত ও যাকাত। সালাত হলো এক প্রকার ইবাদাত যা বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, আর যাকাত হলো আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে এমন এক ইবাদাত, যা বান্দা ও তার সমাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। এতে ইবাদাতের এই দুই দিকের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যেহেতু এগুলো দ্বীনের উদ্দেশ্যের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যান্য ইবাদাতকে নির্দেশ করে। যেমন, রোজা ও হজ সালাতের মতোই বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। আর যাকাত হলো আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে এমন ইবাদাত যার ভিত্তি সমাজের সদস্যদের মধ্যে দান-অনুদানের মাধ্যমে সহযোগিতা। এটি সদকা ও কাফফারার মতো অন্যান্য ইবাদাতেরও প্রতিনিধিত্ব করে।

আয়াতে কারীমায় এমন কিছু মহান নৈতিকতার উল্লেখ রয়েছে, যা সমাজের সংহতি নিশ্চিত করে এবং মানুষের মন্দ প্রবৃত্তিগুলো দূর করে। এগুলোর অন্যতম হলো অঙ্গীকার পূরণ, যা চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর মধ্যে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা প্রদান করে। কারণ, অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা ব্যক্তি, সমাজ, এমনকি দেশ ও রাষ্ট্রের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে, অঙ্গীকার রক্ষা ও তা পূরণের মাধ্যমে সামাজিক এক বিশাল নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তারপর পবিত্র আয়াতে তিনটি কঠিন অবস্থায় ধৈর্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদি কেউ এর একটিতে ধৈর্য ধারণ করতে পারে, তবে আল্লাহর সাহায্যে সে অন্যান্য পরিস্থিতিতেও তা অবলম্বন করতে পারবে। এই অবস্থাগুলো হলো: (البأساء) চরম দারিদ্র্য, (الضراء) রোগব্যাধি, এবং (وحين البأس) আল্লাহর পথে তীব্র যুদ্ধের সময়। এই প্রতিটি অবস্থাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে একপ্রকার জিহাদ। যে ব্যক্তি আল্লাহর সর্বক্ষণিক

পর্যবেক্ষণ অনুভব করে, সে এই গুণাবলি অর্জন করতে সক্ষম হয়। কারণ, তার আল্লাহর উপর অগাধ আশা থাকে যে, তিনি তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে উত্তম পুরস্কার দেবেন, রোগ থেকে সুস্থতা ও প্রতিদান প্রদান করবেন, এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে বিজয় দান করবেন অথবা শাহাদাতের মাধ্যমে তাকে চিরস্থায়ী সুখময় জীবন দান করবেন।

এতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, মানুষকে এ অবস্থাগুলোর কোনো একটি দিয়ে পরীক্ষা করা হতে পারে। যদি সে কোনো একটির মুখোমুখী হয়, তবে তাকে এই বিষয়টির পরিণতি জানা উচিত, যা আল্লাহ তাআলা এই মহান আয়াতের শেষে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: " তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।" হে আল্লাহ! আপনার রহমতের দ্বারা আমাদেরকে সত্যনিষ্ঠ এবং মুত্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত করুন, হে জগতসমূহের প্রভু, হে সর্বশেষ্ঠ দয়ালু।

বস্তুত সত্যনিষ্ঠ ও মুত্তাকী ব্যক্তিরা সৃষ্টির সেরা মানুষ, কারণ তারা উত্তম চরিত্রের গুণাবলী ধারণ করেছেন। তাই তারা পরিপূর্ণ প্রশংসার যোগ্য। আল্লাহ তাআলা কুরআনের বহু আয়াতে মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত রাখা পুরস্কার ও প্রতিদানের কথা উল্লেখ করেছেন।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩﴾

অর্থ: ***[হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর 'কিসাস' ফরজ করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সহজীকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।* আর হে বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্নগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।]*** *(আয়াত নং ১৭৮)*

এরপর কুরআনিক প্রসঙ্গ সৎকর্মের বাস্তবতা স্পষ্ট করার পর মানুষের জীবন পরিচালনার নিয়ম-কানুন এবং স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার বুনিয়াদ স্থাপনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এটি মানুষের মধ্যে স্থিরতা ও শান্তি প্রোথিত করে, যাতে তারা সম্মানজনক, নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করতে পারে। এই অবস্থায় তারা তাদের উপর অর্পিত দুনিয়া ও আখিরাতের দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর 'কিসাস' ফরয করা হয়েছে।" আয়াতটি মুমিনদের প্রতি আহ্বান দিয়ে শুরু হয়েছে, কারণ এই মহান দ্বীনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য তারাই দায়িত্বপ্রাপ্ত।

এরপর এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, নিহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে এই আইন প্রয়োগ করা ফরজ করেছেন। এই নির্দেশনার ভাষা নির্দেশ করে যে, এটি বাস্তবায়ন করা এবং অনুসরণ করা অপরিহার্য, যাতে মানুষের মধ্যে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা যা নির্ধারণ করেছেন, তা রক্ষা করা সকল পক্ষের দায়িত্ব। এতে কোনো ধরনের আপোস বা সত্য গোপন করা উচিত নয়। শাসককে অবশ্যই এটি কার্যকর করতে হবে এবং জনগণকে তা মেনে চলতে হবে, এমনকি হত্যাকারীর পরিবারকেও শাসককে আল্লাহ তাআলার আদেশ বাস্তবায়নে সহায়তা করতে হবে। কোনোভাবেই হত্যাকারীকে আশ্রয় দেয়া উচিত নয়, কারণ তাতে আল্লাহ তাআলার বিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং তাঁর নির্ধারিত শাস্তি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হবে।

এরপর আল্লাহ তাআলা আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন "স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী।" ইমাম কুরতুবী রহঃ বলেছেন: (একদল আলেম বলেছেন, এই আয়াতটি সেই বিধানটি স্পষ্ট করেছে, যা কেউ তার অনুরূপ কাউকে হত্যা করলে প্রযোজ্য হয়। অর্থাৎ, মুক্ত ব্যক্তি যদি অন্য মুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করে, দাস যদি অন্য দাসকে হত্যা করে, এবং নারী যদি অন্য নারীকে হত্যা করে, তাহলে তাদের বিচার কী হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে।)[২৪]

মুফাসসীরগণ উল্লেখ করেছেন যে, এটি নাজিল হয়েছিল একটি বিশেষ পরিস্থিতির কারণে, যেখানে কিছু মানুষ প্রতিশোধ গ্রহণে অবিচার করত। যখন কোনো দাস হত্যা হতো, তারা দাবী করত যে, তার প্রতিশোধে এক স্বাধীন ব্যক্তি হত্যা করা হোক, যা ছিল অযৌক্তিক ও সীমালঙ্ঘনমূলক। ফলে এটি ইঙ্গিত করে যে, কুরআন যখন নাজিল হয়েছে, তখন এটি এমন কিছু সমস্যা এবং সাধারণ বাস্তবতাকে সমাধান করছিল যা ভবিষ্যতেও চলতে থাকত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর শরীয়তের মাধ্যমে মুসলিমদের ভবিষ্যত জীবনকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করার জন্য একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা স্থাপন করেছেন। তেমনিভাবে এটাও বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে আয়াত নাযিলের কারণ জানা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, এবং একইভাবে, নাসিখ ও মাকসুখ (রহিতকারী ও রহিত বিধান) সম্পর্কে জানাও গুরুত্বপূর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট

(২৪) আল-জামে লি আহকামিল কুরআন: (২/১৬৫)।

আয়াতগুলোর সমন্বয়সাধনের গুরুত্ব রয়েছে, যাতে আল্লাহর উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। কেননা এ বিষয়ে আলোচ্য আয়াত ছাড়াও সূরা মায়িদাতে আল্লাহর এ বাণীও রয়েছে: ***[আর আমি তাদের জন্য এতে (তওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদল প্রাণ।]*** আয়াত নং ৪৫। এটি অত্যন্ত গুরুতর একটি ভুল যে, কোনো আয়াতকে এককভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, সংশ্লিষ্ট অন্য আয়াত অথবা অর্থ স্পষ্টকারী হাদীস এড়িয়ে যাওয়া হয়। এই বিষয়গুলো থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের পন্থা মানুষের চিন্তা-ধারা প্রসারিত করেছে এবং মেধার উন্নতি সাধন করেছে, যার ফলে শরয়ী আলেমগণ চিন্তাভাবনায় ও মেধায় শ্রেষ্ঠ। এজন্য, তাফসীর এবং ফিকহের কিতাবগুলিতে আলেমরা সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে ফিকহী বিধানগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছেন, এমনকি একজন জিম্মী হত্যা বা তার সম্পদ চুরি হওয়ার বিধান বিষয়েও। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, এই শরীআত মানুষের জীবনকে শাস্তির বিধানের মাধ্যমে আলোকিত করেছে এবং আলেমদের চিন্তাভাবনাকে হুকুম-আহকাম সম্বলিত জ্ঞানে গভীর হওয়া, দলীলগুলোর অর্থ বিশ্লেষণ এবং কুরআন ও হাদীসের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে আলোকিত করেছে। এর ফলস্বরূপ, ইসলামী ফিকহ একটি মহান মর্যাদাপূর্ণ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে এবং এটি মুসলিমদের জন্য আইন তৈরির প্রয়োজনীয়তা দূর করেছে, যা মানুষকে একমত করতে পারে না। কাজেই সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই।

এরপর এই আয়াতে ক্ষমার দিকটি স্পষ্ট করা হয়েছে, যা মুসলিমদের মধ্যে শরীয়তের অন্যতম একটি দাবী: (তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে।) এখানে, এমনকি হত্যার মতো একটি গুরুতর ঘটনাতেও, আল্লাহ তাআলা সম্পর্কটিকে ভ্রাতৃত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, যা ঘটেছে তা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে বিলীন করে না। কাজেই যে ব্যক্তি হত্যাকারীকে ক্ষতিপূরণ বা বিনা মূল্যেই ক্ষমা করে দিবে, তাহলে তাকে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে ভালো আচরণ করতে হবে (তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে।)

অতএব হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তির ওলী তার হত্যাকারী ভাইয়ের প্রতি সদ্ভাবে আচরণ করবে, অতিরিক্ত বোঝা না চাপিয়ে। তাকে এমন কিছুতে বাধ্য করবে না যা তার সাধ্যাতীত। বরং সুষ্ঠুভাবে মামলা, দাবি ও তদন্ত পরিচালনায় সহানুভূতি প্রদর্শন করবে, এবং যদি ক্ষতিপূরণ চায় তাহলে তাকে এমন কিছু দিতে বলবে না যা সে দিতে অক্ষম। অন্যদিকে হত্যাকারীও উচিত ক্ষতিপূরণ আদায় করা। তবে তা হতে হবে ভালোভাবে, কোনো প্রকার টালবাহানা বা অপমানজনক কথা বা কাজ ছাড়া। এটি পরম দয়ালু ও উদার আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মহান নির্দেশনা, যাতে তিনি ক্ষমা করার দিকে উৎসাহিত করেছেন এবং তা প্রেরণাদান ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তারপর আল্লাহ তাআলা এই বিধানে তাঁর দয়াকে স্পষ্ট করেছেন, তাঁর ভাষায়: (এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সহজীকরণ ও রহমত।) আল্লাহ তাআলা যখন কিসাস নির্ধারণ করেছেন এবং সেইসাথে ক্ষমা করার সুযোগও দিয়েছেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার উপর এক ধরনের সহজীকরণ ও দয়া। সুতরাং, আল্লাহ তাআলার প্রতি শোকরিয়া ও প্রশংসা।

তারপর আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, কিসাস প্রয়োগের পর অথবা রক্তপণ গ্রহণ বা পূর্ণ ক্ষমা করার পর কী ধরনের অবাধ্যতা ঘটতে পারে এবং এর শাস্তি কী? আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।) এটি এজন্য যে, তিনি উভয়পক্ষের মাঝে উগ্রতা ও বিরোধের বিস্তারকে রোধ করতে চান। আর তাই এই কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছেন। এটি এই শরীয়তের সূক্ষ্মতা এবং তার আগাম সতর্কতা প্রদানের ক্ষমতার উদাহরণ, যা মানুষের মধ্যে পরবর্তী ক্ষতি বা দুঃখজনক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাও উপলব্ধি করে। কারণ এটি এমন বিধান যা এসেছে সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছ থেকে। এরপর আল্লাহ তাআলা কিসাসের এই ঐশী বিধানের সুফল কী তা স্পষ্ট করেছেন: (আর হে বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্নগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা তাকওয়া

অবলম্বন কর।) অতএব এই কিসাস -যা হত্যাকারীর উপর শাস্তি প্রয়োগ, বা রক্তপণ আদায়, অথবা ক্ষমা- এর মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষা করা হয়। এটি মানুষের মধ্যে শান্তি ও সহাবস্থান প্রতিষ্ঠিত করে, কারণ এটি তাদের মনকে অতিরিক্ত রাগ, সহিংসতা এবং সীমা অতিক্রম করা থেকে বিরত রাখে। কিসাসের এর ভয় মানুষের হৃদয়ে জাগ্রত হয়, কারণ তারা জানে যে, তাদের পরিণতি হতে পারে কিসাস, যেখানে যদি একটি প্রাণ হত্যা করা হয়, তবে হত্যাকারীকে শরিয়া অনুযায়ী কিসাস হিসেবে হত্যা করা হবে। এখানে শাসক এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, তার ক্ষমতার বিস্তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আল্লাহ তাআলার শরিয়াত বাস্তবায়িত হতে পারে। তদুপরি, শরিয়া বাস্তবায়নে শাসককে সমর্থন ও সহযোগিতার গুরুত্বও উল্লেখযোগ্য।

এরপর আল্লাহ তাআলা আয়াতটি শেষ করেছেন তাঁর এ কথা দিয়ে: (যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।) এর মানে হল, আল্লাহর শরিয়ার বাস্তবায়ন দ্বারা তাকওয়া অর্জিত হয়, এবং এতে প্রাণহত্যা থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয়। বস্তুত আল্লাহর আদেশ মেনে চলার মধ্যে রয়েছে তাকওয়া, এবং তাকওয়ার মাঝেই রয়েছে হত্যার পাপ থেকে দূরে থাকার উপায়।

﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠ فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ١٨١ فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٨٢﴾

অর্থ*: [***তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তবে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী তার পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য অসিয়ত করা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ (ফরজ) করা হল। এটি মুত্তাকীদের দায়িত্ব।* এটা শুনার পরও যদি কেউ তাতে পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করবে অপরাধ তাদেরই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।* তবে কেউ যদি অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে পক্ষপাতিত্ব ও পাপের আশঙ্কা করে, অতঃপর তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তাহলে তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*]* (আয়াত নং ১৭৯-১৮২)

এরপর কুরআনের আলোচনার ধারা মুসলিমদের এই শিক্ষা দিতে অগ্রসর হয়েছে যে, মৃত্যুর মৃত্যুর কারণ ও লক্ষণ দেখা দিলে তাদের উচিত দ্রুত অসিয়ত (উইল) করা। আল্লাহ তাআলা বলেন*: (***তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তবে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী অসিয়ত করা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হল।*)* এখানে আল্লাহর বাণী **"كتب তথা বিধিবদ্ধ করা হল"** এর অর্থ হলো এটি তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। হে মুমিনগণ, যদি মৃত্যুর কারণ ও লক্ষণ দেখা দেয়—যেমন এমন রোগ যা থেকে আরোগ্য আশা করা যায় না, বা হত্যাকাণ্ডের মতো বিপর্যয়—তাহলে যা আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা আবশ্যক। যদি অনেক সম্পদ রেখে যান, তবে তার কিছু অংশ বাবা-মা এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসিয়ত করা তার দায়িত্ব।

নিশ্চিতভাবেই আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অসিয়ত তাদের প্রয়োজন ও দারিদ্র্যের ভিত্তিতে করা উচিত। কারণ এই অসিয়ত তাকওয়ার অন্যতম আবশ্যক বিষয়, যা মুত্তাকী ব্যক্তির

একটি কর্তব্য এবং তা অসিয়ত প্রদানকারীর তাকওয়ার প্রমাণ। তবে এই বিষয়ে আলেমগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন—এটি কি সম্পদের এক-তৃতীয়াংশে সীমাবদ্ধ, এবং এক-তৃতীয়াংশ কি কেবলমাত্র প্রচুর সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, না অল্প সম্পদের জন্যও প্রযোজ্য? এটি কি এমন পিতা-মাতার জন্য প্রযোজ্য যারা ওয়ারিশী স্বত্ত্ব পান না? এই বিষয়ে যে কেউ বিস্তারিত শর্তাবলী জানতে চাইলে তিনি তাফসীরের কিতাব এবং মীরাস সম্পর্কিত ফিকহের বইগুলোতে দেখতে পারেন। তবে এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি, তার সম্পদের প্রতি এবং তার আত্মীয়স্বজনের প্রতি বিশেষ যত্নশীল—সংরক্ষণ, বণ্টন এবং সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে। তদুপরি, এই নির্দেশনাগুলোর সূক্ষ্মতা এমন যে, তা মানুষের মস্তিষ্কে জ্ঞান ও চিন্তার নতুন দিগন্ত খুলে দেয়, দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য স্থির করে এবং সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করে। একই সঙ্গে এটি মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা রোপণ করে। ফলে সে বুঝতে পারে যে, এই বিধান কেবলমাত্র মহান প্রভু আল্লাহর পক্ষ থেকেই হতে পারে। এর প্রতিটি বিষয়ই তার সূক্ষ্মতা, ব্যাখ্যা ও বিধানের দিক থেকে অলৌকিক। কাজেই আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

এরপরে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন সেই ব্যক্তির অবস্থার কথা, যে অসিয়তের সাক্ষী হয়েছে এবং তা সম্পর্কে অবগত হয়েছে—সে হোক সাক্ষী কিংবা ওয়ারিশ। এরপর যদি কেউ অসিয়তকারী যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পরিবর্তন করে, তবে এর পাপ তাদেরই ওপর বর্তাবে, যারা এটিকে পরিবর্তন করে। অতএব, অসিয়তকারী তার নির্দেশ অনুযায়ী যে সাওয়াবের অধিকারী, তা আল্লাহ তাআলার কাছে নির্ধারিত হয়ে গেছে। আর পাপ তাদের ওপর বর্তাবে, যারা অসিয়তের বিষয়টি বুঝেছে এবং শুনেছে, কিন্তু পরে তা পরিবর্তন ও বিকৃত করেছে। কারণ পাপ কেবল তারাই বহন করবে, যারা এটি পরিবর্তন ও বিকৃত করেছে। *(নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ)* — আল্লাহ তাআলা

অসিয়তকারীর কথা শুনেছেন এবং তোমরা অসিয়ত শুনেছ ও জেনেছ—এ বিষয়েও তিনি জানেন। তিনি জানেন অসিয়তের পর যা কিছু ঘটেছে, তা প্রয়োগ করা হয়েছে, নাকি পরিবর্তন ও বিকৃত করা হয়েছে। অতএব এই নির্দেশনা আল্লাহর পক্ষ থেকে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও গভীর, যা এর শ্রোতার হৃদয়ে গভীরভাবে ছাপ ফেলে, বিশেষত যারা এর তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম।

যেহেতু অসিয়তকারী কখনো অজ্ঞতাবশত বা ওয়ারিশদের কারো প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে, কিংবা কোনো কৌশল বা অন্য যে কোনো কারণে, অসিয়তের মাধ্যমে অবিচার বা ক্ষতি করতে পারেন, তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর মহান নির্দেশনার মাধ্যমে এমন ব্যবস্থা করেছেন যা কল্যাণ নিশ্চিত করে: (তবে কেউ যদি অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে পক্ষপাতিত্ব ও পাপের আশঙ্কা করে, অতঃপর তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তাহলে তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।) এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি যত্নশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, কারণ মানুষ কখনো অজান্তে বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করতে পারে, এবং সেজন্য আল্লাহ তাআলা এটি সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই কারণে, উভয় ক্ষেত্রেই অসিয়তকারী একজন সৎ উপদেশদাতার মুখাপেক্ষী, যিনি অসিয়তে উপস্থিত থেকে অসিয়তসংশ্লিষ্ট বিষয় সংশোধন করতে পারেন। যাতে অসিয়ত সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় এবং অসিয়তকারী ও অসিয়তকৃতদের বিষয় যথার্থ হয়। সুতরাং, অসিয়ত বা উইলের সময় উপস্থিত ব্যক্তির জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে, তিনি এই বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবেন। এতে তার কোনো পাপ হবে না। আল্লাহ তাআলার এই মহান নির্দেশনায় উপস্থিত ব্যক্তির হৃদয়ে যে ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, এটি তো অসিয়ত প্রদানকারীর বিষয়, তাই এতে হস্তক্ষেপ বা অন্যায়কে বাধা দেওয়া তার দায়িত্ব নয়—তেমন ধারণা দূর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত সম্ভাব্য সব সংশয় দূর করেছে। এটা আল্লাহর শরীয়তের সূক্ষ্মতা ও পরিপূর্ণতার পরিচায়ক।

শাইখ ইবন সা'দী রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন: "অসিয়তের সময় উপস্থিত ব্যক্তির উচিত অসিয়তকারীকে সদাচার ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি উৎসাহিত করা এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করা। কিন্তু যদি অসিয়তকারী ইচ্ছাকৃতভাবে উপদেশ মানতে ব্যর্থ হয়, তাহলে উপস্থিত ব্যক্তির দায়িত্ব হবে অসিয়তপ্রাপ্তদের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সমঝোতায় আসতে সহায়তা করা। একইসঙ্গে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে, তাদের মৃত ব্যক্তির জিম্মাদারির দায়মুক্তি নিশ্চিত করা তাদের কর্তব্য। এটি একটি মহৎ কাজ হিসেবে গণ্য হবে, এবং এতে তাদের ও অন্যায় অসিয়ত পরিবর্তনকারীর কোনো দোষ থাকবে না।"

তারপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি শেষ করেছেন এই বাণীর মাধ্যমে: ***[নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।]*** আল্লাহর এই ক্ষমা তাদের জন্য, যারা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে। এ আয়াত থেকে এ কথাও বোঝা যায় যে, মানুষ সহজেই ভুলে পড়তে পারে এবং এমনকি মৃত্যুর প্রাক্কালে থাকলেও ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় করতে পারে। কারণ ভালোবাসা বা পক্ষপাত এবং ঘৃণা বা বিদ্বেষের মানসিক প্রভাব মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের সঙ্গী হতে পারে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত এই মানসিক অবস্থার বিষয়ে সচেতন থাকা এবং সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করা। সব অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং ভালোবাসা বা ঘৃণা তাকে যেন কোনো অন্যায় বা পক্ষপাতিত্বে জড়িয়ে না ফেলে।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٤ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ

فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥

অর্থ: *[***হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।* নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদয়া- একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা। অতএব যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান।* রমযান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং হিদায়তের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।*]* (আয়াত নং: ১৮৩-১৮৫)

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা রোজা ফরজ হওয়ার বিধানটি বর্ণনা করেছেন তাঁর এই আয়াতে: *[***হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।***]* এই মহান আয়াতটি ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর সরাসরি সম্বোধনের মাধ্যমে শুরু হয়েছে, যা এ বিষয়টির গুরুত্ব ও মহত্ব নির্দেশ করে। এখানে ঈমানদারদের জন্য বিশেষ একটি মর্যাদার উল্লেখ রয়েছে—**"হে যারা ঈমান এনেছ!"**—যা তাদের প্রতি আল্লাহর

একটি বিশেষ সম্মাননা। যেন বলা হচ্ছে: হে তোমরা, যারা তোমাদের নিকট আসা সত্যের প্রতি ঈমান এনেছ।

এরপর সম্বোধনের পরে সেই বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা তাদের উপর ফরজ ও প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তথা রোজা। একই ধাঁচের বর্ণনা এসেছে কিসাস ও অসিয়তের আয়াতেও। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: " كتب عليكم القصاص /**তোমাদের উপর কিসাস ফরজ করা হয়েছে**" এবং বলেন: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية /**যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে কিছু সম্পদ রেখে যায়, তখন অসিয়ত ফরজ করা হয়েছে**"। একইভাবে, রোজার ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام /**হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে**"। এর অর্থ হলো, এটি তোমাদের উপর ফরজ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। রোজার এই বিধান নাযিল হয়েছে হিজরতের দ্বিতীয় বছরে। এটি আল্লাহর আদেশ ও উপদেশের গুরুত্বকে নির্দেশ করে। কেননা, "كُتِبَ" শব্দটি এমন যা ফরজ ও আবশ্যিকতার অর্থ প্রকাশ করে। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর এই বিধান বাধ্যতামূলক এবং দৃঢ়ভাবে প্রয়োগযোগ্য।

আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, রোজার ফরজ বিধান শুধু মুসলিম উম্মতের উপর নয়, বরং তাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ফরজ করা হয়েছিল। আল্লাহ বলেন: ***[তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল।]*** এই তথ্য মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করে, যেন তারা তাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের অতিক্রম করার জন্য রোজা পালনে আগ্রহী হয়। একইসঙ্গে এটি প্রমাণ করে যে রোজা শুধু মুসলিমদের জন্য নয়, বরং তা এমন একটি ইবাদত যা পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ফরজ ছিল। এর মাধ্যমে এমন ধারণাও দূর হয় যে, রোজা কোনো শাস্তিমূলক আদেশ। আর এটি রোজার কষ্ট ও ক্লান্তির অনুভূতিও লাঘব করে, কেননা এর মাধ্যমে

তাকওয়া বৃদ্ধি পায়, তা মজবুত হয় এবং এর মাধ্যমে উচ্চতর মর্যাদা অর্জন হয়। যেমন আল্লাহ বলেন: *[**যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।**]* এটি বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অসীম করুণার প্রকাশ যে, তিনি তাদের জন্য এই ফরজ বিধানের উদ্দেশ্য এবং এর মহান উপকারিতা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এই বিধানের অন্যতম বড় উপকারিতা হলো তাকওয়া অর্জন। এটি নির্দেশ করে যে, রোজা মুসলিমের মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে। কারণ রোজাদার ব্যক্তি তার খাদ্য ও পানীয় শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করে। এর প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাকে এই মহান ইবাদতের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করার সামর্থ্য দান করেন। নিঃসন্দেহে রোজা শয়তানের পথগুলো বন্ধ করার একটি মাধ্যম এবং তা মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ। রোজার মাধ্যমে মানুষ অসংখ্য মানসিক, নৈতিক এবং শারীরিক উপকারিতা লাভ করে। রোজার ফজিলত ও প্রতিদান সম্পর্কে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাঁর বান্দাদের প্রতি সহজীকরণের একটি উদাহরণ হলো: তিনি রোজার সময়কালকে খুবই কম (কিছু দিন মাত্র) বলে উল্লেখ করেছেন। তা দীর্ঘ সময় নয়, বরং মাত্র কিছুদিন। এটি আল্লাহর মেহেরবানির এক নিদর্শন, যিনি তাঁর ঈমানদার বান্দাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন এবং তাদের জন্য এই ফরজ বিধানকে সহজ করেছেন। এটি একে অপরের প্রতি দয়া, কোমলতা এবং সদয় আচরণের গুরুত্বকে স্পষ্ট করে, বিশেষত যখন একজন অন্যকে শিক্ষাদান, দাওয়াত বা উপদেশ দেয়। এভাবেই এটি কর্মক্ষেত্র, পেশাগত সম্পর্ক এবং সমাজে সহযোগিতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি আরও একটি করুণা প্রকাশ করেছেন, যখন তিনি অসুস্থ এবং সফররত ব্যক্তির জন্য রোজার বিধান সহজ করেছেন: *[**তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে।**]* এটি ইসলামে ইবাদতের ফরজ বিধানগুলির সূক্ষ্মতার প্রমাণ, কারণ

তা এমন পরিস্থিতি বিবেচনা করেছে যা ফরজ পালনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত সঠিকভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে। এই সূক্ষ্মতা প্রমাণ করে যে, এ ধরনের বিধান শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই হতে পারে, যিনি পরিপূর্ণ জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় এবং দয়ালু।

এরপর এই মহান আয়াতে রোজাদারদের আরেকটি অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: *[**আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদয়া- একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা।**]* এই ব্যক্তিরা তারা যারা রোজা রাখতে সক্ষম, তবে কোন না কোন কারণে তাদের জন্য রোজা রাখা কঠিন হয়। তাদের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে তারা রোজা না রেখে, প্রতিটি দিনের জন্য একজন মিসকিনকে খাবার দেয়। এটি রোজা ফরজ হওয়ার সূচনাকালে ছিল, তবে পরে এটি রহিত হয়ে যায়- যার বিস্তারিত বর্ণনা আসছে। তারপর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য রোজা ভঙ্গ করার চেয়ে তা পালন করাকে উত্তম বলে প্রাধান্য দিয়েছেন; যাতে তারা রোজা পালনে আগ্রহী হয় এবং তা ভাঙ্গা ও মিসকিনকে খাওয়ানোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে: *[**অতএব যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালনই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান।**]* এখানে আল্লাহর বাণী: *[**অতএব যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে।**]* এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, যদি কেউ প্রতিটি দিনের জন্য একাধিক মিসকিনকে খাবার দেয়, তাহলে তা ভালো। তবে যদি রোজা রাখে তাহলে এটি আরও শ্রেষ্ঠ, কারণ রোজা রাখা খাওয়ানোর চেয়েও উত্তম। ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, তাওস, মুকাতিল সহ বহু সালাফ এরূপ বলেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, এই শরিয়ত মানব প্রকৃতির প্রতি মনোযোগী, কারণ এটি পর্যায়ক্রমে নির্দেশনা দেয় এবং উত্তম ও পূর্ণতার দিকে উৎসাহিত করে। এর মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে, মানুষের অবস্থার প্রতি মনোযোগ দিয়ে, বিশেষ করে শিক্ষাদান ও পেশাগত ক্ষেত্রে, তাদের সক্ষমতার পার্থক্য বিবেচনায়

নিয়ে উপদেশ দেওয়া উচিত। এছাড়া, এই নির্দেশনায় বলা হচ্ছে যে, যাদের সক্ষমতা অন্যদের থেকে কম, তাদের অবহেলা করা হবে না। বরং তাদের যথাযথ সহায়তা প্রদান করা হবে এবং তাদের জন্য উপযুক্ত উপায় গ্রহণ করা হবে। তারপর তাদের উন্নতি এবং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করা হবে, যেন তারা নিজেদের উন্নতির জন্য আরও পরিশ্রম করে এবং সেরা অবস্থানে পৌঁছাতে পারে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি ইবাদত এবং তাদের মধ্যে কোমলতা, উৎসাহ এবং পরিপূর্ণতার দিকে প্রেরণা প্রদানের মাধ্যমে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, তাহলে এই একই আচরণ ও সহানুভূতি মানুষের পরস্পরের মাঝে থাকা অধিক বাঞ্চনীয়।

আল্লাহর বাণী: ***[আর সিয়াম পালনই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান।]*** এতে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, যারা রোজা রাখতে সক্ষম হলেও এটি তাদের জন্য কঠিন, তাদের জন্য খাদ্যদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি এরপর রোজা রাখার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন, কারণ রোজা রাখা সেরা ও উত্তম: ***[আর সিয়াম পালনই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান।]*** কাজেই তিনি উত্তমতাকে গ্রহণের জন্য জ্ঞানকে ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এটি পছন্দের স্বাধীনতা প্রদান করে, সাথে সাথে উত্তমের দিকে উৎসাহ ও প্রেরণা প্রদান করে। এটি অত্যন্ত সৃজনশীল নির্দেশনামূলক পদ্ধতি।

এরপর আয়াতটি রোজার ফরজ সম্পর্কে প্রশংসাসূচক উপস্থাপনায় আসে, যেখানে রমযান মাসের প্রশংসা ও স্তুতি দিয়ে শুরু হয়েছে: ***[রমযান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং হিদায়তের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে।]*** এতে মুসলিমদের জন্য রমযান মাসের মর্যাদা এবং আল্লাহর কাছে তার স্থান স্পষ্ট করা হয়েছে, যা মুসলিমদের জন্য এই মাসের প্রতি যত্ন নেওয়া এবং তার মর্যাদা উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। এতে মুসলিমদেরকে আরেকটি বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে যা পরবর্তীতে উল্লেখিত হবে, তা হলো: মুসাফির বা

অসুস্থ ছাড়া অন্যদের জন্য রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি বাতিল করা হবে। মুসলিমরা এই কুরআনিক প্রসঙ্গ থেকে শিখতে পায় যে, কোনো কিছুর গুরুত্ব ও ফজিলত প্রকাশের জন্য প্রথমে তার প্রশংসা করা হয়, যাতে তা গ্রহণের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তার গুরুত্ব বোঝা যায় এবং পরিতৃপ্তির সাথে তা পালন করা হয়। এটি কুরআনের মর্যাদা ও ফজিলত তুলে ধরে, কারণ এটি রমযান মাসের প্রশংসার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, যা রোজার মাস। এতে আরও উল্লেখিত যে, কুরআন রমযান মাসে, বিশেষত কদরের রাত্রিতে পৃথিবীর আসমানে নাযিল হয়েছে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন: ***[আমি এটিকে লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি।]*** তারপরে তা বিভিন্ন ঘটনা ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর উপর পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে- যেমনটি বিভিন্ন সূত্রে ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে।[২৫]

অনুরূপভাবে আল্লাহ এই আয়াতে কুরআনকে 'হিদায়াত' হিসেবে উল্লেখ করে এর প্রশংসা করেছেন: ***[রমযান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং হিদায়তের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে।]*** এটি কাফের-মুসলিম সমস্ত মানুষের জন্য হিদায়েত—কাফেরদের জন্য, যাতে তারা আল্লাহর দ্বীনের হিদায়েত পেতে পারে, কারণ এতে এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যা আল্লাহর দিকে পথ দেখায়। আর মুসলিমদের জন্য এটি হিদায়াত, কারণ এতে আল্লাহ তাদের কাছ থেকে কী চান এবং কী থেকে নিষেধ করেছেন তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আল্লাহর ভালোবাসার বিষয় এবং অপছন্দের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত এতে আদেশ ও নিষেধের সমন্বিত পথনির্দেশনা রয়েছে। এছাড়াও আল্লাহ কুরআনকে প্রশংসিত করেছেন এতে থাকা সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের কারণে। তিনি বলেন: ***[এবং হিদায়তের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে।]*** এতে রয়েছে এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ ও যুক্তি তাদের জন্য যারা তা পাঠ করবে এবং গভীরভাবে চিন্তা করবে। এটি নির্দেশ করে

---

(২৫) দেখুন: তাফসীরে ইবনে কাসীর: (১/২২২)।

যে, কুরআনে প্রদত্ত হিদায়াত সত্য ও সঠিক, যা বিভ্রান্তির বিপরীত। এটি সুস্পষ্ট দিশা, যা বিপথগামিতা থেকে দূরে রাখে এবং সত্য-মিথ্যা ও হালাল-হারামের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী।[২৬] এ থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি হিদায়াত চায়, তার জন্য কুরআন অপরিহার্য। যে ব্যক্তি যুক্তি-প্রমাণ জানতে বা শিখতে চায়, তার জন্য কুরআনই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি মানুষের সামনে সত্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চায়, তাকে অবশ্যই কুরআনের দিকে ফিরে যেতে হবে। যে ব্যক্তি জ্ঞান ও তার ভিত্তি অর্জন করতে চায়, তার জন্য কুরআন শিক্ষা করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি ফিকহ ও তাওহীদ জানতে চায়, তার জন্য কোরআনই উৎস। আর যে ব্যক্তি সত্য-মিথ্যা এবং সঠিক-বেঠিকের পার্থক্য বুঝতে চায়, তার জন্য কোরআনই পথপ্রদর্শক। এটি সেই কল্যাণ ও আলো যা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যের দিকে চলা পথিকের জন্য পথপ্রদর্শক। তেমনিভাবে, রমজান মাস ও তাতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার এই বিশেষ সম্পর্ক রমজান মাসে কুরআন তেলাওয়াতের ফজিলত ও মর্যাদাকে আরও সুস্পষ্ট করে তোলে।

রমজান মাস ও এতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার বিশেষত্ব বর্ণনার পর, আল্লাহ তায়ালা বলেন: ***[কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।]*** এ দ্বারা যারা সুস্থ ও মুকীম, তাদের জন্য পূর্বে দেওয়া রোজাভঙ্গ ও প্রতিদিন একজন মিসকিনকে খাদ্যদানের অনুমতি রহিত বা বাতিল করা হয়েছে, যেমনটি আগের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৭]এরপর আল্লাহ তাআলা মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তিকে ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করেছেন: ***[তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।]*** এটি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও দয়া, যেমনটি পূর্ববর্তী আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে এর পুনরাবৃত্তি দ্বারা এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, কিছু রহিত বা বাতিলের পরেও এটা প্রতিষ্ঠিত রয়ে গেছে। যাতে

---

(২৬) পূর্বোক্ত।

(২৭) পূর্বোক্ত।

কেউ মনে না করে যে, এটিও অন্য অংশের মতো (রোজা রাখতে সক্ষমদের জন্য রোজা রাখার অথবা তা ভঙ্গ করা ও মিসকিনকে খাওয়ানোর অনুমতি) রহিত বা বাতিল হয়ে গিয়েছে, যেমন আগের আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাআলা রোগী ও সফররত ব্যক্তির জন্য রোজা মওকুফের কারণ ও তা অন্য দিনে রাখার অনুমতি দেওয়ার হিকমত ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, *[***আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না।***]* এটি আল্লাহর করুণা এবং বিশেষ যত্নের বহিঃপ্রকাশ। রোগী ও মুসাফিরকে রোজা পিছিয়ে দেওয়ার সুযোগ দিয়ে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি এই ফরজ বা অন্য কোনো বিধান মুসলমানদের জন্য কঠিন করার উদ্দেশ্যে দেননি; বরং সহজ করেছেন, যাতে তারা আল্লাহর আনুগত্যে থাকতে পারে। আর এই রোজার মাধ্যমে তিনি চান যে, বান্দারা তাকওয়া অর্জন করুক, যা অর্জনকারীদের জন্য প্রকৃত সফলতা। রোজার কাজা, রোগী ও মুসাফিরের অবস্থা, সফরের সময়কাল ও দূরত্ব, এবং কার ওপর রোজা ফরজ ইত্যাদি বিষয়ে ফিকহ শাস্ত্রে বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়। এ বিষয়ে জানতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা তাফসির ও ফিকহের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত আলোচনা অধ্যয়ন করতে পারেন।

তারপর আল্লাহ তাআলা রোগী ও মুসাফির সম্পর্কে বলেন, *[*আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর।*]* এখানে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা যেসব রোজা ভেঙেছে, সেগুলো অন্য দিন পূরণ করতে হবে, যাতে মাসের নির্ধারিত দিনের সংখ্যা পূর্ণ হয়: *[***তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর।***]* তারপর আল্লাহ তাদেরকে তাকবির পাঠ করার প্রতি নির্দেশনা দেন, যা আল্লাহর প্রতি শোকর ও কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। কারণ, তিনি তাদের এই ইবাদতে সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং তা সম্পাদনের সুযোগ করে দিয়েছেন: *[***এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা

কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।] অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে, এতে রমজানের শেষে তাকবির পাঠ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেছেন: "শাওয়ালের চাঁদ দেখার পর মুসলিমদের ওপর তাকবির বলা আবশ্যক।" তার থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, "মানুষ চাঁদ দেখা থেকে শুরু করে ঈদের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবির পাঠ করবে।" এ কথা প্রমাণ করে যে, রোজা আল্লাহর একটি মহান নেয়ামত, যার জন্য বান্দার শোকর আদায় করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি ইবাদতই আল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত, যা শোকর প্রকাশের দাবিদার। এই শোকরের সূচনা হয় তাকবিরের মাধ্যমে, যা আল্লাহর জিকির ও শোকরের অন্যতম নিদর্শন।

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾﴾

অর্থ: **[আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।]** (আয়াত নং: ১৮৬।)

তারপর কুরআনের প্রসঙ্গ স্থানান্তরিত হয়েছে এমন এক প্রশ্নের উত্তরের দিকে, যেখানে আল্লাহর নৈকট্য ও দূরত্ব সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। এক বেদুইন নবী সাঃ-কে জিজ্ঞাসা করলেন: **আমাদের প্রভু কি আমাদের কাছে, না দূরে? যদি কাছে হন তাহলে আমরা তাঁর সাথে মুনাজাত করে বা চুপেচুপে কথা বলব। আর যদি তিনি দূরে হন তাহলে আমরা উচ্চস্বরে তাকে ডাকব।** নবী সাঃ নীরব রইলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন: **[আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।]** এটি একটি মহান আয়াত এবং একটি আন্তরিক প্রশ্ন, যার মাধ্যমে প্রশ্নকারী তার প্রভুর নৈকট্য ও দূরত্ব সম্পর্কে জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভ করতে চেয়েছিলেন। নবী করিম সাঃ-এর নীরবতা, যিনি নিজের ইচ্ছায় কিছুই বলেন না, এবং পরে পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত অসাধারণ উত্তর—সবই এর মাহাত্ম্য প্রকাশ করে।

অতএব, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের নিকটবর্তী; তিনি তাদের কথা শোনেন, এমনকি তাদের গোপন কথা এবং অন্তরের ফিসফিসও শুনেন। তিনি তাদের সকল অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কেও জানেন। তাঁর সৃষ্টির কোনো বিষয়ই তাঁর জ্ঞানের বাইরে

নয়। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির নিকটবর্তী হওয়া এমনভাবে যা তাঁর মহিমা ও গৌরবের সঙ্গে মানানসই, যা সৃষ্টিকুলের পরস্পরের নৈকট্যের মতো নয়। আর আল্লাহ তাআলার ক্ষমতাও তাঁর কোন সৃষ্টির ক্ষমতার মতো নয়; বরং তিনি তাদের ক্ষমতারও স্রষ্টা। এই আয়াতটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির অত্যন্ত নিকটে। যেমন তিনি বলেন: ***[আমি তার গলার ধমনীর চেয়েও নিকটবর্তী।]*** সূরা ক্বা-ফ: ১৬। তাছাড়া নবী সাঃ বলেছেন: ***(হে লোক সকল! নিজেদের প্রতি সদয় হও। কেননা, তোমরা তো বধির বা দূরবর্তী সত্তাকে ডাকছ না। বরং তোমরা ডাকছ এমন সত্তাকে যিনি তোমাদের সব কথা শুনেন ও দেখেন। তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। তোমরা যাকে ডাকছ তিনি তোমাদের প্রত্যেকের বাহনের গর্দান থেকেও বেশি নিকটে।)***[২৮] নবী সাঃ এই কথা তাদের বুঝিয়েছিলেন, যারা তার সঙ্গে একটি যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করছিলেন। তারা উচ্চস্বরে তাকবীর পড়ছিলেন। নবী সাঃ তাদের বোঝালেন যে, আল্লাহ বান্দার নিজের আত্মার চেয়েও তার কাছাকাছি আছেন। যদি একজন বান্দা কোনো বিষয়ে নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা চিন্তা করে, তবে তা তার কিছু সময় নিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন চান যে বান্দা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাক, তখন তিনি তাকে সিদ্ধান্তের সঠিকতা অনুপ্রেরণা হিসেবে দিয়ে দেন, এমনকি তার চিন্তা-ভাবনার আগে। এর ফলে তার মন শান্ত হয়, তার ইচ্ছা সেই সিদ্ধান্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এতে বোঝা যায়, আল্লাহর ক্ষমতা বান্দার নিজের ওপর তার নিজের ক্ষমতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।

এই মহিমান্বিত আয়াতের অন্যতম ফায়েদা হলো, আল্লাহর প্রতি যথাযথ শিষ্টাচার বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত যখন কেউ প্রার্থনা, দোয়া বা সাহায্যের আবেদন করে। এটি আল্লাহর প্রতি বান্দার সম্বোধন সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে প্রযোজ্য। বান্দার উচিত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে আল্লাহ তার নিকটবর্তী এবং তার সকল অভাব-অভিযোগ

---

(২৮) দেখুন: মাজমূউল ফাতাওয়া: ১৭/১৫)।

ও প্রয়োজন শুনে থাকেন। তাই প্রার্থনার সময় উচ্চস্বরে কথা বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। এ আয়াতের আরেকটি শিক্ষা হলো, আল্লাহ তাআলা দোয়ায় সাড়া দেন, যেমন তিনি নিজেই বলেছেন*: [**আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই।**]* তাই মুসলমানের উচিত এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করা যে, আল্লাহ তার দোয়া কবুল করবেন। তাকে এটিও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা তার অবস্থা ও চাহিদা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন এবং কখন তার প্রার্থনা পূরণ করা অধিক উপযুক্ত হবে। কখনো তিনি দোয়ার মাধ্যমে বান্দার কোনো অমঙ্গল দূর করেন, আবার কখনো তাকে কল্যাণ দান করেন। তাই মুসলিম ব্যক্তির উচিত আল্লাহর আদেশগুলো বাস্তবায়নে সাড়া দেওয়া, এবং নিষেধাজ্ঞাগুলো মেনে সেগুলো থেকে বিরত থাকা। সুন্নত বা মুস্তাহাব আমলগুলোতে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো। সেই সঙ্গে এমন ঈমান অর্জন করা উচিত, যা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। এজন্য আল্লাহ বলেছেন*: [**কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।**]* এ নির্দেশনা থেকে বোঝা যায় যে, পরিপূর্ণ সঠিক পথ বা হিদায়াত কেবল তখনই অর্জিত হয় যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ-এর নির্দেশে সাড়া দেয়া হয় এবং আল্লাহ ও যা কিছুতে ঈমান আনয়ন করতে আদেশ করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনা হয়।

﴿أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١٨٧﴾

অর্থ: **[সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোষাকস্বরুপ এবং তোমরাও তাদের পোষাকস্বরুপ। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা নিজেদের সাথে খিয়নত করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে মার্জনা করেছেন। কাজেই এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কালোরেখা থেকে উষার সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ না হয়। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ তার আয়াতসমূহ মানুষদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারে।]** (আয়াত নং: ১৮৭)

এখানে কোরআনিক প্রসঙ্গটি আবার রোজার বিধান নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে- আল্লাহ তাআলার বান্দাদের নিকটে থাকা সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর। রোজা সম্পর্কিত আয়াতগুলোর মাঝে এই বিরতির একটি ফায়েদা হলো: যাতে রোজার বিষয়ে বান্দাদের মনোযোগ আরো বেশি আকর্ষণ হয়। এর মাধ্যমে কোরআন পাঠকদের পরবর্তী আয়াতগুলির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে, যাতে রোজাদারদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ এবং দয়া প্রদর্শন রয়েছে। এতে রোজাদারদের জন্য খাবার, পানীয় এবং সহবাসের

সময় আরও বাড়ানো হয়েছে, যেহেতু রোজা ফরজের প্রথমদিকে অনুমতি ছিল এতটুকু যে, সূর্যাস্ত থেকে এশার নামাজ পর্যন্ত, অথবা এশার আগে কারো ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত। কাজেই যদি কেউ এশার নামাজের আগে ঘুমিয়ে পড়তো, তবে তার জন্য খাবার, পানীয় এবং স্ত্রী সহবাস বন্ধ হয়ে যেত পরবর্তী রাত পর্যন্ত। এটি কঠিন ও কষ্টকর ছিল, তাই আল্লাহ তাদের জন্য সহজতা এনে দেন এবং সময় বাড়িয়ে দেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন: ***[সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে।]*** অতএব, যা কিছু এর নিচে রয়েছে তাও বৈধ, কারণ উচ্চতর বিষয়ে বৈধতার নিম্নতর বিষয়গুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এরপর আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের বিশেষত্ব বর্ণনা করেন: ***[তারা তোমাদের পোষাকস্বরুপ এবং তোমরাও তাদের পোষাকস্বরুপ।]*** অর্থাৎ তারা তোমাদের প্রশান্তির জায়গা, আর তোমরাও তাদের প্রশান্তির জায়গা। যিনি এই বিশেষ গুণটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থাপন করেছেন তিনি আল্লাহ তাআলা। এ থেকে বুঝা যায় যে, মানসিক শান্তির এ নেয়ামতটি একে অপরের মধ্যে একটি পরস্পরিক অভ্যন্তরীণ নেয়ামত, যা উভয় পক্ষের জন্যই সমান। এতে কোনো পক্ষের অন্যপক্ষের উপর কোনো অতিরিক্ত বিশেষত্ব নেই; বরং তারা একে অপরের জন্য এই শান্তি প্রদান করতে সমানভাবে দায়িত্বশীল। আয়াতে উল্লেখিত "لباس" তথা পোষাক শব্দটির অর্থ: ঢেকে রাখা, আড়াল করা, নিকটতা এবং সরাসরি সংস্পর্শ; কারণ পোশাক শরীরের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে। এই সমস্ত ধারণাগুলো যদি মানুষ মন দিয়ে ভাবে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, তবে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য ঠিক তেমনি হবে, যেমন পোশাক শরীরের জন্য, যেন তাদের সম্পর্ক বাস্তব জীবনে সেসব অর্থে প্রতিফলিত হয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেন যে, মুসলমানরা ইফতারের সময়ের স্বল্পতার কারণে সমস্যায় পড়ছিলেন এবং তারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করছিলেন, যেমন সহবাস বা খাওয়া-দাওয়ায় জড়িয়ে পড়া। এজন্য আল্লাহ তাদের কষ্ট লাঘব করে দিয়েছেন, যেমন তিনি বলেছেন: ***[আল্লাহ জানেন যে, তোমরা***

নিজেদের সাথে খিয়নত করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে মার্জনা করেছেন।] এটি আল্লাহ তাআলার করুণা ও দয়ার প্রমাণ।

এখানে আল্লাহ তাআলার বাণী ***[আল্লাহ জানেন যে, তোমরা নিজেদের সাথে খিয়নত করছিলে।]*** থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের সব কাজ এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা জানেন। এছাড়া, এটি যে **"جمع"** বা বহুবচন পদের মাধ্যমে এসেছে, তা সেই ব্যক্তির অসুবিধা দূর করে যে নবী সাঃ-এর কাছে তাদের খাওয়া, পান করা, বা সহবাসের বিষয়গুলো নিয়ে অভিযোগ করছিলেন। ফলে এ বাচনভঙ্গি থেকে এও ইঙ্গিত রয়েছে যে, হয়তো তার মতো অন্যরাও একই ভুল করেছে। ফলে এটা পরামর্শ দেওয়ার এবং ভুল সংশোধনের সময় গোপনীয়তা রক্ষা করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। নবী সাঃ-এর পদ্ধতিও এমন ছিল; তিনি দিকনির্দেশনা দেয়ার সময় সর্বসাধারণকে সম্বোধন করে বলতেন। যেমন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা *(রা.)* বলেছেন*:* ***(যখন নবী সাঃ-এর কাছে কোনো মানুষের ব্যাপারে কিছু পৌঁছাতো, তিনি বলতেন না, অমুকের কী হয়েছে? বরং তিনি বলতেন, লোকদের কী হলো যে তারা এসব বলতে শুরু করেছে?)*** সুনানে আবু দাউদ।

তারপর আল্লাহ তাআলার মহান দয়া ও ক্ষমা প্রকাশিত হয়েছে*:* ***[সুতরাং তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে মার্জনা করেছেন। কাজেই এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর।]***, অর্থাৎ আল্লাহ কেবল তাদের তাওবা কবুল করেননি, বরং তাদের ভুল-ত্রুটিও পুরোপুরি ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ কতই না পবিত্র, যিনি তাওবা গ্রহণকারী ও অত্যন্ত দয়ালু। এরপর আল্লাহ তাআলা সরাসরি অনুমতি প্রদান করে বলেছেন*:* ***[কাজেই এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও।]***, এবং এই মিলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন*:* ***[এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন তা কামনা কর।]***, অর্থাৎ সন্তান। এই নির্দেশনার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের আনন্দের পেছনে থাকা মূল উদ্দেশ্য, যেমন সন্তানের আকাঙ্ক্ষা, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি এইসব নিয়ামত দান করেছেন, যেমন নিয়ন্ত্রণ, সহজীকরণ, সুবিধা প্রদান এবং শিক্ষা দেওয়া।

এরপর আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেন এবং সংশয় দূর করেন যে, অনুমতি খাবার ও পানীয়ের জন্যও প্রযোজ্য: ***[আর তোমরা পানাহার কর।]***, এবং সেই অনুমতির সীমা নির্ধারণ করেন: ***[যতক্ষণ রাতের কালো রেখা থেকে উষার সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ না হয়। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।]***, অর্থাৎ যতক্ষণ না ফজরের সময় রাতের অন্ধকার থেকে দিনের সাদা আলো স্পষ্ট হয়ে যায়। এটি কুরআনের অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট ব্যাখ্যার উদাহরণ, যেখানে রোজার সূচনা নির্ধারণ করা হয়েছে এমনভাবে যাতে তা স্থির ও অপরিবর্তনীয় থাকে। রোজা শুরু হয় ফজর থেকে, যা চিহ্নিত হয় দিনের সাদা আলো রাতের কালো অন্ধকার থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা হওয়ার মাধ্যমে। এরপর রোজা চলতে থাকে রাত প্রবেশ করা পর্যন্ত, অর্থাৎ সূর্যাস্ত পর্যন্ত: ***[তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।]***

এরপর আলোচনা করা হয়েছে ইতিকাফকারীর জন্য নিষিদ্ধ বিষয়ের, যেমন যৌনসঙ্গম। কারণ তিনি ইতিকাফ নামক মহান ও ঐচ্ছিক ইবাদতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আল্লাহ বলেন: ***[আর তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না।]*** এটি ইতিকাফকারীদের জন্য একটি বিশেষ নিষেধাজ্ঞা, যা সাধারণ রোজাদারদের রাতের স্বাধীনতা থেকে ভিন্ন। সুতরাং ইতিকাফকারী ব্যক্তির জন্য দিনের বেলায় বা রাতের বেলায় সহবাস করা বৈধ নয়। রাতের নিষেধাজ্ঞা ইতিকাফের কারণে এবং দিনের নিষেধাজ্ঞা রোজার কারণে, যা ইতিকাফের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ইতিকাফ হলো আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করা। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: ***[এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না।]*** এই বিধানগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, সুতরাং এগুলোর বিরোধিতা করো না। আর *(এগুলো)* শব্দটি এসব আদেশ ও নিষেধের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর

*(*এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না*)* বাক্যটি নির্দেশ করে যে, এগুলোর কাছে পৌঁছানো থেকেও বিরত থাকতে হবে, যাতে এগুলো অতিক্রম করা বা লঙ্ঘন করার অবস্থা সৃষ্টি না হয়। যদিও এর মূল অর্থ হলো এগুলো অতিক্রম না করা, তবে *(*নিকটবর্তী হয়ো না*)* শব্দচয়ন দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, লঙ্ঘনের পথ তৈরির সম্ভাবনাও এড়িয়ে চলতে হবে।

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, একজন মুসলিম এই আয়াতকে নিজের জন্য একটি শক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, যা তাকে সকল প্রবৃত্তি এবং বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করবে। যখন কোনো পাপ তার নিকট আসবে, সে নিজেকে বলবে*: (*এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না।*)* যদি তার প্রবৃত্তি কোনো আদেশ লঙ্ঘনের দিকে তাকে প্রলুব্ধ করে, তখন সে বলবে*: (*এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না।*)* যদি শয়তান তাকে আল্লাহর কোনো সীমারেখা লঙ্ঘনের দিকে আকৃষ্ট করে, তখন সে আল্লাহ তাআলার এই বাণী দিয়ে নিজেকে শক্তি জোগাবে*: (*এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না।*)* এটি মুমিনের জন্য এক অনন্য শক্তি, যদি সে তার জীবনে এর তাৎপর্য হৃদয়ে ধারণ করে।

এরপর আয়াতটি এই কথা বলে শেষ হয়*: [***এভাবে আল্লাহ তার আয়াতসমূহ মানুষদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারে।***]* যেমন আল্লাহ তাআলা এই সীমারেখাগুলো স্পষ্ট করেছেন, তেমনি এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বিধি-বিধানও তিনি পরিষ্কার করেছেন, যাতে যাদের প্রতি এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তারা তা অতিক্রম না করে। আর যাতে তারা জানতে পারে কীভাবে সঠিক পথ অনুসরণ করতে হবে, কীভাবে আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে এবং কীভাবে তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সুতরাং, আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে আশা করা যায় তারা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখায় তাকওয়া অবলম্বন করবে,

আল্লাহ তাআলা তাকে তাকওয়া দান করবেন, এবং সন্দেহ নেই যে, এর মাধ্যমে সে বিশাল কল্যাণ লাভ করবে।

﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٨﴾

অর্থ: ***[আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে পেশ করো না।]*** *(*আয়াত নং ১৮৮*)*।

এই আয়াতের সূচনা নিষেধাজ্ঞা দিয়ে হয়েছে: ***[আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না]***, এখানে অর্থ গ্রহণের অপব্যবহারকে "খাওয়া" বলে উপস্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে অবৈধ পথে অর্থ গ্রহণ ও তার ব্যবহারকে এমনভাবে দৃষ্টান্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে, যা শাস্তিযোগ্য ও ঘৃণ্য। আর "তোমরা নিজেদের মধ্যে", এ কথা দ্বারা অবৈধভাবে অর্থের লেনদেনের উল্লেখ করা হয়েছে। আর "অন্যায়ভাবে" শব্দটি সব ধরনের নিষিদ্ধ কার্যকলাপকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন: প্রতারণা, জুয়া, ঘুষ, সুদ, পূর্ণ কাজ না করে পারিশ্রমিক নেয়া, কিংবা কাজ করিয়ে পূর্ণ পারিশ্রমিক না দেওয়া। অবৈধ কাজের একাধিক রূপ থাকতে পারে, কিন্তু "অন্যায়ভাবে" শব্দটি একাই সমস্ত অবৈধ লেনদেন ও আচরণকে তুলে ধরেছে। এটি কুরআনের স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জল ভাষার একটি উদাহরণ।

এতে একটি সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ নীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে অবৈধ অর্থ লেনদেনের ধরণ বা উপায়ের নির্দিষ্ট নাম দেওয়া হয়নি, যাতে এটি অতীতের সকল

অবৈধ লেনদেন এবং ভবিষ্যতে উদ্ভূত হতে পারে এমন নতুন ধরনের অবৈধ লেনদেনকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এর মধ্যে নৈতিক ও ফিকাহগত অত্যন্ত মূল্যবান একটি দিক রয়েছে, যা নিত্যনতুন অবৈধ-হারাম বিষয় ও এর পদ্ধতিগুলোকে ধারণ করার ক্ষেত্রে এই শরীয়তের বিস্তৃত ধারণক্ষমতার পরিচায়ক। এটি এই মহিমান্বিত শরীয়তের ফিকাহগত, চিন্তাগত ও নৈতিক বিস্ময়কর শক্তির প্রমাণ, এবং কুরআনের বিভিন্ন দিক থেকে এর অলৌকিকতার প্রমাণ, যার মাধ্যমে সব ধরনের প্রকার এবং নতুনভাবে উদ্ভূত বিষয়সমূহের গ্রহণক্ষমতা প্রকাশ পায়। এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনামূলক নীতি। তদুপরি, এই নিষেধাজ্ঞা যা হারাম হওয়ার ইঙ্গিত দেয়, তা এই সত্যটিকে স্পষ্ট করে যে, ধর্মের উদ্দেশ্যসমূহ সমাজে ফাসাদ বা অশান্তি, ঘৃণা বা মানুষের প্রয়োজনের অপব্যবহার রোধ করার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন: ***[এবং বিচারকদের কাছে পেশ করো না।]*** অর্থাৎ এটি একটি পন্থা যা অর্থের মাধ্যমে অবৈধভাবে সম্পদ আহরণের একটি ধরন বর্ণনা করে, যেখানে টাকা দিয়ে বিচারকদেরকে প্রভাবিত করা হয়, ঘুষ এবং চতুরতার মাধ্যমে অন্যের টাকা অবৈধভাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে: ***[এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে পেশ করো না।]*** এতে একটি ইঙ্গিত এবং ব্যাখ্যা রয়েছে যে, কিভাবে মানুষ অন্যের প্রতি অবিচার ও মিথ্যার মাধ্যমে তার সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ করতে পারে, যদিও সে জানে যে সে অধিকারী নয়, এবং সে তা পাপের সাথে গ্রহণ করে। এটি প্রমাণ করে যে, শরীয়ত শুধুমাত্র শাসকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থের লেনদেন বা গ্রহণ বিবেচনা করেনি, যা কখনও প্রমাণের অভাবে ভুল সিদ্ধান্ত হতে পারে, ফলে জালেমের পক্ষে ও মজলুমের বিপক্ষে রায় যেতে পারে। বরং এর চেয়ে অনেক বড় একটি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে, তা

হলো আত্ম-পর্যালোচনা, যেখানে আল্লাহর শাস্তি ও পাপের ভয় দ্বারা মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

﴿يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَهِلَّةِۖ قُلۡ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلۡحَجِّۗ وَلَيۡسَ ٱلۡبِرُّ بِأَن تَأۡتُواْ ٱلۡبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَأۡتُواْ ٱلۡبُيُوتَ مِنۡ أَبۡوَٰبِهَاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٨٩﴾

অর্থ: *[***লোকেরা আপনার কাছে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, 'এটা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময়-নির্দেশক। আর পিছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই; বরং পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া তাকওয়া অবলম্বন করলে। কাজেই তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।***]*** (আয়াত নং: ১৮৯)।

তারপর এই কুরআনিক প্রসঙ্গ একটি প্রশ্নের উত্তরে উপস্থাপিত হয়েছে, যা নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর কাছে নতুন চাঁদ সম্পর্কে করা হয়েছিল। এটি হলো, চাঁদ প্রথমে ক্ষুদ্র আকারে উদিত হয়, পরে ক্রমান্বয়ে বড় হয় এবং পূর্ণিমার চাঁদে রূপান্তরিত হয়। এরপর আবার ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে মিলিয়ে যায়। এই চক্রটি প্রতি ২৯ বা ৩০ দিনে পুনরাবৃত্তি হয়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করেন: ***[লোকেরা আপনার কাছে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে।]***, যা প্রমাণ করে যে, কুরআন ধাপে ধাপে নাজিল করার অন্যতম উপকার হলো—নবী সাঃ-কে করা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা, এবং সেই উত্তরগুলো যথাসময়ে নাজিল করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা উত্তরে বলেন: ***[বলুন, 'এটা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময়-নির্দেশক।]***, "সময়-নির্দেশক" শব্দটি বহু রকমের উপকার বহন করে, যা সকল মানুষের

জন্য উপযোগী—মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের জন্য। সবাই চাঁদের সময়-সূচি থেকে উপকৃত হয়, তবে মুসলমানদের জন্য এটি ইবাদতের সময় নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এটি রোজা, যাকাত, চুক্তি, ঋণ পরিশোধ, প্রতিশ্রুতি, এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সময় নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও অসংখ্য ব্যবহারিক উদ্দেশ্য রয়েছে, যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। একটি বাক্যেই এর বিরাট উপকারিতা নিহিত রয়েছে। কাজেই মানুষ যেন এই মহিমান্বিত কুরআনিক রচনাশৈলী নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, যেখানে শব্দ চয়নের নিখুঁততা এবং অসাধারণ ভাষাশৈলী ও বর্ণনাশক্তি বিদ্যমান।

তারপর আল্লাহ তাআলা সময়-সূচির উপকারিতাগুলোর মধ্যে হজের সময়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এটি চাঁদের সময়-সূচির সাথে সম্পর্কিত ইবাদতের একটি উদাহরণ এবং গুরুত্ব তুলে ধরে। পাশাপাশি হজের সাথে সংশ্লিষ্ট পরবর্তী দিকনির্দেশনাও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ একটি ভুল ধর্মীয় বিশ্বাসকে সংশোধন করেছেন, যা জাহেলি যুগে প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন: ***[আর পিছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই]***। সে যুগে আনসারদের কেউ যদি হজ বা ওমরার ইহরাম বাঁধত এবং কোনো প্রয়োজনে ঘরে ফিরতে চাইত, তবে তারা দরজা দিয়ে প্রবেশ করত না। বরং দেয়াল টপকে ঘরের পিছন দিয়ে প্রবেশ করত, যেন তাদের এবং আকাশের মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে। তারা বিশ্বাস করত, দরজার কাঠামোর নিচ দিয়ে প্রবেশ না করাই আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও নেক কাজ। দয়াময় ও করুণাময় আল্লাহ এই প্রথা বা বিশ্বাসকে বাতিল করেছেন পূণ্যের সাথে এই পদ্ধতির কোনো সম্পর্ক নেই বলে ঘোষণা দিয়ে। তিনি প্রথমে অজ্ঞতার এই মূল ভিত্তি দূর করেন এবং তার পরিবর্তে শরীয়তসম্মত জ্ঞান স্থাপন করেন: ***[বরং পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া তাকওয়া অবলম্বন করলে।]***। আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, প্রকৃত পূণ্য হলো আল্লাহর প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করা। এতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, বিদআত

বাতিল, যদিও তা ইবাদতের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। এটি প্রমাণ করে যে বিদআত আনুগত্য বা নেকির অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকৃত নেকি হলো আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করা, যা তাঁর নির্দেশ পালন এবং শরীয়তের নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী হয়, এতে কোনো বাড়তি বা কমতি ছাড়া এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে। এরপর আল্লাহ তাআলা সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: ***[কাজেই তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে।]***। এতে বুঝা যায় যে, ইসলাম একটি উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ অনুসরণ করে, এবং এটি কোনো কঠোরতা বা জটিলতার উপর ভিত্তি করে নয়, বরং এটি সহজ ও নমনীয়। এরপর আল্লাহ তাআলা আয়াতের শেষে তাকওয়ার প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: ***[তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।]***, যা নির্দেশ করে যে, আল্লাহর তাকওয়া একজন মানুষের সফলতা, সাফল্য এবং নিরাপত্তার পথ। অতএব মুসলমানদের উচিত নিজেদের এবং অন্যদের তাকওয়া শিক্ষা দেওয়া, কারণ এটি গোপন ও প্রকাশ্যে সঠিক আচরণ গঠনের একটি মূলনীতি।

আয়াতের এই বিন্যাস থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নেওয়া যায়, তা হলো ধাপে ধাপে সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব। প্রথমে আয়াতে ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে: (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها)। পরে সঠিক জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, যা গ্রহণ ও অনুসরণের উপযুক্ত: (ولكن البر من اتقى)। তারপর সঠিক চিন্তা ও বোঝার পর, আচরণ সংশোধন করা হয়েছে: (وأتوا البيوت من أبوابها)। অবশেষে, পরিবর্তন ও কাজ করার জন্য একটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে: (واتقوا الله لعلكم تفلحون)। এইভাবে, আয়াতটি একটি শিক্ষামূলক এবং সুসংগঠিত পদ্ধতির মাধ্যমে সংশোধন, শিক্ষা এবং উন্নতির নির্দেশনা দেয়।

﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠ وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٩١ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٩٢ وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ١٩٣ ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ١٩٤ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۚ وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥﴾

অর্থ: **[আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।* আর তাদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে তোমরাও সে স্থান থেকে তাদেরকে বহিস্কার করবে। আর ফেতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর। আর মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যে পর্যন্ত না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। অতঃপর যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, এটাই কাফেরদের শাস্তি।* কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।* আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না ফেতনা চূড়ান্তভাবে দূরীভূত না হয় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা বিরত হয় তবে যালিমরা ছাড়া আর কারও উপর আক্রমণ নেই।* হারাম মাস হারাম মাসের বদলে এবং পবিত্র বিষয়সমূহ কিসাসের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে, তোমরা তার উপর আক্রমণ কর, যেরূপ সে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।* আর তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করা এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।**

আর তোমরা ইহসান কর, নিশ্চয় আল্লাহ মুহসীনদের ভালবাসেন।] *(*আয়াত নং **১৯০-১৯৫***)*

এই আয়াতের বক্তব্য রাসূলুল্লাহ *(*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)* এবং মুমিনদের উদ্দেশ্যে এসেছে। এখানে সমষ্টিগত ও আদেশমূলক রূপে বলা হয়েছে*: (*وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين / আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর*;* কিন্তু সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।*)*। আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের অনুমতি সংক্রান্ত প্রথম নাযিলকৃত এই আয়াতে দুটি বিষয়ে মুমিনদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন*:* **১.** যারা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। **২.** সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকা।

এই আয়াতের একটি ফায়েদা হলো যুদ্ধের লক্ষ্য নির্ধারণ করা, যা আল্লাহর পথে হওয়া আবশ্যক। সুতরাং, আল্লাহর পথে না হলে কোনো যুদ্ধ বৈধ নয়। এ থেকে বোঝা যায়, প্রকৃত মুজাহিদ তিনিই, যিনি আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেন, এবং শহীদ তিনি, যিনি আল্লাহর পথে নিহত হন। এছাড়া, এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, যুদ্ধ করতে হবে কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এরপর "সীমালঙ্ঘন করো না" এই একটি শব্দের মাধ্যমে যুদ্ধের নীতিমালা ও চরিত্রের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর *(*রহিমাহুল্লাহ*)* বলেন*: (*এই সীমালঙ্ঘনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে*:* শত্রুর লাশ বিকৃত করা, আত্মসাৎ করা এবং নারী, শিশু, বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী ও উপাসনালয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিদের হত্যা। অনুরূপভাবে গাছ-গাছালী পুড়িয়ে দেওয়া এবং কোনো বৈধ প্রয়োজনে ব্যতীত প্রাণী হত্যা করা।*)*[২৯]

---

(২৯) তাফসীরে ইবনে কাসীর*: (*১/২৩৩*)*।

এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম একটি নৈতিক, শান্তিপূর্ণ এবং করুণাশীল ধর্ম। এটি কোনো প্রতিশোধ, হত্যা বা অন্যকে কষ্ট দেওয়ার ধর্ম নয়। ইসলাম মানুষের নিরাপত্তা ও স্থিতি নিশ্চিত করে। তার যুদ্ধের উদ্দেশ্য হল অন্যায় প্রতিরোধ করা, কল্যাণ সাধন করা এবং সীমা লঙ্ঘন না করা, এমনকি যুদ্ধের সময়ও। আয়াতটি শেষ হয়েছে এই বক্তব্য দিয়ে: ***[নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।]*** এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়িকে অপছন্দ করেন এবং যারা এ কাজগুলো করে তাদেরকেও আল্লাহ পছন্দ করেন না। এর শিক্ষাগুলো হলো:

১. সীমা লঙ্ঘন থেকে বিরত থাকতে হবে।

২. নিজের আচরণ সংযত রাখতে হবে।

৩. মুসলমানদের আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর বিধান অনুযায়ী কাজ করতে হবে, যাতে তাদের জিহাদ সত্যিকার অর্থে আল্লাহর পথে হয়।

যখন আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরতদের সঙ্গে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন, তখন তিনি মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার আদেশ দিলেন। তিনি বললেন: **"তোমরা তাদের যেখানে পাও, হত্যা করো"** এবং **"তোমরা তাদের বহিস্কার করো, যেখান থেকে তারা তোমাদের বহিস্কার করেছিল।"** অর্থাৎ, তাদের সেই স্থান থেকে বের করো, যেখান থেকে তারা তোমাদের বিতাড়িত করেছিল, আর তা হলো মক্কা মুকাররমা। মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মুহাজির সাহাবাদের মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছিল। তারা নিজেদের সম্পদ এবং সহায়-সম্পদ ত্যাগ করে কেবলমাত্র আল্লাহর দ্বীনের জন্য মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, মুশরিকদের অত্যাচারের কারণে। এ নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল শত্রুদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত আচরণের উদাহরণ। যেমন তারা মুমিনদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাদের দেশছাড়া করেছে, তেমনি তাদেরও হত্যা করা এবং মক্কা থেকে বিতাড়িত করা হবে। এতে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর আল্লাহ তাআলা একটি

ধর্মীয় সত্যতা ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন: **"ফিতনা হলো হত্যার চেয়েও গুরুতর।"** অর্থাৎ, দ্বীনের ক্ষেত্রে ফিতনা (ঈমান আনায় বাধা সৃষ্টি বা ধর্মত্যাগে বাধ্য করা) হত্যার চেয়েও ভয়াবহ ও গুরুতর অপরাধ। মুশরিকদের কাজ ছিল মুমিনদের কুফরিতে বাধ্য করা, যা হত্যার চেয়েও বড় অপরাধ। তাদের ফিতনার কিছু উদাহরণ হলো:
মুসলমানদের প্রতি শারীরিক নির্যাতন, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি মিথ্যা অভিযোগ, যেমন তাকে জাদুকর, কবি বা গণক বলে অপমান করা, ইত্যাদি। এ নির্দেশনা থেকে বুঝা যায় যে,

- দ্বীনের ক্ষেত্রে ফিতনা সবচেয়ে বড় বিপদ ও অপরাধ।
- আল্লাহর পথে মানুষকে বাধা দেওয়া ভয়াবহ অপরাধ।
- মুমিনদের ফিতনার বিভিন্ন কৌশল, রূপ ও মাধ্যম থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এছাড়া, ফিতনা মুসলিমদের দেশে প্রবেশ করানোর যেকোনো পদ্ধতি যেমন বাক্য, চিত্র বা অন্য কোনো মাধ্যমে আনা থেকে সাবধান হতে হবে।

কুরআনের বর্ণনাটি একটি তুলনার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে, যেখানে হত্যার ক্ষতি ও বিপদের সঙ্গে মুমিনকে তার দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার ক্ষতি ও বিপদ তুলনা করা হয়েছে: **"আর ফিতনা হলো হত্যার চেয়েও গুরুতর।"** এ থেকে বোঝা যায়:
১. জিহাদের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন ভ্রান্ত ধারণা ও চিন্তা চিহ্নিত করা এবং তা দূর করা অত্যন্ত জরুরি।
২. ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মাকে প্রস্তুত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৩. যে মুমিন তার দ্বীনে ফিতনার শিকার হয়েছে, তাকে সহায়তা করা একটি দায়িত্ব।

এ শিক্ষাটি বিভিন্ন ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেমন: দাওয়াত, শিক্ষাদান, প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে। এখানে মূল কথা হলো, চিন্তার প্রতিবন্ধকতা দূর করা। এটি সম্ভব

স্বার্থ ও ক্ষতির তুলনা করে সঠিক পথ নির্ধারণ এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে।

আল্লাহ তাআলা এরপর মক্কা মুকাররমার পবিত্রতা এবং সম্মানের বিষয়ে নির্দেশ দেন: **"আর মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যে পর্যন্ত না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। অতঃপর যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে।"** এ নির্দেশনায় কাবা ঘরের মর্যাদা ও পবিত্রতার প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা রয়েছে। এটি মানুষের মনে কাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জাগ্রত করে এবং তাদের আচরণে শালীনতা ও শিষ্টাচার বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। তবে যুদ্ধের জন্য কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যতক্ষণ না শত্রুরা আগে আক্রমণ করে। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আদেশ অনুসরণ করেছিলেন এবং তিনি যুদ্ধ শুরু করেননি। এর ফলে আল্লাহ মক্কাকে শান্তিপূর্ণভাবে বিজয় দান করেন। আল্লাহ আরও বলেন: **"এটাই কাফেরদের শাস্তি।"** এটি ইঙ্গিত দেয় যে, যারা পবিত্র ঘরের মর্যাদা নষ্ট করে, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারিত। এরপর আল্লাহ তাআলা কী ঘটতে পারে এবং কী ব্যবস্থা নিতে হবে তা ব্যাখ্যা করেন: **"কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"** কাজেই যদি শত্রুরা তাদের অবস্থান থেকে ফিরে আসে, এবং তারা শিরক থেকে বিরত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ তাদের মাফ করে দিবেন ও তাদের প্রতি দয়া করবেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা ইসলামের মাধ্যমে পূর্বের সব পাপ মাফ করে দেন। আর ইসলামের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র শত্রুদের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়া নয়, বরং মূল লক্ষ্য হলো তাদের ইসলামে প্রবেশ করানো।

আল্লাহ তাআলা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন: **"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না ফেতনা চূড়ান্তভাবে দূরীভূত না হয় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।"** তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল, যাতে তারা

মানুষের ধর্মে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করতে পারে এবং মক্কায় কোনো নির্যাতিত মুসলিম না থাকে, যাতে তার ধর্মে কোন ফিতনা না আসে, এবং মক্কায় আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে মূল থেকেই শিরক নির্মূল হয় এবং আল্লাহর দ্বীনই প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি তারা তাদের শিরক ও কুফর থেকে ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে মূলনীতি হলো: **"অতঃপর যদি তারা বিরত হয় তবে যালিমরা ছাড়া আর কারও উপর আক্রমণ নেই।"**

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অবিচার এড়াতে সহায়ক, লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে এবং প্রতিশোধের পরিবর্তে সব ধরনের শত্রুতা ও বিদ্বেষ মেটায়। ইসলামের পূর্বে যাই ঘটুক না কেন ইসলাম রক্তপাত বন্ধ করে। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে প্রতিশোধ বা কঠোরতা গ্রহণ করতে বলেননি, বরং তিনি বলেন: **"কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"**

আল্লাহ তাআলা বলেন: **"হারাম মাস হারাম মাসের বদলে এবং পবিত্র বিষয়সমূহ কিসাসের অন্তর্ভুক্ত।"** এটি নির্দেশ দেয় যে, যেকোনো আক্রমণের প্রতিফলন সমানভাবে করা হবে। যারা পবিত্র মাসে (যেমন: জিলকদ, জিলহজ্জ, মুহাররম, এবং রজব) আক্রমণ করে এবং যুদ্ধ শুরু করে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা লঙ্ঘন করলে তাদের প্রতিশোধ সমানভাবে নেওয়া হবে, অর্থাৎ **"সুতরাং যে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে, তোমরা তার উপর আক্রমণ কর, যেরূপ সে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে।"** এটি ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধকৃত বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তা রক্ষা করার গুরুত্বকে প্রকাশ করে। তবে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা জরুরি, এমনকি যদি আক্রমণ পবিত্র মাসে বা কোনো পবিত্র স্থানে বা ইহরাম অবস্থায়ও ঘটে। এতে এমন কিছু উপকারিতা রয়েছে যা ন্যায় এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, যাতে কাফেররা ইসলামের পবিত্রতাকে কাজে লাগিয়ে আক্রমণ বা অত্যাচার করতে না পারে, এবং এমনকি কেউ যদি ইহরামের অবস্থায় পবিত্র স্থানসমূহে অশান্তি বা অবিচার করতে চায়, তাকে প্রতিরোধ করা উচিত, যাতে সে শাস্তি

পায় এবং তার অপকর্ম রোধ করা যায়। এই আয়াতটি হুদাইবিয়ার বছরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিল, এবং এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছে মুফাস্সিরগণ।[৩০]

যেহেতু মানুষ যখন প্রতিশোধের সুযোগ পায়, তখন তাদের মন খারাপের কারণে সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং তারা প্রতিশোধের মাধ্যমে ক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা করতে পারে, এজন্য আল্লাহ তাআলা সীমার মধ্যে থাকা এবং তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: **"আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।"** এখানে আল্লাহ তাআলা তাকওয়া বা আত্ম-সংযমের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তিনি তাদের সাথে থাকেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। এ থেকে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি চায় আল্লাহ তাআলা তার সাথে থাকুক, তাকে তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে, যাতে আল্লাহ তাকে সাহায্য, সমর্থন এবং শক্তি প্রদান করেন। এর বিপরীতে, যারা আল্লাহ তাআলার ভয় থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাদের সহায়তা বন্ধ করে দেন, এবং তাদের জীবনে সবসময় পরাজয় ও দুর্ভোগ নেমে আসে।

তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর পথে দান করার নির্দেশ দিয়েছেন: **"আর তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো"** অর্থাৎ, হে সামর্থ্যবানরা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্যে দান করো। এটি বিভিন্ন ধরনের ভালো কাজে দান করতে উৎসাহিত করে, যেহেতু আল্লাহ তাআলা কোনো নির্দিষ্ট খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, সব ধরনের ভালো কাজে দান করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি দান করার একটি সাধারণ ভিত্তি স্থাপন করেছেন (আল্লাহর পথে)। আর যেহেতু এটি জিহাদ সম্পর্কিত আয়াত, তাই এটি বিশেষভাবে জিহাদের জন্য দান করার ওপর গুরুত্ব দেয়। আল্লাহ তাআলা দান থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন, যা তার ধ্বংসের কারণ হয়: **"তোমরা স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।"** এইভাবে এই নির্দেশটি বোঝায় যে, যে

---

(৩০) দেখুন: আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন: (২/২৩৬-২৩৭)।

ব্যক্তি আল্লাহর পথে দান করতে অস্বীকার করে, এর অর্থ হলো- যেন সে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অর্থাৎ, দান থেকে বিরত থাকলে ব্যক্তি নিজেকে ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে। পক্ষান্তরে দানের মাধ্যমে ধ্বংস প্রতিহত হয়। যেমনটি হাদিসে এসেছে যে, নবী সাঃ বলেছেন: **(নিশ্চয় দান-সদকা রবের ক্রোধ দমন করে এবং অপমৃত্যু রোধ করে।)** সুনানে ইবনে মাজাহ। দানে স্বচ্ছল কর্তৃক অসচ্ছলদের সাহায্য করা, শক্তিশালীর দ্বারা দুর্বলদের সহযোগিতা করা এবং ধনীদের দ্বারা গরীবদের উপকার করার দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। এবং জিহাদে দানের মাধ্যমে ইসলাম এবং মুসলিমদের জন্য উপকারিতা আসে যা ধ্বংসের কারণগুলো ঠেকাতে সহায়তা করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা সৎকর্মের আদেশ দিয়েছেন: **"وأحسنوا إن الله يحب المحسنين /আর তোমরা ইহসান কর, নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"** এই নির্দেশনার মধ্যে সমস্ত ধরনের সৎকর্ম অন্তর্ভুক্ত, যেমন অর্থ, সামাজিক মর্যাদা, কথাবার্তা ইত্যাদি জাতীয় সবধরণের সৎকর্ম। বস্তুত সৎকর্মশীল ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করে, যা একটি অত্যন্ত মূল্যবান পুরস্কার। কারণ এটি আল্লাহর দয়া, সহায়তা ও তাওফীক আনয়ন করে, এবং আল্লাহ ওই ব্যক্তির প্রতি সৃষ্টির মধ্যে ভালোবাসা স্থাপন করেন।

আল্লাহর বাণী: (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) এতে একটি শক্তি রয়েছে যা দ্বারা ব্যক্তি নিজেকে স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত করতে পারে এবং সৎকর্মের দিকে ধাবিত করে। যদি সে সৎকর্মে দ্বিধাগ্রস্ত হয়, তবে সে নিজেকে এই আয়াতে দৃঢ় করতে পারে (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)। যদি সে স্বার্থপরতা অনুভব করে, তবে সে এই আয়াত দ্বারা নিজেকে শক্তিশালী করবে (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)। যদি সে বেশি দান করতে চায়, তবে সে এই আয়াতের মাধ্যমে নিজেকে উৎসাহিত করবে (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)। যদি সে কোনো ভালো কাজ করতে অলস হয়, তবে এই আয়াত তাকে উদ্দীপ্ত করবে (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)। এবং যদি সে নিজের দিকে মনোযোগী হয়ে থাকে, তবে এই আয়াত তাকে তার আত্মাকে উপদেশ দেবে (وأحسنوا

إن الله يحب المحسنين)। এটি এমন এক শক্তি যা মুসলিম তাদের মধ্যে অনুভব করে এবং সৎকর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোতে প্রয়োগ করে। আল্লাহ তাআলার কাছে সফলতা, সাহায্য ও সঠিক পথ কামনা করছি এবং তিনি যেন আমাকে ও আমার মুসলিম ভাইদেরকে সৎকর্মশীল বানান।

﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ١٩٦﴾

অর্থ: **[আর তোমরা হজ ও উমরা পূর্ণ কর আল্লাহর উদ্দেশ্যে। অতঃপর যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও তাহলে সহজলভ্য হাদী (কুরবানীর পশু) প্রদান করো। আর তোমরা মাথা মুন্ডন করো না যে পর্যন্ত হাদী তার স্থানে না পৌছে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় বা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হয় তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা পশু যবেহ দ্বারা তার ফিদইয়া দিবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ উমরাকে হজের সঙ্গে মিলিয়ে লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য হাদী যবাই করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তবে তাকে হজের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফিরার পর সাত দিন এ পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। এটা তাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।]** (আয়াত নং ১৯৬।)

সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ মুমিনদের জন্য হজ ও উমরাহ ফরজ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন: **"আর তোমরা হজ ও উমরা পূর্ণ কর আল্লাহর উদ্দেশ্যে।"** আয়াতটি এমন এক আদেশ দিয়ে শুরু হয়েছে যা নির্দেশ দেয় যে, হজ ও উমরাহ শুরু করলে তা সম্পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক। বাক্যটি এর গুরুত্ব ও পূর্ণতা বজায় রাখার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে, যা এর রুকন, ফরজ, ও সুন্নতগুলো যথাসাধ্য সুন্দরভাবে পালন করার মধ্যেই নিহিত। তেমনি পূর্ণ করার অর্থ হলো সন্দেহ দূর করা এবং দৃঢ় সংকল্পকে

অগ্রাধিকার দেওয়া। এটি একজন মুসলিমকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃঢ়তা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখার অভ্যাস গড়ে তোলে, যা তাকে যেকোনো কল্যাণকর কাজে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। পাশাপাশি, সন্দেহ ও দ্বিধা দূর করা আবশ্যক, যা মানুষের ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। এর পাশাপাশি, যে কাজই করা হোক না কেন, তা সর্বোত্তম উপায়ে সম্পাদন করতে হবে। যেমন নবী সাঃ বলেছেন*: (**যদি তোমাদের কেউ কোনো কাজ করে, তবে সে যেন তা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে**।)* আয়াতটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে, তা হলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠতা*: **"আর তোমরা হজ ও উমরা পূর্ণ কর আল্লাহর উদ্দেশ্যে।"*** অতএব আমল যেন লোক দেখানো, প্রশংসা অর্জন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে না হয়। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম একনিষ্ঠতার ধর্ম*;* এখানে কাজের মাধ্যমে গর্ব বা আত্মপ্রচার করার কোনো স্থান নেই। যখন কোনো ব্যক্তি এ অভ্যাস গড়ে তোলে, তখন এটি তাকে এমনভাবে গড়ে তোলে যে সে ধর্মীয় বা দুনিয়াবি কাজে লৌকিকতা বা অহংকারের প্রতি মনোযোগ দেয় না। এটি তাকে অহংকার থেকে বিরত রাখে যা সমাজে বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণ হয়। বস্তুত ইবাদতের যথাযথ বাস্তবায়ন মুসলিমের নৈতিকতা, আচার-আচরণ এবং তার অন্যান্য কর্মকাণ্ড ও জীবনের সব দিকেই ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ইসলামী শরীয়ত "**যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও**" এই বাণীর মাধ্যমে সম্ভাব্য বাধা থেকে সমাধানের পথ নির্ধারণ করেছে, যা ইহরাম পালনকারী ব্যক্তিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। শরীয়ত এই ধরনের পরিস্থিতিতে অগ্রিম সতর্কতা গ্রহণ করেছে, যাতে ইহরাম অবস্থায় কেউ কোনো বাধার সম্মুখীন হলে, তার জন্য সহজ ও দুঃখমুক্ত সমাধান থাকে। এটি সমস্ত প্রকারের বাধা বা কারণকে অন্তর্ভুক্ত করে যা হজ বা ওমরাহ সম্পন্ন করতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টি এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যাতে বাধা বা প্রতিবন্ধকতার ধরন নির্দিষ্ট না হয়। এর ফলে এর পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, কারণ এই ধরনের বাধার প্রকার ও কারণগুলো অসংখ্য। এটি আল্লাহর এই বিধানের সূক্ষ্মতা ও

পূর্ণতার অন্যতম নিদর্শন। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের যা কিছু ঘটতে পারে, সে সম্পর্কে সর্বজ্ঞ এবং সব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। এটি শিক্ষণীয় ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ: জীবন পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে সুনির্দিষ্ট বিধান ও নিয়মাবলীর প্রণয়নে একটি পদ্ধতিগত কাঠামো গড়ে তোলার পথ প্রদর্শন করে, বিশেষ করে মাসলাহা মুরসালা (সার্বিক কল্যাণ সংশ্লিষ্ট বিষয়) সংক্রান্ত ক্ষেত্রে।

ফলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বাধাপ্রাপ্তির বিষয়টি সর্বোত্তম ও সহজতম পন্থায় সমাধান করেছেন। তিনি বলেন, "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" **(অতঃপর যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও তাহলে সহজলভ্য হাদী প্রদান করো।)**। এটি একটি ছাগল, উটের সপ্তমাংশ, অথবা গরুর সপ্তমাংশ কুরবানী হিসেবে হতে পারে। এর জন্য কঠিন কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। এটি প্রজ্ঞাময় ও করুণাময় সত্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজতর বিধান, যেখানে বাস্তব অবস্থার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। যেমন: সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখা, সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং এমন বিকল্প সমাধান রাখা যা পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য হয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতার প্রতি সতর্ক করে নির্দেশ দেন যে এটি হাদির কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পরেই হওয়া উচিত। আল্লাহ বলেন, "وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" (তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না যতক্ষণ না হাদি তার নির্ধারিত স্থানে পৌঁছায়)। এটি ইঙ্গিত করে যে ইসলামী শরীয়ার ইবাদত একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা প্রজ্ঞাময় ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। এবং এটি অবশ্যই আল্লাহর বিধান ও আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যার আলোকে পালন করতে হবে। এরপর আল্লাহ তাআলা আরও বাধাসমূহ এবং জরুরি পরিস্থিতি উল্লেখ করেন, যা হজ বা উমরাহ পালনকারী ব্যক্তির জীবনে ঘটতে পারে। তিনি বলেন, "فَمَن

كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " **(তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে, অথবা তার মাথায় কোনো কষ্ট বা সমস্যা হলে, তার জন্য প্রতিকার হলো রোজা রাখা, সদকা করা বা কুরবানী করা)**। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জীবনে সংঘটিত হতে পারে এমন কারণসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগত, যা কখনো কখনো তাদের নস্কের পদ্ধতি অনুসরণে ব্যত্যয় ঘটাতে পারে, তাই তিনি জানিয়ে দেন এমন পরিস্থিতিতে করণীয় কী। এটি প্রমাণ করে যে, এই শরীয়ার পদ্ধতি অত্যন্ত নিখুঁত, যা কেবলমাত্র প্রজ্ঞাময় ও বিজ্ঞ সত্তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হতে পারে। এটি একজন মুমিনের ঈমান ও বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করে। যদি কোনো অসুস্থ ব্যক্তি বাধ্য হন মাথার চুল কাটতে, তবে তাকে এটি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে সাথে কাফফারা আদায়ের শর্ত রাখা হয়েছে। কাফফারা পালনে তাকে তিনটি বিকল্পের মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে: রোজা রাখা, দরিদ্রদের খাদ্য দান করা, অথবা একটি পশু জবাই করা। এ বিষয়ে সুন্নাহ স্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে এবং ফিকহবিদগণ আরও বিস্তৃত ফিকহি বিশ্লেষণ করেছেন। আল্লাহপ্রদত্ত শরয়ী এ পদ্ধতির অন্যতম উপকার হলো: এটি অসাধারণ মেধাবী আলিম তৈরি করেছে, যাদের মস্তিষ্ক থেকে আল্লাহর অনুগ্রহে বিস্তৃত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা উদ্ভাবিত হয়েছে। ফলে তারা এমন অনন্য বৈজ্ঞানিক ও জ্ঞানতত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন যা আগে কোনো জাতি উপস্থাপন করতে পারেনি, যেমন: ফিকহী নীতিমালা, উসূলুল ফিকহ, মুসতালাহুল হাদীস এবং অন্যান্য বহু জ্ঞান যা আল্লাহর অনুগ্রহে এবং ঐশী শরয়ী পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের মাঝে বিকশিত হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তাআলা নিরাপত্তা থাকলে তামাত্তু হজের কথা বর্ণনা করেন: ***[অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ উমরাকে হজের সঙ্গে মিলিয়ে লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য হাদী যবাই করবে।]*** অর্থাৎ যখন কেউ হজের মাসগুলোতে উমরাহ করার পর ইহরাম খোলার মাধ্যমে হালাল হয়ে যাবে এবং

মুকিমদের মতো বৈধ বিষয়াদি উপভোগ করবে, তারপর হজের সময় আবার ইহরাম বাঁধবে—তাহলে তার জন্য হাদি *(কুরবানি)* দেওয়া অপরিহার্য। অনুরূপভাবে শরীয়ত মানুষের অবস্থা এবং তার মুখোমুখি হতে পারে এমন বাস্তবতার দিকেও লক্ষ্য রেখেছে*:* "فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ"। অর্থাৎ, যদি কেউ কুরবানির জন্য পশু না পায় অথবা তার মূল্য দিতে অক্ষম হয়, তাহলে বিকল্প হিসেবে রোজা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এটি দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যাতে সেই বিকল্পও তার জন্য কষ্টকর না হয়*:* হজের সময় তিন দিন এবং দেশে ফিরে সাত দিন। এতে সম্ভাব্য অবস্থার প্রতি সতর্কতা এবং মানুষের পরিস্থিতি বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক কঠিন পরিস্থিতির সমাধান দেওয়ার অসাধারণতা দক্ষতাকে প্রকাশ করে। এটি কেবল সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসতে পারে যিনি তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু এবং যার আইন প্রজ্ঞাপূর্ণ।

এরপর আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে এই বিধান তাদের জন্য, যারা হারামের অধিবাসী নয়*: [***এটা তাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়।***]* বিখ্যাত তাফসিরকারক ইবনে সা'দি *(রহ.)* বলেছেন*:* "যারা মসজিদুল হারামের অধিবাসী, তাদের ওপর হাদির *(কুরবানি)* বাধ্যবাধকতা নেই, কেননা তাদের জন্য এই কারণ প্রযোজ্য নয়।"[৩১] এই বিষয়ে ফকিহগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার আদেশ করেছেন*:* **"وَاتَّقُوا اللَّهَ" *[আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর]***, এই বাক্যটি তাকওয়ার নির্দেশ বহন করে, যা নির্দেশ করে যে হাজী ও উমরাহকারীদের জন্য আবশ্যক যে, তারা এই ইবাদতে আল্লাহ তাআলার তাকওয়া অবলম্বন করবে। কেননা এখানে তাদের কাজের হিসাব নেওয়ার কেউ নেই, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। তাই তারা যেন এই ফরজ ইবাদত আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্পন্ন করে। এটি আরও বোঝায় যে দাওয়াহ, শিক্ষা ও চরিত্র

---

(৩১) দেখুন*:* তাইসীরুল কারীমির রহমান*: (*১/১৫৬*)*।

গঠনের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি তাকওয়া অবলম্বনের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনো কাজে কল্যাণের উপদেশ পুনরাবৃত্তি করা গুরুত্বপূর্ণ, এবং এর ইতিবাচক প্রভাব ও উপকারিতা রয়েছে। এমনকি পেশাগত কাজ, পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেনেও সবার মধ্যে কল্যাণের উপদেশ দেওয়ার প্রথা বিদ্যমান থাকা উচিত। পরে আল্লাহ তাআলা এমন লোকদের জন্য শাস্তির হুমকি দিয়েছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে না, ইবাদত ও হজের কার্যাদি পালনে অবহেলা করে, বলেছেন: ***[জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।]*** এ থেকে বোঝা যায় যে, যদি কেউ আল্লাহর আদেশকে হালকাভাবে নেয় এবং সঠিকভাবে পালন না করে, তবে আল্লাহর কঠিন শাস্তি আসবে। অতএব, মুসলমানদের উচিত আল্লাহর আদেশকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা এবং এতে কোনো অবহেলা বা ঢিলেঢালাভাবে কাজ না করা। এতে আল্লাহ তাআলা কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করে সতর্ক করেছেন, কারণ আল্লাহর ভয়ে মানুষ তাঁর হেদায়াত অনুযায়ী চলতে পারে। আল্লাহর শাস্তির ভয় মানুষকে তাকওয়া অর্জনে সহায়তা করে, এবং আল্লাহর শাস্তি কতটা কঠোর, তা মনে করিয়ে দেওয়া মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে, কারণ মানুষের অন্তরে নিরাপত্তা ও শান্তির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। এটি শিক্ষামূলকভাবে নির্দেশনা দেওয়ার গুরুত্বকে তুলে ধরে, যাতে মানুষ উপদেশের পাশাপাশি তার পরিণতিও বুঝতে পারে। এটি মানুষের মধ্যে এমন এক ধরনের আত্মশিক্ষা সৃষ্টি করে, যেখানে ব্যক্তি নিজে নিজে আল্লাহর তাকওয়া অর্জনে সচেষ্ট থাকে, কারণ তার ইবাদতের ত্রুটির জন্য কেউ তাকে শাস্তি দিতে পারে না; বরং শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই তার কাজের হিসাব নেবেন এবং শাস্তি দেবেন।

﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩٧ لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ

ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًاۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

অর্থ*: [***হজ হয় সুবিদিত মাসগুলোতে, তারপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ করা স্থির করে সে হজের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ করবে না। আর তোমরা ভাল কাজের যা কর আল্লাহ তা জানেন, আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। নিশ্চয় উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ*!* তোমরা আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর।* তোমাদের রব-এর অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। অতঃপর যখন তোমরা আরাফাত হতে ফিরে আসবে তখন মাশ'আরুল হারামের কাছে পৌছে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন - ঠিক সেভাবে তাকে স্মরণ করবে। যদিও এর আগে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।* তারপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে ফিরে আসে তোমরাও সে স্থান থেকে ফিরে আসবে। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।* তারপর যখন তোমরা তোমাদের হজের কাজসমূহ শেষ করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা স্মরণ করতে তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে, এমনকি তার চেয়ে অধিক স্মরণ। আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দিন। বস্তুত আখিরাতে তার জন্য কোন অংশ নেই।* আর তাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন, আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।* তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। আর আল্লাহ হিসেব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।* আর

তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করবে। অতঃপর যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই এবং যে ব্যক্তি বিলম্ব করে আসে তারও কোন পাপ নেই। এটা তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, তোমাদেরকে তাঁর নিকট সমবেত করা হবে।] (আয়াত নং: ১৯৭-২০৩)।

এরপর আল্লাহ তাআলা এ মহান হজের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যা ইসলামের একটি স্তম্ভ। তিনি বলেন, (الحج أشهر معلومات) অর্থাৎ হজের মাসগুলো বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, এগুলো শ্রোতাদের কাছে পরিচিত। এটি ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকে পরিচিত এবং এ মাসগুলো হলো শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজের প্রথম দশ দিন। এ থেকে বুঝা যায় যে, যেসব বিষয় সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার, সেগুলো বিস্তারিতভাবে পুনরায় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। ইমাম কুরতুবী রহঃ বলেন: "আল্লাহ তাআলা এখানে ওমরার কথা উল্লেখ করেননি, কারণ এটি সারা বছর হতে পারে, কিন্তু হজ প্রতি বছর কেবল একবারই অনুষ্ঠিত হয়।"(৩২)

এরপর আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির নৈতিকতা বর্ণনা করেন, যারা এই পবিত্র ইবাদতে অংশগ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, **[তারপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ করা স্থির করে সে হজের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ করবে না।]** অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হজের কার্যাদিতে প্রবেশ করেছে সে মূলত নিজের উপর তা আবশ্যক করে নিয়েছে। এমতবস্থায় তার জন্য হজের সময় কোনো অশালীনতা, পাপাচার কিংবা বিবাদ নিষিদ্ধ। যার মানে হল যে, যারা এই পবিত্র কাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তারা নিজের উপর হজের সমস্ত দায়িত্ব আরোপ করেছে এবং তাদের জন্য এর সমস্ত শর্ত পালন করা অপরিহার্য। এটি এমন, যেমন কেউ কোনো চুক্তিতে প্রবেশ করলে, তাকে সেই চুক্তির সকল শর্ত মেনে চলতে বাধ্য করা হয়। ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ

(৩২) আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন: (২/২৬৯)।

বলেছেন: "এর মানে হল, সে নিজের উপর তা আবশ্যক করে নিয়েছে; অন্তরে নিয়তের মাধ্যমে সূচনা করে, ইহরাম দ্বারা বাহ্যিকভাবে এবং প্রকাশ্যে তালবিয়া পাঠ ও ঘোষণা করার মাধ্যমে।"(৩৩)

হজের মধ্যে যে সকল কাজ নিষিদ্ধ, তা হাজিদের মধ্যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সৃষ্টি করে, শরীয়ত যে সকল কাজ নিষিদ্ধ করেছে, তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তারা নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে শেখে, তাদের ইচ্ছাশক্তি ও সংকল্প আরও দৃঢ় হয়, এবং তারা বুঝতে পারে যে, তারা কোনো কিছু থেকে বিরত থাকতে সক্ষম, যা আগে তাদের ধারণা ছিল যে, সম্ভব নয়। এর মাধ্যমে তারা তাদের আসল ক্ষমতা আবিষ্কার করে এবং তাদের পুরোনো অবসাদজনক বিশ্বাসগুলো দূর হয়ে যায়, যা তাদের সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা ছিল। এটি আত্মশুদ্ধির এবং উচ্চমানের শিষ্টাচারের দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর সুফল এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক ও পেশাগত জীবনের সাথে সম্পৃক্ত এর উপকারিতার বৃত্তান্ত শেষ হবার নয়। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এমন একটি বিষয় যা তারা জানে, তা হল আল্লাহ তাদের সম্পর্কে সকল কিছু জানেন: ***[তোমরা যা কিছু ভাল কাজ করবে, আল্লাহ তা জানেন।]*** এই উপদেশের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা এবং ভাল কাজ করার জন্য মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেন বলা হচ্ছে: যা তুমি পরিত্যাগ করবে এবং তার বিপরীতে যা ভালো কাজ করবে, আল্লাহ তা জানেন, তিনি জানেন তোমার কর্ম, তিনি জানেন তুমি কিভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করছ এবং আল্লাহর নির্দেশ পালন করছ। তাই তিনি তোমাকে তার জন্য পুরস্কৃত করবেন। কারণ আল্লাহ তাআলা সব জানেন এবং তিনি মহান দাতা।

এরপর আল্লাহ তাআলা হাজিদেরকে আদেশ করেন যে, তারা তাদের সফরের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করুক: ***[আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। নিশ্চয় উত্তম***

---

(৩৩) পূর্বোক্ত।

পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া।] এর কারণ ছিল যে, কিছু হাজী হজে আসার সময় তাদের সঙ্গে কোনো পাথেয় নিয়ে আসতো না, তারা কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করেছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা এমন কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করুক, যা তাদেরকে মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে রক্ষা করবে।[৩৪] কারণ আল্লাহ তাআলা হজের জন্য সক্ষমতার শর্ত রেখেছেন- যা ইনশাআল্লাহ সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামের পদ্ধতি একটি কার্যকর পদ্ধতি, যা মুসলিমকে প্রয়োজনীয় উপকরণ গ্রহণের জন্য আদেশ করে। কারণ আল্লাহই উপকরণ সৃষ্টি করেছেন এবং তা সৃষ্টির জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তাই একজন মুসাফিরের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কী তার প্রতি তিনি তাদেরকে নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়েছেন। আর তা হলো: পাথেয় গ্রহণ করা। তারপর তিনি আরেক ধরনের পাথেয়-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যা হল 'তাকওয়া'। এটা পরকালের পাথেয়, যা মুসলিম তার পরকালের গন্তব্যের জন্য গ্রহণ করে। এভাবে আল্লাহ যখন বস্তুগত পাথেয় গ্রহণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন সাথে সাথে তিনি তাদেরকে আধ্যাত্মিক পাথেয় তথা অন্তরের তাকওয়ার প্রতিও নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটা ভয়, নম্রতা, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, ভালোবাসা ও অন্যান্য গুণাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা একজন হাজীকে আল্লাহর দ্বীনের বাস্তব প্রয়োগের দিকে পরিচালিত করে। এতে দুনিয়াবী সফর এবং পরকালের সফরের পাথেয়-এর ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশনা ও সতর্কতা প্রদান করা হয়েছে। উম্মতের প্রথম প্রজন্ম পাথেয়-এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল, বিশেষত দেহের সুরক্ষা এবং সফরের কষ্ট সহ্য করার ব্যাপারে। এমনকি ইবনু উমর (রাঃ) বলতেন: "একজন মানুষের মহানুভবতার অন্তর্ভুক্ত হলো তার সফরের পাথেয় উৎকৃষ্ট হওয়া।" তাছাড়া তিনি তার সফরসঙ্গী হওয়ার জন্য ভালো ও প্রশস্ত মনের অধিকারী হওয়া শর্ত করতেন।[৩৫]

---

(৩৪) তাফসীরে ইবনে কাসীর: (১/২৪৬)।

(৩৫) পূর্বোক্ত।

তারপর, আল্লাহ তাআলা পাথেয়-এর কথা স্পষ্ট করার পর, সেরা ও সবচেয়ে ভাল পাথেয় কী তা উল্লেখ করে আদেশ দেন যে, তাকওয়া শুধুমাত্র তাঁরই জন্য অবলম্বন করতে হবে, তাঁর সাথে কোনো অংশীদার নেই: ***[হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর।]***। তাছাড়া বাক্যটিতে প্রথমে সেইসব ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করা হয়, যারা বুদ্ধিমান ও বিবেকবান। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যারা আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করেছে এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, তারা প্রকৃত বুদ্ধিমান। কারণ তারা মিথ্যার বিপরীতে সত্যকে বেছে নিয়েছে। এ পদ্ধতিটি শিক্ষাদান এবং দাওয়াত দেওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকেও উপকারী; কারণ এতে যে ব্যক্তিকে আহ্বান করা হচ্ছে বা যে শিক্ষার্থী শিখছে, তার ভাল গুণাবলী ও বিশেষত্বগুলো উল্লেখ করা হয়, যা তাকে আরও বেশি ভাল কাজ করার জন্য উৎসাহিত করে এবং প্রেরণা দেয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা হজে বাণিজ্য করার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কারণ জাহেলী যুগে উকায, মাজনা ও যুল-মাজাজ আরবদের বাণিজ্যিক বাজার ছিল, এবং তারা হজের মৌসুমে সেখানে ব্যবসা করত। তাই এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলো: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم), অর্থাৎ, তোমাদের জন্য কোনো পাপ নেই ব্যবসার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে অর্থ উপার্জনে অনুগ্রহ কামনায়। এর মাধ্যমে, হজে বাণিজ্য করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনুমতি দেওয়া হয়, যাতে এর সঙ্গে সম্পর্কিত যেকোন উদ্বেগ বা সন্দেহ দূর হয়ে যায়। বরং আল্লাহ তাআলা যা তারা খুঁজছে তা তাঁর সাথে সংযুক্ত করেছেন, যাতে মুমিন বুঝতে পারে যে, সে যে রিজিক চাচ্ছে, তা আল্লাহরই এক বিশেষ অনুগ্রহ এবং এই রিজিক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য একটি অনুগ্রহ। সুতরাং, যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ চায়, তাকে তা দুটি উপায়ে চাওয়া উচিত: প্রথমত: তা অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টা দ্বারা, এবং দ্বিতীয়ত: দোয়া দ্বারা। কারণ আল্লাহ তাআলা এই অনুগ্রহকে নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। কাজেই এতে অনেক বিষয় ও উপকারিতা সম্মিলিত হয়েছে; এর মধ্যে কিছু আগেই উল্লেখ করা

হয়েছে। আর কিছু হলো যেমন: দোয়া এবং এর গুরুত্ব ও সাওয়াব, রিজিকের জন্য প্রচেষ্টা এবং এর গুরুত্ব, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের বিষয়, এবং এই ধর্ম কাজের ধর্ম, তাও স্পষ্ট হয়েছে। এছাড়া, ব্যবসার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে উপকারিতা সৃষ্টি করার গুরুত্ব এবং এর বৈধতা, যতক্ষণ না তাতে কোনো হারাম বস্তু বা হারাম লেনদেনের পদ্ধতি থাকে।

তারপর আল্লাহ তাআলা হজে আগতদের জন্য যিকিরের বিষয়টি স্পষ্ট করেন, যেমন তিনি বলেন: (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام), অর্থাৎ, যখন তোমরা আরাফাত থেকে ফিরে আসবে, তখন মাশআরুল হারামের কাছে আল্লাহকে স্মরণ করো। আরাফাত হলো হজের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যেখানে অবস্থান করতে হয়, এবং এটি হজের প্রধান কাজ। যেমন হাদিসে এসেছে: **(আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করাই হলো হজ।)** মাশআরুল হারাম হলো মুজদালিফা, সেখানে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যিকির করতে আদেশ দিয়েছেন, যাতে হাজীরা আল্লাহর যিকিরে আবদ্ধ থাকে। বরং যিকিরের আদেশ বারবার দেওয়া হয়েছে, সাথে এর কারণও বর্ণনা করা হয়েছে: **"তোমরা তাঁকে স্মরণ করো, যেমন তিনি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।"** এটি আল্লাহর হেদায়াত এবং এই ধর্মে তাওফিক পাওয়ার নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে হেদায়াতকে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে (كما هداكم), যাতে বান্দা বুঝতে পারে যে আল্লাহই তার হৃদয়কে এই ধর্মের প্রতি হেদায়াত দিয়েছেন, রাসুল মুহাম্মদ সাঃ-কে তার কাছে প্রেরণ করেছেন এবং তার সঙ্গে কিতাব ও সুন্নাহ নাজিল করেছেন। কোনো পথপ্রাপ্ত বান্দাই পথপ্রাপ্ত হতে পারত না, যদি আল্লাহ তাকে হেদায়াত ও তাওফিক না দিতেন। এই মহান নিয়ামত উপলব্ধি করলে বান্দার জন্য আবশ্যক হয়ে যায় যে, সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে এবং এই হেদায়াতের জন্য শুকরিয়া আদায় করবে, যা আখিরাতের নেয়ামতের একমাত্র

পথ। তাই আল্লাহর যিকির করা তার জন্য অত্যন্ত জরুরি। কাজেই সমস্ত প্রশংসা ও শুকরিয়া আল্লাহর জন্য।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হজযাত্রীদের হজের পরবর্তী ধাপের নির্দেশ দিয়েছেন: **"তারপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে ফিরে আসে তোমরাও সে স্থান থেকে ফিরে আসবে।"**—এটি মিনার দিকে যাওয়ার নির্দেশ; যেখানে রাত যাপন, জমরায় পাথর নিক্ষেপ, হাদি কোরবানি, তাওয়াফ ও সাঈ সম্পন্ন করার জন্য। একই সঙ্গে আল্লাহ্ হজযাত্রীদেরকে ইস্তিগফারের আদেশ দিয়েছেন: **"আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"**। কারণ, আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য যতই পূর্ণাঙ্গ হোক না কেন, তাতে কিছু না কিছু ঘাটতি ও ত্রুটি থেকেই যায়। এজন্য ইস্তিগফার থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয়। একজন আরাধক কখনোই নিজেকে বা নিজের ইবাদতকে পূর্ণাঙ্গ মনে করা উচিত নয়। কেননা ভুল-ত্রুটি ও বিস্মৃতি মানব প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে সব অবস্থায়ই ইস্তিগফারের প্রয়োজন। এ থেকে বোঝা যায় যে, হজযাত্রী এমন একটি মহান ও কষ্টসাধ্য ইবাদতে নিয়োজিত, তবুও আল্লাহ্ তাকে ইস্তিগফারের নির্দেশ দেন। তাহলে মানুষের সারাদিন, সপ্তাহ, মাস এবং পুরো জীবনের অবস্থাটি কী রকম হওয়া উচিত! এতে স্পষ্ট হয় যে, বান্দার জন্য ইস্তিগফারের কতটা প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা রয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, মানুষের জীবনে ঘাটতি, ভুল-ত্রুটি, পাপ, ভুল চেষ্টা, কিংবা কাজের মধ্যে রিয়া ও খ্যাতির মতো ইখলাস নষ্টকারী বিষয়গুলোর মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে ইস্তিগফার লাজিম রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মহান গুণাবলির মধ্যে একটি গুণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন: **"নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"** এতে মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা রয়েছে—তারা যেন ইস্তিগফার করে এই উপলব্ধি নিয়ে যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, তিনি পাপ ক্ষমা করেন এবং ইস্তিগফারকারীকে দয়া প্রদর্শন করেন। সুতরাং ইস্তিগফারকারী যেন ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করে।

এরপর আল্লাহ্ তাআলা হজযাত্রীদের নির্দেশ দেন যে, তারা তাদের হজের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর আল্লাহকে স্মরণ করবে: **"তারপর যখন তোমরা তোমাদের হজের কাজসমূহ শেষ করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ (যিকির) কর, যেভাবে তোমরা স্মরণ করতে তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে, এমনকি তার চেয়ে অধিক স্মরণ।"** এ নির্দেশনার মাধ্যমে আল্লাহ্ হজযাত্রীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, হজ শেষ করার পরও তারা যেন আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকে। এটি এমন স্মরণ বা যিকির হওয়া উচিত, যেমন একটি শিশু তার পিতা-মাতার স্মরণ করে। শিশুর জিহ্বা যেমন দিনভর তার মা-বাবার নাম উচ্চারণে ব্যস্ত থাকে, তেমনি একজন মুসলমানের জিহ্বাও আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত থাকা উচিত। যেমন একটি শিশু তার মা-বাবার প্রতি অনবরত মনোযোগ দেয়—মা এসেছে, বাবা এসেছে, মা কোথায়, বাবা কোথায়; মা বলেছে, বাবা বলেছে; ক্ষুধার্ত হলে কাঁদে আর মা-বাবার নাম নিয়ে ডাকে; তৃপ্তি পেলে খেলার সময়ও তাদেরই স্মরণ করে—তেমনি মুসলমানেরও উচিত প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা। এই উদাহরণ আল্লাহর স্মরণের গুরুত্ব বোঝায়। যেমন শিশু ঘুম থেকে উঠে, খাবারের সময় বা খেলার মধ্যেও মা-বাবার নাম নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তেমনি মুসলমানের উচিত তার খাবার ও পানীয়ের আগে **"بِسْمِ اللَّهِ"** বলে আল্লাহর স্মরণ করা। এ সে যিকিরের মধ্যে থাকে। পানাহার শেষেও সে আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহর যিকির করে। এই প্রশংসার মাধ্যমে স্মরণ অব্যাহত রাখে। সে ঘুমের আগে এবং ঘুম থেকে উঠে আল্লাহকে স্মরণ করে। নামাজের আগে ও পরে আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত থাকে। জীবনের প্রতিটি বিষয়েই আল্লাহর স্মরণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা একজন মুসলমানের কর্তব্য। রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন: ***(তোমার জিহ্বা যেন সব সময় আল্লাহর স্মরণে সিক্ত থাকে।)*** সুনানে তিরমিযি। বরং একজন মুসলমানের উচিত শিশুর তার মা-বাবার প্রতি যে স্মরণ থাকে, তার চেয়েও বেশি আল্লাহকে স্মরণ করা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **"যেভাবে তোমরা স্মরণ করতে তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে, এমনকি তার চেয়ে অধিক স্মরণ।"**। আমরা আল্লাহ

তাআলার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের সময়গুলোকে তাঁর স্মরণ ও শোকর আদায়ে পূর্ণ করে দেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের চাহিদার অবস্থা তুলে ধরেন এবং তাদের দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। প্রথম শ্রেণি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: **"আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দিন। বস্তুত আখিরাতে তার জন্য কোন অংশ নেই।"** এই শ্রেণি এমন একদল মানুষ, যাদেরকে দুনিয়ার জীবন তার চাকচিক্য, চাহিদা এবং অন্তহীন আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে আকৃষ্ট করে রাখে। তারা দুনিয়ার বিষয়াদির জন্য অধিক পরিমাণে দোয়া করে এবং আখিরাতের জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু—তা উপেক্ষা করে। অথচ আখিরাতই বেশি স্থায়ী এবং পূর্ণাঙ্গ। এই শ্রেণির দো'আয় আখিরাতের কোনো অংশ থাকে না। আল্লাহ তা'আলা এই শ্রেণির অবস্থা উল্লেখ করে সতর্ক করেছেন, যাতে মানুষ দোয়ার মধ্যে ভারসাম্য ও সংযম রক্ষা করে এবং আখিরাতের বিষয়াদিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। তাই আল্লাহর কাছে আখিরাতের কল্যাণ ও সফলতা বেশি বেশি প্রার্থনা করা উচিত, কারণ আখিরাত দুনিয়ার চেয়ে উত্তম ও চিরস্থায়ী। এরপর আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ সম্পর্কে বলেন: **"আর তাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন, আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"** এই শ্রেণির মানুষ দো'আয় দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়াদিতে সমান গুরুত্ব দিয়েছে এবং জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে গভীর অনুভূতি ধারণ করে তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং সকল মুসলিমকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। এতে বোঝা যায় যে, কিছু মানুষের ইচ্ছা সীমিত, তারা শুধু দুনিয়া চাওয়ার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, যা তাদের আখিরাত কামনা করতে ভুলিয়ে দেয়। অন্যদিকে, কিছু মানুষ উচ্চ মানসিকতার অধিকারী, যারা শুধু দুনিয়া চেয়ে সন্তুষ্ট হয় না, বরং তাদের মন আখিরাতের দিকে উন্নীত হয় এবং আল্লাহর কাছে তা প্রার্থনা

করে। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসেন যারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্য প্রার্থনা করেন। এবং এটি যে বিষয়টি স্পষ্ট করে, তা হল যে দুনিয়া ও আখিরাতের সব কিছু আল্লাহর হাতে, এবং বান্দা সেগুলো শুধুমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে পারে, তাই তাকে আল্লাহর কাছে চাওয়া উচিত। এই দোয়াতে যে উপকারিতা রয়েছে তা হল, এটি সমস্ত ধরনের কল্যাণের একত্রিত। কারণ "হাসানাহ" (কল্যাণ) প্রতিটি ভালোকেই ধারণ করে এবং এর দ্বারা সমস্ত অপকারিতা পরিহার করার প্রার্থনা করা হয়। তাই যখন একজন মুমিন আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চায়, তখন সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের সব ধরনের কল্যাণ প্রার্থনা করে। আর যখন সে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়, তখন সে সমস্ত ক্ষতিকর কিছু থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা করছে। এটি কত মহান একটি দোয়া!

এটি ছিল নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত দোয়া। আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: **(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বেশি দোয়া ছিল এটি: 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও, ও আখিরাতে কল্যাণ দাও, এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।'"** (সহীহ বুখারী)

তারপর আল্লাহ বলেন: "**তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। আর আল্লাহ হিসেব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।**" তাফসিরে এসেছে যে, এটি দ্বিতীয় দলের, অর্থাৎ ইসলামের অনুসারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাদের জন্য হজের এবং দোয়ার সওয়াব থাকবে, কারণ মুমিনের দোয়া একটি ইবাদত। কিছু তাফসিরবিদ বলেছেন যে, এটি উভয় দলের জন্য প্রযোজ্য, অর্থাৎ মুমিন তার আমল ও দোয়ার সওয়াব পাবে, আর কাফের তার শিরক ও দুনিয়া সংক্রান্ত সংকীর্ণ দৃষ্টির জন্য শাস্তি ভোগ করবে। এখানে দুটি মতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা কুরআনের বিভিন্ন দিকের ব্যাপকতা এবং তার বহু

দিকের সুবিধা ও উপকারিতা প্রকাশ করে। কুরআনের শব্দগুলো বিভিন্ন দিক থেকে বোঝার মাধ্যমে এর উপকারিতা এবং শিক্ষা বাড়ে। এরপর আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির প্রতি হিসাব গ্রহণের দ্রুততা বর্ণনা করেছেন, যাতে মুমিন বুঝতে পারে যে আল্লাহর হিসাব মানুষের হিসাবের সাথে তুলনা করা যায় না, এবং এটি মানুষের মাপজোকের বাইরে। কারণ আল্লাহ তা'আলা সব কিছু জানেন এবং সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর যিকরের গুরুত্বকে পুনর্ব্যক্ত করেছেন: **" আর তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করবে।"** এখানে "নির্দিষ্ট দিনগুলো" বলতে তাশরীকের দিনগুলো, অর্থাৎ ঈদের পরের তিনটি দিন, যেগুলো মিনায় অবস্থানের তিনটি দিন। এসব দিনগুলোতে ফরজ নামাজের পর তকবীর পাঠ করা হয়। এই দিনগুলোর বিশেষ উল্লেখ এর মহিমা এবং সেগুলোর প্রতি গুরুত্বের নিদর্শন। এটি মুসলিমদের জন্য একটি উপদেশ যে, তাদের এই দিনগুলোতে আল্লাহর স্মরণে মনোনিবেশ করতে হবে। অন্যদিকে, এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে যিকরের গুরুত্ব বর্ণনা করে শিক্ষা, দিকনির্দেশনা ও উপদেশের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছেন। এরপর এই ধর্মের মহানুভবতা প্রকাশ পেয়েছে, যখন আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির জন্য অনুমতি দিয়েছেন যে দ্রুত চলে যেতে চায়। আল্লাহ বলেছেন: **" অতঃপর যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই"**। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার জন্য তাদেরকে গুনাহ দেননি। এবং তিন দিনের শেষ পর্যন্ত যারা অপেক্ষা করেছেন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: **"এবং যে ব্যক্তি বিলম্ব করে আসে তারও কোন পাপ নেই। এটা তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে।"**। এতে যারা তিন দিন পর্যন্ত থাকতে চান, তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকওয়ার নির্দেশ দেন: **"আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, তোমাদেরকে তাঁর নিকট সমবেত করা হবে।"** এতে দুটি

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে: প্রথমত, তাকওয়ার নির্দেশ, এবং দ্বিতীয়ত, আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনের স্মরণ। কারণ, আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার চিন্তা মুমিনের মধ্যে এমন একটি তাকওয়া সৃষ্টি করে, যা তাকে সৎ কাজ করার প্রেরণা দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। এটি শিক্ষাগত, দাওয়াতী এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যা এবং তার চূড়ান্ত ফলাফল প্রদর্শন করে, যা মানুষের উপকারিতা এবং নিয়ম মেনে চলার জন্য স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষের অন্তর প্রায়ই অবহেলা, শিথিলতা এবং ভুলে যাওয়ার দিকে চলে যেতে পারে, সেজন্য এমন উপদেশ প্রয়োজন হয়। আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আমার মুসলিম ভাইদের সফলতা, সঠিক পথ এবং অবিচলতা দান করুন।

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ ٢٠٤ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُفۡسِدَ فِيهَا وَيُهۡلِكَ ٱلۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَسَادَ ٢٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتۡهُ ٱلۡعِزَّةُ بِٱلۡإِثۡمِۚ فَحَسۡبُهُۥ جَهَنَّمُۚ وَلَبِئۡسَ ٱلۡمِهَادُ ٢٠٦ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡرِي نَفۡسَهُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ رَءُوفُۢ بِٱلۡعِبَادِ ٢٠٧﴾

অর্থ*: [***আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবনে যার কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়।* আর যখন সে প্রস্থান করে তখন সে যমীনে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণী ধ্বংসের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ ফাসাদ ভালবাসেন না।* আর যখন তাকে বলা হয় 'আল্লাহকে ভয় কর', তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপাচারে লিপ্ত করে, কাজেই জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট ঠিকানা।* আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে বিকিয়ে দেয়। আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল।*]* (আয়াত নং*:* ২০৪-২০৭)।

আগের আয়াতে মানুষদের দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতি চাহিদার অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিছু মানুষের মনের অবস্থার কথা প্রকাশ করেছেন, যারা তাদের কুফরী গোপন রাখে এবং ইসলাম প্রকাশ করে। আল্লাহ বলেন*:* **"আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবনে যার কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়।"** এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে মুনাফিকদের আসল অবস্থা জানিয়ে দেন। এটি সব ধরনের মুনাফিকদের উপর প্রযোজ্য, যদিও বিশেষ কিছু মুনাফিকদের সম্পর্কে এটি নাযিল হয়েছে। তারা এমন এক শ্রেণির মানুষ যারা তাদের অন্তরের বিপরীত কথা প্রকাশ করে। তারা সুন্দর কথা বলে ও মিষ্ট ভাষা উপস্থাপন করে। তারা দ্বীন ও জাতির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে, অথচা তারা সবার সাথে

প্রতারণা করে; এভাবে যে, তারা সততার দাবি করে, অথচ তারা মিথ্যাবাদী ও মুনাফিক। তারা নিজেদের কথা সত্য বলে দাবি করে এবং আল্লাহকে সাক্ষী রাখে, যদিও তারা মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। তারা তীব্র বিরোধিতাকারী, কঠিন ঝগড়াটে ও মিথ্যাচারী। তাদের বাহ্যিক কথা মধুর ও আকর্ষণীয় হলেও, তাদের অন্তর অকল্যাণ ও মিথ্যায় ভরপুর।

এটি মুনাফিকের আসল অবস্থার উন্মোচন করেছে; যারা এই নকল পথ অনুসরণ করে, ইসলামের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি ভাষায় প্রকাশ করে, কিন্তু অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও বিরোধিতা পোষণ করে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, কথার চেয়ে কাজই আসল প্রমাণ, কারণ কার্যাবলীই সত্যিকার ফয়সালা। এটি মুসলিম ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে। কাজের মধ্যে থাকে অবস্থা ও কথার সঠিকতা বা মিথ্যার সংকেত। আল্লাহ তাআলা এই সত্য প্রকাশ করে মুমিনদের সতর্ক করেছেন, যাতে তারা মুনাফিকদের থেকে সাবধান থাকে।

মুনাফিকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো: **" আর যখন সে প্রস্থান করে তখন সে যমীনে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণী ধ্বংসের চেষ্টা করে।"** তার কথা যেমন বক্র ও মিথ্যা, তেমনি তার কাজও খারাপ। কারণ যখন সে চলে যায়, তখন তার সব প্রচেষ্টা ও শ্রম পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে। তার অশান্তি ও ক্ষতি সাধারণ ও বিভিন্ন দিক থেকে প্রকাশিত হয়, কথায় ও কাজে। এর মধ্যে রয়েছে: **" শস্যক্ষেত্র ধ্বংস"**, যা শস্য ও ফলমূল উৎপাদন ক্ষেত্রের ক্ষতিসাধন, এবং **"প্রাণী ধ্বংস"**, যা পশু-পাখির প্রজনন ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত। মানুষের জীবিকা এই দুইটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল, তাই সে ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের সম্পদ ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করে। বস্তুত এরূপ কর্ম আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যের বিপরীত, এবং যা তিনি পছন্দ করেন তার সাথে অমিল। আল্লাহ বলেছেন: **"আর আল্লাহ ফাসাদ (অশান্তি) পছন্দ করেন না"**। এই বাক্যে আল্লাহ তাআলা একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, এই ধর্ম কোনোভাবেই ফাসাদকে মেনে নেয়

না, বরং তা থেকে নিষেধ করে এবং যারা ফাসাদ সৃষ্টি করে তাদের শাস্তি দেয়। তাহলে, এমন একটি মহান ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কী হতে পারে?

মুনাফিকের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো: **" আর যখন তাকে বলা হয় 'আল্লাহকে ভয় কর', তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপাচারে লিপ্ত করে, কাজেই জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট ঠিকানা।"** সে তার অপকর্ম এবং অশোভন আচরণ থেকে সঠিক পরামর্শ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। যখন তাকে উপদেশ দেওয়া হয় এবং বলা হয়: 'আল্লাহকে ভয় করো, তুমি যে সকল অশুভ কাজ এবং মন্দ কথা বলো, তা ত্যাগ করো, এবং সঠিক পথের দিকে ফিরে আসো,' সে এতে অস্বীকৃতি জানায় এবং গর্বের সাথে পাপের পক্ষে দাঁড়ায়। এ থেকে বুঝা যায় যে, মুনাফিকরা জাতির জন্য কতটা ক্ষতিকর, এবং অহংকারও ব্যক্তির জন্য কতটা ক্ষতিকর। এমন মুনাফিকের জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের শাস্তি ঘোষণা করেছেন: **"কাজেই জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট ঠিকানা।"** এটাই তার জন্য শাস্তি ও পরিণতি হিসেবে যথেষ্ট। আর তা কতই না খারাপ বাসস্থান, খারাপ পরিণতি এবং খারাপ ঠিকানা।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা এই ধরনের মানুষের মানসিকতা ও কার্যকলাপের আসল প্রকৃতি প্রকাশ করেছেন, যারা মিষ্টি ভাষায় কথা বলে, কিন্তু অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা, শত্রুতা ও বিদ্বেষ লুকিয়ে রাখে। আল্লাহ তা'আলা তাদের কার্যকর দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যও উদঘাটন করেছেন, যেখানে তারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে আগ্রহী, বিশেষ করে মানুষের খাদ্য ও জীবনধারণের উৎস ধ্বংস করতে চায়। তারা এমন ক্ষোভ ও বিদ্বেষ পোষণ করে, যা কেবল একজন মন্দ, ঈর্ষান্বিত এবং খারাপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন মানুষের কাছ থেকে আসতে পারে। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রকৃতির উন্মোচন করেছেন, যে তারা সত্যের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শন করে না, যতই উপদেশ দেয়া হোক না কেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"আর যখন তাকে বলা হয় 'আল্লাহকে ভয় কর', তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপাচারে লিপ্ত করে,"** তারা

ইচ্ছাকৃতভাবে পাপের পক্ষে দাঁড়ায়, এবং তারা জানে তাদের অন্তরে কী রয়েছে। তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই পথ অনুসরণ করে, এবং এজন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিয়েছেন, তাদের পরিণতি হবে জাহান্নামে। এর মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনদেরকে মুনাফিকদের প্রকৃতি এবং গুণাবলী সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, যাতে তারা তাদের থেকে দূরে থাকে এবং এই বিপথগামী পথ থেকে বাঁচে। এই শিক্ষার মাধ্যমে মুমিনদের মধ্যে নম্রতা ও বিনয়ের গুণাবলী আরও দৃঢ় হয়।

তারপর আল্লাহ তাআলা মানুষের দ্বিতীয় ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন: **" আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে বিকিয়ে দেয়।"** এই ধরনের মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তার সবচেয়ে মূল্যবান ও দামি জিনিসগুলো উৎসর্গ করে। তারা কুফর ও মুনাফিকি থেকে নিজেকে মুক্ত করে, এমনকি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি অর্থ ও খ্যাতি হারাতে হয়, তবুও এটি তাদের কাছে সস্তা হয়। তারা জানে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির তুলনায় অন্য কোনও কিছু মূল্যবান নয়। অন্যদিকে, প্রথম ধরনের মানুষ নিজেকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে, তারা তাদের সত্ত্বাকে মুনাফিকির বিনিময়ে বিক্রিত করে।

এই আয়াত একটি মহান পাঠশালা, যা মানুষকে শেখায় যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যদি নিজের জীবন মূল্য দিতে হয়, তবে তা দিতে হবে। এ বিষয়ে সোহাইব রুমি হলেন এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। মূলত তার ব্যাপারেই উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। যখন সোহাইব বিন সিনান রুমি রাঃ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হিজরত করতে চেয়েছিলেন, তখন তাকে তার সম্পদ নিয়ে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল, যদি সে তার সম্পদ ত্যাগ করে, তবে হিজরত করতে পারবে। সোহাইব তার সমস্ত সম্পদ তাদের হাতে তুলে দিয়ে মুক্ত হয়ে যান। যখন এই ঘটনা নবী *(সা.)*-কে জানানো হয়, তিনি বলেছিলেন: ***(সোহাইব লাভবান হয়েছে, সোহাইব লাভবান হয়েছে।)*** সহীহ ইবনে হিব্বান। তারপর উমর বিন খাত্তাব রাঃ সহ অন্যান্য সাহাবীরা মদীনার

প্রান্তে এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "আপনার ব্যবসা লাভবান হয়েছে"।(৩৬)

এখানে আয়াতটি আল্লাহ তাআলার একটি মহান গুণ প্রকাশ করে সমাপ্ত হয়েছে: **"আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল।"** কাজেই আল্লাহ তাআলার স্বীয় দয়া ও সহানুভূতি দ্বারা তাঁর বান্দাদের হেদায়াত এবং তাওফিক প্রদান করেন, এবং তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতার কারণে কাফের, মুনাফিক এবং পাপীকে তিনি ক্ষমা করেন। যদি আল্লাহ তাআলার এই দয়া না থাকতো, তবে কাফের এবং পাপীসহ অনেক মানুষ ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং, আমাদের ও সকল মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার এই দয়ালু প্রকৃতির জন্য তাঁর প্রশংসা করছি।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨ فَإِن زَلَلۡتُم مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡكُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٠٩ هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٖ مِّنَ ٱلۡغَمَامِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلۡأُمُورُ ٢١٠﴾

অর্থ: ***[হে মুমিনগণ! তোমরা পুর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।* অতঃপর তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর যদি তোমাদের পদস্থলন ঘটে, তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।* তারা কি শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে উপস্থিত হবেন? এবং সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। আর সমস্ত বিষয় আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।]*** (আয়াত নং: ২০৮-২১০)।

(৩৬) তাফসীরে ইবনে কাসীর: (১/২৫৪)।

এরপর আল্লাহ মুমিনদের উদ্দেশ্যে বলেন: **"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পুর্ণাঙ্গভাবে প্রবেশ করো।"** এই আয়াতের সূচনা মুমিনদের আহ্বান করার মাধ্যমে হয়েছে, যেখানে তাদের ঈমানের গুণবাচক নামে সম্বোধন করা হয়েছে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর বান্দাদের এ মহান মর্যাদার মাধ্যমে ডাকেন। এই আহ্বান ও সম্বোধনের ধরন মুমিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এরপর আল্লাহ নির্দেশমূলক ভাষায় বলেন: **"তোমরা ইসলামে পুর্ণাঙ্গভাবে প্রবেশ করো"**—অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যে প্রবেশ করো, ঈমানের শাখাসমূহ ও ইসলামের বিধানগুলো পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করো, কোনো অংশ বাদ দিও না। তাই তোমরা সকল সৎকর্ম ও নৈতিকতার অনুশীলন করো, এবং ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা অনুসারে জীবন পরিচালনা করো। এতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা খণ্ডিত নয়। ঈমানের সকল শাখা ও মহিমান্বিত শরিয়তের ওপর সম্পূর্ণরূপে আমল করা আবশ্যক। ইসলাম এমন কোনো বিষয় নয় যা ইচ্ছেমতো বেছে নেওয়া বা পরিত্যাগ করার জন্য রাখা হয়েছে, যেখানে মনগড়া পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে কেউ কিছু গ্রহণ করবে আর কিছু বর্জন করবে, অথবা সুযোগ বুঝে কখনো মানবে আর কখনো এড়িয়ে যাবে। বরং ইসলাম পরিপূর্ণ, খণ্ডিত নয়। (كافة) তথা "পুর্ণাঙ্গভাবে" শব্দটি এ দিকেও ইঙ্গিত করে যে, এর আবেদন সকলের জন্য—অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকেই ঈমানের শাখাসমূহ ও ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলবে, যেন কেউই এতে পিছিয়ে না থাকে বা কোনো অংশ অবহেলা না করে। এটাই প্রকৃত ইসলাম।

এরপর আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের নির্দেশ দেন শয়তানের অনুসরণ না করতে: **"এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"** এখানে (خطوات) তথা "পদাঙ্কসমূহ" শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, শয়তান মানুষকে ধাপে ধাপে পাপের দিকে নিয়ে যায়। সে সরাসরি মহাপাপের দিকে আহ্বান করে না, বরং প্রথমে ক্ষুদ্র ভুলের মাধ্যমে প্রলুব্ধ করে, যা ধীরে ধীরে মানুষকে বড় গুনাহ ও অবাধ্যতার দিকে ঠেলে দেয়। তাই আল্লাহ মুমিনদের সতর্ক করেছেন তাদের প্রকৃত শত্রুর বিরুদ্ধে, যে কৌশলে ও ধাপে ধাপে মানুষকে পাপের দিকে ধাবিত করে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা অবাধ্য, তাদের সতর্ক করে বলেন: **" অতঃপর তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে..."** তাই জ্ঞানের পর ভুলের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে, কারণ সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও যে পথভ্রষ্ট হয়, তার পথচ্যুতি আরও ভয়াবহ। আর **"পদস্খলন"** শব্দটি ইঙ্গিত করে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি, আর সাধারণত এই বিচ্যুতি স্থিতিশীলতার পর ঘটে। অর্থাৎ, যখন কেউ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও তার পথচ্যুতির সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই পরম প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেছেন, যেন তারা তাঁর আনুগত্য ও নির্দেশ থেকে দূরে সরে না যায়। আল্লাহর এই সতর্কবাণী সব ধরনের বিচ্যুতির জন্য প্রযোজ্য, এবং এটি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে যেন তারা গাফলতি বা অসতর্কতার কারণে সত্য পথ থেকে সরে না যায়। **"তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।"** এটি আল্লাহ তায়ালার মহিমান্বিত অবস্থানের স্পষ্ট বর্ণনা, যেখানে তিনি নিজেকে পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর পরাক্রমশালী হওয়া এটাই নির্দেশ করে যে, সবকিছু তাঁর সামনে নতশীর, তিনি অন্যদের ওপর বিজয়ী কিন্তু কেউ তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। তাঁর প্রতিশোধ ক্ষমতা শক্তিশালী এবং তাঁর মর্যাদা মহান ও অটুট। আর তিনি প্রজ্ঞাময়—অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি বিধান, আদেশ-নিষেধ এবং কৌশলগত ব্যবস্থা পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই জ্ঞান ও উপলব্ধি মানুষের জন্য একটি কঠোর সতর্কবার্তা বহন করে—যেন তারা এমন মহান ও সম্মানিত সত্তার অবাধ্যতায় না জড়ায়, যার শক্তি অপরিসীম এবং যিনি পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অধিকারী।

এটি এমন একটি বর্ণনাশৈলী, যা একইসঙ্গে লজ্জা ও ভয়কে উদ্দীপিত করে এবং মানুষের পথচ্যুতির বিষয়ে মনোযোগ, সতর্কতা ও সংযমকে দৃঢ় করে। আল্লাহ তায়ালার মহিমান্বিত গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষাশৈলী কত মহান, কত সুন্দর, কত মনোমুগ্ধকর! বিশেষত, যখন আল্লাহ তায়ালা আগের আয়াতে **"হে ঈমানদারগণ"** বলে সম্বোধন করেছেন, তখন তা মুমিনদের হৃদয়ে ঈমানের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এটি তাদের মনে করিয়ে দেয় যে, তোমরা ঈমানদার—এমন মর্যাদার অধিকারী, যাদের জন্য পথচ্যুতি মোটেও শোভনীয় নয়, বিশেষ করে যখন তোমাদের কাছে স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ এসে গেছে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা সেইসব লোকদের সম্পর্কে নিন্দাসূচক জিজ্ঞাসার (استفهام استنكاري) মাধ্যমে বলেন, যারা ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করছে: **" তারা কি শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে উপস্থিত হবেন? এবং সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। আর সমস্ত বিষয় আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।"** এদের উপর চুড়ান্ত হুজ্জত কায়েম হয়েছে—যারা সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও অবাধ্যতা ও কুফরে লিপ্ত থাকে এবং শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করে। তারা কি এই আশায় বসে আছে যে, কিয়ামতের দিন বিচার চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হবে, তারপর প্রত্যেককে নিজ কর্ম অনুযায়ী কর্মফল দেয়া হবে? "**সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। আর সমস্ত বিষয় আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।**" তারা কি তখন ঈমান আনবে? কিন্তু তখন তো ঈমান আনা কোনো উপকারে আসবে না। কেননা সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে হয়ে যাবে, সমস্ত সৃষ্টির মাঝে বিচার সম্পন্ন হবে, এবং সকল বিষয় আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে। তাহলে তারা কীসের অপেক্ষায় রয়েছে? তারা কি শুধু এই আশা করছে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুত হিসাব-নিকাশ তাদের সামনে উপস্থিত হোক?

এই বক্তব্যশৈলীতে আল্লাহ তায়ালা ইসলাম গ্রহণে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের গভীর চিন্তা ও মননশীলতার দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি নিন্দাসূচক জিজ্ঞাসার মাধ্যমে সেইসব অন্তর ও চিন্তাকে জাগ্রত করছেন, যেগুলো সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এ ধরনের বক্তব্যশৈলী মানুষের চেতনা, বিবেক ও বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করে, যাতে তারা গভীরভাবে চিন্তা ও পর্যালোচনা করে এবং সত্যের দিকে ফিরে আসে। কারণ, এই প্রশ্নের ভঙ্গি এমন যে, এটি শুধুমাত্র চিন্তার উদ্রেকই করে না, বরং সত্য গ্রহণের জন্য তাগিদও দেয়। আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে কিয়ামতের দিনের কিছু ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন, যা মানুষের বুদ্ধি ও অনুভূতিকে একইসঙ্গে আলোড়িত করে। এটি বিরাট এক মহাসময়ের রোমহর্ষক দৃশ্য—যখন হিসাব ও প্রতিফল নির্ধারিত হবে। আয়াতটি শেষ হয়েছে আল্লাহ তায়ালার এই কথা দিয়ে: "আর সমস্ত বিষয় আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।" সুতরাং সমস্ত বিষয় আল্লাহর কাছেই ফিরবে, যেমন সমস্ত সৃষ্টিও আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে; সেখানে তাদের হিসাব এবং প্রতিফল হবে। সুতরাং পবিত্র সেই আল্লাহ, যার মহিমান্বিত কিতাব মানুষের

মঙ্গলার্থে তাদের মন ও আত্মাকে উদ্দীপ্ত করে, আদেশ, নিষেধ, দিকনির্দেশনা, ব্যাখ্যা, শিক্ষা এবং স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে, এবং বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগময় উদ্দীপনার মাধ্যমে।

﴿سَلۡ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ كَمۡ ءَاتَيۡنَٰهُم مِّنۡ ءَايَةم بَيِّنَةٖۗ وَمَن يُبَدِّلۡ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢١١ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا وَيَسۡخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَٱللَّهُ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ ٢١٢﴾

অর্থ*: [***বনী ইসরাইলকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তাদেরকে কত সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি। আর আল্লাহর অনুগ্রহ আসার পর কেউ তা পরিবর্তন করলে আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।* যারা কুফরী করে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবন সুশোভিত করা হয়েছে এবং তারা মুমিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকে। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে কেয়ামতের দিন তারা তাদের উর্ধ্বে থাকবে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত রিযিক দান করেন।*]* (আয়াত নং*:* ২১১-২১২*)*।

কুরআনের বর্ণনাশৈলী ও প্রসঙ্গ আবারও বনী ইসরাইল সম্পর্কে, যেখানে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ উল্লেখ করেছেন যারা সে নেয়ামতকে অবাধ্যতার মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করেছিল। আল্লাহ বলেন*:* **"বনী ইসরাইলকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তাদেরকে কত সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি। আর আল্লাহর অনুগ্রহ আসার পর কেউ তা পরিবর্তন করলে আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।"** এই আয়াতটি শুরু হয়েছে আল্লাহর বাণী **"বনী ইসরাইলকে জিজ্ঞেস কর"** দিয়ে, যা মূলত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সম্বোধন। এখানে বনী ইসরাইলকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিরস্কার

ও নিন্দার স্বরূপে, যাতে তাদের অন্যায় ও অকৃতজ্ঞতার ব্যাপারে তাদের সতর্ক করা হয়।[৩৭]

এতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য সান্ত্বনার বার্তা রয়েছে, যাতে বনী ইসরাইলের অবাধ্যতা ও ঈমান না আনার কারণে তিনি যেন চিন্তিত না হন। কারণ, তাদের প্রকৃতি ছিল অবাধ্যতা ও ধর্মীয় নেয়ামত পরিবর্তনের প্রবণতা, যদিও তারা বহু স্পষ্ট ও মহান নিদর্শন পেয়েছিল। "ﻢ" শব্দটি প্রচুর সংখ্যক সুস্পষ্ট নিদর্শনের ইঙ্গিত দেয়। এতদসত্ত্বেও তারা প্রমাণ ও মহান নিদর্শন— যেমন: মূসার লাঠি, উজ্জ্বল শুভ্র হাত, সাগর চিরে পথ তৈরি হওয়া, মান্না ও সালওয়া— এগুলোর সঠিক উপকার গ্রহণ করেনি। বরং তারা তাদের কিতাবকে বিকৃত করেছে, ফলে তাদের দ্বীনও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বনী ইসরাইল এতসব নিদর্শন পাওয়ার পরও যখন তা থেকে উপকৃত হয়নি, তখন নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ক্ষেত্রে তাদের অবিশ্বাস করাই স্বাভাবিক। যদিও তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তবে সাধারণভাবে তাদের ওপর অবাধ্যতার রায়ই প্রযোজ্য।

এতে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা ও ভীতি প্রদর্শন ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ তাআলার নেয়ামত পরিবর্তন করে, বিশেষত দ্বীন বা ধর্মের নেয়ামতকে পরিবর্তন করে। কেননা, আল্লাহ তাআলার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। এ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো— দ্বীন ইসলামের নেয়ামত একটি মহান ও মূল্যবান অনুগ্রহ, যা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা, বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে পালন করা এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য। এছাড়া, যারা দ্বীনকে পরিবর্তন করে, তাদের ওপর কঠোর শাস্তি নির্ধারিত হওয়াই প্রমাণ করে যে, দ্বীন একটি অত্যন্ত মহান বিষয় এবং এর পরিবর্তন করাকে

---

(৩৭) আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন: (৩/২০)।

অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই দ্বীনকে সংরক্ষণ করা জরুরি, কেননা এটি আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ।

ইমাম কুরতুবী রহঃ এই আয়াত **"ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته"** সম্পর্কে বলেন, যদিও এখানে সরাসরি বনী ইসরাইলের কথা বলা হয়েছে- কারণ তারা নিজেদের ধর্মগ্রন্থের বাণী পরিবর্তন করেছে এবং নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর আদেশ অস্বীকার করেছে, তবে এই বাক্যটি সাধারণভাবে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য, যারা আল্লাহর নেয়ামত পরিবর্তন করে। আর ইমাম তাবারি রহঃ বলেন: এখানে "নেয়ামত" বলতে ইসলামকে বোঝানো হয়েছে। এটি পূর্বের ব্যাখ্যার কাছাকাছি অর্থ প্রকাশ করে। এছাড়া, এই বাক্যের মধ্যে কুরাইশ কাফেররাও অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তাদের মাঝে নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর আবির্ভাব তাদের জন্য একটি বিশাল নিয়ামত ছিল, কিন্তু তারা সেটিকে গ্রহণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে কুফরির মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করেছিল।[৩৮] বিদ্বানগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে যে অর্থ গ্রহণ করেছেন, তা এই মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত দেয় যে: "বাক্যের ব্যাপকতা উদ্দেশ্য, নির্দিষ্ট কারণ নয়", অর্থাৎ, যদিও আয়াতটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছে, তবে এর বিধান সকলের জন্য প্রযোজ্য। এছাড়া, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে যে বিষয়সমূহ উল্লেখ করেছেন, তা কেবল জ্ঞান অর্জন বা তথ্য জানার জন্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে আমল করা। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর কিতাবের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে- উপদেশ গ্রহণ করা ও অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে আমল করার মধ্যে।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: **"কাফেরদের জন্য পার্থিব জীবনকে সুশোভিত করা হয়েছে।"** আল্লাহ তাআলা এখানে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যারা কুফরি করেছে এবং তাঁর শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের কাছে দুনিয়ার জীবনকে সুশোভিত করা হয়েছে।

---

(৩৮) পূর্বোক্ত।

ফলে এটি তাদের দৃষ্টিতে ও অন্তরে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তারা এতে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে, এবং তাদের সমস্ত প্রবৃত্তি, ইচ্ছা ও কর্ম এ দুনিয়াকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। ফলে, তারা মুমিনদের তুচ্ছজ্ঞান করে ও তাদের নিয়ে উপহাস করে, কারণ তাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার মোহই সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ, আর মুমিনদের দুনিয়াবিমুখ জীবন তাদের কাছে অর্থহীন মনে হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা আল্লাহর শরীয়ত সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জেনে নেওয়ার পরও দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের প্রতি আল্লাহর অন্যতম শাস্তি হলো— দুনিয়াকে তাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত সুশোভিত করে দেওয়া। এতটাই যে, তারা মুমিনদের নিয়ে উপহাস ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। এতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো— দুনিয়ার চাকচিক্যের ফিতনা থেকে সতর্ক থাকা। কেননা, যে ব্যক্তি আখিরাতের চেয়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়, সে মুমিনদের তাচ্ছিল্য করে যারা দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়। এতে এটিও স্পষ্ট হয় যে, মুমিনদের প্রতি উপহাস করা কাফেরদের চিরকালীন বৈশিষ্ট্য, যা সব যুগে বিদ্যমান ছিল। এজন্য আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সতর্ক করেছেন, যাতে তারা কাফেরদের এই উপহাসের তোয়াক্কা না করে এবং তাদের খুশি করতে গিয়ে নিজের দ্বীনকে খর্ব না করে। এ আয়াত থেকে আরও বোঝা যায় যে, উপহাস ও ব্যঙ্গ করা কাফেরদের অন্যতম অস্ত্র, যার মাধ্যমে তারা মানুষকে আল্লাহর পথে আসা থেকে বাধা দেয়। তাই একজন মুমিনের উচিত এসব ফিতনা থেকে নিজেকে রক্ষা করা, যাতে সে সেই উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে পারে, যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: **"আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে কেয়ামতের দিন তারা তাদের উর্ধ্বে থাকবে।"** অর্থাৎ, মুত্তাকিরা হবে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অনন্ত সুখে, আর কাফেররা নিম্নতম স্তরে কঠিন শাস্তির মধ্যে থাকবে। এটি মুমিনদের ধৈর্যকে আরও দৃঢ় করে তোলে, যাতে তারা দ্বীনের পথে কাফেরদের কাছ থেকে যে অবহেলা ও নির্যাতন সহ্য করে, তাতে অবিচল থাকতে পারে। এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, সম্পদ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার ক্ষেত্রে

মুমিনকে উৎসাহিত করতে পারে। আর তাকওয়াই মুমিনকে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও রহমতের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠ প্রতিদান লাভে সহায়তা করে।

এরপর আল্লাহ তাআলা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করে দেন, আর তা হলো রিজকের প্রকৃত উৎস: **"আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিসাব ছাড়া রিজিক দান করেন।"** এতে রিজিকের প্রকৃত বাস্তবতা ও তার মূল উৎস সম্পর্কে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। এ আয়াত মুমিনদের উৎসাহিত করে এবং তাদের প্রতি আহ্বান জানায়, যাতে তারা তাদের রিজিক সেই সত্তার কাছেই চায়, যিনি প্রকৃতপক্ষে এর মালিক। সুতরাং, দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত রিজিক একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতেই। তাই মুমিনের উচিত দুনিয়া ও আখিরাতের রিজিকের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করা এবং দ্বীনের ওপর অটল থাকার জন্য তাঁর সাহায্য চাওয়া। কারণ, প্রকৃত দাতা ও অনুগ্রহকারী শুধুমাত্র তিনিই।

এ আয়াত থেকে আরও বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা হিসাব ছাড়া রিজিক দান করেন, এবং তাঁর দান বান্দার আমলের সমপরিমাণে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তিনি এতই মহান দাতা যে, যখন তিনি দান করেন, তখন তাঁর অনুগ্রহ হয় সীমাহীন ও বিশাল। বান্দা যতই ইবাদত করুক না কেন, তা আল্লাহর হক অনুযায়ী খুবই সামান্য। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন বান্দাকে অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি তাকে তার ইবাদতের তুলনায় অনেক বেশি দেন, যা কোনো তুলনার মধ্যে পড়ে না। আল্লাহর দান দুনিয়া ও আখিরাত- উভয় জগতে প্রচুর ও অফুরন্ত। তাই আমরা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, করুণা ও দয়ার প্রার্থনা করি।

﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ

فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِۦۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴿٢١٣﴾

অর্থ: **[মানুষ ছিল এক উম্মত। অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে নবীদেরকে প্রেরণ করলেন এবং সত্যসহ তাদের সাথে কিতাব নাযিল করলেন, যাতে মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। আর তারাই তাতে মতবিরোধ করেছিল, যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিল, তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষবশত। অতঃপর আল্লাহ নিজ ইচ্ছাক্রমে মুমিনদেরকে হিদায়াত দিলেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন।]** (আয়াত নং: ২১৩)।

আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-এর পর মানুষের অবস্থা কেমন ছিল এবং কিভাবে তিনি নবীদের পাঠিয়েছেন তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: " **মানুষ ছিল এক উম্মত। অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে নবীদেরকে প্রেরণ করলেন**।" এ থেকে বোঝা যায় যে, সমস্ত মানুষ মূলত একই উম্মত, তারা সবাই আদম (আ.)-এর দ্বীনের অনুসারী ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, মতবিরোধ ও বিভেদ দেখা দেয়, এবং পথভ্রষ্টতা শুরু হয়— যার মধ্যে অন্যতম ছিল মূর্তিপূজার প্রচলন। তখন আল্লাহ তাআলা নূহ (আ.)-কে নবী করে পাঠান, এবং তিনিই প্রথম রাসুল যাকে আল্লাহ মানুষের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

এই আয়াতের একটি ফায়েদা হলো: আল্লাহ তাআলা দুই শব্দে (أمة واحدة - এক উম্মত) মানুষের প্রাথমিক অবস্থা স্পষ্ট করেছেন। এরপর নবীদের পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছেন: "অতঃপর আল্লাহ নবীদের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠালেন।" নবীদের দায়িত্বও মাত্র দুই শব্দে নির্ধারিত করা হয়েছে: "مبشرين" (সুসংবাদদাতা) এবং "منذرين" (সতর্ককারী)। এটি কুরআনের ভাষাগত অলৌকিকতা;

সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থবহ উপস্থাপনা। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন: "নূহ (আ.) ও আদম (আ.)-এর মধ্যে দশ প্রজন্ম ছিল, তারা সকলেই এক সত্য দ্বীনের অনুসারী ছিল। কিন্তু পরে মতভেদ সৃষ্টি হলে আল্লাহ নবীদের পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে।[৩৯]

এটি নির্দেশ করে যে, মানুষের প্রয়োজন রয়েছে এমন একজনের, যিনি তাদের দ্বীন পুনরুদ্ধার করবেন, যেহেতু তাদের মধ্যে ও তাদের দ্বারা বিভক্তি ও মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। নবী করিম সাঃ বলেছেন: **"আল্লাহ প্রতি একশত বছরে আমার উম্মতের জন্য এমন কাউকে পাঠাবেন, যে তাদের দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করবে।"** (সুনানে আবু দাউদ) এটি প্রমাণ করে যে, যদি ধর্মের মধ্যে মতবিরোধ ঘটে, তবে অন্য বিষয়েও যেমন সামাজিক সম্পর্ক, পেশা এবং অন্যান্য বিষয়েও মতভেদ হতে পারে। অতএব, এটি বোঝায় যে, এই ধরনের বিভক্তি এবং মতবিরোধ সমাধান করার জন্য, এবং জনগণকে একত্রিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। মানুষ মাঝে মাঝে এই একতা ফিরে পাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে—এটি হতে পারে উম্মত, সমাজ, পরিবার, পেশা বা সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে।

এই আয়াতটির একটি উপহার হলো যে, নবীদের দায়িত্ব হলো আনুগত্যকারীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া এবং অবাধ্য-অপরাধীদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করা। সেইসাথে তারা আল্লাহর পথে মানুষের জন্য সঠিক নির্দেশনাও বর্ণনা করেন।

এটি স্পষ্ট করে যে, আলেমগণ ও দাঈদের দায়িত্ব নবীদের মতোই- তারা মানুষের মাঝে শিক্ষা প্রদান করেন। তবে, তারা মানুষকে হিদায়াতের তাওফীক দেয়ার ক্ষমতা রাখেন না, বরং নাযিলকৃত কিতাবের আলোকে তাদেরকে সত্যের দিকে নির্দেশনা দিতে পারেন। তাই আল্লাহ বলেছেন: **"আর তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন।"**

---

(৩৯) তাফসীর ইবনে কাসীর: (১/২৫৭)।

তারপর আল্লাহ তাআলা নবীদের মিশন ব্যাখ্যা করেছেন, যা হলো মানুষের মধ্যে যে বিষয়গুলোতে তারা মতবিরোধ করেছে, সেগুলোর বিচার-ফয়সালা করা, যাতে তারা পূর্বের ঐক্যে ফিরে আসে। এটি আরও প্রমাণ করে যে, মানুষ একতা অর্জন করতে পারে কেবল তখনই যখন তারা তাদের একতার উৎসে ফিরে যাবে, যা হলো আল্লাহর কিতাব এবং তার রাসূলের সুন্নাহ। এই কিতাব পুরোপুরি সত্য, এবং আল্লাহ তাআলা তা (সত্যসহ) নাযিল করেছেন।

পরে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করেন যে, যারা কিতাব আসার পরও হকের ব্যাপারে মতবিরোধ করেছে, তাদের মতবিরোধের কারণ ছিল বিদ্বেষ। বিদ্বেষের কারণে কিছু মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল, যা প্রমাণ করে যে, বিদ্বেষ হলো উম্মাহর মধ্যে মতবিরোধের অন্যতম গুরুতর কারণ এবং এটি তাদেরকে বিভক্ত ও ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। কারণ বিদ্বেষ হলো ফাসাদ, সীমালঙ্ঘন, অন্যায় এবং অবিচারের প্রতীক।

তারপর আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাহর প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাদেরকে সঠিক পথনির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে, যেখানে পূর্ববর্তী উম্মতরা মতভেদ করেছিল। **"অতঃপর আল্লাহ নিজ ইচ্ছাক্রমে মুমিনদেরকে হিদায়াত দিলেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল।"** প্রথমত: হিদায়াত আল্লাহর অনুগ্রহ। দ্বিতীয়ত: তাঁর হিদায়াত আসে তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছার মাধ্যমে—তিনি তাদের সম্পর্কে জানেন, যে সত্যের দিকে তিনি তাদের পথনির্দেশনা দিয়েছেন তা সম্পর্কেও জানেন, এবং তাঁর তাওফিক ও ইচ্ছার মাধ্যমেই এটি বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই প্রাপ্য। আর পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে যারা মতভেদ করেছিল, তাদের মতভেদ ছিল হকের মূল বিষয়েই। এটি প্রমাণ করে যে, বিদ্বেষ মানুষকে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক অবতীর্ণ স্পষ্ট সত্যের ক্ষেত্রেও মতভেদে লিপ্ত করে, যার মূল কারণ হলো হিংসা, জুলুম, অহংকার, উচ্চাভিলাষ এবং অন্যের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তারের প্রবণতা। তাহলে মানুষের

পারস্পরিক অধিকারের বিষয়ে বিরোধের অবস্থা কেমন হবে? এ থেকে বোঝা যায় যে, সত্য ও বিনয়পূর্ণ চরিত্র গঠনের শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, এবং বিদ্বেষের কারণ হওয়া জুলুম, ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞার মনোভাব থেকে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মতভেদের বিভিন্ন রূপের মধ্যে একটি হলো জুমার দিনের বিষয়ে তাদের মতভেদ; ইহুদিরা শনিবারকে গ্রহণ করেছিল, আর খ্রিস্টানরা রবিবারকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শুক্রবারের দিকে পথনির্দেশনা দিলেন। তারা কিবলার ক্ষেত্রেও মতভেদ করেছিল; খ্রিস্টানরা পূর্ব দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করত, আর ইহুদিরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে। কিন্তু আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদকে সঠিক কিবলার দিকে পরিচালিত করলেন। তারা নামাজের ক্ষেত্রেও মতভেদ করেছিল; তাদের কেউ ছিল যারা রুকু করত কিন্তু সিজদা করত না, কেউ সিজদা করত কিন্তু রুকু করত না, কেউ নামাজ পড়ার সময় কথা বলত, আবার কেউ নামাজরত অবস্থায় চলাফেরা করত। কিন্তু আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদকে এর সত্যপথের দিকে পরিচালিত করলেন। তারা রোজার ক্ষেত্রেও মতভেদ করেছিল; তাদের কেউ দিনে কিছু সময় রোজা রাখত, কেউ কিছু নির্দিষ্ট খাবার থেকে বিরত থাকত। কিন্তু আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদ-কে এর সঠিক রূপের দিকে পরিচালিত করলেন। তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ব্যাপারেও মতভেদ করেছিল; ইহুদিরা বলেছিল, তিনি ছিলেন ইহুদি, আর খ্রিস্টানরা বলেছিল, তিনি ছিলেন খ্রিস্টান। কিন্তু আল্লাহ তাকে করেছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। আর আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদকে এ বিষয়ে সত্যের দিকে পরিচালিত করলেন। তারা ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারেও মতভেদ করেছিল; ইহুদিরা তাকে অস্বীকার করেছিল এবং তার মায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদ দিয়েছিল, আর খ্রিস্টানরা তাকে আল্লাহর পুত্র এবং উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাকে তাঁর রূহ ও কালেমা হিসেবে নির্ধারণ করলেন। আর আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদকে এ বিষয়ে সত্যের দিকে পরিচালিত

করলেন। বস্তুত এ উম্মাহর মধ্যে যে কোনো মতভেদ সৃষ্টি হলে, তা মূলত সেই পথের অনুসরণ যা আল্লাহর গজবে পতিত ও পথভ্রষ্টদের (ইহুদি ও খ্রিস্টানদের) ছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই বিবৃতিকে সমাপ্ত করেন এই বলে যে, তিনিই পথপ্রদর্শক ও তাওফিক দানকারী। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা সত্যের দিকে পথনির্দেশ দেন। এটি হিদায়াতের মহান নিয়ামতের গুরুত্ব প্রকাশ করে এবং নির্দেশ করে যে, সৎপথপ্রাপ্ত ব্যক্তির উচিত তার হিদায়াতকে আল্লাহর দান হিসেবে বিবেচনা করা। বরং প্রতিটি নিয়ামতকেই আল্লাহর দিকে সমর্পণ করা উচিত, নিজের সামর্থ্য, বুদ্ধিমত্তা, অন্তর্দৃষ্টি বা প্রচেষ্টার প্রতি তা সম্পৃক্ত না করা। মূলত আল্লাহই সবকিছুর দাতা। তাই মানুষের উচিত আল্লাহর কাছেই হিদায়াত প্রার্থনা করা এবং জীবনের প্রতিটি প্রয়োজন ও চাওয়া-পাওয়া একমাত্র তাঁর কাছেই নিবেদন করা, এবং সকল অকল্যাণ থেকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করা। তাইতো মুসলিম ব্যক্তি দোয়ায় বলে: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت) "হে আল্লাহ! তুমি যাদের হিদায়াত দান করেছ, তাদের সঙ্গে আমাকেও হিদায়াত দান করো; যাদের সুস্থতা দান করেছ, তাদের সঙ্গে আমাকেও সুস্থতা দান করো; যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ, তাদের সঙ্গেই আমাকেও অভিভাবকত্বে রাখো; তুমি যা দান করেছ, তাতে আমার জন্য বরকত দান করো; এবং যা নির্ধারণ করেছ, তার অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করো। নিশ্চয়ই তুমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, তোমার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তুমি যার অভিভাবক, সে কখনো অপমানিত হয় না, আর তুমি যার বিরুদ্ধে অবস্থান নাও, সে কখনো সম্মানিত হতে পারে না। তুমি কল্যাণময়, হে আমাদের রব! এবং তুমি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।" (সুনানে আবু দাউদ।)

﴿أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَأۡتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلِكُمۡۖ مَّسَّتۡهُمُ ٱلۡبَأۡسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلۡزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصۡرُ ٱللَّهِۗ أَلَآ إِنَّ نَصۡرَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ ٢١٤﴾

অর্থ: ***[নাকি তোমরা মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত অবস্থা আসেনি? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল এমনকি রাসূল ও তার সংগী-সাথী ঈমানদারগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।]*** (আয়াত নং: ২১৪)।

এখানে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা ও পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর নীতি স্পষ্ট করেন। মহিমান্বিত আয়াতটি একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে শুরু হয়েছে, যা মুমিনের জন্য পরীক্ষার ও পরিশুদ্ধির বিষয়ে অজানা দিকগুলো স্পষ্ট করে। এর ফলে মুমিন আল্লাহর নির্ধারিত এই নীতির বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারে, যাতে সে তা গ্রহণ করতে ও মানতে সক্ষম হয়। বরং এটি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও রহমতের অংশ যে, তিনি মুমিনদের জন্য এমন বিষয় স্পষ্ট করেছেন যা তাদের এই পরীক্ষার সময় সান্ত্বনা দেয়। কেননা এই পরীক্ষা কেবল তাদের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং এটি আল্লাহ তা'আলার একটি নীতি, যা পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল: "**অথচ এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত অবস্থা আসেনি; অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল।**" আর এই পরীক্ষা মুমিনের পরিশুদ্ধি ও জান্নাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, জান্নাতের পথ পরীক্ষায় পরিবেষ্টিত। এই জ্ঞান লাভের ফলে মুমিন উপকৃত হয়, কারণ সে বুঝতে পারে যে, তাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং সকল পরীক্ষার বিপর্যয় থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, যাতে তার পরিণাম

কল্যাণকর হয়। আর যদি কোনো পরীক্ষা তার ওপর আসে, তবে সে তার প্রতিপালকের কিতাব থেকেই জেনে নেয় যে, এটি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান।

পূর্ববর্তীদের পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে মুমিনদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, যাতে তারা মনে না করে যে, একমাত্র তারাই আল্লাহর পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে। বরং নবীগণও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। "**তাদেরকে এমনভাবে কম্পিত করা হয়েছিল যে, রাসূল এবং তার সাথে বিশ্বাসীরা বলেছিলেন, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?**" তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য দুআ করতেন এবং সংকট থেকে মুক্তির নিকটবর্তী হওয়ার প্রার্থনা করতেন। "وزلزلوا" (এবং তারা কম্পিত হয়েছিলেন) শব্দটি ভয়াবহ ও ভীতিকর অবস্থার ইঙ্গিত দেয়, যেখানে ভয় ও আতঙ্কে হৃদয় কাঁপতে থাকে। এমতাবস্থায় রাসূল (সা.) এবং তার সঙ্গী মুমিনরা সংকট থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে আকুল প্রার্থনা করতেন, যেমনটি ঘটেছিল আহযাবের যুদ্ধের দিনে। আল্লাহ তাআলা সূরা আহযাবে ইরশাদ করেন: **"যখন তারা তোমাদের ওপর থেকে এবং নিচ থেকে তারা তোমাদের কাছে এসেছিল... যখন দৃষ্টিসমূহ বিচ্যুত হচ্ছিল এবং হৃদয়গুলো গলদেশে পৌঁছে যাচ্ছিল..."**। এরপর আল্লাহ এই আয়াতের সমাপ্তি টানেন: **"জেনে রাখ! আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী"**—যা ইঙ্গিত করে যে পরীক্ষার পরই মুক্তি আসে। তাই মুমিনের কর্তব্য হলো ধৈর্য ধারণ করা। এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম যখন অগণিত শত্রুবাহিনী দেখলেন এবং হৃদয় গলদেশে পৌঁছে গেল, তখন বললেন: **"এটাই তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেয়েছিল।**" অতঃপর আল্লাহ অদৃশ্য বাহিনী ও প্রবল বাতাস পাঠালেন, এবং শত্রুবাহিনী পরাজিত হলো। এভাবেই আল্লাহর সাহায্য তাদের নিকটবর্তী হলো।

﴿يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلۡ مَآ أَنفَقۡتُم مِّنۡ خَيۡرٖ فَلِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٢١٥﴾

অর্থ: *[***তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? বলুন, 'তোমরা যে কল্যাণই ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতা, আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য। আর যে কোন ভাল কাজ তোমরা কর, নিশ্চয় সে ব্যাপারে আল্লাহ সুপরিজ্ঞাত'।*]* (আয়াত নং ২১৫)।

এরপর পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় মুমিনদের সেই প্রশ্নের উত্তর আসে, যা তারা নবীজি (সা.)-কে নফল দান-সদকা ও এর খাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী দান করবে?"** এতে বোঝা যায় সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য সদকার খাত জানতে আগ্রহী ছিলেন। কুরআনের অলঙ্কৃত বাক্যশৈলীতে এখানে সাধারণভাবে বলা হয়েছে: **"বলুন, তোমরা যে কল্যাণই ব্যয় কর..."**। এখানে "কল্যাণ" বলতে মূলত অর্থ-সম্পদ বোঝানো হলেও শব্দটির ব্যাপকতা সকল প্রকার ভালো কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী দানের দ্বার উন্মুক্ত রাখে- কম বা বেশি যে কোনো পরিমাণে অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি যে কোনো মাধ্যমে।

এরপর আল্লাহ তাআলা দানের হকদারদের ক্রম উল্লেখ করেন: **"...সে কল্যাণ পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করবে"**। এখানে প্রাপকদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ক্রমবিন্যাস করা হয়েছে: প্রথমে পিতা-মাতা, তাদের অধিকার সর্বাধিক। তারপর নিকটাত্মীয়: আত্মীয়তার নৈকট্য ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার। যেমন, নিকটাত্মীয় যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে দূরের আত্মীয়ের চেয়ে তার অধিকার বেশি। এরপর ইয়াতিম: যাদের অভিভাবক নেই এবং নিজেদের প্রয়োজন

মেটানোর সামর্থ্য নেই। তারপর মিসকিন: যারা দারিদ্র্যের কারণে মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম। সবশেষে মুসাফির: যাত্রাপথে যার সম্পদ ফুরিয়ে গেছে এবং সাহায্য প্রয়োজন।

এই বিন্যাস থেকে বোঝা যায়, ইসলামে দানের একটি সুসংগঠিত ও যৌক্তিক পদ্ধতি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি কতটা মমতাশীল যে, তিনি তাদেরকে তাঁর দেওয়া নেয়ামত মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এতে সামাজিক সম্প্রীতি ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কুরআনের শব্দচয়ন এতই ব্যাপক যে, এটি নিকট-দূর সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে- যেকোনো ইয়াতিম, মিসকিন বা পথিক, যেখানেই হোক না কেন।

আরেকটি ফায়েদা হলো: দানকারীর এই উপলব্ধি হওয়া যে, যিনি তাকে সম্পদ দান করেছেন, তিনিই তাকে তা থেকে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর যিনি অন্যদেরকে তার প্রতি মুখাপেক্ষী করেছেন, তিনিই তাকে অন্যদের থেকে স্বাবলম্বী করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে অন্যদেরকে তার প্রতি মুখাপেক্ষীও করতে পারেন, অথবা অন্য কাউকে তার চেয়ে ধনী বানাতে পারেন। সুতরাং কতই না পবিত্র তিনি, যার হাতে সব কিছুর রাজত্ব। এরপর আল্লাহ তাআলা দানকারীর প্রতিদানের কথা উল্লেখ করেন: **"তোমরা যে কল্যাণই কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা সম্যক জ্ঞাত"**। এখানে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে: **১. বান্দার কাজ:** "তোমরা যে কল্যাণই কর" **২. আল্লাহর কাজ:** "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা সম্যক জ্ঞাত"। এই বাক্যগঠন থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা বান্দার কাজের সম্পূর্ণ খবর রাখেন। তিনি জানেন কে কী পরিমাণ দান করেছে, কী নিয়তে করেছে এবং এর বিনিময়ে তিনি তা সংরক্ষণ করবেন, প্রতিদান দেবেন এবং পুরস্কৃত করবেন। মুমিনদের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢١٦﴾

অর্থ: ***[তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, যদিও তোমাদের নিকট এটা অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ কর হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালবাস হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ্ জানেন তোমরা জান না।]*** *(*আয়াত নং ২১৬*)*।

আল্লাহ তাআলা জিহাদের বিধান সম্পর্কে জানাচ্ছেন: **"তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে।"** অর্থাৎ জিহাদ তোমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এই আয়াত দ্বারা জিহাদ ফরজ হওয়ার বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নবীজি *(*সা.*)* মক্কায় অবস্থানকালে তাকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি, কিন্তু হিজরতের পর তাকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"যাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো কারণ তারা অত্যাচারিত হয়েছে"**। পরবর্তীতে সকল মুশরিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সাধারণ অনুমতি দেওয়া হয়। এই আয়াতের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিছু বিদ্বানের মতে, এই আয়াতটি বিশেষভাবে নবী *(*সা.*)*-এর সাহাবীদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। তাদের জন্য নবী *(*সা.*)*-এর সাথে যুদ্ধ করা ফরজে আইন *(*প্রত্যেকের উপর ব্যক্তিগত কর্তব্য*)* ছিল। পরবর্তীতে শরীয়তের বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত হলে তা ফরজে কিফায়ায় *(*সমষ্টিগত কর্তব্য*)* পরিণত হয়। ইমাম আতা ও আওযাঈ *(*রহ.*)* এই মত পোষণ করেন।[৪০] আর যুদ্ধের বিধান ধাপে ধাপে চালু করার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর ঐশী প্রজ্ঞা, যা পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা

(৪০) আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন: (৩/২৭)।

দাওয়াতি, সামাজিক ও প্রতিরক্ষামূলক এমন কিছু বিধান প্রবর্তন করেছেন, যেগুলো মানবজাতির জন্য অপরিহার্য, যাতে তাঁর ইচ্ছায় প্রতিটি বিষয় সুফল বয়ে আনে। মক্কায় অবস্থানকালে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামকে যুদ্ধের নির্দেশ দেননি। এটি সংখ্যা ও শক্তির স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অংশ; তখন মুসলমানরা সংখ্যায় কম ও দুর্বল ছিলেন, অন্যদিকে শত্রুরা সংখ্যায় বেশি ও শক্তিশালী ছিল। আল্লাহ চাইলে অলৌকিকভাবে তাদের বিজয় দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চেয়েছেন তাঁর সৃষ্টির নিয়ম যেমন: সংখ্যা-শক্তির সমীকরণ অনুসারেই বিষয়গুলো সম্পন্ন হোক। তবে এটা মানে এই নয় যে অলৌকিক ঘটনা ঘটে না—বদরের যুদ্ধে যেমনটি ঘটেছিল। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে উম্মতকে এই ঐশী পদ্ধতি থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মগুলো (যেমন: প্রস্তুতি, সম্পদ, জনশক্তি) জিহাদ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে যথাযথভাবে বিবেচনা করতে হবে। এভাবেই কুরআন ও হিকমাহ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে উম্মত একটি প্রজ্ঞাবান জাতিতে পরিণত হবে।

এরপর আল্লাহ তাআলা মানবপ্রকৃতির বাস্তবতা ও তার মানসিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন: **"তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, যদিও তোমাদের নিকট এটা অপ্রিয়।"** এখানে কুরআন কারীম বাস্তবভিত্তিক সত্য উপস্থাপন করেছে, যা বুঝা ও মানা অপরিহার্য। এটি মানুষের স্বভাবের বিপরীত একটি বিষয়কে (যুদ্ধ) নির্দেশ করলেও মানবীয় প্রকৃতির সত্যকে উপেক্ষা করেনি; বরং স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছে। এটি শিক্ষামূলক, মনস্তাত্ত্বিক ও দাওয়াতি দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে, ব্যক্তির সংশোধন, নির্দেশনা বা উন্নয়ন কার্যক্রমে মানবীয় মানসিক ও স্বাভাবিক প্রকৃতির সত্যকে উপেক্ষা করা যায় না। বরং আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে স্বভাব ও প্রকৃতি দিয়েছেন, তা প্রথমে স্বীকার করতে হবে, তারপর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে- এমনকি যদি সেই লক্ষ্য অর্জনে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেতে হয়। কারণ, এ পদ্ধতিই যথাযথ সমাধান ও গ্রহণযোগ্যতার দিকে পরিচালিত করে। এভাবে আত্মপ্রতারণা থেকে দূরে থাকা যায়, যা

মানুষ প্রকাশ পেলে প্রত্যাখ্যান করে অথবা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে- যদি সঠিক ও সুসংগত পদ্ধতিতে প্রকৃতির সত্যের সাথে সমন্বয় করে সমাধান না করা হয়।

এখানে "অপ্রিয়" বলতে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ফরজকৃত জিহাদকে বোঝানো হয়নি, বরং এটি মানুষের নফস (আত্মা) দ্বারা অনুভূত জিনিসের প্রতি নির্দেশিত। কারণ, জিহাদের জন্য বের হওয়া মানে পরিবার-পরিজন, জন্মভূমি ও সম্পদ থেকে দূরে থাকা, এবং দেহকে যেকোনো সম্ভাব্য কষ্ট বা মৃত্যুর মুখোমুখি করা।

অতএব, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মনস্তাত্ত্বিক, স্বভাবগত, এমনকি মানসিক প্রকৃতির জন্যও প্রতিকার এসেছে, যা বিশ্বাসীকে এই সত্যে দৃঢ় করে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর যা ফরজ করেন ও নির্ধারণ করেন, তাতেই কল্যাণ রয়েছে: **"কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ কর হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালবাস হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ্ জানেন তোমরা জান না।"** এটি একটি ঈমানী সমীকরণ; যখন মুমিন এটা বুঝতে পারে, তখন সে আল্লাহর ফরজ বিধানগুলোকে স্বাগত জানায়, আল্লাহর তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকে, প্রতিটি ভালো-মন্দ পরিস্থিতিতে আল্লাহর হুকুমের প্রতি আত্মসমর্পণ করে, ধৈর্য ধারণ করে ও কল্যাণের পথে প্রচেষ্টা চালায়, সর্বোপরি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন করে।

এই মহান আয়াতটি শিক্ষা দেয়: মানুষ যা ঘৃণা করে, হতে পারে তা-ই তার জন্য মঙ্গলজনক। আর যা সে ভালোবাসে, তা-ই ধ্বংসের কারণ হতে পারে। এটি প্রমাণ করে যে, মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ—সে কখনোই ভবিষ্যতের গোপন ফলাফল সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা অপরিহার্য, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যের পরম জ্ঞানী, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। এসব ক্ষেত্রে মুমিনের কর্তব্য হলো: আল্লাহর হিকমাহতে বিশ্বাস রাখা, কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুসরণ করা, প্রতিটি পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট থাকা।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর হৃদয়গ্রাহী ও ব্যবহারিক দিকগুলোর আরও ব্যাখ্যা পরবর্তী আয়াতগুলোতে এসেছে। যেমন, এই সূরাতেই আল্লাহ তাআলা বলেন: **"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো না"**। আর সূরা আলে-ইমরানে বলা হয়েছে: **"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও রিযিকপ্রাপ্ত..."**। এখানে আল্লাহ তাআলা মানুষের স্বভাবজাত ভালো কিছুর প্রত্যাশাকে বিবেচনায় নিয়ে মুজাহিদদের জন্য মহান প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছেন। এভাবে একজন মুজাহিদ নিজের জীবনকেও আল্লাহর পথে তুচ্ছ করে দেন। এই ঐশী সত্য ও সমাধানের মাধ্যমে মুজাহিদ তার স্বাভাবিক ভয় ও অনিচ্ছাকে জয় করে জিহাদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসা তৈরি করেন। যদিও যুদ্ধের ক্ষতি, আঘাত বা মৃত্যুর কথা চিন্তা করে তার মনে অনিচ্ছা জাগে, তবুও: জিহাদের কষ্ট ও আল্লাহর আনুগত্যের ভালোবাসা- এই দ্বৈত আবেগের মধ্যে সমন্বয় ঘটে, আনুগত্যের ভালোবাসা কষ্টের উপর বিজয়ী হয়। ফলে মুজাহিদ প্রিয় রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্মোৎসর্গে এগিয়ে যান।

ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ *(রহ.)* আল্লাহ তাআলার বাণী **"কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ কর হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালবাস হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ্ জানেন তোমরা জান না।"**-এর ফায়দা ও গূঢ় রহস্য সম্পর্কে একটি মূল্যবান বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: এই আয়াতে বান্দার জন্য বিভিন্ন হিকমত, রহস্য ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যখন বান্দা জানে যে, অপছন্দনীয় জিনিসের মাধ্যমেও পছন্দনীয় জিনিস আসতে পারে এবং পছন্দনীয় জিনিসের মাধ্যমেও অপছন্দনীয় জিনিস আসতে পারে, তখন সে আনন্দের মধ্যেও বিপদের আশঙ্কা করে এবং বিপদের মধ্যেও আনন্দের আশা করে। কারণ বান্দা পরিণাম

সম্পর্কে জানে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা পরিণাম সম্পর্কে জানেন যা বান্দা জানে না। এটি বান্দাকে কয়েকটি বিষয়ের দিকে পরিচালিত করে:

১. বান্দার জন্য সবচেয়ে উপকারী হলো আল্লাহর আদেশ পালন করা, যদিও তা প্রথমে কঠিন মনে হয়। কারণ এর পরিণতি সর্বদা কল্যাণ, আনন্দ ও সুখকর হয়। যদিও নফস তা অপছন্দ করে, তবুও তা তার জন্য উত্তম ও উপকারী। অনুরূপভাবে বান্দার জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর হলো নিষিদ্ধ কাজ করা, এমনকি যদি তার নফস তা চায় এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কারণ এর পরিণতি সর্বদা বেদনা, দুঃখ, অকল্যাণ ও বিপদ নিয়ে আসে। আর এই আয়াতের একটি রহস্য হলো যে, এটি বান্দাকে তার কাজসমূহের পরিণাম জানেন এমন সত্তার উপর নির্ভর করতে এবং আল্লাহর পছন্দ ও ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে উৎসাহিত করে। কারণ বান্দা এতে উত্তম পরিণামের আশা করে।

২. বান্দার উচিত নয় যে, সে তার রবের উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দিবে বা তার উপর নিজে কিছু পছন্দ করবে। কারণ হতে পারে যে, তার জন্য ক্ষতিকর বা ধ্বংসাত্মক জিনিস সে চাইছে, অথচ সে জানে না। তাই বান্দার উচিত আল্লাহর কাছে উত্তম পছন্দের জন্য দোয়া করা এবং আল্লাহর পছন্দের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। কারণ তার জন্য এর চেয়ে অধিক উপকারী আর কিছু হতে পারে না।

৩. যখন বান্দা তার সব কাজ আল্লাহর উপর সোপর্দ করে এবং আল্লাহর পছন্দের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তখন আল্লাহ তাকে সেই পছন্দ অনুযায়ী কাজ করার শক্তি, দৃঢ়তা ও ধৈর্য দান করেন। আর বান্দা নিজের জন্য যা পছন্দ করে, আল্লাহ তাকে এর বিপদ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন। এছাড়াও, আল্লাহ তাকে তার পছন্দের উত্তম পরিণাম দেখান, যা বান্দা নিজে কখনোই অর্জন করতে পারত না।[৪১]

---

(৪১) দেখুন, ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযায়্যিাহ রচিত 'আল-ফাওয়ায়েদ': (পৃঃ ১৪৬-১৪৭)

এই শিক্ষাগুলো বান্দাকে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখতে এবং তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে উৎসাহিত করে, যা তার জীবনে শান্তি ও সাফল্য বয়ে আনে।

﴿يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ قِتَالٖ فِيهِۖ قُلۡ قِتَالٞ فِيهِ كَبِيرٞۚ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفۡرُۢ بِهِۦ وَٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ وَإِخۡرَاجُ أَهۡلِهِۦ مِنۡهُ أَكۡبَرُ عِندَ ٱللَّهِۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَكۡبَرُ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمۡ عَن دِينِكُمۡ إِنِ ٱسۡتَطَٰعُواْۚ وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢١٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ يَرۡجُونَ رَحۡمَتَ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢١٨﴾

অর্থ: ***[পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে। বলুন, এতে যুদ্ধ করা কঠিন অপরাধ। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেয়া ও এর বাসিন্দাকে এ থেকে বহিস্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তারচেয়েও বেশী অপরাধ। আর ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ। আর তারা সবসময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের হয়ে মারা যাবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আমলসমূহ নিস্ফল হয়ে যাবে। আর এরাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।* নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের আশা করে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।]*** *(*আয়াত নং ২১৭-২১৮*)*।

এই মহান আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হারাম মাসে যুদ্ধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। হারাম মাসগুলো হলো: যিলকদ, যিলহজ, মুহাররম ও রজব। আল্লাহ তাআলা বলেন: **“পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে।”**

এ প্রসঙ্গে, রাসূলুল্লাহ সাঃ আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী বাতনে নাখলাহ-তে প্রেরণ করেছিলেন, যাতে শত্রুদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য

সংগ্রহ করা যায়। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তারা কুরাইশদের একটি কাফেলার সাথে মুখোমুখি হয় এবং সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এই সংঘর্ষে তারা কুরাইশদের একজন ব্যক্তিকে হত্যা করে, যার নাম ছিল আমর ইবনুল হাদরামী, এবং দুজনকে বন্দী করে তাদের কাফেলা দখল করে মদিনায় ফিরে আসে। এই ঘটনা ঘটেছিল 'জুমাদা সানী' মাসের শেষ দিনে এবং রজব মাসের প্রথম রাতে। তখন মুশরিকরা বলল: "তোমরা হারাম মাসে হত্যাকাণ্ড করেছ।" আর কুরাইশরা বলল: "মুহাম্মদ ও তার সাহাবীরা হারাম মাসকে হালাল করে নিয়েছে এবং এ মাসে রক্তপাত করেছে।" এমনকি কিছু মুসলিমও এই ঘটনায় বিচলিত হয়ে পড়ল। তারা রাসূলুল্লাহ সাঃ-কে জিজ্ঞাসা করল যে, তারা এই অভিযানে আমর ইবনুল হাদরামীকে হত্যা করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে নাকি সঠিক কাজ করেছে। তারা নিশ্চিত ছিল না যে, সেই দিনটি রজব মাসের ছিল নাকি জু'মাদা সানী' মাসের। এদিকে মুশরিকরা বলছিল: "তোমরা হারাম মাসে হত্যাকাণ্ড করেছ।" আর তখনই এই আয়াত নাযিল হয়।[৪২]

এটি ইঙ্গিত করে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। যখন মুসলিমরা তাদের অভিযান থেকে ফিরে আসল, তখন তারা খুবই দুঃখিত ও বিচলিত হয়ে পড়ল। তারা ভেবেছিল যে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে, বিশেষত যখন তাদের মুসলিম ভাইয়েরা তাদের সমালোচনা করল এবং কুরাইশরা বলল: "মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবীরা হারাম মাসকে হালাল করে নিয়েছে এবং এ মাসে রক্তপাত করেছে।"[৪৩] ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: "আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের চেয়ে উত্তম কোনো সম্প্রদায় দেখিনি। তারা তাকে মাত্র তেরোটি প্রশ্ন করেছিলেন, যার সবগুলোর উত্তর কুরআনে রয়েছে... তারা আপনাকে শুধুমাত্র এমন

---

(৪২) দেখুন, ইবনুল জাওযি রচিত 'যাদুল মাসীর মিন ইলমিত তাফসীর': (১/২১৪)।

(৪৩) তাফসীর ইবনে কাসীর: (১/২৬১)।

বিষয়েই প্রশ্ন করতেন যা তাদের জন্য উপকারী।”[৪৪] এটি সাহাবায়ে কেরামের ভালো ও সৎকাজের প্রতি আগ্রহ এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন।

কুরআন মাজিদে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যা প্রশ্নের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। এই আয়াতগুলো সাহাবায়ে কেরাম *(*রাদিয়াল্লাহু আনহুম*)* বা মুশরিকদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো*:*

(“তারা আপনাকে নতুন চন্দ্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে”) (“তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে”) (“তারা আপনাকে হারাম মাসে যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে”) (“তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে”) (“তারা আপনাকে এতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে”) (“তারা আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে”) (“তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে”) (“তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে”) (“তারা আপনাকে গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে”) (“তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে”) (“তারা আপনাকে যুল-কারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে”) (“তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে”) (“লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে”)

এই আয়াতগুলো নাযিলের পেছনে সাহাবীদের প্রশ্ন হোক বা মুশরিকদের আপত্তির ফলে হোক—ক্রমাগত কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার অন্যতম উপকারিতা হলো*:* ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর যথাযথ সমাধান প্রদান, তাতে সত্য স্পষ্ট করা, প্রশ্নকারীদের জন্য জবাব প্রদান এবং মুসলমানদের জন্য দ্বীনি ও দুনিয়াবি বিষয়ে করণীয় নির্দেশনা প্রদান। পাশাপাশি, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুমিনদের জন্য সান্ত্বনা

---

(৪৪) আল-জামে’ লি-আহকামিল কুরআন*: (*৩/২৮*)*।

ছিল, ধাপে ধাপে ইসলামী শিক্ষা ও দীক্ষার একটি পদ্ধতি ছিল। এ ছাড়াও এতে এমন বহু উপকারিতা রয়েছে, যা স্বতন্ত্র ও গভীর অধ্যয়নের দাবি রাখে।

আল্লাহ তাআলা হারাম মাসে যুদ্ধ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে বলেন: **"বলুন, এতে যুদ্ধ করা কঠিন অপরাধ। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেয়া ও এর বাসিন্দাকে এ থেকে বহিস্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তারচেয়েও বেশী অপরাধ।"** এই আয়াতে একটি সত্য তুলে ধরা হয়েছে, যা মুশরিকরা হয়তো উপেক্ষা করে বা তারা এ সম্পর্কে অজ্ঞ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের অবস্থা ও তাদের অপরাধের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক অবগত। হারাম মাসে যুদ্ধ করা নিঃসন্দেহে একটি বড় পাপ। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন থেকে মানুষকে বিরত রাখা, তাঁর সাথে কুফরী করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদেরকে হারাম ভূমি (মক্কা) থেকে বের করে দেওয়া- হারাম মাসে যুদ্ধ করার চেয়েও অনেক বড় অপরাধ। এই আয়াতটি মুশরিকদের নিন্দা ও তাদের যুক্তির অসারতা প্রকাশ করে। তারা হারাম মাসে যুদ্ধ করার বিষয়ে আপত্তি তুললেও, তারা নিজেরাই এমন অপরাধ করেছে যা আল্লাহর কাছে আরও গুরুতর। তারা মানুষকে ঈমান থেকে বিরত রেখেছে, আল্লাহকে অস্বীকার করেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এই আয়াত তাদেরকে সতর্ক করে যে, তারা যেন নিজেদের অপরাধের কথা ভুলে গিয়ে অন্যদের তুলনামূলক ছোটখাটো বিষয় নিয়ে সমালোচনা না করে। এই কুরআনিক শৈলীতে মানুষের মন ও চিন্তাকে উদ্দীপিত করা হয়েছে, যাতে তারা বিষয়ের গভীরে গিয়ে চিন্তা করে এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে তাদের সমালোচনা ও নিজেদের কুফর ও অপরাধের মধ্যে তুলনা করে। এটি তাদেরকে সতর্ক করে যে, তারা যেন নিজেদের বড় অপরাধগুলো উপেক্ষা না করে।

এই কুরআনিক ভাষাশৈলীটি শিক্ষামূলক ও দাওয়াতি পদ্ধতির একটি উদাহরণ, যা একজন দাঈ, শিক্ষক ও অধিকার রক্ষাকারী ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয়। এটি ভুল চিন্তাকে

যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে খণ্ডন করে, যা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে সত্য প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং ভুল ধারণাগুলো দূর করা যায়।

কুরআনের এই মহান ভাষাশৈলীতে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তা থেকে বিচ্যুত না হওয়ার শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা হারাম মাসের পবিত্রতা নিশ্চিত করেছেন এবং একে অস্বীকার করেননি, এমনকি সংঘটিত ঘটনার পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্যও তা প্রত্যাখ্যান করেননি; বরং তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ মাসে যুদ্ধ করা অবশ্যই গুরুতর অপরাধ, তবে এর চেয়েও ভয়াবহ অপরাধ হলো—মক্কাবাসীদের তাদের মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করা। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিপক্ষের ভুল যুক্তি ও মিথ্যা দাবিগুলো বুঝতে হবে। এতে এমন একটি পদ্ধতি রয়েছে যেখানে প্রতিপক্ষ যা উপেক্ষা করে বা ভুলে যায়, তা ব্যবহার করে যুক্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি আরও দেখায় যে, মানুষ সাধারণত সেই দিকটি দেখে যা তার যুক্তিকে শক্তিশালী করে, কিন্তু সেই দিকটি উপেক্ষা করে যা তার জন্য উপকারী নয়। তাই, যুক্তি প্রতিষ্ঠার সময় এই দিকটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। এই পদ্ধতিটি শিক্ষামূলক ও দাওয়াতি কাজে অত্যন্ত কার্যকর, কারণ এটি মানুষকে তাদের ভুল বুঝতে এবং সত্য গ্রহণ করতে সাহায্য করে। এটি সত্য প্রতিষ্ঠার একটি শক্তিশালী মাধ্যম, যা যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে কাজ করে।

এরপর তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি আরও শক্তিশালী করা হয় তাদের ফিতনার মাধ্যমে, যা হত্যার চেয়েও বড় অপরাধ। এই ফিতনা হতে পারে কুফর অথবা মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা। এটি হারাম মাসে হত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ। এটি মুমিনকে হত্যা করার চেয়ে মুমিনকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার অপরাধকে আরও গুরুতর হিসেবে তুলে ধরে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, অপরাধের মাত্রা ও গুরুত্ব ভিন্ন হতে পারে। কিছু অপরাধ অন্য অপরাধের চেয়ে বেশি গুরুতর। এটি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যে,

মানুষ যেন ছোট অপরাধের দিকে বেশি মনোযোগ দিয়ে বড় অপরাধগুলো উপেক্ষা না করে। বরং, তার উচিত নিজের আচরণ ও কাজকর্ম নিয়ে সতর্ক থাকা এবং নিয়মিত নিজের হিসাব নেওয়া। এটি মুসলিমের দৈনন্দিন আচরণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিমের উচিত ছোটখাটো ভুল থেকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি বড় গুনাহগুলো থেকে দূরে থাকা। নিজের আত্মসমালোচনা ও হিসাব নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে।

মুশরিকরা মুসলমানদের তাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে আনতে সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে গেছে, এবং তারা কখনো এ কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করেনি। কুরআন তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে: **"তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদের তোমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়।"** অর্থাৎ তারা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবে মুসলমানদের বিচ্যুত করতে, যে কোনো উপায়ে, যে কোনো কৌশলে—প্রলোভন, বিভ্রান্তি, সন্দেহ, কিংবা আকর্ষণীয় ভোগবিলাসের মাধ্যমে। এ থেকে মুসলমানদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়: তাদের অবশ্যই সব ধরনের ফিতনার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে—হোক তা চাক্ষুষ দৃশ্য, শ্রবণযোগ্য শব্দ, চিন্তার বিভ্রান্তি, অথবা সন্দেহ ও কামনার মাধ্যমে প্রবৃত্তিকে দুর্বল করার কৌশল। আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সতর্ক করেছেন: **"আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার ধর্ম থেকে ফিরে যাবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তার সকল আমল নিস্ফল হয়ে যাবে দুনিয়া ও আখিরাতে।"** এ থেকে বোঝা যায় যে, ঈমানহীন অবস্থায় মৃত্যু হলে পূর্ববর্তী সকল সৎকর্ম অর্থহীন হয়ে যায়। তাই আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও ঈমানের উপর দৃঢ়তার দোয়া করি। আর যারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করে কাফের হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের জন্য আল্লাহ বলেন: **"তারা জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"** অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দ্বীন থেকে ফিরে যায় এবং কাফির অবস্থায় মারা যায়, তার চূড়ান্ত পরিণতি হলো জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকা। এটি এক চূড়ান্ত সতর্কবাণী, যা প্রত্যেক মুমিনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ—যাতে সে

কখনোই ঈমানের পথ থেকে বিচ্যুত না হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েই ধ্বংসের সম্মুখীন না হয়।

ইবনে সাদী *(রহ.)* বলেন: কিছু মুফাসসির বলেছেন যে, হারাম মাসে যুদ্ধের বিধান রহিত হয়নি। কারণ, মুতলাক *(সাধারণ)* বিধান মুকাইয়াদ *(সীমাবদ্ধ)* বিধানের উপর প্রয়োগ করা হয়। এই আয়াতটি মুকাইয়াদ, কারণ যুদ্ধের সাধারণ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। হারাম মাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ, তবে এটি শুধুমাত্র যুদ্ধ শুরু করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ হারাম মাসে জায়েয, যেমন হারাম ভূমিতে *(মক্কা)* প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ জায়েয।[৪৫] এই আয়াত এবং অন্যান্য আয়াত থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, বিবেককে বিভিন্ন দিক নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে। বিশেষত আলিম, ফকিহ ও মুফাসসিরগণ আয়াতগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন, ফিকহি বিধান বের করা এবং মুতলাক ও মুকাইয়াদ, আম ও খাসের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। এই ইসলামী পদ্ধতির ফলে ফিকহ ও তাফসীরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক স্কুল ও মতবাদ গড়ে উঠেছে। এই পদ্ধতি মুসলিম উম্মাহকে গভীর চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী বিধান বোঝার এবং প্রয়োগ করার সুযোগ দেয়। এটি ইসলামী জ্ঞানের বিকাশ ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আর যখন আল্লাহ তা'আলা কুরআনে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে, ঐ অভিযানে যারা হত্যা করেছিল তাদের কোনো গুনাহ হয়নি, তখন আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ ও তাঁর সঙ্গীরা সওয়াবের আশা করতে লাগলেন। তারা বললেন: 'হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি আশা করতে পারি যে, আমাদের এই অভিযানও জিহাদের সওয়াবপ্রাপ্ত হবে?' তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন: **"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা হিজরত করেছে এবং যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর রহমতের আশা রাখে। আর**

---

(৪৫) তাফসীর ইবনে সা'দী: (১/১৭২)।

আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ, যা ঐ অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের আশ্বস্ত করেছে যে, তারা কোনো গুনাহ করেনি এবং তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া।

এই মহান আয়াতটি ঈমানের মর্যাদা, হিজরত ও মুহাজিরদের অবস্থান এবং আল্লাহর পথে জিহাদের ফজিলত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ ও তাঁর সঙ্গীদের এই গুণাবলির মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এছাড়াও, এই আয়াত থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝা যায়—আল্লাহর জন্য ইখলাস (বিশুদ্ধ নিয়ত) কত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মহান আল্লাহ এখানে জিহাদের শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন যে, তা হতে হবে **"তাঁর পথে"**—অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, অন্য কোনো স্বার্থে নয়।

﴿يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلِ ٱلۡعَفۡوَۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۗ﴾

অর্থ: ***[তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এ দু'টোয় রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য উপকার। আর তার পাপ তার উপকারিতার চেয়ে অধিক বড়। আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে। বলুন, 'যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত'। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।* দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে।]*** (আয়াত নং ২১৯)।

এই মহান আয়াতটি সাহাবায়ে কিরামের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) দ্বীনের বিষয়ে গভীর যত্ন ও আগ্রহকে তুলে ধরেছে, যা প্রকাশ পায় তাদের মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে।

তাফসিরের কিতাবে এসেছে যে, হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ দোয়া করে বলেছিলেন: "হে আল্লাহ! আমাদের জন্য মদের বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করুন।" এরপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়— **"তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে..."**। তখন হজরত উমর (রা.)-কে ডেকে এই আয়াত পড়া হলো। তিনি পুনরায় দোয়া করলেন: "হে আল্লাহ! আমাদের জন্য মদের বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করুন।" এরপর **"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না...।"** আয়াত নাযিল হলো। তখনও তিনি বললেন: "হে আল্লাহ! আমাদের জন্য মদের বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করুন।" এরপর **"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, বেদীপূজা ও ভাগ্য**

নির্ধারণের তীর— এসব শয়তানের অপবিত্র কর্ম, অতএব এগুলো থেকে বিরত থাকো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।" আয়াত অবতীর্ণ হলো।[৪৬]

এটি সাহাবায়ে কিরামের মদ ও জুয়ার বিষয়ে প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। কারণ তারা মদ ও জুয়াকে কল্যাণকর জিনিস হিসেবে বিবেচনা করেননি। মদের কারণে বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়, আর জুয়ার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা হয়। এছাড়াও এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা ধীরে ধীরে মদ হারাম করেছেন, যা তাঁর মুমিনদের প্রতি করুণা ও দয়ার বহিঃপ্রকাশ। কারণ, জাহেলি যুগে মদ ও জুয়া তাদের সমাজের একটি সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তাই অনেকের জন্য হঠাৎ করে তা পরিত্যাগ করা সহজ ছিল না। এ জন্য ধাপে ধাপে নিষিদ্ধকরণের বিধান এসেছে। এটি আরো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও অবস্থা বিবেচনায় নিয়েই বিধান প্রদান করেন এবং মানবজীবনের প্রকৃতিগত নিয়ম অনুযায়ী পরিচালনা করেন। সুবহানাল্লাহ, তিনি সর্বাবস্থায় বরকতময়। এখান থেকে এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষা, দাওয়াহ ও সংশোধনের ক্ষেত্রে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা না করে যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে, যাতে সে দাওয়াহ ও নির্দেশনার ইতিবাচক ফল পেতে পারে। এটি প্রমাণ করে যে মানুষের কিছু প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন: ভুলে যাওয়া, অবহেলা করা, এবং মানবীয় দুর্বলতা। এর ফলে মানুষের প্রতিনিয়ত মনে করানোর প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়, বিশেষ করে যখন কোনো কাজ বা অভ্যাস মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে যায়, তখন তাকে বদলানোর জন্য একটি বিকল্পের প্রয়োজন হয় এবং এর জন্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন হয়, যা এক ধরনের জিহাদ বা যুদ্ধে পরিণত হয়, যেখানে শখ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। এছাড়াও, এটি ভাল গুণাবলীর অর্জনেও প্রযোজ্য, কারণ সেগুলোর জন্যও কখনও কখনও ধীরে ধীরে শেখার প্রক্রিয়া

---

(৪৬) তাফসীর ইবনে কাসীর: (১/২৬২)।

প্রয়োজন হয়। যেমন হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে: **"জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে অর্জিত হয় এবং ধৈর্য সহনশীলতা ধরে আসে।"** (মাজমাউয যাওয়ায়েদ), এবং **"যখন কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য বলে চলে এবং সত্যবাদিতার জন্য চেষ্টা করে, অবশেষে এক সময় সে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়।"** (মুসনাদে আহমাদ)।

এই পবিত্র আয়াতে ধাপে ধাপে শিক্ষার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে মদ ও জুয়ার প্রকৃতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তারপর এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট পাপের কথা বলা হয়েছে। একই সাথে, এগুলো থেকে যে সাময়িক উপকার পাওয়া যায় তাও উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর উপকার ও পাপের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে: **"বলুন, এতে রয়েছে বড় পাপ।"** আল্লাহ তাআলা এখানে প্রমাণ করেছেন যে মদ ও জুয়া শুধু সাধারণ পাপ নয়, বরং এগুলো বড় পাপের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মদ্যপানের ফলে মানুষ অশ্লীল কথা ও কাজে লিপ্ত হয়, যা বড় বড় পাপের দিকে নিয়ে যায়। এছাড়াও, মদ্যপানের কারণে মানুষ তার বুদ্ধি হারায় এবং নামাজসহ অন্যান্য ইবাদত ও কর্তব্য পালনে অক্ষম হয়ে পড়ে। তেমনি, জুয়ার ক্ষেত্রে, এটি অন্যায় উপার্জনের মাধ্যম এবং এতে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এছাড়াও, জুয়ার মাধ্যমে মানুষের অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে বিনষ্ট হয়। এই সমস্ত ক্ষতিকর দিকগুলো বিবেচনা করে, মদ ও জুয়া থেকে দূরে থাকা অপরিহার্য, কারণ এগুলো বড় পাপের কারণ এবং সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে। তারপর আল্লাহ তাআলা প্রমাণ করেছেন যে মদ ও জুয়াতে মানুষের জন্য কিছু সাময়িক উপকারও রয়েছে। যেমন, মদ্যপায়ী ব্যক্তি কিছু সময়ের জন্য আনন্দ বা তৃপ্তি লাভ করে, আর জুয়ার মাধ্যমে কিছু মানুষ সহজেই অর্থ-সম্পদ অর্জন করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করেছেন: **"এগুলোর পাপ এগুলোর উপকারের চেয়ে অনেক বড়।"**

এই বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মদ ও জুয়ার হুকুম এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যা মানুষের বুদ্ধি ও মনকে আলোকিত করে এবং তাদের হৃদয়কে সন্তুষ্ট করে। আল্লাহ

তাআলা চাইলে সরাসরি মদ ও জুয়া হারাম ঘোষণা করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞা ও দয়া এটাই চেয়েছে যে মুসলমানরা যেন ধাপে ধাপে শিক্ষা লাভ করে এবং তাদের বুদ্ধি ও বিবেককে কাজে লাগিয়ে এই বিধান বুঝতে পারে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে এমন একটি বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি শিখিয়েছেন, যা তাদেরকে ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনের বিভিন্ন বিষয় মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে সক্ষম করে তোলে। এটি তাদেরকে সর্বোত্তম চিন্তা ও বিশ্লেষণের দিকে নিয়ে যায় এবং তাদের জ্ঞান ও বোধগম্যতা বৃদ্ধি করে। যাতে তারা এই জ্ঞান নিজেদের মধ্যে এবং অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়, গভীর জ্ঞান ও ফিকহী বুঝ দ্বারা।

এই পবিত্র আয়াতে মুমিনদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরও একটি প্রশ্ন উল্লেখ করা হয়েছে: **"তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী খরচ করবে?"** এখানে তারা জানতে চেয়েছে যে তারা কতটুকু সম্পদ খরচ করবে। এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য সহজ ও সুন্দর একটি নির্দেশনা দিয়েছেন: **"বলুন, যা প্রয়োজনাতিরিক্ত তা।"** যার অর্থ হলো যা সহজে দেওয়া যায় এবং যা দাতার জন্য কষ্টকর নয়। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান করবে, কিন্তু এমনভাবে নয় যে তোমরা নিজেরা কষ্টে পড়ে যাও বা অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়।[৪৭] **"এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।"** এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য সত্য ও কল্যাণের দিকনির্দেশনা স্পষ্ট করেছেন, যাতে তারা আল্লাহর পছন্দনীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। **"যাতে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে চিন্তা কর।"** এই আয়াতে মুমিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করার প্রতি। এটি একটি

---

(৪৭) আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন: (৩/৪২)।

ব্যাপক ও মহান নির্দেশনা, যা জীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। দুনিয়া সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার মধ্যে রয়েছে: সৃষ্টির সূচনা ও পরিণতি, সাফল্য ও ব্যর্থতা, লাভ ও ক্ষতি, ধনী ও গরীবের অবস্থা, দুনিয়ার বিনাশ ও ধ্বংসপ্রাপ্তি, এবং দুনিয়ার পরিবর্তনশীলতা ও তার বিভিন্ন অবস্থা। একইভাবে আখিরাত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা, যা হলো চূড়ান্ত গন্তব্য এবং এর জীবন চিরস্থায়ী, যা কখনো ধ্বংস বা শেষ হবে না। আখিরাতে মুমিনদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি, আর কাফিরদের জন্য রয়েছে দুঃখ, দুর্দশা ও শাস্তি। এছাড়াও আখিরাতের অন্যান্য বিষয় রয়েছে যা চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক করে। আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশনা, দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে চিন্তা করার মাধ্যমে, উভয়ের মধ্যে তুলনা করতে এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের চেয়ে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য প্রেরণা যোগায়। এটি মানুষকে দুনিয়ার মোহ ও প্রতারণা থেকে সতর্ক করে এবং আখিরাতের প্রস্তুতির প্রতি মনোযোগী করে। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অত্যন্ত সহজ ও সুন্দর বাগ্মীতার মাধ্যমে, যা মনকে উদ্দীপিত করে, বিশেষত যখন প্রশ্নকারীরা তাদের দীন ও দুনিয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে তাদের আখিরাতের জন্য। এখানে আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর মহান উদারতা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ, প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা দিয়েছেন তা প্রশ্নের চেয়েও ব্যাপক ও গভীর। এটি শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে উদারতার গুরুত্বকে তুলে ধরে, বিশেষত যখন প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়।

﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَٰمَىٰۖ قُلۡ إِصۡلَاحٞ لَّهُمۡ خَيۡرٞۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ مِنَ ٱلۡمُصۡلِحِۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعۡنَتَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٢٠﴾

অর্থ: **[আর লোকেরা আপনাকে ইয়াতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; বলুন, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা (ইসলাহ) উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক তবে তারা**

তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন কে উপকারকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আর আল্লাহ ইচ্ছে করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।] *(*আয়াত নং ২২০)।

এই পবিত্র আয়াতটি মুসলমানদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে, যা হলো ইয়াতীমদের সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা। মুসলমানরা ইয়াতীমদের সম্পদ নিয়ে চিন্তিত ছিল এবং ভয় পেত যে তারা ভুলবশত ইয়াতীমদের সম্পদ ব্যবহার করে ফেলতে পারে। তাই তারা ইয়াতীমদের খাবার ও সম্পদকে আলাদা করে রাখত। এই বিষয়ে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রশ্ন করলে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন: **"তারা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, তাদের জন্য সংশোধন (ইসলাহ) করা উত্তম। আর তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন কে উপকারকারী এবং কে অনিষ্টকারী।"** এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইয়াতীমদের বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর নির্দেশনা দিয়েছেন: **"ইসলাহ"** বা সংশোধন। এই একটি শব্দে ইয়াতীমদের সম্পদ সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, বৃদ্ধি এবং যেকোনো ধরনের ক্ষতি থেকে তাদের সম্পদ রক্ষা করার সমস্ত দিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে ইয়াতীমদের সম্পদের **"ইসলাহ"** বা সংশোধন করা তাদের জন্য উত্তম। এর অর্থ হলো তাদের সম্পদকে সকল দিক থেকে সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা, যা তাদের জন্য কল্যাণকর। এটি সম্পদকে আলাদা করে রাখার চেয়ে উত্তম, কারণ আলাদা করে রাখলে সম্পদের বৃদ্ধি ও উন্নতি সম্ভব নয়। এরপর আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: **" আল্লাহ জানেন কে উপকারকারী এবং কে অনিষ্টকারী।"** এই বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইয়াতীমদের সাথে খাবার, সম্পদ এবং অন্যান্য বিষয়ে মিশে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, যাতে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত হয় এবং তাদের উপর কোনো কষ্ট না আসে। আল্লাহ তাআলা এই সংশোধন (ইসলাহ) এর প্রচেষ্টাকে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক

ও অবস্থার সাথে যুক্ত করেছেন: **" আর তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই।"** এই বক্তব্য ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, ভালোবাসা, কল্যাণ কামনা, সংরক্ষণ ও উন্নতির প্রতীক। এটি সকল প্রকার ফাসাদ (অশান্তি ও ধ্বংস) দূর করে এবং ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ভালোবাসা ও কল্যাণের উদাহরণ হওয়া উচিত এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকা উচিত। এরপর আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরের গোপন উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানেন না: **"আল্লাহ জানেন কে উপকারকারী এবং কে অনিষ্টকারী।"** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা জানেন যে তোমরা ইয়াতীমদের সাথে মিশে যাওয়ার পেছনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তাদের সম্পদে তোমরা কী করছ। এটি নিঃসন্দেহে মানুষের মনে সতর্কতা ও আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে এবং প্রতিটি কাজে আল্লাহর তত্ত্বাবধানের অনুভূতি জাগ্রত করে, বিশেষত ইয়াতীমদের সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, যা এই আয়াতের মূল বিষয়।

আল্লাহ তাআলার বাণী: **"আল্লাহ জানেন কে উপকারকারী এবং কে অনিষ্টকারী।"** এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি আচরণগত নীতি। অনেক সময় মানুষের আচরণ বা বাহ্যিক লক্ষণ দেখে প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝা সম্ভব হয় না, কারণ তা কেবল অন্তরের গভীরে থাকে, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। তিনি গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী। এই আয়াতটি মানুষকে প্রতিটি মুহূর্তে তার আচরণ সংশোধনের সুযোগ দেয়। যদি কেউ তার ইখলাস (ঈমানী সততা) নিয়ে সন্দেহে পড়ে, তবে সে এই আয়াতের মাধ্যমে নিজেকে সংশোধন করতে পারে: **"আল্লাহ জানেন কে উপকারকারী এবং কে অনিষ্টকারী।"** যদি কেউ তার কাজ বা আচরণ নিয়ে সন্দেহে পড়ে, তবে সে এই আয়াতের মাধ্যমে নিজেকে সংশোধন করতে পারে: **"আল্লাহ জানেন কে উপকারকারী এবং কে অনিষ্টকারী।"** যদি কেউ অন্যের বিষয় সংশোধনের চেষ্টা করে এবং তার ইচ্ছার বিপরীত কিছু ঘটে, তবে সে এই আয়াতের মাধ্যমে নিজেকে শান্ত করতে পারে:

"আল্লাহ জানেন কে উপকারকারী এবং কে অনিষ্টকারী।" যদি কেউ অন্যের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহে পড়ে, তবে সে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে পারে: **"আল্লাহ জানেন কে উপকারকারী এবং কে অনিষ্টকারী।"** এই আয়াতটি মানুষের মনে আল্লাহর তত্ত্বাবধানের অনুভূতি জাগ্রত করে এবং প্রতিটি কাজে সততা ও নিষ্ঠার সাথে চলার প্রেরণা যোগায়। এটি ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা, যা মানুষের জীবনে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

এই ঐশী পদ্ধতি থেকে বোঝা যায় যে, জীবনে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার সমস্ত দিক বোঝা বা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন, বিশেষত যখন তা অন্যের সাথে সম্পর্কিত। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমাদের উচিত প্রথমে সংশোধন (ইসলাহ) এর দিকে মনোযোগ দেওয়া, দ্বিতীয়ত ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বিবেচনা করা এবং তৃতীয়ত এই বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ তাআলা বান্দার সকল কাজ ও উদ্দেশ্য জানেন, যা তাঁর কাছে গোপন নয়। এই আচরণগত পদ্ধতির উপকারিতা ব্যবসায়িক প্রশাসন, প্রশাসনিক ও সাধারণ সম্পর্ক, সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কসহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। মানুষের উচিত সংশোধনের নীতি অনুসরণ করা, যা ভ্রাতৃত্বের নীতির উপর ভিত্তি করে এবং আল্লাহর তত্ত্বাবধান ও তাঁর জ্ঞানের প্রতি সচেতন থাকার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি আচরণের একটি নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি, যা এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক এবং এর সুফল ও দিকগুলি গভীরভাবে বিবেচনা করলে এর গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

তারপর আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রতি তাঁর এই মহান ও মহিমান্বিত নির্দেশনার মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেন: **"আল্লাহ ইচ্ছে করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই কষ্টে ফেলতে পারতেন।"** অর্থাৎ, আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে তিনি এই ছাড় (রুখসত) দিতেন না এবং তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করতেন। কিন্তু তিনি এর মাধ্যমে তোমাদের জন্য কষ্ট ও সংকট দূর করেছেন এবং ইয়াতীমের

জন্য কল্যাণ ও উপকারের পথ তৈরি করেছেন। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে কত গুরুত্বপূর্ণ ও মহান বিধান দান করেছেন এবং এর মাধ্যমে কত কল্যাণ অর্জিত হয়েছে। তিনি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, তিনি তাদের সংকট ও কষ্ট দূর করেছেন, যা নিয়ামতের গুরুত্ব বোঝাতে বিপরীত দিক থেকে আলোকপাত করার একটি শিক্ষামূলক পদ্ধতি। এরপর আল্লাহ তাআলা এই মহান আয়াতটি শেষ করেছেন এই বলে: **"নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"** এখানে "পরাক্রমশালী" বলতে পূর্ণ শক্তি ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা বোঝানো হয়েছে। তিনি তাঁর সকল কাজে বিজয়ী এবং তাঁর আদেশ, নিষেধ, বিধান, নির্ধারণ, সৃষ্টি, জীবনদান ও মৃত্যুদানে প্রজ্ঞাময়। কাজেই আল্লাহ তাআলা সকল বিষয়ে প্রজ্ঞাময় এবং সবকিছুর সঠিক ব্যবস্থাপক। প্রজ্ঞা অর্থ হলো প্রতিটি জিনিসকে তার যথাযথ স্থানে রাখা, যা অনর্থক বা অযথা কাজের বিপরীত। এই দুই গুণ—**"আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"**—এর সমন্বয়ে বোঝা যায় যে, তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সকল কাজে প্রজ্ঞাময়। তিনি তাঁর আদেশ, ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্তে প্রজ্ঞা প্রয়োগ করেন এবং তা তাঁর নাম ও গুণাবলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমন রহমত, দয়া, সাহায্য, মজলুমের জন্য কৌশল ও সাহায্য, এবং জালিমের জন্য কৌশল ও শাস্তি। প্রজ্ঞা একটি মহান ও সম্মানিত গুণ। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে প্রজ্ঞা দান করেছেন, তাদের প্রশংসা করেছেন: **"আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে, তাকে প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে।"** নিঃসন্দেহে বান্দার প্রজ্ঞা দাতা ও প্রদানকারী আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞার মতো নয়। আল্লাহর প্রজ্ঞা পূর্ণ, কিন্তু সৃষ্টির প্রজ্ঞায় মানুষের মতো ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে, সে অবশ্যই তার চেয়ে উত্তম ও ভালো, যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়নি। যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে, সে শক্তি ও ভালো কাজকে তার উপযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করতে সক্ষম। অতএব, সমস্ত

প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি এই মহান গুণাবলী ও সুন্দর নামের অধিকারী। প্রজ্ঞা হলো প্রতিটি জিনিসকে তার যথাযথ স্থানে রাখা, এবং আল্লাহ তাআলা এই গুণে পরিপূর্ণ।

﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١﴾

অর্থ*: [***আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে এবং মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে নিশ্চয় উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহবান করে, আর আল্লাহ তাঁর ইচ্ছায় তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন এবং মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।*** *]* (আয়াত নং ২২১)।

পবিত্র আয়াতে বিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রী বা স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্মের দিকটি বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, **"মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে"**। এই আয়াতে মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। এরপর আল্লাহ তাআলা এই নিষেধাজ্ঞার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন, **"একজন মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে"**। এই আয়াতটি দুটি বিষয়ের মধ্যে তুলনা করার শিক্ষা দেয়*:* মুগ্ধতা ও উত্তমতা। মুগ্ধতা সবসময় কল্যাণ বা উত্তম নয়, তাই অপর একটি মানদণ্ড অর্থাৎ উত্তমতা বা কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এটি একটি মূল্যবান নীতি, যা মুমিনকে প্রতিটি বিষয়ে এর প্রয়োগ বিস্তৃত করতে অনুপ্রাণিত করে। এই আয়াতের আরেকটি উপকারিতা হলো, এটি মুগ্ধতার কথা উল্লেখ করেছে, যা বিভিন্ন অংশ ও উপাদান নিয়ে গঠিত। নবীজি সাঃ এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন যখন তিনি

বলেছেন, **"নারীকে চারটি কারণে বিয়ে করা হয়: তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য এবং তার ধর্ম। সুতরাং তুমি ধর্মপরায়ণ নারীকে বিবাহ করো।"** *(*সহীহ বুখারী*)* এখানে নারীর মুগ্ধতার স্থানগুলো এই চারটি মাপকাঠিতে রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা অন্য একটি মানদণ্ড প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন, তা হলো ঈমানের কল্যাণ। তিনি বলেন, **"একজন মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে।"** এর কারণ হলো, ঈমানের কল্যাণময় উপাদান ও প্রভাব। ঈমান একজন নারীকে তার আচরণ, সম্পর্ক, নিজের প্রতি দায়িত্ব, সম্পদ, সন্তান ও স্বামীর প্রতি দায়িত্বে সংযত রাখে। ঈমানের কারণে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য স্বামীর প্রতি আনুগত্য ও সদাচরণ করে। এই গুণাবলী মুশরিক নারীর মধ্যে থাকে না, কারণ তার মধ্যে ঈমানের অভাব রয়েছে। এছাড়াও, ঈমানের উদ্দেশ্য তার হৃদয়ে এমন একটি উন্নত স্তর নিয়ে আসে যা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করে।

একই নীতি স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, **"মুশরিক পুরুষদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। একজন মুমিন দাস মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে।"** এই আয়াতটি উভয় পক্ষের জন্য একই রকম: মুগ্ধতা ও কল্যাণ। এখানেও মুগ্ধতার চেয়ে ঈমানের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তাআলা কল্যাণের আরেকটি দিক উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, **"তারা (মুশরিকরা) আগুনের দিকে ডাকে।"** অর্থাৎ, এই মুশরিকরা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তারা শিরক, চারিত্রিক পাপ, ক্ষতি সাধন, মুসলিম ও ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ, অন্যদেরকে কুফরির দিকে আহ্বান করা এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখার মাধ্যমে জাহান্নামের দিকে ডাকে। এ সমস্ত কিছুই আল্লাহর দাওয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ তাআলা বলেন, **"আর আল্লাহ তাঁর ইচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমার দিকে ডাকেন।"** অর্থাৎ, আল্লাহ

তাদের ডাকার বিপরীত দিকে ডাকেন। এখানে একটি বিশাল বৈপরীত্য রয়েছে, যা তাদেরকে বর্জন করা এবং তাদেরকে পছন্দ না করার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে, তা যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন। এই আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে যে, জান্নাত ও ক্ষমা শুধুমাত্র আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছার মাধ্যমেই সম্ভব। আল্লাহ তাআলা বলেন, **"আর আল্লাহ তাঁর ইচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমার দিকে ডাকেন।"** এর অর্থ হলো, আমাদের উচিত আল্লাহর কাছে দুআ করা এবং তাঁর কাছে সত্যের উপর অবিচল থাকার তাওফিক চাওয়া। কারণ, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো জন্য কোনো সুযোগ বা সাফল্য নেই।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, **"এবং তিনি মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"** এখানে আল্লাহ তাআলা ব্যাখ্যা করেন যে, তিনি তাঁর বিধান ও ইচ্ছা বর্ণনা করেন এবং মানুষের অজানা বিষয়গুলো তাদেরকে শেখান, যাতে তারা তাঁর বিধান অনুসারে কাজ করতে পারে এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতে পারে। যখন মানুষ ভুলে যায়, তখন এই সুস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢ نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢٢٣﴾

অর্থ: **[আর তারা তোমাকে হায়েয সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তা কষ্ট (অশুচি)। সুতরাং তোমরা হায়েযকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে।* তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে গমন করতে পার। আর তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। এবং জেনে রেখো, তোমরা অবশ্যই আল্লাহর সম্মুখীন হবে। আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।]** (আয়াত নং ২২২-২২৩)।

এরপর আল্লাহ তাআলা কিছু মুসলিমের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, যা মাসিক ঋতুস্রাব (হায়েয) সম্পর্কে। ইহুদিরা যখন কোনো নারীর মাসিক ঋতুস্রাব হতো, তখন তারা তার সাথে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করত না, পানীয় গ্রহণ করত না এবং ঘরে তার সাথে বাস করত না। নবীজি (সা.)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, আল্লাহ তাআলা এর উত্তর দেন এই আয়াতের মাধ্যমে: **"তারা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।"** আল্লাহ তাআলা এর উত্তর দিয়েছেন অত্যন্ত সুন্দর ও সংক্ষিপ্তভাবে: **"বলুন, এটি একটি কষ্ট বা অপবিত্রতা।"** এখানে আল্লাহ তাআলা মাসিক ঋতুস্রাবকে একটি শব্দে বর্ণনা করেছেন, যা হল **"أذى"**, অর্থাৎ কষ্ট বা অপবিত্রতা। এই শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ, যা নারীর শারীরিক ও মানসিক কষ্টকে অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি।

এতে নারীর অনুভূতি ও লজ্জাশীলতা সংরক্ষিত হয়েছে, কারণ নারীর ব্যক্তিগত বিষয়গুলো প্রকাশ্যে আলোচনা করা উচিত নয়। আল্লাহ তাআলা নারীর গোপনীয়তা ও লজ্জাশীলতা রক্ষা করেছেন, যা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এই আয়াতে নারীর প্রতি সদয় ও সম্মানজনক আচরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মাসিক ঋতুস্রাবের সময় নারীর শারীরিক ও মানসিক কষ্টের দিকে খেয়াল রাখা এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও, স্বামীর উচিত এই সময়ে তার স্ত্রীর প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া এবং তার কষ্টকে উপলব্ধি করা।

এরপর আল্লাহ তাআলা মাসিক ঋতুস্রাবের সময় নারীদের থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, **"তোমরা মাসিক ঋতুস্রাবের সময় নারীদের থেকে পৃথক থাকো।"** এরপর তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলেন, **"আর তাদের নিকট যেও না যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়।"** এখানে আল্লাহ তাআলা সহবাস *(যৌন সম্পর্ক)* থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, যা ইজমা দ্বারা হারাম। তবে মাসিক ঋতুস্রাবের সময় শুধুমাত্র সহবাস থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে সহবাস ছাড়া অন্যান্য শারীরিক সম্পর্ক *(যেমন স্পর্শ, আদর ইত্যাদি)* জায়েয, যদি তা আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকে। এই বিষয়ে নবীজি *(সা.)* বলেছেন, **"তোমরা সবকিছু করতে পারো, শুধু সহবাস ছাড়া।"** *(সহীহ মুসলিম)*। এই আয়াত ও হাদীস থেকে ফিকহশাস্ত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা উদ্ভূত হয়েছে। ফকীহ ও মুফাসসিরগণ কুরআনের আয়াত এবং নবীজি *(সা.)*-এর সুন্নাহর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এই বিষয়ে গভীরভাবে গবেষণা করেছেন। এর মাধ্যমে তারা মাসিক ঋতুস্রাব সংক্রান্ত অনেক সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী মাসআলা বের করেছেন, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য পথনির্দেশক।

এরপর আল্লাহ তাআলা মাসিক ঋতুস্রাব শেষ হওয়ার পর এবং গোসল করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক পুনরায় স্বাভাবিক করার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, **"অতঃপর যখন তারা পবিত্র হয়ে যাবে ..।"** এই আয়াতটি দুটি

বিষয় নির্দেশ করে: ১. মাসিক ঋতুস্রাব শেষ হওয়া, যা পবিত্রতার শুরু। ২. গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা সম্পূর্ণ করা, যা সুন্নাহতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, **"যখন তারা পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তোমরা তাদের নিকট যাও যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।"** এই বাক্যটি অত্যন্ত শালীন ও মার্জিত ভাষায় বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন তার স্ত্রীর নিকট সেই পন্থায় যান, যা আল্লাহ অনুমোদন করেছেন, এবং যা আল্লাহ অনুমোদন করেননি তা থেকে বিরত থাকেন। এই ধরনের নৈতিক ও শালীন নির্দেশনা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আদব ও নৈতিকতার মডেল হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। এটি আমাদেরকে শেখায় যে, লজ্জাশীলতা ও শালীনতা ইসলামের একটি মৌলিক গুণ।

এরপর আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে বান্দাদের থেকে কী পছন্দ করেন তা উল্লেখ করে বলেন, **"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন।"** সুতরাং আল্লাহ তাআলা সেই বান্দাদেরকে ভালোবাসেন, যারা বেশি বেশি তাওবা করে, কারণ মানুষ ভুল ও পাপ থেকে মুক্ত নয়। আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন। এছাড়াও, তিনি সেইসব বান্দাদেরকে ভালোবাসেন, যারা শারীরিক ও আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করে। এর মধ্যে রয়েছে পানি দ্বারা গোসল করা, জানাবাত ও মাসিক ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করা, এবং যাবতীয় নোংরা ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকা।

এই আয়াত থেকে ফিকহশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হলো, আলিমগণ আয়াতের গভীর অর্থ ও সূক্ষ্ম দিকগুলো অনুধাবন করেছেন এবং তা থেকে বিস্তারিত মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: **"যখন তারা পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তোমরা তাদের নিকট যাও যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।"** এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আলিমগণের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে:

কিছু আলিম বলেছেন যে, এটি একটি নসীহত (উপদেশ) এবং গোসলের পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। ইবনে হাযম (রহ.) মত দিয়েছেন যে, এটি প্রতিটি ঋতুস্রাবের পর সহবাস করা অবশ্যকর্তব্য। কিছু উসুলবিদ বলেছেন যে, এ আদেশটি ওয়াজিবসূচক। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এটি শুধুমাত্র জায়েয (অনুমতি) মাত্র। তারা যুক্তি দিয়েছেন যে, পূর্বের নিষেধাজ্ঞা (মাসিকের সময় সহবাস নিষিদ্ধ) এটিকে ওয়াজিবের পরিবর্তে জায়েয (অনুমতি)র দিকে নিয়ে যায়। ইবনে কাসীর (রহ.) এই মতামতগুলো উল্লেখ করার পর বলেন: "যে মতটি দলিলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তা হলো এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার পূর্বের হুকুম ফিরে আসবে। যদি পূর্বের হুকুম ওয়াজিব হয়, তবে তা ওয়াজিব হবে, যেমন আল্লাহ বলেন, 'যখন হারাম মাসগুলো শেষ হয়ে যাবে, তখন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।' (সূরা আত-তাওবা)। আর যদি পূর্বের হুকুম মুবাহ (অনুমতি) হয়, তবে তা মুবাহ হবে, যেমন আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমরা ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তখন শিকার করো।' (সূরা আল-মায়িদা) এবং 'যখন নামায শেষ হয়ে যাবে, তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো।' (সূরা আল-জুমুআ)।" এই মতটি ইমাম গাজ্জালী (রহ.) এবং অন্যান্য আলিমগণ বর্ণনা করেছেন, এবং পরবর্তী যুগের কিছু ইমাম এটি গ্রহণ করেছেন। এটি সঠিক মত হিসেবে বিবেচিত।[৪৮] এই আলোচনা থেকে আমরা শিখতে পারি যে, কুরআনের আয়াতগুলো ফিকহ ও উসুলের বিকাশে গভীর প্রভাব ফেলে। আলিমগণ কুরআন ও সুন্নাহর নীতিমালা থেকে বিস্তারিত মাসআলা উদ্ভূত করেছেন। তাদের মতপার্থক্য গভীর চিন্তা, গবেষণা ও যুক্তির ভিত্তিতে হয়েছে, যা তাদের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তির উচ্চ স্তরকে প্রতিফলিত করে। এটি প্রমাণ করে যে, কুরআন মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে বিকশিত করে এবং তাদেরকে নিষ্ক্রিয়ভাবে নয়, বরং সক্রিয়ভাবে চিন্তা ও গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করে।

---

(৪৮) তাফসীর ইবনে কাসীর: (১/২৬৭)।

আল্লাহ তাআলা মাসিক ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের আরও কিছু দিক ব্যাখ্যা করেছেন। এ বিষয়ে মানুষ বিভিন্ন প্রশ্ন করত, বিশেষ করে মদীনার ইহুদিদের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল যে, যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীর সাথে পিছন দিক থেকে সহবাস করে, তবে তাদের সন্তান ট্যারা হবে। এই ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, **"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ। অতএব, তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা আগমন করো।"** এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে প্রচলিত এই ভ্রান্ত ধারণাকে বাতিল করেছেন। এটি কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যে, এটি মানুষের বিভিন্ন সমস্যা ও ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে সমাধান করে। কুরআন মাজীদ খণ্ডে খণ্ডে নাযিল হয়েছে, যাতে মানুষের বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান দেওয়া যায়। মুফাসসিরগণ, বিশেষ করে ইবনে কাসীর *(রহ.)*, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: "অর্থাৎ, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা করো *(তোমাদের স্ত্রীর নিকট যাও)*, সামনে থেকে বা পিছন থেকে, তবে শুধুমাত্র যোনিপথে।" এটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইবনে আব্বাস *(রা.)*-কেও এক ব্যক্তি এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "দাঁড়ানো, বসা, সামনে থেকে বা পিছন থেকে—যেকোনো অবস্থায় যাওয়া যাবে, তবে শুধুমাত্র যোনিপথে। অন্য কোনো পথে নয়।"[৪৯] সাহাবা, তাবেয়ী ও ফিকহবিদগণের ব্যাপক মত হলো যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে যেকোনো অবস্থায় *(সামনে থেকে বা পিছন থেকে)* সহবাস করতে পারে, তবে শর্ত হলো তা যোনিপথে হতে হবে। এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শালীন ও বৈধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্মুক্ততা দিয়েছে, তবে তা শরীয়তের সীমার মধ্যে।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম মুসলিমদের জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি গভীর মনোযোগ দেয় এবং তা সুস্পষ্ট, পরিপূর্ণ ও শালীন ভাষায় ব্যাখ্যা

---

(৪৯) তাফসীর ইবনে কাসীর: *(১/২৭০)*।

করে। ইসলামী শিক্ষা ও নির্দেশনা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে, তা পাঠক বা শ্রোতার মনে কোনো প্রকার অস্বস্তি বা লজ্জার অনুভূতি সৃষ্টি করে না। এটি কুরআনের বাচনিক অলৌকিকতার একটি দিক। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, **"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ।"** এখানে *'ক্ষেত্র'* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা ফসল উৎপাদনের স্থানকে বোঝায়। ঠিক তেমনই নারীর জরায়ুতে ভ্রূণের বিকাশ ঘটে। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, **"তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা আগমন করো।"** এই বাক্যটিতে অত্যন্ত শালীন ও মার্জিত ভাষায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যা নারী ও পুরুষ উভয়ের লজ্জাশীলতা রক্ষা করে। এটি আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলীর সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাদীসে এসেছে, **"নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাশীল ও গোপনকারী।"** *(*মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ*)*। অন্যদিকে, আল্লাহ তাআলা বলেন, **"নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না।"** *(*সূরা আল-আহযাব*)*। এর অর্থ হলো, আল্লাহ সত্য প্রকাশ করতে ও তা নির্দেশ দিতে লজ্জাবোধ করেন না, তবে তা অত্যন্ত শালীন ও মার্জিত ভাষায় উপস্থাপন করেন। এটি আমাদেরকে শেখায় যে, লজ্জাশীলতা সত্য প্রকাশে বাধা নয়, বরং তা উপযুক্ত ও শালীন ভাষায় প্রকাশ করা উচিত। এই নীতি আমাদেরকে শালীনতা ও লজ্জাশীলতার শিক্ষা দেয়, বিশেষ করে কথোপকথন ও ভাষা নির্বাচনের ক্ষেত্রে। আমাদের উচিত উপযুক্ত ও মার্জিত শব্দ ব্যবহার করা এবং অশ্লীল বা অমার্জিত শব্দ পরিহার করা। এটি ইসলামের আদব ও নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা নবী *(*সা.*)* এবং সাহাবায়ে কেরাম এর জীবন থেকে প্রতিফলিত হয়। তাদের কথাবার্তা ও লেখনীতে কোনো প্রকার অশ্লীলতা বা অমার্জিত ভাষা পাওয়া যায় না। বরং তারা সতর্কতার সাথে শব্দ নির্বাচন করতেন, যেমন ইবনে আব্বাস *(*রা.*)*-এর উক্তি*:* **"দাঁড়ানো, বসা, সামনে থেকে বা পিছন থেকে—যেকোনো অবস্থায় যাওয়া যাবে, তবে শুধুমাত্র যোনিপথে। অন্য কোনো পথে নয়।"** এই উচ্চ মার্জিত আদব ও শালীনতা পরবর্তী আলিমগণের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। তারা তাদের

লেখনীতে সত্যকে সুস্পষ্ট ও মার্জিত ভাষায় উপস্থাপন করেছেন, যা অমার্জিত ভাষার প্রয়োজন ছাড়াই সম্পূর্ণ বোধগম্য। হে আল্লাহ! আমাদেরকে জ্ঞান দান করুন এবং এমন আদব ও শালীনতা দান করুন, যা আপনি পছন্দ করেন এবং যা আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করে। আমীন।

উক্ত আয়াতের ভাষাগত ও প্রাসঙ্গিক দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো **"أنى"** শব্দের ব্যবহার। আল্লাহ তাআলা বলেন, **"فأتوا حرثكم أنى شئتم"** (অর্থাৎ, "তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা আগমন করো")। এখানে **"أنى"** শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা আরবি ভাষায় একটি ব্যাপক ও গভীর অর্থবহ শব্দ। **"أنى"** শব্দটি সাধারণত প্রশ্ন ও বিবৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং এটি বিভিন্ন দিক নির্দেশ করে। এটি **"كيف"** (কিভাবে), **"أين"** (কোথায়) এবং **"متى"** (কখন) এর চেয়ে ব্যাপক অর্থ বহন করে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে নমনীয়তা ও বৈচিত্র্যের অনুমতি দিয়েছেন, তবে তা শরীয়তের সীমার মধ্যে।[৫০]

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, **" আর তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো।"** এই বাক্যটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিমদের করণীয় বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো সহবাসের সময় **"বিসমিল্লাহ"** বলা। অর্থাৎ, আল্লাহর নাম নিয়ে এই কাজ শুরু করা। এছাড়াও, এর অর্থ হতে পারে নিজেদের জন্য আগামীকালের জন্য উপকারী কাজ করা, যেমন সৎকর্ম ও আল্লাহর আনুগত্য করা। কিছু আলিম বলেছেন যে, এর মধ্যে সন্তান কামনা করাও অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ সবগুলোই হতে পারে। এটি কুরআনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, এর কিছু আয়াতের অর্থ ব্যাপক ও বহুমুখী, যা একই সাথে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ ধারণ করে। আরেকটি ফায়েদা হলো যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক

---

(৫০) আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন: (৩/৬২)।

শুধুমাত্র শারীরিক আনন্দের জন্য নয়, বরং তা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের সাথে যুক্ত। সহবাসের সময় আল্লাহর নাম নেওয়া (বিসমিল্লাহ বলা) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে বরকত লাভ করা যায়। নবীজি (সা.) বলেছেন, **"যদি তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর নিকট যাওয়ার সময় বলে,** بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا/**'বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ! শয়তানকে আমাদের থেকে দূরে রাখ এবং শয়তানকে আমাদের যে সন্তান দান করবে তা থেকে দূরে রাখ।' তাহলে যদি তাদের সন্তান হয়, তবে শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"** (সহীহ বুখারী)।

অতঃপর আয়াতটির সমাপ্তি হয়েছে **"واتقوا الله"** "আল্লাহকে ভয় করো" এই নির্দেশনার মাধ্যমে। এটি কুরআন মাজীদে বারবার উল্লেখিত একটি উপদেশ, যা মুমিনদের সচেতন করে এবং এর গুরুত্বকে তাদের মনে গেঁথে দেয়। আল্লাহর তাকওয়া (ভয়) অবলম্বন করা মুমিনের জীবনের একটি মৌলিক দিক, কারণ তাকওয়ার মাধ্যমে কল্যাণ অর্জিত হয় এবং অকল্যাণ দূরীভূত হয়। তাকওয়ার অর্থ হলো আল্লাহর নিষেধ থেকে বিরত থাকা, তাঁর আদেশ মেনে চলা এবং ভুল বা পাপের সময় ভয় ও অনুতপ্ত হওয়া। এটি মুমিনকে পাপ থেকে ফিরে আসতে এবং তাওবা ও ইস্তিগফারের দিকে ধাবিত করে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, **"তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে।"** এই সাক্ষাতের মাধ্যমে মুমিন উপলব্ধি করে যে, তার প্রতিটি কাজের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে এবং এর ফল ভোগ করতে হবে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সা.)-কে বলেন, **"মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।"** এখানে সুসংবাদটি কী তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, যাতে এটি দুনিয়া ও আখিরাতের সকল প্রকার কল্যাণকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য একটি আকর্ষণীয় ও উৎসাহব্যঞ্জক বার্তা। যখন কোনো সৃষ্টি অন্য সৃষ্টিকে সুসংবাদ দেয়, তখন তা মানুষের মনে আশা ও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। আর যখন এই সুসংবাদ সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, তখন তা আরও বেশি প্রভাবশালী ও মূল্যবান হয়ে ওঠে।

এ থেকে বুঝা যায় যে, সুসংবাদ দেওয়া একটি কার্যকরী ও প্রভাবশালী পদ্ধতি, যা মানুষকে আল্লাহর পথে আকর্ষণ করে এবং তাদের মনে আশা ও উৎসাহ সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে ইসলামী শিক্ষা ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাকওয়ার গুরুত্ব এবং সুসংবাদ দেওয়ার পদ্ধতি অপরিহার্য। এটি আমাদেরকে আল্লাহর পথে অবিচল থাকতে এবং তাঁর রহমত ও কল্যাণের আশা করতে সাহায্য করে।

﴿وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٤ لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥﴾

অর্থ: ***[আর তোমরা সৎকাজ এবং তাকওয়া ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্‌র নামের শপথকে অজুহাত করো না। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।* আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য পাকড়াও করবেন না। কিন্তু পাকড়াও করবেন যা তোমাদের অন্তরসমূহ অর্জন করেছে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।]*** *(*আয়াত নং ২২৪-২২৫*)*।

এই আয়াতগুলো মানুষের জন্য তার স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার সাথে কীভাবে আদব রক্ষা করতে হবে তা স্পষ্ট করে। এগুলো ঈমান, আল্লাহর নামে শপথ এবং এর সাথে সম্পর্কিত নিষেধ ও আদব সম্পর্কেও আলোচনা করে। মানুষ যখন তার কথার সত্যতা, দেখা বা শোনা বিষয়, জ্ঞান, ভবিষ্যতের কাজ বা বিরত থাকা, অথবা কোনো অভিযোগ বা বিষয় থেকে মুক্ত থাকার বিষয় নিশ্চিত করতে চায়, তখন সে আল্লাহর নামে শপথ করে। তবে কখনও কখনও এই শপথের মাধ্যমে সীমা লঙ্ঘন বা অতিরিক্ত কিছু করার প্রবণতা দেখা দেয়। তাই আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টি এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যা

শপথের সকল দিক ও সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী আলিমগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহর নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি কুরআনের বাচনিক অলৌকিকতার একটি দিক যে, সংক্ষিপ্ত আয়াতেও সকল প্রয়োজনীয় দিক ও অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই অলৌকিকতা শুধুমাত্র শব্দের বহুমুখী অর্থেই নয়, বরং বাক্য গঠন ও এর গভীরতায়ও প্রতিফলিত হয়। ইমাম কুরতুবী *(রহ.)* এই আয়াতের ব্যাখ্যায় যা উল্লেখ করেছেন তার সারাংশ হলো যে, এই আয়াতের অর্থ হলো: "তোমরা কোনো ভালো কাজ থেকে বিরত থাকার অজুহাত হিসেবে এই বলে না যে, 'আমরা শপথ করেছি যে আমরা এটি করব না।'" ইবনে আব্বাস *(রা.)*, নাখঈ, মুজাহিদ, রবী এবং অন্যান্য আলিমগণও এরূপ বলেছেন। সাঈদ ইবনে জুবাইর *(রা.)* বলেন, এর অর্থ হলো: "কেউ যদি শপথ করে যে সে কোনো ভালো কাজ করবে না, যেমন সদাচরণ করা, সম্পর্ক ঠিক করা বা মানুষের মধ্যে মীমাংসা করা, তখন তাকে বলা হয়, 'ভালো কাজ করো।' কিন্তু সে বলে, 'আমি তো শপথ করেছি।'" কিছু মুফাসসির বলেছেন যে, এর অর্থ হলো: "তোমরা আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করো না, বিশেষ করে যখন তোমরা সদাচরণ, তাকওয়া বা মীমাংসার কথা চিন্তা করো।"

এই আয়াত থেকে আমরা আরও গুরুত্বপূর্ণ যা শিখতে পারি তা হলো: **কম শপথ করা;** সদাচার ও তাকওয়ার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে। কেননা শপথের সংখ্যা বেড়ে গেলে তা লঙ্ঘন করার সম্ভাবনা বাড়ে এবং আল্লাহর প্রতি সম্মান কমে যায়। তাই শপথ শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই করা উচিত। **শপথকে তুচ্ছ ও অবহেলিত না করা**– অর্থাৎ, প্রতিটি বিষয়ে, হোক তা সত্য বা মিথ্যা, অহেতুক শপথ গ্রহণ করা উচিত নয়। **শপথকে অজুহাত বানানো**– অনেকে কোনো ভালো কাজ করতে বলা হলে শপথকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে, যেমন বলে: "আমি শপথ করেছি, তাই করতে পারছি না," অথচ বাস্তবে সে শপথ করেনি। **যদি কোনো ভালো কাজ না করার জন্য শপথ**

করা হয়, তাহলে তা ভেঙে দিতে হবে– যেমন, যদি কেউ বলে: "আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখব না," "আমি দান-সদকা করব না," "আমি মীমাংসা করব না," কিংবা অন্য কোনো নেক কাজ থেকে বিরত থাকার শপথ নেয়, তাহলে এই শপথ ভঙ্গ করা আবশ্যক এবং এজন্য কাফফারা আদায় করতে হবে।[৫১]

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নেক আমলের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন, যা শপথের কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত নয়: সদাচার (البر), তাকওয়া (التقوى) ও মানুষের বিভেদ ও বিবাদ মিটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা (الإصلاح بين الناس)। আয়াতের মূল শিক্ষা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি শপথ নিয়ে থাকে যে সে এই সৎকর্মগুলো করবে না, তবে সে শপথ পালন না করে বরং তা ভেঙে ফেলা এবং কাফফারা আদায় করা উত্তম। এই শিক্ষা আমাদেরকে প্রাধান্য নির্ধারণের শেখায়—কোনো কিছুতে আসল কল্যাণ কোথায়, তা চিন্তা করা উচিত। এটি মুসলমানদের চিন্তা ও প্রজ্ঞাকে বিকশিত করে, যাতে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে, শরীয়তের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের তুলনায় আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়। এই শিক্ষা শিক্ষাব্যবস্থা, নৈতিক দীক্ষা, দাওয়াতি কার্যক্রম এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ করা জরুরি, যাতে সমাজের নৈতিক ও সামাজিক কাঠামো সুদৃঢ় হয় এবং মানুষ সঠিকভাবে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করতে পারে।

তারপর আল্লাহ শপথ সম্পর্কে আরও নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, **"আল্লাহ তোমাদের অনিচ্ছাকৃত শপথের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।"** এখানে আল্লাহ তাআলা মানুষের ভাষায় স্বাভাবিকভাবে চলে আসা অনিচ্ছাকৃত শপথের জন্য কোনো পাকড়াও বা শাস্তি দেবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। আলিমগণ একমত হয়েছেন যে, অনিচ্ছাকৃত শপথ হলো যখন মানুষ কথার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বলে, **"৸**

---

(৫১) আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন: (৩/৬৪-৬৫)।

"والله *(*আল্লাহর কসম, না*)* বা **"بلى والله** *(*আল্লাহর কসম, হ্যাঁ*)*, ইত্যাদি, কিন্তু এর মাধ্যমে সে প্রকৃতপক্ষে শপথ করার ইচ্ছা রাখে না। এটি আল্লাহ তাআলার একটি মহান অনুগ্রহ যে, তিনি মানুষের উপর থেকে এই ধরনের অনিচ্ছাকৃত শপথের দায়ভার উঠিয়ে নিয়েছেন। তবে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, **"তিনি তোমাদেরকে সেই শপথের জন্য পাকড়াও করবেন, যা তোমাদের হৃদয় অর্জন করেছে।"** অর্থাৎ, যদি কেউ জেনে-শুনে মিথ্যা শপথ করে বা শপথ ভঙ্গ করে, তবে সে এর জন্য দায়ী হবে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, শুধুমাত্র সেই শপথের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, যা ইচ্ছাকৃত এবং হৃদয় থেকে করা হয়েছে।

এরপর আয়াতটি শেষ হয়েছে আল্লাহ তাআলার দুটি গুণবাচক নামের মাধ্যমে*:* **" والله غفور حليم"** *(*আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল*)*। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল। তিনি তাদের ত্রুটিগুলো ক্ষমা করেন এবং তাদের উপর শাস্তি দ্রুত প্রয়োগ করেন না। যারা তাওবা করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন। এটি আল্লাহ তাআলার একটি মহান অনুগ্রহ ও রহমত, আলহামদুলিল্লাহ।

﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧﴾

অর্থ*: [***যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত না হওয়ার শপথ করবে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। অতঃপর তারা যদি ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।* আর যদি তারা তালাক দেয়ার সংকল্প করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।*]* *(*আয়াত নং ২২৬-২২৭*)*।

কুরআনের পরবর্তী প্রসঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, **"যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত না হওয়ার**

শপথ করবে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। অতঃপর তারা যদি ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" এই আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতগুলোতে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার শপথ *(ইলা)* সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার শপথ করে এবং এই শপথের মেয়াদ চার মাসের কম হয়, তবে এটি সাধারণ শপথের মতো বিবেচিত হবে। এর দুটি সম্ভাবনা রয়েছে*:* ১. স্বামী শপথ ভঙ্গ করে কাফফারা দিয়ে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারে। ২. অথবা সে শপথে অটল থাকতে পারে, এবং এই সময়ে তার প্রতি স্ত্রীর কোনো পথ থাকবে না, কারণ শপথের মেয়াদ চার মাসের কম। আর যদি শপথের মেয়াদ চার মাসের বেশি হয়, তবে স্ত্রীকে চার মাস অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে যদি স্বামী তার শপথ ভঙ্গ করে স্ত্রীর কাছে ফিরে আসে, তবে আল্লাহ তাআলা বলেন, **"যদি তারা ফিরে আসে, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"** অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের পূর্বের শপথ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন। কিন্তু যদি স্বামী চার মাস পরেও ফিরে না আসে, তবে স্ত্রীর অধিকার রয়েছে*:* ১. সে স্বামীর সাথে সহবাসের দাবি করতে পারে, কারণ এটি তার অধিকার। ২. যদি স্বামী সহবাস করে, তবে তাকে শপথ ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে। ৩. যদি স্বামী সহবাস করতে অস্বীকার করে, তবে স্ত্রী ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারে অথবা তালাক চাইতে পারে। ৪. যদি স্বামী তালাক দিতে অস্বীকার করে, তবে তাকে তালাক দেওয়ার জন্য বাধ্য করতে পারে।[৫২]

এখানে কুরআনিক বর্ণনার এক অনন্য দিক প্রকাশিত হয়, যেখানে অসাধারণ নীতিশিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো সৌজন্যমূলক ভাষার ব্যবহার, যা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে এমনভাবে ইঙ্গিত প্রদান করে, যা সতর্ক শব্দচয়নের মাধ্যমে মর্যাদা রক্ষা করে*;* ছোটরা যখন এ আয়াত পাঠ করে, তখন

---

(৫২) দেখুন, তাফসীরে সা'দী*: (১/১৮০)*।

তারা এর গভীর অর্থ অনুধাবন করতে পারে না, আর **বড়রা পড়লে বুঝতে পারে**, তবে তা **তাদের নৈতিকতাকে আঘাত করে না**। কারণ, মানুষের স্বভাবজাত লজ্জাবোধ সংরক্ষিত থাকে। এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, কুরআনের ভাষা ও বাচনিক সৌন্দর্য মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও রুচিবোধকে উচ্চ নৈতিকতা, আদব ও অলঙ্কারশাস্ত্রের স্তরে উন্নীত করেছে। এটি আমাদেরকে শালীনতা ও লজ্জাশীলতার শিক্ষা দেয়, বিশেষ করে কথোপকথন ও ভাষা নির্বাচনের ক্ষেত্রে। আমাদের উচিত উপযুক্ত ও মার্জিত শব্দ ব্যবহার করা এবং অশ্লীল বা অমার্জিত শব্দ পরিহার করা। এটি ইসলামের আদব ও নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা আমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

এখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে, যা তাদের মধ্যে অধিকার ও দায়িত্বের ভারসাম্য বজায় রাখে। আল্লাহ তাআলা এই সম্পর্কের সীমা নির্ধারণ করেছেন চার মাসের মধ্যে, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ বা দূরত্বের সর্বোচ্চ সীমা। এটি স্বামীকে নির্দেশ দেয় যে, সে যেন তার স্ত্রী থেকে চার মাসের বেশি সময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন না থাকে, যেমন দীর্ঘ সফর বা অন্যান্য কারণে। এতে স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষিত হয়, এবং যদি স্বামী এই সময়সীমা অতিক্রম করে, তবে স্ত্রীর অধিকার রয়েছে তার দাবি জানানোর এবং প্রয়োজনে তালাক চাওয়ার।

এই নির্দেশনার মাধ্যমে ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট প্রতিরোধ করে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব তুলে ধরে। এটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে সীমিত ও শরীয়ত দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামী শরীয়ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও গভীর মনোযোগ দেয়। চার মাসের এই সীমা নির্ধারণ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা নারীর প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক অবগত। এই সীমা নির্ধারণের মাধ্যমে ইসলাম নারীর প্রতি সম্মান ও যত্ন প্রদর্শন করে। এমনকি স্ত্রীকে শাসন করার ক্ষেত্রেও ইসলাম সীমা

নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, **"তাদেরকে শয্যা থেকে পৃথক রাখো।"** (সূরা আন-নিসা)। চার মাসের সীমা নির্ধারণের বিষয়ে হযরত উমর (রা.) একদল নারীর মতামত নেন, এবং তারা জানান যে চার মাসের বেশি স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা তাদের জন্য কঠিন। এরপর তিনি যুদ্ধরত সৈন্যদের জন্য চার মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করেন, এই সময় শেষ হলে, তিনি সৈন্যদের ফিরিয়ে আনতেন এবং অন্য দল পাঠাতেন।[৫৩] এ থেকে আমরা শিখতে পারি যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আল্লাহর নির্ধারিত সীমার প্রতি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং মানুষের অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি গভীর মনোযোগ দিতেন। এটি আমাদেরকে শরীয়তের সীমা মেনে চলতে এবং মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট হতে শিক্ষা দেয়। ইসলামী শরীয়তের এই নিয়ম ও পদ্ধতি আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে উদ্বুদ্ধ করে। মুসলিমদের উচিত সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া, যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমার প্রতি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং মানুষের অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি গভীর মনোযোগ দিতেন। তারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলতেন এবং মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। এটি আমাদেরকে শরীয়তের সীমা মেনে চলতে এবং মানুষের কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শিক্ষা দেয়।

অতঃপর আয়াতটি এমন বাক্যে শেষ হয়, যা পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই: **"আর যদি তারা তালাকের সিদ্ধান্ত নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"** অর্থাৎ, যদি তারা তালাক দিতে চায় এবং সে বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ তাদের কথা শুনছেন এবং তাদের অবস্থা, অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন- তা কষ্ট দেওয়া, অনিষ্ট সাধন করা বা অন্য কোনো কারণেই হোক। এটি মানুষকে সর্বজ্ঞ ও সর্বশ্রোতা সত্তার প্রতি ভয় রাখতে উদ্বুদ্ধ করে এবং দাম্পত্য সম্পর্কে কোনো ধরনের ক্ষতি বা অন্যায় আচরণ থেকে বিরত রাখে। আর যদি কোনো পক্ষ অন্যকে কষ্ট দিতে

---

(৫৩) আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন: (৩/৭২)।

চায়, তবে শরিয়তের নির্ধারিত আইন ও অধিকারসমূহ তা প্রতিহত করার জন্য সুসংগঠিত রয়েছে। অতএব, আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা, যিনি বান্দাদের জন্য এই মহৎ বিধান দান করেছেন।

﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٢٨﴾

অর্থ*: [***আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন রজঃস্রাব কাল (قروء) প্রতীক্ষায় থাকবে। আর তারা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে হালাল নয়। আর যদি তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চায় তবে এতে তাদের পুনঃ গ্রহণে তাদের স্বামীরা বেশী হকদার। আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; আর নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।*** (আয়াত নং ২২৮)।

এরপর কুরআনের আলোচনা তালাকপ্রাপ্ত নারীর বিষয়ে স্থানান্তরিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, **"তালাকপ্রাপ্ত নারীরা নিজেদের জন্য তিনটি ঋতু (قروء) অপেক্ষা করবে।"** অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্ত নারীর ইদ্দত (প্রতীক্ষা কাল) হলো তিনটি ঋতুচক্র (حيض ও طهر)। এই সময়সীমা অপেক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহর বাণী **"يتربصن"** (তারা অপেক্ষা করবে) দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এখানে **"قروء"** শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা ঋতু (حيض) ও পবিত্রতা (طهر) উভয় অবস্থাকে নির্দেশ করে। এটি কুরআনের বাচনিক অলৌকিকতার (ইজাজে বায়ানি) একটি দিক যে, একটি শব্দ দুটি অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে। ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেছেন যে, **"তিনটি قروء"** অর্থ তিনটি পর্যায় বা তিনটি পরিবর্তন। তালাকপ্রাপ্ত নারী দুটি অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়: একবার পবিত্রতা থেকে ঋতুতে এবং আবার ঋতু থেকে পবিত্রতায়। এইভাবে শব্দটি ঋতু ও পবিত্রতা উভয় অবস্থাকে নির্দেশ করে, যা শব্দটির ব্যাপকতা ও গভীরতা প্রকাশ করে। ইদ্দতের এই সময়সীমা নির্ধারণের মাধ্যমে ইসলাম ন্যায় ও অধিকার সংরক্ষণের

নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সময় অপেক্ষা করার উদ্দেশ্য হলো গর্ভধারণের সম্ভাবনা নিশ্চিত করা, যাতে বংশ ও বংশগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার জটিলতা বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়। এটি তালাকদাতা স্বামীর অধিকার রক্ষা করে, যদি তার সন্তান থাকে, এবং নতুন স্বামীর অধিকার রক্ষা করে, যাতে তার বংশে অন্য কারো সন্তান প্রবেশ না করে। এই বিধান ইসলামী শরীয়তের ন্যায়পরায়ণতা, সূক্ষ্মতা ও মহত্ত্বকে প্রকাশ করে। এটি বংশ ও সন্তানের পরিচয় সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে এবং শরীয়তের বিধানগুলোর মধ্যে ভারসাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।

বরং তালাকপ্রাপ্ত নারীর জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হলো, যদি তার গর্ভে সন্তান থাকে, তবে তা প্রকাশ করা অবশ্যক। আল্লাহ তাআলা বলেন, **"আর তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে হালাল নয়।"** এই নিষেধাজ্ঞা গর্ভের সন্তান গোপন করা সম্পূর্ণ হারাম করে দেয়। এর মাধ্যমে তালাকদাতা স্বামীর অধিকার সংরক্ষিত হয়, যেমন সন্তানের পিতৃত্বের অধিকার। এছাড়াও, সন্তানের অধিকার সংরক্ষিত হয়, যেমন তার বংশগত পরিচয়, যাতে সে তার পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই ভ্রূণের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তাঁর একক প্রভুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, **"আর তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে হালাল নয়।"** এখানে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, তিনিই গর্ভের সন্তানের স্রষ্টা, স্বামী বা স্ত্রী নন। এটি আমাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টিশক্তি ও জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে শিক্ষা দেয়। তারপর আল্লাহ তাআলা গর্ভের সন্তান গোপন করার বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং মুমিন নারীদেরকে সতর্ক করেছেন, যদি তারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে। এটি তাদেরকে সত্য প্রকাশ করতে এবং আল্লাহর ভয় করতে উদ্বুদ্ধ করে। মুমিন নারীরা আল্লাহ ও আখিরাতের বিশ্বাসের কারণে সত্য গোপন করা থেকে বিরত থাকে, কারণ তারা জানে যে, আখিরাতে প্রতিটি কাজের হিসাব হবে এবং এর জন্য প্রতিদান বা শাস্তি

দেওয়া হবে। এই বিশ্বাস তাদেরকে সত্য প্রকাশ করতে এবং মিথ্যা বা গোপন করা থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। এ থেকে আমরা শিখতে পারি যে, ভালো কাজে উৎসাহিত করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য ব্যক্তির গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে কাজে লাগানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুমিন নারীদের ঈমান ও আল্লাহর ভয় তাদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করে এবং মিথ্যা বা গোপন করা থেকে বিরত রাখে। এটি আমাদেরকে শেখায় যে, ঈমান ও আল্লাহর ভয় মানুষের আচরণ ও নৈতিকতাকে উন্নত করে এবং তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে সাহায্য করে। এই আলোচনা আমাদেরকে শেখায় যে, ইসলামী জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সততা, ন্যায় ও আল্লাহর ভয় অপরিহার্য। এটি আমাদেরকে আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে এবং তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

এরপর আল্লাহ তাআলা স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে ইদ্দতের সময়ের মধ্যে ফিরিয়ে আনার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি বলেন, **"তাদের স্বামীরা তাদের ফিরিয়ে আনার অধিকার রাখে, যদি তারা সদ্ভাব বজায় রাখতে চায়।"** এটি ইসলামী শরীয়তের সহজতা ও আল্লাহর রহমতের প্রকাশ যে, আল্লাহ তাআলা স্বামীকে এই সুযোগ দিয়েছেন যে সে তার স্ত্রীকে ইদ্দতে থাকাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবে। তাছাড়া শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো পরিবারের ঐক্য বজায় রাখা এবং সম্পর্কের উন্নয়নে সহায়তা করা। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্বামীকে **"بعل"** *(বা'ল)* বলে উল্লেখ করেছেন, যা স্বামীর মর্যাদা ও দায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে। **"بعل"** শব্দটি স্বামীর উচ্চ মর্যাদা ও স্ত্রীর উপর তার দায়িত্বের প্রতীক। এই আয়াত স্পষ্ট করে যে, পুনরায় গ্রহণ ও প্রত্যাবর্তনের নিয়ত সংশোধনের ওপর ভিত্তি করে, ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে নয়। আল্লাহ বলেন: **"আর তাদের স্বামীরা তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার অধিক হকদার, যদি তারা সংশোধনের ইচ্ছা রাখে।"** এটি দেখায় যে ইসলামের পদ্ধতি কল্যাণকর নিয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা ক্ষতিকর অভিপ্রায়কে প্রতিহত করে। অতএব, কেউ শুধুমাত্র ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে

ফিরিয়ে নিতে পারবে না। এই বিষয়টি নির্ভর করে তার অন্তরের নিয়তের ওপর, যা একমাত্র সে নিজেই জানে এবং তারও আগে সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ জানেন। এটি কেবল সেই ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব, যেখানে অনুসারীরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে। একজন মুমিন ইসলামী বিধানের মহিমা উপলব্ধি করতে পারে, যা বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিত হয়ে আচরণ ও সম্পর্কের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং সঠিক নিয়মের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়। আল্লাহর বিধান ছাড়া এই ভারসাম্য অর্জন করা সম্ভব নয়। অতএব, সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্য। আয়াতগুলো থেকে প্রাপ্ত ফায়েদাগুলোর অন্যতম হলো: ইসলামি ফিকহে এই বিষয়ে এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম বিধানসমূহে যে সমৃদ্ধ জ্ঞান রয়েছে- আলেমগণ এসব আয়াত ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিল থেকে দাম্পত্য জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলা বহু ফিকহি বিধান উদ্ভাবন করেছেন। যারা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান, তারা ফিকহ ও তাফসিরের গ্রন্থগুলোতে তা খুঁজে নিতে পারেন।

এরপর আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর অধিকার বিষয়ে সাম্যতার নির্দেশনা দিয়েছেন: **"আর তাদের (নারীদের) রয়েছে তাদের দায়িত্বের অনুরূপ ন্যায়সঙ্গত অধিকার"**। অর্থাৎ, যেমন স্বামীর অধিকার রয়েছে, তেমন স্ত্রীরও স্বামীর ওপর অধিকার রয়েছে। উভয়ের একে অপরের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে, তাই প্রত্যেককে তার ওপর অর্পিত অধিকার যথাযথভাবে পালন করতে হবে। এরপর আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন যে, **"তবে পুরুষদের নারীদের ওপর মর্যাদা রয়েছে"**। পুরুষদের এই অতিরিক্ত মর্যাদা তাদের আর্থিক ব্যয়ভার বহন করা এবং পরিবারে নেতৃত্ব ও দায়িত্ব গ্রহণের কারণে। সুতরাং, পরিবার পরিচালনার জন্য একজনকে নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে, যা আল্লাহ পুরুষদের ওপর অর্পণ করেছেন। যেমন সূরা আন-নিসায় আল্লাহ বলেন: **"পুরুষরা নারীদের অভিভাবক, কারণ আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তারা তাদের অর্থ ব্যয়**

করে"। এই মর্যাদা ও দায়িত্ব একটি নিয়ামত, যা পারিবারিক শৃঙ্খলা, সন্তানদের লালন-পালন ও সঠিক দিকনির্দেশনার জন্য অপরিহার্য।

এরপর আল্লাহ এই আয়াতটি শেষ করেছেন তাঁর বাণী দ্বারা: **"আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"**। এটি স্পষ্টভাবে বোঝায় যে, আল্লাহ মহাশক্তিশালী, যাঁর ক্ষমতা ও শক্তি অসীম, যা তাঁর অবাধ্যদের জন্য ভয়ের কারণ। একইসঙ্গে তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়, তাঁর প্রতিটি বিধান ও আদেশ পরিপূর্ণ হিকমতপূর্ণ। আল্লাহর এই গুণাবলী বোঝার মাধ্যমে মানুষের উচিত হবে তাঁর বিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য দেখানো এবং কোনো ধরনের অবাধ্যতা বা আপত্তি না করা। কারণ, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা, যিনি মানুষের অস্তিত্বের প্রতিটি দিক সম্পর্কে তার নিজের চেয়েও অধিক জ্ঞাত।

﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠﴾

অর্থ: **[তালাক দু'বার। অতঃপর বিধি মোতাবেক রেখে দেবে কিংবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে। আর তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু নিয়ে নেবে। তবে উভয়ে যদি আশঙ্কা করে যে, আল্লাহর সীমারেখায় তারা অবস্থান করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না তাহলে স্ত্রী যা দিয়ে নিজকে মুক্ত করে নেবে তাতে কোন সমস্যা নেই। এটা আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যে আল্লাহর সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করে, বস্তুত তারাই যালিম।* অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে সে স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে সংগত না হবে। অতঃপর সে (দ্বিতীয় স্বামী) যদি তালাক দেয় আর তারা উভয়ে (স্ত্রী ও প্রথম স্বামী) মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে তবে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোন অপরাধ হবে না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, যা তিনি স্পষ্টভাবে এমন কওমের জন্য বর্ণনা করেন, যারা জানে।]** (আয়াত নং ২২৯-২৩০)

অতঃপর প্রসঙ্গটি তালাক ও এর শিষ্টাচার ব্যাখ্যার দিকে চলে যায়— **"তালাক দুবার"**। আল্লাহ তাআলা ইদ্দতকাল থাকা অবস্থায় একবার এবং দুবার ফিরে আসার অনুমতি দিয়েছেন এবং তৃতীয়বারের ক্ষেত্রে বাইন তালাকের বিধান দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন— **"অতঃপর বিধি মোতাবেক রেখে দেবে অথবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে।"** এটাই হলো প্রত্যাবর্তন ও ফিরে আসার কিংবা চূড়ান্ত বিচ্ছেদের নিয়ম। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা হলো— প্রথম তালাকের পর পুনরায় চিন্তা ও পর্যালোচনার সুযোগ দেওয়া হয়, অতঃপর দ্বিতীয়বারও সুযোগ দেওয়া হয়,

যাতে তৃতীয়বারের দিকে অগ্রসর না হয়। কেননা তালাকের বিষয়ে ইতিপূর্বে দুবার পর্যবেক্ষণ ও পুনর্বিবেচনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এটি তাদের জন্যও একটি সুযোগ, যারা এই সম্পর্কটি সর্বোত্তম উপায়ে সমাপ্ত করতে চায়নি। ফলে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও উত্তম আচরণ ও শিষ্টাচার বজায় রাখা সম্ভব হয়, যা অধিক দয়া ও ন্যায়বিচারের অন্তর্ভুক্ত। এটি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণে স্বামীর ওপর সাত আসমানের ওপার থেকে আরোপিত এক মহান দায়িত্ব।

অতঃপর, যদি স্বামী নিয়ম অনুযায়ী সহৃদয়তার সঙ্গে স্ত্রীকে রাখে, তাহলে তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে, ভালো ব্যবহার করবে এবং জীবনযাপনে সৌজন্য বজায় রাখবে। এর মাধ্যমে সত্য ও সম্পর্কের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। অথবা, সে যদি সহৃদয়তার সঙ্গে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে, তবুও তা হতে হবে ন্যায়সঙ্গত ও সুসংগত উপায়ে। **"ইহসান"** শব্দটি এমন প্রতিটি সৌন্দর্য ধারণ করে, যা কেবল জুলুম প্রতিহত করেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এতে আরও তিনটি উন্নত চারিত্রিক গুণের সমন্বয় রয়েছে— **১.** জুলুমকে প্রতিহত করা, কেননা জুলুম ইহসানের পরিপন্থী। **২.** স্ত্রীকে তার বস্তুগত ও নৈতিক সকল অধিকার প্রদান করা, যা ইহসানের অংশ। **৩.** সদয়ভাবে স্ত্রীকে অতিরিক্ত বস্তুগত ও নৈতিক সুবিধা দেওয়া, যা পরিপূর্ণ ইহসানের প্রকাশ।

এখান থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর বিধান ইহসান, দয়া, ন্যায়বিচার এবং সত্যকে চেনার উপায় ও অনিষ্ট দূর করার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই স্বামী-স্ত্রী উভয়কে এমন আচরণ ও গুণাবলী ধারণ করতে বলা হয়েছে, যা এই মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক হয়। এটি সন্তানদের মানসিক ও চারিত্রিক স্থিতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। কারণ, সন্তানরাই পরিবারের ধারাবাহিকতা বহন করে এবং তারা সেসব নিয়মনীতি অনুসারে বেড়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে তাদের পারিবারিক জীবনের ভিত্তি গড়ে তোলে। যেহেতু

একটি পরিবার থেকেই বহু পরিবার গড়ে ওঠে, তাই মূল পরিবার থেকেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মূল্যবোধের প্রসারণ ঘটে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, আল্লাহ তাআলা স্ত্রীর সঙ্গে সহবস্থান করার ক্ষেত্রে সমস্ত কল্যাণকর স্বভাবকে একটি শব্দের মাধ্যমে একত্রিত করেছেন; তা হলো (مَعْرُوف –"নিয়মানুযায়ী সদাচরণ")। তেমনিভাবে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রেও সমস্ত কল্যাণকর স্বভাবকে একত্রিত করেছেন একটি শব্দের মাধ্যমে; তা হলো (إِحْسَان – "সহৃদয়তা")। ফলে এই দুটি শব্দের ব্যাপক অর্থব্যাপ্তির মাধ্যমে চারিত্রিক সমস্ত উদ্দেশ্য ও গুণাবলী একীভূত করা হয়েছে। এটাই পবিত্র কোরআনের বিস্ময়কর অলংকারিক সৌন্দর্য এবং এর উন্নত নৈতিক শিক্ষা।

অতঃপর, আল্লাহ তাআলা স্বামীকে আদেশ করেছেন যেন সে স্ত্রীর অধিকারে সীমালঙ্ঘন না করে। আল্লাহ বলেন, **"আর তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু নিয়ে নেবে।"** এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা স্বামীর জন্য স্ত্রীর মহর থেকে কিছু নেওয়াকে হারাম করেছেন। **"হালাল নয়"**— এই শব্দটি বোঝায় যে, মহর স্ত্রীর বৈধ অধিকার এবং এটি তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রদান করতে হবে। সুতরাং, এই অধিকার লঙ্ঘন করা জায়েয নয়। স্ত্রীর মহর থেকে কিছু নেওয়া বাড়াবাড়ি ও অন্যায় এবং এটি স্পষ্টত হারাম। এটি ইসলামী আইনের সূক্ষ্ম বিচারিক নীতির মাধ্যমে স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণের একটি মহান দৃষ্টান্ত।

অতঃপর, আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের বিষয়টিকে এমনভাবে পৃথক করেছেন যাতে কোনো পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা অন্যায়ভাবে ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। আল্লাহ বলেন, **"তবে উভয়ে যদি আশঙ্কা করে যে, আল্লাহর সীমারেখায় তারা অবস্থান করতে পারবে না..."** এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বামী-স্ত্রীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ

নির্দেশনা। যদি স্বামী-স্ত্রী এমনভাবে আশঙ্কা করে যে, তাদের প্রবল ধারণা হয়— তারা একে অপরের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে পারবে না, তাহলে আল্লাহ তাআলা এর প্রতিকার দিয়েছেন তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে, **"সুতরাং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না তাহলে স্ত্রী যা দিয়ে নিজকে মুক্ত করে নেবে তাতে কোন সমস্যা নেই।"** এটি সুবিবেচক, নেককার ও মধ্যপন্থিদের জন্য কল্যাণের বার্তা। এরপর, আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, স্ত্রীর জন্য তার মুক্তিপণ বা বিনিময় দেওয়া বৈধ, যেমনটি স্বামীর জন্য তা গ্রহণ করাও অনুমোদিত। একে ইসলামী শরিয়তে **"খুলা"** বলা হয়। এখান থেকে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এই বিধান বাস্তবায়নের ওপর ভিত্তি করে টিকে থাকে। এটি বাস্তবায়নই নির্ধারণ করে সম্পর্ক চলমান থাকবে নাকি বিচ্ছিন্ন হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার সক্ষমতা থাকে, ততক্ষণ সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে; অন্যথায় এটি অকারণে টিকিয়ে রাখা উচিত নয়।

আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা এমন এক স্থান, যেখানে বান্দার থেমে যাওয়া আবশ্যক, এবং এটি লঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ। এই সীমারেখা অন্তর্ভুক্ত করে— আদেশ, নিষেধ, ফরজ, অধিকার, ওয়াজিব ও দায়িত্ববোধ। এখান থেকে এ শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, পরিবারের প্রতিষ্ঠা, এর কাঠামো, চলমানতা কিংবা স্থবিরতা— সবই আল্লাহ তাআলার সূক্ষ্ম ঐশী তত্ত্বাবধানে বেষ্টিত। এটি একজন মুসলিমের জন্য শিক্ষা দেয় যে, সে যেন আল্লাহর সৃষ্ট প্রতিটি বিধান ও সম্পর্ক যথাযথ সম্মানের সঙ্গে পরিচালনা করে।

শাব্দিক অর্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এখানে সম্বোধনটি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত। আল্লাহ বলেন— **"কিন্তু যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই আশঙ্কা করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করতে পারবে না..."** এই আয়াত এমন এক সূক্ষ্ম ও ব্যক্তিগত বিষয়ে নির্দেশ করে, যা কেবল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই

বিদ্যমান, অন্য কেউ তা জানে না। বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে তাদের দুজনের অভ্যন্তরীণ উপলব্ধির ওপর নির্ভরশীল। এখান থেকে এ শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, যদি তাদের পূর্ববর্তী জীবন, পারস্পরিক জানাশোনা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা প্রবলভাবে ধারণা করে যে, তারা আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত বিধান যথাযথভাবে পালন করতে পারবে না এবং তাদের দাম্পত্য জীবনে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, তাহলে তাদের পৃথক হয়ে যাওয়াই উত্তম।

অতঃপর, আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা তাঁর বিধান লঙ্ঘন না করে। তিনি বলেন—**"এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না।"** এই আয়াতে প্রথমে আল্লাহ তাআলা তাঁর নির্ধারিত সীমারেখার কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর, সেই সীমা লঙ্ঘন করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা আয়াতের প্রকাশভঙ্গিতে একটি সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়— প্রথমে সীমারেখার উল্লেখ, এরপর তা লঙ্ঘন করা থেকে সতর্ক করা।

সীমারেখা বলতে বোঝায়— মহান রবের নির্ধারিত বিধান, যা অন্তর্ভুক্ত করে আদেশ, নিষেধ, ওয়াজিব, অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই সীমারেখা বর্ণনা করেছেন এবং স্বামী-স্ত্রীর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন এই সীমার মধ্যে থেকে চলে, তা যথাযথভাবে পালন করে এবং কোনো প্রকার বৈপরীত্য, গাফিলতি কিংবা বাড়াবাড়ির মাধ্যমে এর লঙ্ঘন না করে। যদি কেউ এই সীমা অতিক্রম করে, তবে সে নিজেকে এবং অপর পক্ষকে জুলুম করল। আল্লাহ বলেন, **"বস্তুতঃ যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই জালিম।"** সুতরাং, যে ব্যক্তি হারামের দিকে যাওয়ার জন্য হালালের সীমা লঙ্ঘন করে, ওয়াজিব আদায়ে গাফিলতি করে এবং মন্দের দিকে ধাবিত হয়, সে নিঃসন্দেহে জালিম এবং শাস্তির যোগ্য। এটি প্রমাণ করে যে জুলুম করা হারাম। কারণ, আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে সীমা লঙ্ঘনকারীকে "জালিম" নামে অভিহিত করেছেন। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে নিরাপত্তা ও সঠিক দিকনির্দেশনা (তাওফিক) প্রার্থনা করছি।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা **তালাক-এ-বাইন** এর ক্ষেত্রে তালাকপ্রাপ্ত নারীর, তালাকদাতা স্বামীর নিকট ফিরে আসার বিধান বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন **"অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে সে স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।"** অর্থাৎ, যখন **তালাক-এ-বাইন** সংঘটিত হয়, তখন স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায় এবং স্বামীর কাছে ফিরে আসার বৈধতা থাকে না। তবে, আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আরও বলেন— **"যতক্ষণ না সে স্ত্রী অন্য কোনো স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।"** অর্থাৎ, যদি ওই স্ত্রী অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করে, অতঃপর দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেয় বা মারা যায়, তাহলে প্রথম স্বামীর সঙ্গে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে। আল্লাহ বলেন—" **অতঃপর সে (দ্বিতীয় স্বামী) যদি তালাক দেয় আর তারা উভয়ে (স্ত্রী ও প্রথম স্বামী) মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে তবে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোন অপরাধ হবে না।"** এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, দ্বিতীয় স্বামী যদি তালাক দেয়, তবে প্রথম স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের প্রতি আগ্রহী হলে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

"তাদের ফিরে আসা" শব্দের মাধ্যমে উভয়ের একত্রিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। তবে, এটি শর্তসাপেক্ষ— "যদি তারা আল্লাহর বিধান মেনে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।" অর্থাৎ, শুধুমাত্র দাম্পত্য জীবনের প্রতি আকর্ষণই বিবাহের ভিত্তি নয়; বরং এটি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার বাস্তবায়ন উত্তম জীবনের পাথেয়, মজবুত পরিবারের শক্ত ভিত্তি এবং আল্লাহ তাআলার দেওয়া সন্তানদের হেফাজতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এছাড়াও, এটি বৈবাহিক অধিকারের মর্যাদা ও গুরুত্ব বোঝায়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আল্লাহর বিধান অনুসরণে সমানভাবে আদিষ্ট, একে অপরের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না, বরং উভয়ের অধিকার আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আল্লাহ নিজ দয়া ও রহমতে বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য শরয়ী নীতিমালা ও বিধান নির্ধারণ করেছেন, যাতে দাম্পত্য জীবন সুস্থ, সুশৃঙ্খল ও কল্যাণকর হয়। এখান থেকে আরও বোঝা যায় যে, যদি স্বামী-স্ত্রীর প্রবল ধারণা হয় যে তারা আল্লাহর বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে না, তবে তাদের পুনর্মিলনের চেষ্টা করা বৈধ নয়। এর কারণ হলো, যদি তারা পুনরায় একত্রিত হয় এবং আগের মতো কলহ ফিরে আসে, তবে তা উভয়ের জন্যই কষ্টদায়ক হবে এবং দাম্পত্য জীবনের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—**"তাহলে তাদের উভয়ের পুনরায় বিয়ে করাতে কোনো পাপ নেই, যদি তারা আল্লাহর বিধান মেনে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।"** এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রবল ধারণাকে ভিত্তি হিসেবে নেওয়া যায়। যদি কোনো বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব না হয় এবং সেখানে কেবল প্রবল ধারণাই থাকে, তবে সেটিই গ্রহণযোগ্য হবে। ইসলামের নিয়ম হলো— সন্দেহকে পরিহার করা এবং নিশ্চিত বিষয়ের ওপর নির্ভর করা। উদাহরণস্বরূপ: যদি কোনো মুসলিম অজু করে এবং পরে সন্দেহ হয় যে, তার অজু ভেঙেছে কি না— তবে ইসলামী নীতিমতে, অজু আছে ধরে নেওয়া হবে। মূল অবস্থাকে (যে সে অজু করেছে) গ্রহণ করা হবে এবং সন্দেহকে বাতিল করা হবে। এভাবে, সন্দেহের পরিবর্তে প্রবল ধারণা অনুসরণ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি, যা মুসলিমদের বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে।

অতঃপর আয়াতটি শেষ হয় আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মাধ্যমে: "**এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, যা তিনি স্পষ্টভাবে এমন কওমের জন্য বর্ণনা করেন, যারা জানে।**" এটাই বিবাহ, জীবনযাপন ও তালাকের বিষয়ে আল্লাহ তাআলার বিধান, যা আমাদের রব তাবারকা ও তাআলা বর্ণনা করেছেন। এটি এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব এবং এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন জোরদার করে, পাশাপাশি এর সীমা লঙ্ঘন না করাকেও গুরুত্ব দেয়। কেননা আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে তা বর্ণনা করেছেন। ***(যারা জানে তাদের জন্য)***— অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা ও জানার সেই উপাদানসমূহ, যার দ্বারা তাদের ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যখন আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন জ্ঞান-বুদ্ধির সক্ষমতা দিয়েছেন, যার দ্বারা তিনি যা ফরজ করেছেন, সে সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর জন্য বিধান বর্ণনা করেছেন, তখন তারা সে সম্পর্কে আর অজ্ঞ থাকতে পারে না। এ বিষয়ে আমল করাও ওয়াজিব করেছেন। এটি এই ফায়দা দেয় যে, স্বামী-স্ত্রীর ওপর বৈবাহিক দায়িত্ব-কর্তব্য জানা আবশ্যক। কারণ তা আদায় করা সম্ভব নয়, যদি তা জানা না থাকে। বরং তাদের জন্য তা জানা ওয়াজিব, যাতে করে আল্লাহ তাআলা যেভাবে ফরজ করেছেন, ঠিক সেভাবেই তারা তা পালন করতে পারে। এটি এই ফায়দাও দেয় যে, স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জানা এবং তা মেনে চলা ও যথাযথভাবে আদায়ের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সে সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। যাতে তারা জালেম না হয়। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা পূর্ববর্তী আয়াতের পূর্ণতায় বর্ণনা করেছেন: "আর যারা তার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে, তারাই জালেম।" *(*বস্তুতঃ যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই জালেম।*)* আর আল্লাহ তাআলার এই বাণী— "আর এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা জানে, তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়।" এটি ঐ সকল সীমারেখা সম্পর্কে জানা ফরজ হওয়ার ফায়দা প্রদান করে।

﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٣١﴾

অর্থ: **[আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছে যাবে তখন হয়তো বিধি মোতাবেক তাদেরকে রেখে দেবে অথবা বিধি মোতাবেক তাদেরকে ছেড়ে দেবে। তবে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখো না। আর যে তা করবে সে তো নিজের প্রতি যুলম করবে। আর তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে উপহাসরূপে গ্রহণ করো না। আর তোমরা স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহর নিআমত এবং তোমাদের উপর কিতাব ও হিকমত যা নাযিল করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।]** (আয়াত নং: ২৩১)

আল্লাহ তায়ালা তালাকের আদব ও পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: **(আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছে যাবে)**। এই বাক্য **(অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছে যাবে)** এই ফায়েদা দেয় যে, এখানে তালাকপ্রাপ্তার জন্য নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। আর এটি তালাকে "রেজঈ" এর ক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বারের জন্য। কেননা এর জন্য একটি সময় নির্ধারিত আছে, আর তা হলো ইদ্দত। ফলে এখানে দুটি পছন্দের স্বাধীনতা রয়েছে— হয় তালাকপ্রাপ্তার প্রত্যাবর্তন অথবা তাকে ছেড়ে দেওয়া। আর এই দুই পছন্দের কিছু আদব ও দায়িত্ব রয়েছে, যা স্বেচ্ছামূলক নয়।

আল্লাহ বলেন: **(তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও অথবা সহানুভূতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও)**। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ। তাই দায়িত্ব-কর্তব্যসহ বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার নিয়ত ও লক্ষ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে, আর এটি হলো নিয়ম অনুযায়ী রেখে দেওয়া। অথবা কোনো ধরনের ক্ষতি সাধন ছাড়া তাকে ছেড়ে দিতে হবে, আর এটি হলো সহানুভূতির সাথে মুক্ত করা। উভয় অবস্থাতেই তিরস্কার ও ক্ষতি সাধন করা যাবে না। প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে তার ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায় রাখা যাবে না। আল্লাহ বলেন: (আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না)। ফলে সীমালঙ্ঘন ও কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, তাকে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে সময়ক্ষেপণ করা অথবা অন্য কোনো খারাপ উদ্দেশ্য থাকা। এরপর তাবারকা ও তায়ালা ঐ ধরনের ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে, সে মূলত নিজের ওপরই জুলুমকারী। (যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে)।

ফলে আল্লাহর ফরজ বিধানে সীমালঙ্ঘনকারী তার স্ত্রীর প্রতি জুলুম করার কারণে নিজের প্রতিও জুলুমকারী হয়ে যায়। ফলে সে দুটি জুলুমে পতিত হয়— তার স্ত্রীর প্রতি জুলুম এবং নিজেকেও জুলুমের মধ্যে ফেলে দেওয়া। যার দরুন তার ওপর আল্লাহর শাস্তি পতিত হয়। তার নিজের প্রতি জুলুমেরও এখানে একটি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা সে তার তালাকপ্রাপ্তার প্রতি জুলুমের বাস্তবায়নকারী, কিন্তু মূলত এটি এমন এক জুলুম যা তাকে আল্লাহ তায়ালার আযাবে পতিত করবে। সে হয় এ বিষয়ে জ্ঞাত থেকেও ভুলের ভান করছে অথবা প্রকৃতপক্ষে ভুল করছে।

আর এই স্থানে মহিমান্বিত আয়াতগুলোর ভাষ্য গভীরভাবে চিন্তাশীল ব্যক্তি লক্ষ করবে যে, তা স্বামীকে সম্মোধনকারী। তার অভিভাবকত্ব, দায়িত্বভার বহন, এবং তার (স্ত্রীকে) রাখা বা ত্যাগ করার নিয়ত—যা সে ছাড়া অন্য কেউ জানে না—সেই দৃষ্টিকোণ থেকে। তবে আল্লাহ তাআলা ইতোপূর্বেই তার নিয়ত সম্পর্কে অবগত। সুতরাং সম্মোধন ও সতর্কবাণী তার দিকেই। অনুরূপভাবে শাস্তিও তার জন্যই প্রযোজ্য। অতঃপর আল্লাহ

তাআলা অভিভাবকত্বের দায়িত্ব যার উপর অর্পিত হয়েছে, তাকে সম্মোধন করেই এই বিষয়ের সমাধান দিয়েছেন। যদি কেউ এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, তবে যাকে সম্মোধন করা হয়েছে সে তার প্রতি লজ্জিত হতো এবং তার ইচ্ছা বুঝতে পারতো। আর তিনি (আল্লাহ) এই সহধর্মিণীকে তার জন্য প্রশান্তির উৎস ও অনুগত করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাকে মর্যাদা দান করেছেন, তার এই নিয়ামত ও মর্যাদার আনুগত্য করাই একান্ত আবশ্যক।

এভাবে এই দুটি বাক্যের সংক্ষিপ্ত অলংকারিক তাৎপর্য হলো: প্রথমত, 'বিধি মোতাবেক রেখে দাও' এবং দ্বিতীয়ত, 'বিধি মোতাবেক বিদায় করো'। ফলে বাক্যদ্বয় পরস্পর বিপরীতমুখী- রাখা বনাম ত্যাগ করা। কিন্তু উভয় বাক্য দয়ার ফজিলতের ব্যাপারে একীভূত হয়েছে এবং একই অনুগ্রহ সঞ্চয় করেছে, তা হলো—রাখা হোক বা ত্যাগ করা, উভয় ক্ষেত্রে দয়া প্রদর্শন। অনুরূপভাবে 'অনুগ্রহ' শব্দটি সমস্ত কল্যাণের বৈশিষ্ট্যকে একত্রিত করেছে; ওয়াজিব ও মুস্তাহাব এবং যেখানে অধিকতর কল্যাণ নিহিত রয়েছে সে সম্পর্কে ইঙ্গিত বহন করে। অলংকারিক দৃষ্টিকোণে 'ক্ষতিসাধন' শব্দটির স্তর বা প্রকার সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, যাতে এটি সব ধরনের ও মাত্রার ক্ষতিকে ধারণ করতে পারে। ফলে স্বামী তার মানসিক প্রবণতা বা ক্ষতিসাধনের ন্যূনতম স্তরেও আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে। আল্লাহ কত মহান, যার বাণী তার সমস্ত উদ্দেশ্যকে পরিব্যাপ্ত করে! তিনি স্বামীর অভিভাবকত্বের হক সংরক্ষণ করেন, স্ত্রীর হক সংরক্ষণ করেন—তার স্বামীর গৃহে জীবনযাপনের সকল ক্ষেত্রে।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর আয়াত নিয়ে হেলাখেলা করতে নিষেধ করেছেন: 'আর তোমরা আল্লাহর নির্দেশকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করো না।' এই নিষেধাজ্ঞা ওয়াজিব হওয়ার দাবিদার এবং এটি মানুষকে আল্লাহর আয়াত অমান্যের স্পর্ধা থেকে সতর্ক করে। যে ব্যক্তি শরিয়ত ও বিধান প্রাপ্ত হয়েও তা অনুযায়ী আমল করে না, সে

যেন তার প্রতি উপহাসকারী, যেন তা তার নিকট তুচ্ছবোধ হয়। এটি একটি সতর্কতামূলক নিষেধ, যা ইঙ্গিত দেয় যে, যারা এটিকে ঠাট্টার বিষয় বানায়, তারা নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে তাআলার অবাধ্য হয় এবং শাস্তির যোগ্য হয়। 'ইসতিহযা' (ঠাট্টা) শব্দটি সেই মুসলিমকে সতর্ক করে যারা আল্লাহর আয়াত মান্য করে না—যেসব আয়াত অন্তরে ধারণ, আনুগত্য ও বাস্তবায়নে সম্মান করা আবশ্যক। এরপর নিয়ামতের মর্যাদা ও মূল্য গভীরভাবে উপলব্ধির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: 'আর স্মরণ করো তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতসমূহ'—তা ইসলামের নিয়ামত হোক, জীবনসঙ্গিনীর অনুগত করণ হোক, বা বিধানসমূহের নিয়ামত যাতে দয়া ও রহমত নিহিত। আয়াতে উপদেশ ও এসব নিয়ামত স্মরণের আদেশ রয়েছে, যা কৃতজ্ঞতাকে অপরিহার্য করে। আর কৃতজ্ঞতা প্রশংসা, আনুগত্য ও নিয়ামতের হিফাজতকে আবশ্যক করে—যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

আল্লাহর বাণী 'আর স্মরণ করো তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতসমূহ'-এ সমগ্র নিয়ামত অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর এর কিছুকে বিশেষায়িত করা হয়েছে পরিস্থিতির প্রাসঙ্গিকতায়: 'যে কিতাব ও জ্ঞান তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে'—এটি আল-কুরআনুল কারিম ও রাসূলের সুন্নাত, যাতে রয়েছে বিধান প্রবর্তন ও মানবজীবনের সুসংহত বর্ণনা: ইবাদত, আকিদা, আহকাম; সমাজ, সন্তান, সম্পদ ও পরিবার-সংক্রান্ত বিধান, এমনকি ব্যক্তি, সমাজ, শাসক, শাসিত ও সকল পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও।

সুতরাং উপদেশ—যার মাধ্যমে সম্বোধিত ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করে, তাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে উৎসাহ ও সতর্কবাণী, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, বিধানাবলি, আদেশ-নিষেধ, অনুপ্রেরণা, হিকমাহর বিবরণসহ অন্যান্য বিষয়; যা থেকে সম্বোধিত ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণ করে। এটি বক্তব্য ও শিক্ষাদানের পর দাওয়াত ও শিক্ষার ক্ষেত্রে উপদেশের

গুরুত্ব তুলে ধরে, যাতে দাওয়াত ও শিক্ষার প্রক্রিয়া আত্মার অন্তরালে উপদেশের মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। এটি হৃদয়কে স্পর্শ করে। মানুষের জন্য সর্বোত্তম উপদেশের উৎস হলো আল্লাহ তাআলার কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ। এ দুটিতে পরিপূর্ণ উপদেশবাণী নিহিত রয়েছে। এছাড়া এটি আচরণ নিয়ন্ত্রণে উৎসাহ-সতর্কতা, নিয়ামতদাতার নিয়ামত স্মরণের তাৎপর্যকেও নির্দেশ করে। কেননা এটি উচ্চাভিলাষী আত্মাকে দমিয়ে দেয়—বিশেষত ঐ ব্যক্তির সামনে যে নিয়ামত ভোগ করেও তা ভুলে যায়; যাতে সে সঠিক পথে ফিরে আসে। এমন ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন একজন স্মরণ করিয়ে দেওয়াকারীর, যে তাকে জাগ্রত করবে।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা আয়াতটি তাকওয়ার নির্দেশ দিয়ে সমাপ্ত করেছেন: **"আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।"** কারণ যে তাকওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে রক্ষা ও সাহায্য করবেন। এরপর মহান প্রতিপালক সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের মাধ্যমে সতর্ক করেছেন: **"আর জেনে রাখো, আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সম্যক অবগত।"** যিনি সবকিছু জানেন, সেখানে বাহ্যিক আমল তো দূরস্থ, নিয়তের ভালো-মন্দও তাঁর কাছে গোপন নয়। এভাবে এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ভয়কে অপরিহার্য করে তোলে—যা তাঁর আনুগত্য ও অবাধ্যতা পরিহারের দাবি রাখে।

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢﴾

অর্থ: *[***আর তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, এরপর তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তবে স্ত্রীরা নিজেদের স্বামীদের বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না। এ দ্বারা তাকে উপদেশ দেয়া হয় তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে, এটাই তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।*]* (আয়াত নং: ২৩২)

তালাক এবং প্রত্যাবর্তনের আলোচনা এখনো চলমান। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"আর তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে..."** এখানে একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে: যদি কোনো মহিলার তালাক সম্পন্ন হয়ে যায়—তা এক তালাক হোক বা দুই তালাক (যা প্রথম বা দ্বিতীয় তালাক)—এবং তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, তখনই স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার উক্তি **"তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে"** এই বিষয়টির ওপর জোর দেয়, যেখানে বিবাহ সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান রয়েছে। এতে স্বামী ও স্ত্রীকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেন স্বামীর প্রতি এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয় যে, তালাকের পর তারা যদি বিধি মোতাবেক পরস্পর সম্মত হয়, তবে পরিবারের কেউ তাদের পুনর্মিলনে বাধা দিতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"এরপর তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তবে স্ত্রীরা নিজেদের স্বামীদের বিষয়ে যা করতে চায়, তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না।"** অতএব, আল্লাহ তাআলা পরিবারকে এই বিষয়ে বাধা দেওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। পরিবারের সদস্যরা যেন স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন প্রতিহত না করে, তাদের সংকটে না ফেলে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি না করে, যদি তারা পরস্পরের প্রতি ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং শরিয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী পুনর্মিলনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে পারিবারিক কাঠামোর ভিত্তি হলো সহাবস্থান ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা।

আর যখন কোনো কারণে দাম্পত্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিস্থিতি আসে, তখনও ইসলামের উদ্দেশ্য থাকে পারিবারিক বন্ধন সংরক্ষণ করা। সুতরাং, অভিভাবকদের দায়িত্ব হলো এই গঠনমূলক প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করা, যেন তা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উপযুক্ত হয় এবং তিনি এতে খুশি হন।

তেমনিভাবে, এই বার্তা ও বর্ণনা মহিলাদের বিষয়ে অভিভাবকদের ওপর যে সকল দায়-দায়িত্ব আবশ্যক, সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে উপদেশ প্রদান করে। ***"(এ দ্বারা তাকে উপদেশ দেওয়া হয়)"***— অর্থাৎ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে এই দায়িত্ব পালন করা ঈমানের নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা বলেন*:* ***"(এ দ্বারা তাকে উপদেশ দেওয়া হয়— তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে)"*** সুতরাং, এই বিধান ও উপদেশ মান্য করা একদিকে আনুগত্যের প্রমাণ, অন্যদিকে আখেরাতের দিনে প্রতিদানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের নির্দেশক। এতে এমন ফলাফল রয়েছে যা হিসাব ও প্রতিদানের বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। বস্তুত উপদেশ প্রদান করা হয় বিধান ও প্রত্যাবর্তনের *(*পুনর্মিলনের*)* পদ্ধতি বর্ণনার মাধ্যমে। এটি তখনই মর্যাদাবান হয়, যখন ঈমানের ভিত্তিতে ফলাফল ও পরিণতির কথা স্মরণ করানো হয়। এ থেকে বোঝা যায়, ইসলামে পরিশুদ্ধি, শিষ্টাচার, শিক্ষাদান ও দাওয়াতের পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, ঈমানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ব্যতীত জ্ঞানগর্ভ বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না। এটি একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা ও বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। এর একটি বাস্তব উদাহরণ হলো আবু বাদাহ *(*রা.*)*-এর তালাকের ঘটনা, যা এই আয়াত নাজিল হওয়ার পটভূমিতে বর্ণিত হয়েছে। মাকাল ইবনে ইয়াসার *(*রা.*)*-এর বোন আবু বাদাহ *(*রা.*)*-এর অধীনে ছিলেন। পরে তিনি তাকে তালাক দেন, এমনকি তার ইদ্দতও শেষ হয়ে যায়। এরপর তিনি অনুতপ্ত হন এবং পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব দেন। মহিলাটিও এতে সম্মত হন। কিন্তু তার ভাই মাকাল ইবনে ইয়াসার *(*রা.*)* এতে বাধা দেন এবং

বলেন: **"আমার চেহারা তোমার জন্য হারাম যদি তুমি তাকে পুনরায় বিবাহ করো।"** এরপর এই আয়াত কারিমা নাজিল হয়। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন মাকাল (রা.)-কে ডেকে বললেন: **"যদি তুমি মুমিন হও, তবে তোমার বোনকে আবু বাদাহ (রা.)-এর নিকট বিবাহ দিতে বাধা দিও না।"** এরপর মাকাল ইবনে ইয়াসার (রা.) বললেন: **"আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।"** এবং তারপর তিনি তার বোনকে আবু বাদাহ (রা.)-এর সাথে পুনরায় বিবাহ দিয়ে দেন।

এরপর আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক শিক্ষা প্রদান করেন এবং তা অনুসরণ করার আদেশ দেন: **"(এটাই তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম)"** এটাই সেই বিধান, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাবারাকা ও তাআলা দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং যা সর্বোত্তম ও সর্বাধিক পবিত্র। তবে আয়াতের বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত হয়নি। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও উল্লেখযোগ্য, তা হলো—স্ত্রীর কল্যাণের জন্য তার স্বামীর কাছে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় ক্রোধ, অহংকার এবং প্রতিশোধের মনোভাব প্রাধান্য লাভ করে, যা এই প্রচেষ্টাকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে। সুতরাং, শরিয়তের এই বিধানই অধিকতর উত্তম, পবিত্রতম ও শুদ্ধতম, বিশেষ করে তখন, যখন মানুষের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ভুল ও ত্রুটির শিকার হয়। অতএব, আল্লাহ তাআলার এই বাণী: **"(এটাই তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম)"**—এই বিধান ও তার নির্দেশনার প্রতি ইঙ্গিত করে, যা সম্পূর্ণরূপে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত।

এর সাথে, স্বামী-স্ত্রীর জন্য এই বিধানে রয়েছে পবিত্রতা, যা তাদের জীবনের উত্তম মর্যাদা নির্ধারণ করে—যতক্ষণ তারা সৎভাবে জীবন পরিচালনার নীতি অনুসরণ করে। এতে আরও রয়েছে বিচ্ছেদের কারণগুলো থেকে মুক্ত থাকার শিক্ষা। সন্তানদের জন্য এটি কল্যাণকর, কারণ তারা তাদের পিতা-মাতাকে একই ছাদের নিচে পেয়ে

সঠিক দিকনির্দেশনা লাভ করে। এটি পুরো পরিবারের জন্যও অধিকতর পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করে এবং তাদের সকল ত্রুটি ও ঘাটতি থেকে মুক্ত রাখে। তবে, কখনো কখনো এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যেখানে পুনর্মিলনের পথ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ থেকে বোঝা যায়, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর স্পষ্ট উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও কোরআন ও হাদিসের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে উপকারের ব্যাপকতা অনুধাবন করা সম্ভব। যেমনটি ইতিপূর্বে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, তাঁর অস্তিত্ব, সম্মান ও দয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

সাধারণভাবে এই বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো: পরিবার গঠন ও পারিবারিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে কোরআনুল কারিমে দিকনির্দেশনা প্রদান। কখনো বিচ্ছেদের পরে পুনর্মিলনের গভীর আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়, কারণ তালাকপ্রাপ্তরা ফিরে আসার ইচ্ছা, অনুশোচনা ও আফসোস অনুভব করে। এই আগ্রহ তাদের সৎভাবে জীবন পরিচালনার প্রতি আরও দৃঢ় করে তোলে। আর যেহেতু মানুষ ভুল করতে পারে, আবেগপ্রবণ হয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সময়ের সাথে সাথে তার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে, তাই সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় শরীয়ত প্রণেতা দ্বিতীয়বার সংশোধনের সুযোগ দিয়েছেন। অন্যদিকে, বিবাহিত দম্পতিদের জন্যও এমন একটি সুযোগ রাখা হয়েছে, যেখানে তারা যদি পরস্পরকে গ্রহণ করতে না পারে বা মতৈক্যে না পৌঁছায়, তাহলে দয়া ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সম্মানজনকভাবে পৃথক হতে পারে। এতে সম্পর্কের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, যদিও তার স্থায়িত্ব সীমিত হয়।

﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣﴾

অর্থ: ***[আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার উপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মাদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা। সাধ্যের অতিরিক্ত কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় না। কষ্ট দেয়া যাবে না কোন মাকে তার সন্তানের জন্য, কিংবা কোন বাবাকে তার সন্তানের জন্য। আর ওয়ারিশের উপর রয়েছে অনুরূপ দায়িত্ব। অতঃপর তারা যদি পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে তাদের কোন পাপ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে অন্য কারো থেকে দুধ পান করাতে চাও, তাহলেও তোমাদের উপর কোন পাপ নেই, যদি তোমরা বিধি মোতাবেক তাদেরকে যা দেবার তা দিয়ে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।]*** (আয়াত নং: ২৩৩)

অতঃপর কোরআনের বর্ণনা নবজাতক সন্তানদের বিষয়ে ধাবিত হলো, যা বিবাহের ফলাফল এবং অন্তরের সাথে তার ভালোবাসা জড়িত। ফলে এ বিষয়ে পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু, আলিমুল গায়েব, তাঁর প্রিয় গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন: **"আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ খাওয়াবে।"** ফলে সংবাদ দেওয়ার শব্দরূপে আদেশের সম্বোধন এসেছে, যা আবশ্যকতার ফায়দা দেয়। সম্বোধনের ক্ষেত্রে আদেশের শব্দ মা-কে তার সন্তানকে দুগ্ধপান করানো আবশ্যকতার

অর্থ দেয়। ফলে সে তাকে পূর্ণ দুই বছর দুগ্ধপান করাবে। আর স্বামীর জন্য তার ব্যবস্থা করা ওয়াজিব এবং স্ত্রীর অভিভাবকদের জন্যও আবশ্যক, যাতে তাদের মেয়ে তার সন্তানকে দুধ খাওয়াতে সক্ষম হয়, যদি সে তালাকপ্রাপ্ত হয়। এভাবেই কোরআনের ভাষ্য তার বর্ণনায় বিশাল আলংকারিক মাহাত্ম্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছে; কেননা প্রভুর সম্বোধন সমস্ত উদ্দেশ্য, অধিক সংশ্লিষ্টতা ও জ্ঞানকে অল্প শব্দের মাধ্যমে শামিল ও একীভূত করেছে, যাতে এটি এই আদেশের ব্যাপারে একটি চুড়ান্ত বিবৃতি হয়। আর উভয় পক্ষেরই দুগ্ধপানের বিষয়ে ও সেই সকল অবস্থার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ততা রয়েছে, যেখানে হওয়াটা সম্ভব। সুতরাং তিনি কত মহান, যিনি তাঁর বাণীর মাধ্যমে সকলকে অক্ষম করে দিয়েছেন।

অতঃপর মতানৈক্যের ক্ষতি দূরীকরণের জন্য দুগ্ধপানের সময় নির্ধারণ ও মীমাংসা করা হয়েছে। **"আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ খাওয়াবে।" "পূর্ণ"** শব্দটি প্রত্যেক ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যায় বা যে দিকে অর্থ গমন করতে পারে, তা কর্তিত হয়েছে। কারণ, বছর কখনো অধিকাংশ সময়ের জন্যও হতে পারে। এতে ঝগড়া, তালাকের ফলাফল, দুই বছরের কিছু কম সময় বোঝা, অথবা শিশুর প্রতি বাড়াবাড়ি ও ক্ষতির আশঙ্কা থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তেমনি মাকে দুগ্ধপান করানো আবশ্যক করা হয়েছে, কারণ সে তার শিশুর প্রতি অধিক মায়াবতী, সহায়ক এবং তার প্রয়োজন বুঝতে সক্ষম। এই সময় নির্ধারণ থেকে বোঝা যায় যে, দুই বছরের পর আর দুগ্ধপান ধর্তব্য নয় এবং শিশুরও এরপর দুধপানের প্রয়োজন নেই। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলেন: **"যিনি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চান।"** এটি দুই বছর পূর্ণ দুগ্ধপানের সময়সীমার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে। আর আসল কথা হলো, আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেছেন, তা পুরোপুরি পালন করতে হবে। তাফসির বিশেষজ্ঞগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, দুই বছর পূর্ণ করা আবশ্যক নয়; বরং তার আগেও দুধ ছাড়ানো জায়েজ। আরেকটি উপকার হলো,

উলামাগণ আবিষ্কার করেছেন যে, দুই বছরের পর দুধপান করলে দুধভাই সাব্যস্ত হবে না। তবে দুই বছর পর্যন্ত দুগ্ধপান করা শিশুর ও মায়ের অধিকার। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

ফায়েদা হিসেবে বলা যেতে পারে: আল্লাহ তাআলার এই বাণী **"لمن أراد"** *(যে চায় তার জন্য)* – এটি কি নিশ্চিতকরণ নাকি বিকল্পের সুযোগ প্রদান? যখন আল্লাহ তাআলা দুই বছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করানোকে নির্ধারণ করেছেন এবং তার পূর্ণতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, তখন এটি নিশ্চিতকরণের জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ, যদি তোমরা পূর্ণতা চাও, তবে নবজাতকের জন্য দুই বছর পূর্ণ দুধ পান করানোই আল্লাহর নির্দেশিত বিধান। তবে এটি উভয় অর্থও বহন করতে পারে—একদিকে এটি মূল আদেশকে নিশ্চিত করছে, আবার অন্যদিকে এটি বিকল্পের সুযোগও দিচ্ছে, বিশেষত যদি এমন কোনো কারণ থাকে যা দুই বছর পূর্ণ করা কঠিন করে তোলে। এতে কোনো সংকীর্ণতা বা কষ্ট দূর করা হয়েছে। এটি আরও স্পষ্ট হয় আয়াতের পরবর্তী অংশ থেকে, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন: **(যদি বাবা-মা পরস্পরের সম্মতিতে ও পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে এতে কোনো দোষ নেই)**। অর্থাৎ, এটি শিশুকে দুধ ছাড়ানোর অনুমতি দিচ্ছে। এগুলো আল্লাহ তাআলার বাণীর অলৌকিকতা, যেখানে সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর শব্দাবলীর মাধ্যমে সমস্ত দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে মূল বিধান বজায় থাকে এবং প্রয়োজন অনুসারে সহজীকরণও নিশ্চিত হয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা পিতার দায়িত্ব স্পষ্ট করে বলেছেন: **" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"** *(যে সন্তানের পিতা, তার দায়িত্ব তাদের খোরপোষ ও পোশাকের ব্যবস্থা করা, যথাযথভাবে)*। আরবি ভাষার দিক থেকে এই আয়াতের বিশেষত্ব হলো—আল্লাহ তাআলা **"وعلى المولود له"** বলেছেন, যার অর্থ হচ্ছে **"পিতার**

ওপর এই দায়িত্ব"। অর্থাৎ, যার জন্য সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, সেই পিতার ওপর সন্তানের মায়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব বর্তায়। এর অর্থ দাঁড়ায়, যে ব্যক্তির জন্য সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তার দায়িত্ব হলো স্তন্যদাত্রী (দুধ পান করানো মা)-কে যথাযথভাবে ভরণপোষণ ও পোশাক প্রদান করা—তার সামর্থ্য অনুযায়ী। এই নির্দেশনার মধ্যে বহু ফিকহি বিধান ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে, যা নবজাতক ও স্তন্যদাত্রী সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করেছে। যেমন- স্তন্যদাত্রী যদি তালাকপ্রাপ্ত হয়, বা তার স্বামী যদি মারা যায়, অথবা স্তন্যদাত্রী যদি পারিশ্রমিক দাবি করে—এ সম্পর্কিত বিধানও এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার **"بالمعروف"** (যথাযথভাবে) শব্দটি ব্যবহার করার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, পিতার আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী খরচের মাত্রা নির্ধারিত হবে। কেননা, কেউ অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল, কেউ সীমিত আয়ে চলে, আবার কারও অবস্থা মাঝারি পর্যায়ের। এই একটি শব্দ "بالمعروف" এর মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন আর্থিক অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা কুরআনের অলৌকিক ভাষার সৌন্দর্য প্রকাশ করে। এছাড়াও, এতে পিতার ওপর দায়িত্ব থেকে মুক্তির কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। অর্থাৎ, সন্তান জন্মদানের পর পিতা এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না। এটি আল্লাহ তাআলার দয়ার বহিঃপ্রকাশ, যা তিনি নিশ্চিত করেছেন তাঁর বাণীতে: **"لا تكلف نفس إلا وسعها"** (কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে বোঝা দেওয়া হয় না)। এখানে **"وسع"** শব্দের অর্থ হলো—মানুষের ব্যক্তিগত সামর্থ্যের তারতম্য। এটি নির্ধারণ করবে ভরণপোষণের পরিমাণ ও ধরন। অতএব, আল্লাহর প্রশংসা যিনি এমন সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর ভাষায় নিজের উদ্দেশ্য, বিধান, করুণা ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন—যা মানবজাতির সেরা বক্তাদের জন্যও অনুকরণ করা সম্ভব নয়, যদিও তারা একত্রে চেষ্টা করত!

এই আয়াতের প্রসঙ্গ নবজাতকের মা ও বাবার প্রতি অন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাকার উপর গুরুত্বারোপ করেছে:

"لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده"(মাকে তার সন্তানের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া হবে না, এবং বাবাকেও তার সন্তানের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া হবে না)।

কেননা, ক্ষতির বিভিন্ন ধরণ ও স্তর রয়েছে। তাই শরীয়ত সমস্ত প্রকার ক্ষতি নিষিদ্ধ করেছে, তা যে ধরনেরই হোক না কেন। এখানে **"لا تضار"** (কষ্ট দেওয়া হবে না) শব্দের মাধ্যমে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবহ ভাষায় সকল পক্ষের প্রতি অন্যায় ও কষ্ট দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ- মা যেন তার সন্তানের কারণে কষ্ট না পায়, বাবা যেন তার সন্তানের কারণে কষ্ট না পায়, এবং কোনো পক্ষ যেন অন্য পক্ষের জন্য ক্ষতির কারণ না হয়।

যেহেতু বাবা-মায়ের মধ্যে পারস্পরিক কষ্ট বা অন্যায় অপসারণ করা হলে শিশুর অবস্থাও নিরাপদ থাকবে, তাই আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে শিশুর ওপর কোনো ক্ষতির উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেননি। এটি কুরআনের ভাষাগত অলৌকিকতা, যেখানে অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। আল্লাহর কিতাবে এমন কোনো অতিরিক্ত শব্দ নেই, যা বাদ দিলেও অর্থ অপরিবর্তিত থাকে।

এখানে **"تضار"** শব্দটি অজ্ঞাতকারক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে যে কেউ এই অন্যায়ে জড়িত হোক না কেন, তা অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ- এটি বাবার পক্ষ থেকে মায়ের প্রতি হতে পারে, মায়ের পক্ষ থেকে বাবার প্রতি হতে পারে, স্ত্রীর অভিভাবকদের পক্ষ থেকে হতে পারে, মৃত স্বামীর আত্মীয়দের পক্ষ থেকে হতে পারে, এমনকি এটি সালিশকারী বা ফয়সালা প্রদানকারীর পক্ষ থেকেও হতে পারে। আর ক্ষতির বিভিন্ন রূপের মধ্যে রয়েছে: মাকে দুধ পান করাতে বাধা দেওয়া, তাকে প্রয়োজনীয় ভরণপোষণ

ও পোশাক দেওয়া না হওয়া, মায়ের পক্ষ থেকে বাবাকে কষ্ট দেওয়া, যেমন—শিশুকে দুধ পান করানো থেকে বিরত থাকা, যাতে বাবাকে অসুবিধায় ফেলা যায়, মায়ের পক্ষ থেকে সন্তানের ভরণপোষণের খরচ ও পারিশ্রমিক অযথা বাড়িয়ে দেওয়া, অথবা অন্য যেকোনো উপায়ে বাবা বা মাকে কষ্ট দেওয়া।

এরপর আল্লাহ তাআলা একটি সম্ভাবনা তুলে ধরেন, যা পরিবারের জন্য ঘটতে পারে, যেমন—পিতার মৃত্যু। এবং তিনি এটিকে সমাধান করেছেন এইভাবে: **"وعلى الوارث مثل ذلك"** (এবং অধিকারী (বংশধর) এর ওপরও এমনই দায়িত্ব থাকবে)। অর্থাৎ, যদি শিশুর বাবা মারা যায় এবং শিশুর নিজের কোনো সম্পদ না থাকে, তবে শিশুর উত্তরাধিকারীর (বংশধর বা এমন কেউ যিনি পিতার স্থানে উত্তরাধিকারী) দায়িত্ব হবে, মা'র জন্য সেই একই অধিকার প্রদান করা, যা বাবা কর্তৃক করা হয়েছিল—সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য। এটি আল্লাহ তাআলার করুণার নিদর্শন যে, তিনি স্তন্যদাত্রী মা'র অধিকার সংরক্ষণ করেছেন এবং একই সঙ্গে শিশুর হেফাজতও নিশ্চিত করেছেন। এই মহৎ বিধানগুলো একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্য পূরণ করছে, যা এই শরিয়তের গভীরতার প্রমাণ, যেখানে শিশুর এবং স্তন্যদাত্রী মায়ের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তাআলা আরো বিস্তারিতভাবে সন্তানদের বিষয়ে নির্দেশনা দেন, বিশেষত যখন তারা দুধ ছাড়ানোর পর্যায়ে পৌঁছায়, এ কথা বলে: **"فإن أرادا فصالاً"** (যদি তারা দুধ ছাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন)। এখানে **"فصالاً"** শব্দের অর্থ হলো—দুধ পান করানো থেকে বিরতি, যাকে **"فصل"** (বিচ্ছেদ) বলা হয়, অর্থাৎ শিশু ও স্তন্যদানকারী মায়ের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা। যদি বাবা-মা চান, যে সময়ের আগে শিশুকে দুধ ছাড়ানো হবে (যতটা আল্লাহ তাআলা নির্দেশিত করেছেন), তখন আল্লাহ তাআলা এর জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত দেন: **"تراض منهما"** (তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতি),

"وتشاور" (এবং পরামর্শ)। অর্থাৎ, দুধ ছাড়ানোর বিষয়ে একপক্ষের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অন্যপক্ষের একপেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতি নেই। বাবা-মায়ের উভয়ের সম্মতি ও পরামর্শের মাধ্যমে শিশুর দুধ ছাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এতে শিশুর এবং বাবা-মায়ের উভয়ের মঙ্গলের প্রতি মনোযোগী হওয়া হবে, এবং সম্ভাব্য ক্ষতি থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে। এই আল্লাহর নির্দেশনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ দেয়: এটি পারিবারিক ব্যাপারগুলোর মধ্যে একাধিক সমস্যার সমাধান প্রস্তাব করে, বিশেষ করে যখন মানুষ সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি প্রাধান্য দেয়। এই বিধান পরিবারের অন্যায় ও বিভাজন এড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি একইভাবে নির্দেশনা দেয় যে—যতক্ষণ পর্যন্ত বাবা-মা একমত না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো একপাক্ষিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। এটি একটি মডেল নির্দেশনা, যা জীবনের বহু দিক—যেমন পরিবার, পেশা, সামাজিক সম্পর্ক, ইত্যাদিতে ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে এবং নির্ধারিতভাবে উল্লেখ করেছেন, যেখানে সন্তানের দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারে পূর্বের দুটি শর্ত পূর্ণ হলে, তিনি বলেছেন **"فلا جناح عليها"** (তাহলে তাদের জন্য কোনো দোষ নেই)। এতে আল্লাহ তাআলা পিতামাতার জন্য ভুল বা অপরাধের কোনো অভিযোগ তুলে ধরেননি, যদি তারা পরস্পরের সম্মতি এবং পরামর্শে সন্তানের দুধ ছাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। তবে, এখানে সূক্ষ্মভাবে বোঝানো হয়েছে যে, যদি কোনো পিতা বা মাতা একপক্ষীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তা শুদ্ধ নয়। কারণ, বাবা-মা উভয়ই তাদের সন্তানের দায়িত্বের অংশীদার এবং তাদের উভয়ের সম্মতির মাধ্যমে সন্তানের মঙ্গলের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এটি এ জন্যও গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন পক্ষ যদি অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহলে এটি শিশুর জন্যও ক্ষতিকর হবে। এতে আল্লাহ তাআলা শিশুদের মঙ্গলের প্রতি বিশেষ যত্নশীলতার

পরিচয় দিয়েছেন, যেহেতু শিশুরা তাদের মঙ্গল বুঝতে পারে না এবং তাদের পক্ষ থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য বিশেষ আইন এবং শর্তাবলী নির্ধারণ করেছেন, যা তাদের উপকারে আসে।

এই বিধানটি নিশ্চিত করে যে, শিশুকে দুই বছর পূর্ণ দুধ পান করানোই মূল বিধান। এই নিয়ম থেকে কোনো ব্যতিক্রম শুধুমাত্র নির্দিষ্ট শর্তে, যেমন পিতা-মাতা সম্মত হলে এবং পরামর্শের মাধ্যমে যদি সন্তানের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন হয়, তবেই দুধ ছাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়। এটি একটি প্রমাণ যে, আল্লাহ তাআলার এই বিধান একটি সঠিক ও গভীর রৈখিক নির্দেশনা, যা কখনোই ভুলের সম্মুখীন হবে না। এটি একটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রজ্ঞাময়, দয়ালু এবং চিরস্থায়ী বিধান।

সাহাবীরা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় যা পালন করতেন, তা ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন, কাতাদা বলেছেন: "দুধ পান করানো ছিল দুই বছর বাধ্যতামূলক, এবং এর আগে দুধ ছাড়ানো নিষিদ্ধ ছিল, তবে পরবর্তীতে এটি শিথিল করা হয়, এবং দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগে দুধ পান করানো অনুমোদিত হয় আল্লাহ তাআলার বাণী 'فإن أرادا فصالاً' (যদি তারা দুধ ছাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন)।"

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে একাধিক পক্ষের সম্পর্ক রয়েছে, সেখানে একপক্ষ একপাক্ষিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। বরং, সম্মতি এবং পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটি শত্রুতা ও বিভাজন দূর করে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, এবং এই উদ্দেশ্যই শরীয়তের মূল লক্ষ্য। এটি শুধু পারিবারিক জীবনে নয়, বরং সমাজ ও শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শিশুরা যেন এসব মূলনীতি তাদের পারিবারিক জীবনে শিখে এবং এগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারে, সেটি শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

এখন আল্লাহ তাআলা অন্য একটি পরিস্থিতির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন, যা হলো দুধ পান করানোর একটি নতুন দিক: **" وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم"** (আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের জন্য দুধ পানের জন্য অন্য কোনো মহিলাকে গ্রহণ করতে চাও, তবে এতে কোনো দোষ নেই)।

এটি একটি নতুন পরিস্থিতি, যেখানে একজন নারী (অজানা বা অন্য) শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য নির্বাচিত হতে পারে। এখানে আরবি ভাষায় এটা বোঝানো হয়েছে যে, **"أن تسترضعوا أجنبية لأولادكم"** (তোমরা অন্য কোনো মহিলাকে তোমাদের সন্তানদের জন্য দুধ পান করানোর জন্য নিয়োগ করতে চাও)।

এতে আল্লাহ তাআলা দুধ পান করানোর অনুমতি দিয়েছেন, এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট দিকগুলোও ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য একজন নারীর কাছে অর্থ প্রদান (অর্থাৎ, পরিশ্রমের জন্য অর্থ প্রদান করা) অনুমোদিত হয়েছে, তবে এটি করতে হবে **"بالمعروف"** (যে পরিমাণ যুক্তিসঙ্গত ও সঠিক)। **"إذا سلمتم"** (যদি তোমরা প্রদান করো) শব্দে দুটি দিক বোঝানো হয়েছে:

১. **"سلمتم الأجرة للمرضعة الأجنبية"** (তোমরা স্তন্যদাত্রী মহিলাকে তার পারিশ্রমিক প্রদান করো), ২. **"سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع"** (তোমরা দুধ পান করানোর জন্য তোমাদের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত তুলে দাও)। এখানে আল্লাহ তাআলা দুটো দিক একসাথে তুলে ধরেছেন: অর্থাৎ, দুধ পান করানোর জন্য সঠিক পরিমাণে অর্থ প্রদান এবং মনের সঙ্গে সম্মতি ও সদিচ্ছা প্রকাশ করা।

এরপর, আয়াতটি শেষ হয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়ে: **" واتقوا الله. واعلموا أن الله بما تعملون بصير"** (তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, এবং জানো যে আল্লাহ তোমাদের সবকিছু দেখে থাকেন)। এটি একটি সার্বিক উপদেশ, যা প্রতিটি মুসলিমের

জন্য প্রয়োজনীয়, যাতে তারা সব সময় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং তার সব কর্মকাণ্ডে আল্লাহর উপস্থিতি ও দেখার বিষয়টি মনে রাখে। আল্লাহর ওপর ভয় রাখা এবং তার কাছে সঠিকভাবে ফিরে আসা, একজন মুমিনের জন্য সব সময় প্রয়োজন। এই ধরনের উপদেশ শিক্ষার, তত্ত্বাবধানের, এবং নসিহতের সমাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এটি মুমিনকে তাদের ভুলের দিকে লক্ষ্য আকর্ষণ করে এবং তাদের আধ্যাত্মিক দিক উন্নত করতে সহায়তা করে।

﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾﴾

অর্থ: ***[আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। আর তোমরা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ অবগত রয়েছেন।]*** *(*আয়াত নং: ২৩৪*)***

কুরআনের প্রসঙ্গে স্বামীর মৃত্যু সংক্রান্ত আরেকটি পারিবারিক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে: **"আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা।"** এখানে আল্লাহ তাআলা সেই স্ত্রীর অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যার স্বামী মারা গেছে। তার ইদ্দত *(*প্রতীক্ষা কাল*)* তালাকপ্রাপ্ত নারীর ইদ্দত থেকে ভিন্ন। তার ইদ্দত হলো চার মাস দশ দিন, যাতে গর্ভ থাকলে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা নারীর বিবাহ-সংক্রান্ত অপেক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে একটিমাত্র শব্দে সংক্ষেপে প্রকাশ করেছেন— *(*يَتَرَبَّصْنَ*)* অর্থাৎ ধৈর্য ধারণ করা এবং অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকা, যতক্ষণ না নির্ধারিত ইদ্দতকাল শেষ হয়। এই প্রসঙ্গে মুসলিম নারীর অনুভূতির সংরক্ষণ করা হয়েছে, যার লজ্জাশীলতা এত বেশি যে, তার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা তার জন্য কষ্টদায়ক হতে পারে। ফলে পাঠক পাঠ করবে, কিন্তু নারী তার নিজস্ব বিষয় শুনে বিব্রত বোধ করবে না। এই সময়সীমার মধ্যে মৃত স্বামীর হক সংরক্ষিত হয়েছে। যদি গর্ভ থাকে, তবে গর্ভ ও বংশের হক রক্ষা পায়। এছাড়াও, এটি দুটি বংশের মিশ্রণ রোধ করে এবং যে পুরুষ তাকে বিয়ে করতে চায়, তার জন্য সংরক্ষণ করে যে, তার বংশে অন্য কেউ অনুপ্রবেশ করবে না। সুতরাং, আল্লাহ তাআলা এই বিধানের মাধ্যমে সকলের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন। স্বামীর

মৃত্যুতে স্ত্রীর জন্য আরও কিছু বিস্তারিত বিধান রয়েছে, যা নববী সুন্নাহতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে মুসলিমরা উপলব্ধি করতে পারে যে, ইসলামের পদ্ধতি হলো পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত, যেখানে কুরআন মাজিদ ও পবিত্র সুন্নাহ পরিপূরক। এক্ষেত্রে ফিকহবিদগণ যেসব বিধান সংকলন ও বিশ্লেষণ করেছেন, সেগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। তারা সাধারণ ও বিশেষ, সীমিত ও নিরবচ্ছিন্ন বিধানগুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে গর্ভবতী, অগর্ভবতী ও দাসী নারীর ইদ্দত সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা। এভাবে দুটি উৎস—কিতাব (কুরআন) ও সুন্নাহ থেকে জ্ঞানরাশি উৎসারিত হয়েছে, যা বিবেক ও বুদ্ধিমত্তাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং বুঝার ক্ষমতাকে আরও উন্নত করেছে।

এরপর আল্লাহ তাআলা ইদ্দত শেষে স্বামী-মৃত্যুগ্রস্তা নারীর অবস্থা বর্ণনা করেন: "অতঃপর যখন তারা তাদের নির্ধারিত সময় (ইদ্দত) পূর্ণ করবে, তাহলে তারা নিজেদের সম্পর্কে শরীয়তসম্মতভাবে যা কিছু করবে, তাতে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই।" এটি সমস্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সম্বোধন—যেমন ওলী-আমর (অভিভাবক), মুতাওয়াল্লী (যার এখতিয়ার আছে, যেমন কাযী বা মৃত স্বামীর পরিবার), যদি সে বিবাহ বা সাজসজ্জার মতো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। এখানে (بِالْمَعْرُوفِ) বা "শরীয়তসম্মতভাবে" বলতে ইসলামী বিধানের সীমার মধ্যে কাজ করাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, যা শরীয়ত অনুমোদন করে—না হারাম, না মাকরূহ। কুরআনের এই নির্দেশনা থেকে বুঝা যায়, ওলীর দায়িত্ব হলো তার অধীনস্ত নারীকে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করা থেকে বিরত রাখা। কারণ, (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)-এর বিপরীত অর্থ হলো, যদি কোনো নারী "মা'রূফ"-এর সীমা অতিক্রম করে, তবে ওলীর উপর তা বন্ধ করার দায়িত্ব অর্পিত হয়। সুতরাং, এটি তার উপর ওয়াজিব, এবং তিনি তার মুরব্বী (অধীনস্তা নারী) এর হক রক্ষায় সচেষ্ট হবেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের পদ্ধতি নারীকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়, যাতে সে নিজের বা অন্যের ক্ষতি না করে। এটি ইসলামী বিধানের এক মহান নিয়ামত, যা নারীর বিষয়ে সূক্ষ্ম নির্দেশনা,

সার্বিক যত্ন ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করে। এটি নারীর মর্যাদা ও ইসলামে তার উচ্চ অবস্থানেরই প্রমাণ।

তারপর আয়াতের সমাপ্তি হয়েছে এ বলে: "আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।" এখানে সকলকে সতর্ক করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের কর্ম ও নিয়ত জানেন। তাই তাঁর বিধান লঙ্ঘনের কোনো কাজ বা ইচ্ছা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। এটি আরও ইঙ্গিত দেয় যে, উপদেশ ও সতর্কতা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত নির্দেশনা বা শিক্ষার শেষে। কেননা, উপদেশের প্রভাব হৃদয়ে গভীর, এবং একে পুনরাবৃত্তি করায় কোনো দোষ নেই—যেমন কুরআনের বহু আয়াতে বারবার সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥﴾

অর্থ: **[আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে (সে) নারীদের বিয়ের প্রস্তাব দাও বা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখ তবে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা করবে: কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের সাথে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না; এবং নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনের সংকল্প করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন। কাজেই তাকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহনশীল।]** (আয়াত নং: ২৩৫)

স্বামী মারা যাওয়া নারীর ইদ্দতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে কোরআন কারিমের বর্ণনা স্পষ্টভাবে চলমান রয়েছে। **“আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে সে নারীর বিয়ের পয়গাম দাও, তবে তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই।”**

এই প্রভু-প্রদত্ত নির্দেশনার মাধ্যমে স্বামীহারা নারীর ইদ্দত সংক্রান্ত সূক্ষ্ম বিষয়ের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিয়েছেন। এটি মূলত সেই বিধবা নারীকে বিবাহ করার আগ্রহসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশনা যে, যদি কেউ ইদ্দত পালনকারী নারীকে বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী হয়, তবে তাকে স্পষ্ট প্রস্তাব দেওয়া যাবে না; বরং আকার-ইঙ্গিতে ইচ্ছা প্রকাশ করা বৈধ।

এই সম্মানিত নির্দেশনার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা রয়েছে- ১. সমাজে শালীনতা ও তাকওয়া শিক্ষাদান। ২. বিধবা নারীর অনুভূতিকে সম্মান জানানো। ৩. মৃত স্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। ৪. সম্ভাব্য আগ্রহী ব্যক্তিদের অনুভূতি বিবেচনায় রাখা। ৫. আকার-ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেওয়ার মাধ্যমে সম্ভাব্য আগ্রহ বোঝার সুযোগ রাখা, তবে নিশ্চিতভাবে স্পষ্ট প্রস্তাব দেওয়া নয়। "আকার-ইঙ্গিত" শব্দের অর্থ হলো—কোনো কিছু বুঝানো, যা কোনো নির্দিষ্ট অর্থ বা প্রতীকী ইঙ্গিত বহন করে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, ইদ্দত পালনকারী নারীর জন্য স্পষ্ট প্রস্তাব দেওয়া শরীয়তে অনুমোদিত নয়, কারণ প্রজ্ঞাময় শরীয়ত প্রণেতা শুধুমাত্র আকার-ইঙ্গিতকে বৈধ করেছেন। সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় যে, ইদ্দত পালনকারীকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া নিষিদ্ধ। এটি ইসলামের শালীনতার নিয়ম-কানুনের একটি অংশ, যা উচ্চ নৈতিকতা ও প্রমাণিকতার ভিত্তিতে প্রণীত। ইসলামের নিয়মনীতি হলো বিনয়, আদব ও শিষ্টাচারের শিক্ষা দেওয়া। তাই বাস্তবতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো কিছু পরিহার করা এবং বিনয়ের অভাব না রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ইসলাম হলো সম্মান, শিষ্টাচার ও মার্জিত আচরণের ধর্ম।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা হলো—ইসলামী পদ্ধতি ব্যক্তিগত দিককেও লক্ষ রাখে। ফলে আগ্রহী পুরুষের জন্য আকার-ইঙ্গিতকে বৈধ করা হয়েছে। এতে বিধবা নারীর অনুভূতির পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির পরিবার, তার সন্তান (যদি থাকে), এবং পরিচিতজনদের অনুভূতিকে সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে, মৃত ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর ইদ্দতকালীন সময়ে যথাযথ সম্মান দেওয়াও শরীয়তে অনুমোদিত হয়েছে। ফলে আল্লাহ তায়ালার বিধান মানবজীবনের প্রতিটি বিষয়ে গভীর দৃষ্টি রেখেছে। এ কারণেই আলেমগণ রজই তালাকপ্রাপ্তাকে (যে এখনো স্বামীর অধীনে রয়েছে) আকার-ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া অপছন্দনীয় বলে গণ্য করেছেন। এর সারসংক্ষেপ হলো: এটি জায়েজ নয়, কারণ তালাকপ্রাপ্তা এখনো তার স্বামীর অধীনে রয়েছে। তদ্রূপ, যদি কারও মনে কোনো লুকায়িত আগ্রহ থাকে, তবে তা প্রকাশ না করলে কোনো গুনাহ নেই। অর্থাৎ, যদি কেউ ইদ্দত পালনকারী নারীকে বিয়ের ইচ্ছা মনে লুকিয়ে রাখে এবং তা প্রকাশ না করে, তবে সে নির্দোষ থাকবে। ফলে আল্লাহ তায়ালা বিধবা নারীকে বিয়ে করতে চাওয়া ব্যক্তির গুনাহ দূর করেছেন, সে তা আকার-ইঙ্গিতে প্রকাশ করুক বা গোপনে রাখুক। এরপর, আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, যারা এ বিষয়ে আগ্রহী এবং তাদের গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থার ব্যাপারে সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজ জ্ঞান দ্বারা অবগত। "আল্লাহ জানেন, তোমরা অবশ্যই সে নারীদের কথা উল্লেখ করবে।" ফলে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও মনোভাবের প্রতি অবকাশ দিয়েছেন এবং ছাড় দিয়েছেন যে, ইদ্দত পালনকারী নারীর প্রসঙ্গ আলোচনায় আসবে। মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতির কারণে হয়তো কেউ গোপনে বা প্রকাশ্যে তার প্রতি বিয়ের আগ্রহ প্রকাশ করবে। এই কারণেই ইসলামে আকার-ইঙ্গিতকে বৈধ করা হয়েছে, যা মানুষের প্রতি আল্লাহর রহমতের বহিঃপ্রকাশ।

এই আয়াতের অন্তর্নিহিত ফায়েদা হলো—আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম দয়া ও জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের স্বভাবগত অবস্থাকে বুঝে নিয়েছেন এবং তাদের গুনাহ মাফ

করে দিয়েছেন। তাই তিনি আকার-ইঙ্গিতকে বৈধ করেছেন, যা মানুষের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা অন্তরের লাজুকতা সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তাঁর পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ শরীয়ত মানবজাতির সমস্ত কল্যাণকে একসঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে। একইসঙ্গে, এটি উন্নত শিষ্টাচারের মাধ্যমে আদব ও নৈতিকতার শিক্ষা দেয়, যা ইসলামি বিধানের অন্যতম মূল শিক্ষা।

অতঃপর, আল্লাহ তায়ালার বিধানে আদব ও শৃঙ্খলার পূর্ণতা বিধান করা হয়েছে। যেহেতু সুবহানাহু আয্যা ও জাল্লা গোপনে ওয়াদা করাকে নিষেধ করেছেন—**"তাদের সাথে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না।"** সুতরাং, ইদ্দত পালনকারী নারীর সাথে গোপনে বিয়ের ওয়াদা করা বৈধ নয়। এটি প্রকাশের মাধ্যমে ঈঙ্গিতের সীমালঙ্ঘন ঘটে। অথবা যদি কেউ তার সাথে এভাবে প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার করে যে, সে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না, তবে তা হারাম। ইমাম কুরতুবি *(রহ.)* কতক সাহাবি ও আলেমদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "ইদ্দত পালনকারী নারীর ক্ষেত্রে কেউ সরাসরি তাকে বিয়ের জন্য বলবে না; বরং চাইলে শুধুমাত্র ঈঙ্গিত করতে পারবে। তবে, গোপনে তার কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার নেওয়া যাবে না যে, সে অন্য কাউকে বিয়ে করবে না।" তিনি আরও বলেন: একইভাবে, উম্মতের আলেমগণ একমত হয়েছেন যে— ১. কোনো নারী নিজে নিজে ইদ্দতের ব্যাপারে পূর্বনির্ধারণ করতে পারবে না। ২. পিতা তার অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার জন্য ইদ্দতের ব্যাপারে আগেভাগে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। ৩. মনিব তার দাসীর জন্যও এমনটি করতে পারবে না। তবে এর ব্যতিক্রম হলো—শরীয়ত নির্ধারিত পদ্ধতির ভিত্তিতে ঈঙ্গিত করা বৈধ। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার এই বিধান ও সতর্কবার্তার মাধ্যমে সমাজ সুশৃঙ্খল ও কল্যাণময় হয়, বিশেষত বিধবা নারীদের ক্ষেত্রে। এমনকি বিবাহ-সংক্রান্ত চুক্তির বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার বাণীর মাধ্যমে বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হয়েছে— **"আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোনো ইচ্ছা করো না।"** সুতরাং, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ-

সংক্রান্ত কোনো চুক্তি করা বৈধ নয়। আলেমগণ একমত যে, ইদ্দত চলাকালীন আক্দ (বিবাহ চুক্তি) শুদ্ধ হয় না। **"আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি"**—এর অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণ ইদ্দতকাল পূর্ণ হওয়া। **"কিতাব"** বলতে বোঝানো হয়েছে সীমারেখা এবং ইদ্দতের নির্ধারিত পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালা এটিকে **"কিতাব"** (বিধান) নামকরণ করেছেন, কারণ তিনি এর সীমানা নির্ধারণ করেছেন এবং একে ফরজ করেছেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—**"এটি তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম।"** অর্থাৎ, ইদ্দতের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত এই বিধান পালন করা ফরজ।

অতঃপর, আয়াতটি সম্বোধিত ব্যক্তিদের উপদেশ দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে- **"আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে তা জানেন। সুতরাং তোমরা তাঁকে ভয় কর।"** এরপর, আল্লাহ মু'মিনদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তারা যেন এটা জেনে রাখে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয়ে যা রয়েছে তা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। সুতরাং যিনি জানেন, তাদের অন্তরে কী আছে, তিনি অবশ্যই তাদের বাহ্যিক আমল সম্পর্কেও জানেন। তাই আল্লাহকে ভয় করা জরুরি। **"সুতরাং তোমরা তাঁকে ভয় কর।"** অর্থাৎ, আল্লাহর সেই শাস্তিকে ভয় কর, যার নির্ধারিত সীমারেখায় থেমে যাওয়া অপরিহার্য। সুতরাং সীমা অতিক্রম করো না। এই আয়াতটিতে একটি বিশেষ উপদেশ রয়েছে—আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্তরের গোপন বিষয় জানেন, আর এর দ্বারা বৃহত্তর একটি বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়; অর্থাৎ, তিনি বাহ্যিক ও প্রকাশ্য আমল সম্পর্কেও অবগত। **"সুতরাং তোমরা তাঁকে ভয় কর।"** এই বাক্যের মাঝে এমন কিছু নির্দেশনা রয়েছে, যা শাস্তির যাবতীয় মাত্রা ও প্রকৃতি থেকে আত্মরক্ষা করাকে জরুরি করে। যাতে শাস্তির সীমারেখায় পৌঁছানোর দুঃসাহস দেখানোর আগে হৃদয়ে ভয় সৃষ্টি হয়।

অতঃপর, উপদেশটি শেষ হয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই বাণী দ্বারা— **"আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম সহিষ্ণু।"** আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিধান, সতর্কবার্তা এবং ক্ষমার বার্তাকে একত্র করেছেন। যেন বান্দা ক্ষমা প্রার্থনা

করে, ভুলত্রুটি ও পাপ থেকে তাওবাহ করে এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহের অন্যতম নিদর্শন হলো—তিনি দ্রুত শাস্তি প্রয়োগ করেন না। বরং তিনি বান্দাদের অবহিত করেন, তাদের সতর্ক করেন এবং সীমা লঙ্ঘনের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করেন। একইসঙ্গে, তিনি তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন। বস্তুত আল্লাহর ক্ষমা, অনুগ্রহ ও উদ্বুদ্ধকরণ গ্রহণ করার চেয়ে অধিক কাঙ্ক্ষিত আর কিছুই নেই। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

এই আয়াতটি আশা ও ভয় (তারগীব ও তারহীব) এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে এবং দা'য়ী ও প্রশিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা দেয় যে, তারা যেন কখনো অন্যদের আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা থেকে নিরাশ না করে। বরং গুনাহগার, অপরাধী ও অবহেলাকারীদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার বার্তা তুলে ধরে, যাতে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তাদের গুনাহ থেকে তাওবাহ করতে উৎসাহিত হয়।

﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦﴾

অর্থ: ***[*তোমাদের কোন গুনাহ নেই যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এমন অবস্থায় যে, তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করনি কিংবা তাদের জন্য কোন মহর নির্ধারণ করনি। আর উত্তমভাবে তাদেরকে ভোগ-উপকরণ দিয়ে দাও, ধনীর উপর তার সাধ্যানুসারে এবং অভাবগ্রস্ত বক্তির উপর তার সাধ্যানুসারে। সৎ কর্মশীল লোকদের উপর এটি আবশ্যক।*]* (**আয়াত নং ২৩৬)**

অতঃপর, কুরআন কারীমের বর্ণনার প্রসঙ্গ অন্য আরেকটি অবস্থার দিকে পরিবর্তিত হয়েছে। তালাক সংক্রান্ত এই নতুন অবস্থা হলো- **"তোমাদের কোনো গুনাহ নেই যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, এমন অবস্থায় যে, তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করোনি কিংবা তাদের জন্য কোনো মহর নির্ধারণ করোনি।"** যে ব্যক্তি বিবাহের আকদের পরে, কিন্তু সহবাসের পূর্বে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা পাপমুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন। এতে জানা যায় যে, যারা বিবাহের পর বুঝতে পারে যে, তাদের জন্য এই সম্পর্ক স্থায়ী রাখা সম্ভব নয়, তাদের জন্য তালাকের অবকাশ রয়েছে। এটাই **"যতক্ষণ তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করোনি"**—এই বাণীর অর্থ। বিবাহ স্থায়ী না রাখার কারণ বিভিন্ন হতে পারে, যা নির্দিষ্ট কোনো সীমায় আবদ্ধ নয়। অনেক সময়, সহবাসের পর তালাক দেওয়ার তুলনায় আগেই তালাক দেওয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য উত্তম ও কল্যাণকর হতে পারে। কেননা, সহবাসের পর তালাক দিলে স্ত্রীর হৃদয়ে গভীর আঘাতের সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এই পরিস্থিতিতে স্ত্রীকে কিছু উপকরণ বা সম্পদ প্রদান করার অনুমতি দিয়েছেন, যদিও তার জন্য মহর নির্ধারিত হয়নি। **"কিংবা তাদের জন্য কোনো মহর নির্ধারণ করোনি।"** মহর হলো—স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীকে কিছু প্রদান করা। সুতরাং, **"আর উত্তমভাবে তাদেরকে ভোগ-উপকরণ দিয়ে দাও- ধনী তার সাধ্যানুযায়ী এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তার সাধ্যানুযায়ী।"**

এখানে আল্লাহ তা'আলার সহৃদয়তার প্রকাশ ঘটে, বিশেষ করে যখন মানুষ এ ধরনের কোনো পরিস্থিতিতে পতিত হয়। শারী'আতে মানুষের মানসিক দিকগুলোকে অবহেলা করা হয়নি; বরং তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে বিধানসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে, যথাযথ স্থানেই এ দিকটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার সহানুভূতি এই বিধানে প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি মহরের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বামীর আর্থিক সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা স্বামীকে যে পরিমাণ সম্পদ ও সামর্থ্য দান করেছেন, সে অনুযায়ীই তাকে মহর প্রদান করতে বলা হয়েছে। এই বিবেচনায় মানুষ প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত- *(১)* ধনী ব্যক্তি, যার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল। *(২)* অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, যার সম্পদ সীমিত। এই দুই শ্রেণীর মাঝে আর্থিক সক্ষমতার ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে—কেউ প্রশস্ততায় রয়েছে, আবার কেউ সংকীর্ণতায়। আল্লাহর বাণী "তার সাধ্যানুসারে" এখানেই ইসলামের বিধান প্রণয়ন ও নির্দেশনার প্রজ্ঞা প্রতিফলিত হয়। শারী'আতের বিধানগুলো এমনভাবে প্রণীত হয়েছে যে, তা বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের আর্থিক সক্ষমতা ও সামর্থ্যের পার্থক্যকে যথাযথভাবে বিবেচনা করে। এই সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা ও বিবেচনার মাধ্যমেই কুরআন কারীমের অনন্যতা প্রকাশ পায়। এটি মানুষের জন্য ভাষা বিন্যাস ও বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়—কীভাবে সুবিন্যস্ত শব্দের মাধ্যমে অর্থ ও উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাগিদ দিয়ে ও ব্যাখ্যা করে বলেছেন, **"উত্তমভাবে তাদেরকে ভোগ-উপকরণ দিয়ে"**, অর্থাৎ সাধ্যানুসারে এবং প্রাপ্য অধিকারের ভিত্তিতে। **"উত্তমভাবে"** শব্দটি এমন একটি বিশেষণ, যা চরিত্র, ব্যয়, উদারতা, উপাদান ও পরিমাণ—সবকিছুকে একত্রিত করে এবং মানুষের মাঝে সামর্থ্যের পার্থক্যের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করে। মানুষের আর্থিক সামর্থ্যের তারতম্যের কারণে এই বিধান প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, **"সৎকর্মশীল লোকদের**

উপর এটি আবশ্যক।" অর্থাৎ সৎকর্মশীল ব্যক্তির জন্য এটি পালন করা জরুরি। এই নির্দেশনা মানুষকে অনুপ্রেরণা দেয় এবং উৎসাহিত করে, কারণ এতে বোঝানো হয়েছে যে, যারা উদারতার গুণে গুণান্বিত, তাদের জন্য এটি অবশ্য পালনীয়। প্রত্যেক মুসলিমই এই গুণ অর্জন করতে চায়, কারণ এটি প্রশংসনীয় এবং মহৎ বৈশিষ্ট্য। এই গুণের অনুপস্থিতি কারো জন্যই কাঙ্ক্ষিত নয়, বরং এটি মানুষের চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই আয়াতের মাধ্যমে মানুষের সার্বিক জীবনব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে কুরআনের আদর্শ অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে মানুষ বিভিন্ন নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করে সফলতা লাভ করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, সাহাবি জুবাইর বিন মুত্ব'ইম *(রাঃ)* একবার নাসর গোত্রের এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন, কিন্তু গমন করার আগেই তাকে তালাক দেন। এরপর তিনি তার কাছে সম্পূর্ণ **মহর** পাঠিয়ে দেন এবং বলেন, **"মার্জনায় তার চেয়ে আমি অধিক হকদার।"** এটি প্রমাণ করে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী চাইলে নিজ অধিকার ছেড়ে দিয়ে এই উদারতার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। মুসলিম ব্যক্তির উচিত, সাহাবির এই দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং এই আয়াতের প্রভাব তার জীবনে প্রতিফলিত করা।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—সহবাসের প্রতি পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে **"তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করনি"** এই শব্দের মাধ্যমে। এখানে **"স্পর্শ করা"** শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে নারীর লজ্জাশীলতা রক্ষা করার জন্য, কারণ বিষয়টি সরাসরি উল্লেখ করা হলে তা নারীদের জন্য অস্বস্তিকর ও লজ্জার হতে পারত। এটি ভাষার সৌন্দর্য এবং শালীনতার প্রতি কুরআনের যত্নশীলতার পরিচায়ক। এখানে আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে—সঠিক ও পরিমিত শব্দ চয়ন করা, বিশেষ করে এমন প্রসঙ্গ যেখানে সংবেদনশীলতা বজায় রাখা প্রয়োজন। উত্তেজক বা অপ্রয়োজনীয় স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত, যাতে অন্যরা অস্বস্তিতে না পড়ে।

কুরআনের এই ভাষাশৈলী আমাদের শেখায়, সম্বোধনের সময় শ্রোতার মানসিক অবস্থা ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, যাতে কথাবার্তা শালীন ও সৌজন্যমূলক হয়।

﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

অর্থ *:[***আর যদি তোমরা তাদেরকে তালাক দাও, তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে এবং তাদের জন্য কিছু মহর নির্ধারণ করে থাক, তাহলে যা নির্ধারণ করেছ, তার অর্ধেক *(দিয়ে দাও)*। তবে স্ত্রীরা যদি মাফ করে দেয়, কিংবা যার হাতে বিবাহের বন্ধন সে যদি মাফ করে দেয়। বস্তুতঃ তোমাদের মাফ করে দেয়া তাকওয়ার অধিক নিকটতর। আর তোমরা পরস্পরের মধ্যে অনুগ্রহ ভুলে যেয়ো না। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।*]* (আয়াত নং: ২৩৭)

অতঃপর বর্ণনার প্রসঙ্গ তালাক সম্পূর্ণ হওয়ার পর আরেকটি অবস্থার বিবরণের দিকে অগ্রসর হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, **"আর যদি তোমরা তাদেরকে তালাক দাও, তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে এবং তাদের জন্য কিছু মহর নির্ধারণ করে থাক, তাহলে যা নির্ধারণ করেছ, তার অর্ধেক *(দিয়ে দাও)*।"** যখন স্বামী বিবাহ-সংবন্ধ সম্পন্ন করার পর, কিন্তু সহবাসের পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক দেয়, আর মহর নির্ধারিত হয়ে থাকে, তখন তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত মহরের অর্ধেক পরিশোধ করা আবশ্যক হয়ে যায়। এই বিষয়ে ইসলামি বিদ্বানদের মধ্যে বিশদ আলোচনা ও ফিকহি গবেষণা রয়েছে। এখানে বিষয়টি নির্দিষ্টকরণ, বিশদ ব্যাখ্যা এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে, যা এই আয়াত ও এর পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে মহর নির্ধারিত হয়নি; বরং স্ত্রীর জন্য যা মন থেকে উপযুক্ত মনে হয়, তা দেওয়ার নির্দেশ এসেছে—**"তোমরা তাদেরকে উপভোগ করাও।"** আর এই আয়াতে মহর নির্ধারিত হয়েছে এবং তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য অর্ধেক মহর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে স্ত্রী যদি তা মাফ করে দেয়—**"তবে স্ত্রীরা যদি মাফ করে দেয়"**— তাহলে এটি স্বামীর প্রতি তার উদারতার প্রকাশ হবে। এটি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের এক সুন্দর সুযোগ। কখনো কখনো এটি স্বামীর আর্থিক অবস্থার কারণেও প্রয়োজনীয় হতে পারে। তখন শরিয়তের বিধান অনুসারে স্বামীও সম্পূর্ণ মহর

দিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে উদারতা দেখাতে পারেন। আল্লাহ বলেন, **"কিংবা যার হাতে বিবাহের বন্ধন সে যদি মাফ করে দেয়।"** এখানে **"যার হাতে বিবাহের বন্ধন"** বলতে স্বামীকেই বোঝানো হয়েছে। এ বিষয়ে ইসলামি ফকিহদের মধ্যে আরও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তবে এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, স্বামীর উচিত স্ত্রীকে পুরো মহর প্রদান করা, আর স্ত্রীর উচিত চাইলে তার প্রাপ্য অর্ধেক মহর মাফ করে দেওয়া।

এছাড়া, **অনুগ্রহ ভুলে না যাওয়ার** আল্লাহ তা'আলার দিক-নির্দেশনায় রয়েছে পূর্বে কল্যাণ ও অনুগ্রহ স্মরণের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত। যেহেতু তা মতানৈকের সময় *(ভুল)* উপেক্ষা করার এবং উৎকৃষ্ট ও ভাল মনের মাধ্যমে অনুগ্রহ করার অন্যতম উপলক্ষ। অতঃপর আয়াতে আরও উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে— **"আর তোমরা পরস্পরের মধ্যে অনুগ্রহ ভুলে যেয়ো না।"** অতএব, পুরুষের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ মহর প্রদান করা অথবা নারীর পক্ষ থেকে অর্ধেক মহর ছেড়ে দেওয়া— উভয়টিই মহানুভবতা ও কল্যাণের অংশ। আমাদের প্রতিপালকের দেওয়া বিধান কতই না সুন্দর ও সুপ্রশস্ত*!*

﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ٢٣٩﴾

অর্থ: ***[তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা দাঁড়াবে বিনীতভাবে;* কিন্তু যদি তোমরা বিপদাশংকা কর, তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।]*** *(*আয়াত নং: ২৩৮-২৩৯*)*

অতঃপর কুরআন কারীমের বর্ণনাপ্রসঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে সালাতের বিষয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছে, যাতে স্বামী মারা যাওয়ার পর বিধবা নারীর বিষয়ে নতুনভাবে আলোচনা শুরু করা যায়। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উম্মাহকে সালাতসমূহের হিফাযত করার আদেশ দিয়েছেন, "তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফাযত কর এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে।" এখানে নির্দেশের শব্দে সালাত আদায়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

হিফাযত করার অর্থ হল, নিয়মিত সালাত আদায় করা, যা সালাত আদায়ে লেগে থাকার এবং তাতে অমনোযোগী না হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। এটি সালাতের মহান মর্যাদার প্রমাণ বহন করে এবং তাতে অবিচল থাকার ও তা হিফাযত করার গুরুত্বকে বুঝায়। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করে, তার মর্যাদাও বিশেষ উচ্চ। যেহেতু আল্লাহর নির্দেশ পালনে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে তার জন্য রয়েছে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা। আতপর আল্লাহ মধ্যবর্তী সালাতকে নির্দিষ্ট করেছেন, এবং তার মর্যাদার কারণে তা সালাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, আলাদা করে উল্লেখ করেছেন। কারও মতে, মধ্যবর্তী সালাত হলো আসরের সালাত। আবার কারও মতে, এটি অন্য কোনো সালাত। এর নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে দশটি মত রয়েছে। কারও মতে, এটি লাইলাতুল ক্বদর-এর মতোই অস্পষ্ট, যেন মু'মিন তা পেতে চেষ্টা করে।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তার অস্পষ্টতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এটি সঠিক ইনশাআল্লাহ, যেহেতু দলীলসমূহের মাঝে পরস্পরবিরোধিতা রয়েছে এবং অগ্রাধিকার দেওয়া যাচ্ছে না। তদুপরি, বাকি সব সালাতেরই হিফাযত করা এবং যথা সময়ে তা আদায় করা জরুরি। আল্লাহই ভাল জানেন। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে সকল সালাতের হিফাযতের দিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, যেহেতু আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে ব্যক্তি সকল সালাত হিফাযত করবে, তার মধ্যে মধ্যবর্তী সালাতও অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া, এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, যেকোনো একটি সালাতের রয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব ও আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মর্যাদা, যা মু'মিন সকল সালাতের মাঝে অনুসন্ধান করবে এবং তাতে আরও বেশি কল্যাণ অর্জন করবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সালাতের কিয়ামের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, **"আর আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে।"** তিনি মু'মিনদের আল্লাহর সামনে তাঁর সালাতে বিনয়ী হয়ে, নত হয়ে, বাধ্যগত হয়ে ও বিনীতভাবে দাঁড়াতে আদেশ করেছেন। তাই সালাতের মধ্যে কথা বলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যায়দ বিন আরকাম (রাঃ) বলেন, 'আমরা সালাতে কথা বলতাম। লোকেরা তার পাশের জনের সাথে কথা বলত, অথচ তারা সালাতে থাকত। পরে নাযিল হলো, **"আর আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে।"** তারপর আমাদেরকে চুপ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হলো এবং কথা বলতে নিষেধ করা হলো।' এসব অর্থ "বিনীত হয়ে" শব্দ থেকে বোঝা যায়, যা সালাতের জন্য জরুরী। এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মু'মিনের জন্য সালাতের মধ্যে যা করতে হবে তা হলো— বিনয়ের সাথে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো।

যখন আল্লাহ তা'আলা সালাতে প্রশান্তি ও বিনয়ের সাথে দাঁড়ানোর আদেশ দিয়েছেন, এবং এটি মু'মিনদের সালাতের অধিকাংশ অবস্থায় হয়ে থাকে, তখন তিনি পরবর্তী আয়াতে মু'মিনের হঠাৎ ভয়ের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, **'কিন্তু যদি তোমরা ভয় কর, তবে হেঁটে কিংবা আরোহণ করে (আদায় করো)।'** ভয় অর্থাৎ

শঙ্কা, যেকোনো ভীতিজনক ব্যাপার। এখানে ভয় শব্দটি সাধারণভাবে এসেছে, কোনো বিশেষ ঘটনার সাথে এটি সম্পৃক্ত করা হয়নি, যাতে সকল প্রকার ভয় বোঝানো হয়। অতঃপর তিনি বলেছেন যে, এই ইবাদতটি ভয়ের সময়েও বান্দার উপর থেকে বাদ পড়বে না (তখনও আদায় করতে হবে)। তিনি ভীত ব্যক্তির জন্য বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন যে, সে পায়ে হেঁটে চলা অবস্থায়, চতুষ্পদ প্রাণীর উপর আরোহী অবস্থায়, অথবা অন্য কোনো বাহনে (যেমন গাড়ি, সাইকেল ইত্যাদি) অবস্থান করে, আদায় করতে পারবে। তবে এটি তার সাধ্যানুযায়ী হবে এবং কিবলামুখী হয়ে তা করতে হবে। এভাবে সালাত আদায় করার মাধ্যমে সময়মত এবং ভয়-শঙ্কার অবস্থায় বিলম্ব না করার গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

এরপর, মুসলিম ব্যক্তির জন্য সালাত তার নির্ধারিত সময়ের শেষে বাধ্যগত কোনো কারণ ছাড়াই বিলম্ব করা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। যখন ভীত ব্যক্তির জন্য ছাড় দেয়া হয়নি, তখন নিরাপদ অবস্থায় ছাড় দেয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে? তাই আল্লাহ তা'আলা এর প্রতি তাগিদ দিয়েছেন, আয়াতের শেষাংশে **"এরপর যখন নিরাপদ হবে তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।"** অতঃপর নিরাপদ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা পূর্ণাঙ্গভাবে সালাত আদায় করতে আদেশ করেছেন, যেভাবে তিনি তোমাদের তা আদায় করা শিখিয়েছেন, যখন তোমরা নিরাপদ ছিলে— অর্থাৎ রুকু', সিজদাহ, কিয়াম, বসা ও একাগ্রতার সাথে পূর্ণতা দিয়ে। এতে ফুটে ওঠে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যাতে তারা ঈমান, ইবাদত ও চরিত্র শিক্ষা লাভ করে। আর এই দ্বীনের যা কিছু তোমরা শিখেছো, যা সম্পর্কে তোমরা পূর্বে অজ্ঞ ছিলে।

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী, **"এরপর যখন নিরাপদ হবে তখন আল্লাহকে স্মরণ কর"**, এটা সালাত এবং সাধারণ যিকর তথা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও হাম্দ

(আল-হামদুলিল্লাহ) পড়াকেও অন্তর্ভুক্ত করছে। এবং এখানে দুটি মত রয়েছে। সুতরাং, তিনি যেমন তোমাদেরকে দ্বীনের কল্যাণ শিক্ষা দিয়েছেন, যা সম্পর্কে তোমরা জানো নি, তেমনি তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাধারণ ও সকল প্রকার যিকর করো।

তাছাড়া, অত্র দ্বীন বিধি-বিধানগুলো কঠোরতা বা অক্ষমকরণের মুক্ত। বরং আল্লাহ তা'আলা পর্যাপ্ত ইবাদাত গ্রহণ করবেন, যদি কোনো অক্ষমতার কারণে তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করা সম্ভব না হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ভয়ের মুহূর্তে ফলপ্রসূ পথের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে ভয়ের সময়ে সালাত আদায়ের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন, যা তারা জানতো না। সুতরাং, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তার সমস্ত প্রকার যিকর করা আবশ্যক হয়ে গেছে।

এছাড়া, এটাও বুঝা যায় যে, ভীত ব্যক্তির জন্য সালাত মাফ নেই। তাই অন্যান্য অবস্থায়ও সালাত মাফ নেই। বরং যা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে, যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর রাসূল (সঃ) যেভাবে বর্ণনা করেছেন ও নির্দেশ করেছেন তাঁর পবিত্র হাদীসে। এটি সালাতের মর্যাদা, গুরুত্ব ও মহত্ত্বের ব্যাপারে শক্তিশালী ও মহান দলীল। বান্দার জন্য জরুরি হলো সালাতের ব্যাপারে অবহেলা না করা, বরং তাকে সম্মান করা, তার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা, তা সংরক্ষণ করা, একাগ্রতার সাথে চেষ্টা করা এবং তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করা জরুরি।

﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾﴾

অর্থ: **['আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যাবে এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যাবে, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য এক বছরের ভরণ-পোষণের ওসিয়ত করবে- বের না করে দিয়ে; কিন্তু যদি তারা (স্বেচ্ছায়) বের হয়ে যায়, তাহলে তারা নিজেদের ব্যাপারে বিধি মোতাবেক যা করেছে, সে ব্যাপারে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য থাকবে বিধি মোতাবেক ভরণ-পোষণ। এটি মুত্তাকীদের উপর আবশ্যক। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা দেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি কর।]** (আয়াত নং: ২৪০-২৪২)

যার স্বামী মারা গেছে, সেই স্ত্রী এবং তার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নির্দেশের আলোচনা আবার ফিরে এসেছে। হয়তো এই পদ্ধতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যই গ্রহণ করা হয়েছে, তবে প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ না করেই, যাতে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয়। কারণ, বক্তা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যতীত অন্য কিছু বাদ দেন না, বরং যখন কোনো বিষয় অতীব জরুরি মনে করেন, তখনই তিনি নতুন করে আলোচনা শুরু করেন। যেহেতু এটি সালাতের বিষয়, আর সালাত দ্বীনের মূল স্তম্ভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **"আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যাবে এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যাবে, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য এক বছরের ভরণ-পোষণের ওসিয়ত করবে বের না করে দিয়ে।"** অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিধবা নারীদের প্রতি আচরণের নিয়ম-নীতি বর্ণনা করেছেন এবং এটি তাঁর নির্দেশ ও দয়ার বহিঃপ্রকাশ। বিধবা নারী তার স্বামীর বাড়িতে পূর্ণ এক বছর অবস্থান করতে পারবে এবং তাকে সেখানে থাকতে

দেওয়া হবে, যাতে সে সম্মান ও ভরণ-পোষণসহ প্রয়োজনীয় সুবিধা পায়। এটিই তার সম্মান এবং তার মৃত স্বামীর প্রতি সদ্ব্যবহার। আল্লাহ তা'আলা বিধবা নারীর ইদ্দতের মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন চার মাস দশ দিন, আর ভরণ-পোষণের ওসিয়ত করেছেন এক বছর। এর মাধ্যমে ইসলামী আদর্শের নৈতিক ও চারিত্রিক দিকের প্রতি গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হৃদ্যতা ও সদ্ব্যবহার সংরক্ষণ করা মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মানের অংশ। বিধবা স্ত্রীকে সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা, তার শোকাহত হৃদয়কে শান্ত করা এবং ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে মানসিকভাবে স্বস্তি দেওয়া—এসব ইসলামের সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ।

এটি ইসলামের নির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের প্রতিও গুরুত্বারোপ করে। যাতে শুধুমাত্র সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার দিকটি বিবেচনায় না এনে, পূর্ববর্তী দয়া ও অনুগ্রহের দৃষ্টিতেও তাকানো হয়। যাতে শেষ পরিণতিও হয় দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এক বছর পূর্ণ না করার বিধবা নারীর ইচ্ছাকে অনুমোদন দিয়েছেন। **"কিন্তু যদি তারা (স্বেচ্ছায়) বের হয়ে যায়, তাহলে তারা নিজেদের ব্যাপারে বিধি মোতাবেক যা করেছে, সে ব্যাপারে তোমাদের কোনো পাপ নেই।"** অর্থাৎ, যদি বিধবা নারী ইদ্দত শেষ করে স্বেচ্ছায় বের হয়ে যেতে চায়, তবে সে এতে পূর্ণ স্বাধীন। আর সে নিজে থেকে যা করেছে—যেমন শারিয়তের সীমার মধ্যে থেকে সাজসজ্জা বা অন্য বৈধ বিষয় গ্রহণ—এতে মৃত স্বামীর অভিভাবকদের জন্য কোনো পাপ বা দায়ভার নেই। **"তাহলে তারা নিজেদের ব্যাপারে বিধি মোতাবেক যা করেছে, সে ব্যাপারে তোমাদের কোনো পাপ নেই।"** এই বিধান ইসলামে স্বাধীনতার সঠিক সীমানা নির্ধারণ করে দেয়। অর্থাৎ, উজ্জ্বল শারিয়তের সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না, কারণ ব্যক্তির স্বাধীনতা আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

এটি ইসলামে ব্যক্তি ও সমাজের অধিকার সংরক্ষণের প্রমাণ বহন করে। কেননা, কখনো ব্যক্তির সীমালঙ্ঘনের কারণে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের ওপর কষ্ট বা দায়ভার

আসতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তি ও সমাজের উভয়ের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন, তাদের সম্পর্ক ও সামর্থ্যের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

অতঃপর আয়াতটি শেষ হয়েছে সম্বোধিত ব্যক্তিদের বিশেষ উপদেশ দিয়ে এবং সবাইকে সাধারণ উপদেশ দিয়ে, "আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি পরাক্রমশালী, সকল সম্মান তারই, যে সম্মানের সাথে রয়েছে পূর্ণ ক্ষমতা ও ব্যাপক তত্ত্বাবধান। তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি প্রজ্ঞাময়, এ সকল বিধি-বিধানগুলো তার বিশাল প্রজ্ঞার প্রমাণ বহন করে, যা তার যথাস্থানে প্রয়োগ হয়েছে।

তারপর স্বামী মারা গেছে এমন নারীর ভরণ-পোষণের আলোচনার পর আল্লাহ তা'আলা তালাকপ্রাপ্তা নারীর ভরণ-পোষণের আলোচনা করেছেন। "আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য থাকবে বিধি মোতাবেক ভরণ-পোষণ।" প্রতিটি তালাকপ্রাপ্তা নারী তার স্বামীর কাছে অধিকার রাখেন যে, সে তাকে তাদের উভয়ের অবস্থা অনুযায়ী ভরণ-পোষণ দিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এর বিধান বর্ণনা দিয়েছেন একথা বলে যে, "এটি মুত্তাকীদের উপর আবশ্যক।" বিধানটি হলো হক, আর হক শব্দটি ফরয বুঝায়, তথা ফরয অধিকার যা মুত্তাকীরা আদায় করবে। যা থেকে এটা বুঝা যায় যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা এই অধিকার আদায় করবে। আর অধিকার আদায় করা, তাকওয়ার পরিচায়ক। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা দেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি কর।" অতঃপর বিভিন্ন বিধি-বিধান তথা ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরূহ ও আদব-আখলাক সম্পৃক্ত বিধান সম্বলিত আয়াতসমূহে যা বর্ণনা করেছেন তার দ্বারা, আল্লাহ তা'আলা তার মু'মিন বান্দাদেরকে সুসংহত করেছেন। যাতে তোমরা তার মাধ্যমে বিধি-বিধান আদায় করার পদ্ধতি পরিপূর্ণ বুঝতে পারো।

যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারে, সে আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান আদায় করতে পারে, আর তাই তাকে বলা হয়, জ্ঞানী। আর যে ব্যক্তি অবহেলা করে, তাকে জ্ঞানী বলা হবে না। তথা হিদায়াতের জ্ঞানের জ্ঞানী, বুঝের জ্ঞানের জ্ঞানী নয়। যেহেতু বুঝের জ্ঞানের দায়ভার বান্দার উপর আরোপিত, আর তা হলো পাগল ও বাল্যকাল, বাল্যকাছে ছোট শিশু কোন কিছুর বাস্তবতা বুঝে না, আর তার থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে *(*শিশুর কোন পাপ লিখা হয় না*)*। আর হিদায়াতের জ্ঞান*;* যে জ্ঞান বুঝের জ্ঞানকে ছড়িয়ে যায়, যার সাহায্যে সকল কিছুকে তাঁর প্রকার ও পরিমাণসহ তার ভাল-মন্দ সবটাই জানা যায়। তাই সে সত্য জেনে, তার অনুসরণ করে এবং বাতিল জেনে, তার থেকে দূরে থাকে। আর যে ব্যক্তি সত্য জেনেও তার অনুসরণ করল না এবং বাতিল জেনেও তার অনুসরণ করল, তাকে জ্ঞানী বলা হবে না *(*হিদায়াতের জ্ঞানী বলা হবে না*)*। যেহেতু বুঝতে পারার ফল হলো- উপকারী ও সঠিক জিনিস ব্যবহার করা। এইজন্য লোকেরা রূপক অর্থে বলে প্রকৃত অর্থে নয়, যে ব্যক্তির সামনে ভালোটা স্পষ্ট হওয়ার পরও সে তা গ্রহণ করল না, সে পাগল। তারা তাকে পাগল বলে।

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَهُمۡ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحۡيَٰهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ ٢٤٣ وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٤٤ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافٗا كَثِيرَةٗۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥﴾

অর্থ: ***[তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা তাদের গৃহসমূহ থেকে বের হয়েছে মৃত্যুর ভয়ে এবং তারা ছিল হাজার-হাজার? অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বললেন, 'তোমরা মরে যাও'! তারপর তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শুকরিয়া আদায় করে না।* আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর এবং জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।* এমন কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহ সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে।]*** *(আয়াত নং: ২৪৩-২৪৫)*

আল্লাহ তা'আলা বানু ইসরাঈলদের একটি অবস্থার বিবরণ দিয়ে তাঁর নাবীকে সম্বোধন করে বলেন, "**তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা তাদের গৃহসমূহ থেকে বের হয়েছে মৃত্যুর ভয়ে এবং তারা ছিল হাজার-হাজার?**" এটা নাবী (স)-কে বলা হয়েছে। "তুমি কি দেখনি?" অনুরূপভাবে তা দিয়ে মু'মিনদেরকে ও যারাই আল্লাহ তা'আলার বাণী শুনছে তাদের সবাইকে সম্বোধন করেছেন। যখন নাবী (স)-কে সম্বোধন করা হয়, তখন তার সাথে যারা রয়েছেন তারা সবাই তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা মানব-দানব দুই জাতিকেই সম্বোধন করেছেন।

আর "তুমি কি দেখনি?" বাক্যটি আল্লাহর প্রদত্ত সংবাদের সম্মতিসূচক জিজ্ঞাসা। তিনি তাতে সেই জাতিদের ঘটনাটিকে সম্মতি দিচ্ছেন, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের গৃহসমূহ থেকে বেরিয়ে গেছিল; এজন্য যে, তাদের কিছু সংখ্যক লোক বিপদে পতিত

হয়েছিল, আর বিপদটি তাদের মাঝে বিস্তার লাভ করেছিল। অথবা আকস্মিক শত্রæদের আক্রমণের ভয়ে তারা তাদের গৃহ থেকে বের হয়ে গেছিল। এখানে "তুমি কি দেখনি?" অর্থ: আপনার নিকট কি তাদের সংবাদ পৌঁছেনি? "তুমি কি দেখনি?" বাক্যটির অর্থ: আপনি কি তাদের খবর জানেন না? আর যখন আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে বা বান্দাদেরকে বলেন, "তুমি কি দেখনি?" তখন তিনি বাস্তব ঘটনা এমনভাবে জানান, যেন সম্বোধিত ব্যক্তি তাঁর নিজ চোখে দেখেছে। আর আল্লাহর বাণী "তারা ছিল হাজার-হাজার" অর্থাৎ- বারংবার হাজার সংখ্যা, তথা তারা ছিল কয়েক হাজারের একটি বড় সংখ্যা। তারা বানু ইসরাঈল জাতি যারা তাদের সেই গৃহ থেকে বের হয়ে গেছিল, যেখানে নিধনকারী ঘাতক বিপদ ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা বের হয়ে গেছিল এই ভয়ে যে, তাদেরকে মৃত্যু পেয়ে বসবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "মৃত্যুর ভয়ে" অর্থাৎ মৃত্যু থেকে বাঁচতে তারা বের হয়েছিল। আল্লাহ তাদেরকে মৃত্যু দিলেন; যাতে মানুষদের কাছে এটা নিশ্চিত হয় যে, সতর্কতা তাকদীরের ক্ষেত্রে উপকারে আসে না। যখনই আল্লাহর তাকদীর ও তাঁর নির্দেশ হতে পলায়ন করবে, তখনই আল্লাহর তাকদীর তাকে পেয়ে বসবে, যে ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তা কার্যকর করতে চান। আর যখন মু'মিন ব্যক্তি তা ভালোভাবে বিশ্বাস করে, তখন সে বড় নিশ্চিন্ততা ও প্রশান্তি লাভ করে। তার সামনে গাঢ় কালো বিপদ নেমে আসলেও, সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছার বাস্তবায়ন হবে এবং কোন হেতু আল্লাহ থেকে সামান্য উপকারে আসবে না, যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার ব্যাপারে কোন কিছুর ইচ্ছা করবেন। তারপর মু'মিন ব্যক্তি হেতু গ্রহণ করবে এই বিশ্বাস রেখে যে, স্বয়ং হেতুটি নিজে থেকে কিছুই করতে পারবে না, রক্ষা করতে ও সুরক্ষা দিতে পারবে না। বরং তা হবে আল্লাহর তাকদীর ও ইচ্ছা অনুযায়ী। এটা হবে বান্দার সকল অবস্থাতে, যেমন- অসুস্থতা ও চিকিৎসা, দারিদ্রতা ও ধনাঢ্যতায়। তার ধনাঢ্যতা দারিদ্রতাকে বাধা দিতে পারে না এবং দারিদ্রতা ধনাঢ্যতাকে বাধা দিতে পারে না, যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা না

চান। এভাবেই মানুষের সকল অবস্থায় ও সকল বিষয়ে এমনটাই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত্যু দিয়েছেন, যদিও তারা তাদের বিপদগ্রস্ত গৃহ থেকে বের হয়ে গেছিল। কিন্তু তাদের বের হয়ে যাওয়াতে তাদেরকে মৃত্যুর ফায়সালা থেকে বাঁচাতে পারেনি, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদের মৃত্যু চেয়েছেন। "অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বললেন, 'তোমরা মরে যাও'!" তারা আল্লাহ নির্দেশে সবাই মারা গেল। আবার যখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জীবিত করতে চাইলেন তখন তাদেরকে জীবিত করলেন, যেমন তিনি বলেছেন, "তারপর তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন" সুতরাং সকল নির্দেশ আল্লাহরই।

এর মানে কিন্তু এটা নয় যে, ক্ষতিরোধকারী হেতু বর্জন করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার পদ্ধতি হল, তিনি ক্ষতিকর ও অনিষ্টকর বস্তু থেকে দূরে থাকতে আদেশ করেন। দূরে থাকার অর্থ ক্ষতিরোধকারী ও কল্যাণ আনয়নকারী হেতু গ্রহণ করা। যেমন জিহাদ হলো হেতু গ্রহণ করা। তবে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন, যাতে মু'মিন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন কোন হেতু তাকে বাধা দিতে পারে না এবং (আল্লাহর ইচ্ছের বিরুদ্ধে) তার কোন উপকার সাধন করতে পারে না। আর মু'মিন ব্যক্তির সামনে ভীতিকর কোন কিছু আসে তখন যাতে তার প্রশান্তি লাভ হয় এবং প্রশান্তির ক্ষেত্রে হেতু গ্রহণ করে। ফলে তার রবের ব্যাপারে তার আক্বীদা সংরক্ষিত থাকল এবং তার ঈমানের নিরাপত্তা, প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা সংরক্ষিত থাকল।আর আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা আক্রমণাত্মক জিহাদ বা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদে, যুদ্ধ করা হেতু গ্রহণ করার অন্যতম। শুধুমাত্র হেতুর মাধ্যমে সাহায্য নিশ্চিত হবে না। বরং আল্লাহর ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত, সহায়তা ও উদ্দেশের মাধ্যমে (সাহায্য) পাওয়া যাবে। হেতু যা-ই হোক আল্লাহর ইচ্ছার বিপক্ষে তা কোন উপকারে আসবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এবং তার অন্যান্য সৃষ্টির উপর তার অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তো মানুষের উপর অনুগ্রহশীল।" যেহেতু তাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ হলো মৃত্যুর পর জীবিত করা; যেন তিনি তাদের থেকে তাদের অপছন্দনীয় বস্তু দূরীকরণের মাধ্যমে তাদের উপর কীভাবে অনুগ্রহ করেছেন তা বর্ণনা করে দেন। যদি মুসলিম ব্যক্তি তার জীবন যাত্রা নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে সে পেয়ে যাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে অসংখ্য খারাপকে দূর করে দিয়েছেন। আর অসংখ্য এমন বিপদাপদ তার থেকে দূর হয়ে গেছে তাকে আক্রান্ত না করেই বা সে তার পাশে না গিয়েই, যা সে জানতোই না। তাই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও প্রশংসা করা জরুরি। কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদাসীন লোকের সংখ্যা অনেক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শুকরিয়া আদায় করে না।" আর তাদের প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর সংখ্যা খুবই কম। আর এটাই মু'মিন ব্যক্তিকে তার রবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ও প্রশংসা করতে বলে, সে আল্লাহর যে নিয়ামাত সম্পর্কে জানে তার জন্য এবং যে নিয়ামাত সম্পর্কে জানে না তার জন্যও।

উক্ত ঘটনাটি মু'মিন বান্দার মাঝে বিপদাপদে ও দুর্যোগ মুহূর্তে আন্তরিক সাহস সঞ্চার করে। তাই সে বিপদের সময় তার শক্তি, সাহস ও মনের সজীবতা নষ্ট করতে পারে এমন ভয় ছাড়াই নিজের কাজ সম্পাদন করে। আর এমন কোন উৎকণ্ঠ নেই যা তাকে রাগান্বিত করে আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কাজে লিপ্ত করতে পারে। আল্লাহর উম্মুক্ত তরবারি সাহাবী খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) যুদ্ধের প্রথম সারিতে প্রবেশ করতেন, কিন্তু তিনি বর্শার খোঁচাতে বা তরবারির আঘাতে মৃত্যুবরণ করেননি। তিনি বলতেন, 'আমি এই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, আর আমার শরীরে এক বিঘত পরিমাণ স্থানও নেই যেখানে তরবারির আঘাত বা তীরের আঘাত নেই। অথচ দেখ, আমি আমার বিছানায় মারা যাচ্ছি, যেমন গাধা মারা যায়। সুতরাং কাপুরুষদের চোখ ঘুমাতে পারে না।' আর

যুদ্ধ ক্ষেত্রে মু'মিনের ঈমান ও অনড়তা আরও বেশি বৃদ্ধি পায়। তাই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের প্রতি উৎসাহপ্রদান করা হয়েছে। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার নির্দেশ এসেছে। তিনি বলেছেন, "আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর" আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাস্তায় যুদ্ধ করার নির্দেশ করেছেন; যাতে তার মাঝে বীরত্বের ভিত্তি গড়ে ওঠে এবং তার থেকে বুঝতে পারে যে, মৃত্যুর ভয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ-যুদ্ধ থেকে পলায়ন করবে না। যেমন তাদেরকে মৃত্যু পেয়েছে, অথচ তারা মৃত্যুর কারণ থেকে পালিয়েছিল। যেমন পূর্বে কাহিনীতে এসেছে।যার বর্ণনা আয়াতে কারিমাটি করেছে।

আর আল্লাহ তায়ালার বাণী **"আল্লাহর রাস্তায়"**—এতে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য তাওহিদ ও একনিষ্ঠতার বর্ণনা এসেছে। সুতরাং, আল্লাহ তায়ালার পথ ছাড়া অন্য কোনো পথে জিহাদ হতে পারে না। ইমাম মালেক *(রহ.)* আল্লাহ তায়ালার পথ সম্পর্কে বলেন: **"আল্লাহ তায়ালার পথ বহু, এবং এমন কোনো রাস্তা নেই যেখানে সংগ্রাম করতে হয় না। তবে সর্ববৃহৎ পথ হলো ইসলাম।"** আল্লাহ তায়ালার বাণী **"আল্লাহর রাস্তায়"**– এটিই প্রকৃত রাস্তা, যা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। আর এই পথের অন্যতম অংশ হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

এরপর আয়াতটি একটি মহান নির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়ে শেষ হয়েছে: **"আর তোমরা জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।"** আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিচ্ছেন যে, তিনি তাবারকা ওয় তায়ালা প্রত্যেকের নিয়ত ও উদ্দেশ্য জানেন এবং যা কিছু বান্দা বলে বা করে, বিশেষ করে জিহাদ বা অন্য কোনো বিষয়ে, তিনি তা সবই শোনেন ও জানেন। এই কুরআনের বর্ণনার মাধ্যমে বান্দাদের সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ও তায়ালার শ্রবণ, জ্ঞান ও ক্ষমতা পরিবেষ্টনের বিষয়ে অসতর্ক না থাকে। তদ্রূপ, আমলের নির্দেশও তাদের সেই শিক্ষার আলোকে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: **"আর তোমরা জেনে রাখো, নিশ্চয়ই**

আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।" এতে আল্লাহ সুবহানাহু ও তায়ালার নাম, গুণাবলীর বিষয়ে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। সেই সঙ্গে, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষা গ্রহণ-প্রদানের ফজিলত ও কল্যাণের দিকও তুলে ধরা হয়েছে, যা ইসলামি জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের অপরিহার্যতা নির্দেশ করে।

আর জিহাদে যুদ্ধের সরঞ্জাম, সৈন্যদের খাবার-পানীয়, পোশাক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। এ কারণে, আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালা তাঁর পথে ব্যয় করতে বান্দাদের উৎসাহিত করেছেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন: **"কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে?"** এই আয়াতে অধিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণামূলক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, কে আল্লাহর রাস্তায় দান করবে? এই দানের ক্ষেত্রে দাতা হলো বান্দা, আর গ্রহণকারী হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাবারকা ও তায়ালা, যিনি এর প্রতিদান বহুগুণ বাড়িয়ে ফিরিয়ে দেবেন। এ আয়াতে **"ঋণ"** শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তবে এটি পার্থিব ঋণের মতো পুনরাবৃত্তির ভিত্তিতে নয়, বরং এটি বিশ্বজগতের অধিপতির কাছে দানের আহ্বান। এ আদেশের জন্য **"উত্তম ঋণ"** শর্ত করা হয়েছে, যার অর্থ হলো বিশুদ্ধ নিয়ত ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে দান করা। **"উত্তম"** শব্দটি নিয়ত, পরিমাণ ও গুণগত মানের সর্বোচ্চ উৎকর্ষ বোঝায়। তাই এই দান হতে হবে ঈমান, শিষ্টাচার ও ইহসান দ্বারা পরিপূর্ণ, যাতে কোনো রিয়া (লোক দেখানো) বা কৃপণতার মিশ্রণ না থাকে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা দানকারীর প্রতিদান বর্ণনা করেন। **(তার জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে)** সুতরাং তিনি বৃদ্ধির পরিমান নির্ধরাণ করেননি। না দ্বিগুন না তিনগুন বরং বহুগুণ বৃদ্ধি, যা আল্লাহ তাবরকা ওয়া তায়ালা ছাড়া কেউ গণনা করতে পারে না।আর ইহা থেকে দানের ব্যাপারে দয়া ও দানশীলতার বদান্যতার গুরত্বের ফায়েদা নেয়া যায়। আর যে র্কয দেয় তার সাতে করয গ্রহনকারীর সময়, পরিমান, কৃতজ্ঞতা, প্রশংসা ও দয়া করার ফায়েদা দেয়। কেননা তা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার পদ্ধতি।

এরপর, আল্লাহ তায়ালা আয়াতে কারিমার পূর্ণতায় আক্বিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আচরণ এবং স্থিরতার ওপর তার প্রভাব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: **"আল্লাহ কমিয়ে দেন ও বাড়িয়ে দেন এবং তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে।"** সুতরাং, রিযিক আল্লাহর হাতে। তিনি কারো পরীক্ষার জন্য রিযিক কমিয়ে দেন এবং কারো পরীক্ষা ও পরখ করার জন্য তা বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। এই উপলব্ধি একজন মুমিনের ঈমান ও রবের প্রতি নির্ভরতা বাড়ায়। সে বিশ্বাস করে যে রিযিকের প্রসারতা, বরকত ও সহজলভ্যতা সবই আল্লাহর হাতে। তাই, সে যা পেয়েছে কম হোক বা বেশি—তাতে সে সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ থাকে। কারণ, সে জানে, আল্লাহ যা চান তাই হুকুম করেন এবং আল্লাহ যা করেন তাতেই কল্যাণ রয়েছে। ফলে, আল্লাহ যাকে রিযিক বাড়িয়ে দেন, সে তা আল্লাহর আনুগত্য ও দানে ব্যয় করে। আর যার রিযিক সংকীর্ণ করা হয়, সে ধৈর্য ধারণ করে ও হতাশ হয় না। এরপর, আয়াতে কারিমার বাণী শেষ হলেও, তার প্রভাব ও শিক্ষা চিরস্থায়ী: **"এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন।"** এটি দুনিয়ার জীবনের অন্তিম পরিণতি এবং আখিরাতের গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা নির্দেশ করে—মৃত্যুর পর প্রত্যেককে আল্লাহর দরবারে ফিরে যেতে হবে। তারপর, সব আমলের হিসাব নেওয়া হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মফল অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। এই শিক্ষা একজন মুমিনকে কল্যাণকর কাজের প্রতি উৎসাহিত করে এবং ক্ষতিকর বিষয় থেকে রক্ষা করার উপদেশ দেয়।

এ আয়াত একজন দায়ী (দাওয়াতপ্রদানকারী), আল্লাহভীরু ব্যক্তি ও উপদেশদাতার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বহন করে। এটি কুরআনের সত্যতা উপলব্ধি করার এবং মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করার অপরিহার্যতা তুলে ধরে। এতে মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা ও উত্তম চরিত্রের লালনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা রব্বুল আলামিনের জন্য।

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلۡمَلَإِ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعۡدِ مُوسَىٰٓ إِذۡ قَالُواْ لِنَبِيّٖ لَّهُمُ ٱبۡعَثۡ لَنَا مَلِكٗا نُّقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ قَالَ هَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ أَلَّا تُقَٰتِلُواْۖ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدۡ أُخۡرِجۡنَا مِن دِيَٰرِنَا وَأَبۡنَآئِنَاۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ تَوَلَّوۡاْ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنۡهُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ﴾

অর্থ: **[তুমি কি মূসার পরবর্তী বনী-ইস্রাঈল প্রধানদের দেখনি? যখন তারা নিজেদের নবীকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত কর, যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি।' সে বলল, 'বোধ হয় যদি তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হয়, তাহলে তোমরা তা করবে না?' তারা বলল, 'আমরা যখন আপন ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি, তখন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না কেন?' অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, তখন তাদের স্বল্পসংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। আর আল্লাহ অপরাধিগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।]** *(*আয়াত নং: ২৪৬*)*

এটি আরেকটি ঘটনা, যা মুমিনদের বিপদের সময় তাদের শত্রুর সামনে তাদের সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তুমি কি মূসার পরবর্তী বনী-ইসরাঈল প্রধানদের দেখনি? যখন তারা নিজেদের নবীকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করুন, যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি।" আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুমিনগণ এবং কুরআনের সকল পাঠকের উদ্দেশ্যে বনী-ইসরাঈলের একটি গোত্রের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এটি মুসা আলাইহিস সালামের পরবর্তী কোনো সময়ের ঘটনা। এখানে বোঝা যায় যে, সে যুগে অনেক নবী ছিলেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা মুসা ও ঈসা আলাইহিস সালামের মধ্যবর্তী সময়ে পাঠিয়েছিলেন। বনী-ইসরাঈল তাদের নবীর কাছে অনুরোধ করল যে, তিনি যেন তাদের জন্য এমন একজন নেতা নির্ধারণ করেন, যিনি তাদের পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন। তারা বলল, যদি এমন একজন নেতা নিযুক্ত করা হয়, তাহলে তারা তার নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী পরিচালনায় সহযোগিতা করবে এবং আল্লাহর পথে

জিহাদে অংশ নেবে। কুরআনে এই বর্ণনাটি এমনভাবে এসেছে, যা পাঠককে দৃশ্যমান বাস্তবতার অনুভূতি দেয়। এটি এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যেন তারা এই ঘটনাগুলো নিজ চোখে দেখছে। আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান এবং তিনি যা বর্ণনা করেছেন, তা নির্ভুল ও সন্দেহের ঊর্ধ্বে। এই ঘটনা পাঠকদের সামনে বাস্তব ও স্পষ্ট করে উপস্থাপিত হয়েছে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—যুদ্ধে নেতা ও পরিচালকের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে সৈন্যরা তাদের আমিরের অনুসরণ করবে। একই নেতার ছায়াতলে সকলের একতাবদ্ধ হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই এখানে এমন বার্তা দেওয়া হয়েছে, যাতে উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। এটি যুদ্ধ পরিচালনার সার্বিক কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শুধু যুদ্ধ নয়, সমাজ বা যে কোনো কাঠামো পরিচালনার ক্ষেত্রেও নেতৃত্বের এই গুরুত্ব অপরিহার্য। এরপর তারা নিজেদের উদ্দেশ্য ও চলার পথ নির্ধারণ করল, যার ওপর তারা একতাবদ্ধ হলো। সেটি হলো—"আমরা আল্লাহ তাআলার পথে যুদ্ধ করব।" সুতরাং মূল বিষয় হলো—উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা। বিভিন্ন পেশার মানুষ তাদের অভিন্ন লক্ষ্যকে সামনে রেখে একত্রিত হলো—ছোট-বড় সবাই। কিন্তু তাদের নবী চেয়েছিলেন, তারা যেন নিজেদের এই আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্পের বিষয়ে নিশ্চিত হয়। তাই তিনি তাদের কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি, বরং বারবার তাদের দৃঢ়তা পরীক্ষা করলেন। তিনি বললেন, **"বোধ হয় যদি তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হয়, তাহলে তোমরা তা করবে না?"** এটি প্রমাণ করে যে, কোনো বিষয়ের নিশ্চয়তা দেওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে সবাইকে বাস্তবসম্মত চিন্তা করতে বাধ্য করার গুরুত্ব এখানে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

هَلْ عَسَيْتُمْ- এই বাক্যটি আশা ও আকাঙ্ক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। **قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا** তিনি বললেন, **"বোধ হয় যদি তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হয়, তাহলে তোমরা তা করবে না?"** এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তারা

আল্লাহর আদেশ থেকে সরে আসবে। اَلَّا تُقَاتِلُوْا—এটি তাদের নবী তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ—এটি প্রমাণ করে যে, তিনি নিজে থেকে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেননি। বরং তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে যুদ্ধের অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন।

اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ- এখানে كُتِبَ শব্দের অর্থ فرض (ফরজ করে দেওয়া)। অর্থাৎ, যিনি যুদ্ধ ফরজ করেছেন, তিনি হলেন আল্লাহ তাআলা। তারা নবীর কাছে জবাব দিল যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার কারণকে নাকচ করার মাধ্যমে এবং যুদ্ধের প্রতি তাদের আগ্রহের কারণকে তুলে ধরার মাধ্যমে; তারা বলল, **"আমরা কেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না?"** তারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিল এবং যুদ্ধের জন্য একটি দৃঢ় কারণ উপস্থাপন করল- وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ اَبْنَآئِنَا "**অথচ আমাদেরকে নিজ ঘরবাড়ি ও সন্তান-সন্ততি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে।**" এটি প্রমাণ করে যে, যুদ্ধের জন্য এটি একটি যথেষ্ট কারণ ছিল।

এর আরেকটি উপকারী দিক হলো—বাক্য গঠনের কৌশল। এখানে প্রথমে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার সম্ভাবনাকে নাকচ করা হয়েছে, তারপর তার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এটি বাক্য গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতি। "**অতঃপর যখন তাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করা হলো, তখন তাদের অধিকাংশই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল, কেবল অল্পসংখ্যক ব্যতীত।**" এটি তাদের নবীর কাছ থেকে নেওয়া প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের পরিণতি। ফলে অধিকাংশই পিছিয়ে গেল, আর কেবল সামান্য কয়েকজন রইল যারা নদী পার হয়েছিল। এর বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যুদ্ধের বিধান আসার পর গুজব রটনাকারী ও যুদ্ধ করতে না চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য কঠিন পরিণতি অপেক্ষা করছিল। যদিও সংখ্যায় তারা কম ছিল, কিন্তু তাদের নিষ্ঠার কারণে তারা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তবে এটি তখনই সম্ভব হয়েছিল, যখন তাদের মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তিরা সরে গিয়েছিল। এতে মুমিনদের জন্য শিক্ষা রয়েছে- সবাই পালিয়ে যাওয়া লোকদের

মতো নয়, বরং যারা স্থির ছিল, তারা অনুসরণযোগ্য। তাই প্রকৃত বিজয় তাদেরই জন্য যারা ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে টিকে থাকে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো—সত্যের ওজন কখনো সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। বরং সত্যকে অনুসরণ করতে হয়, যদিও তা গ্রহণকারীরা সংখ্যায় কম হয়। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতটি وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ বাক্যের মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন— "আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সবকিছু জানেন।" তিনি অত্যাচারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যারা সমাজে অন্যায় ছড়িয়ে দেয়। এ আয়াতের মাধ্যমে এই উম্মতের জন্যও একটি শিক্ষা রয়েছে—তারা যেন সত্য ও ন্যায়ের ওপর ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং সেই ব্যক্তিদের মতো না হয়, যারা যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যদিও তারা প্রথমে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল, কিন্তু বাস্তবে তার থেকে পিছিয়ে গিয়েছিল। আরেকটি শিক্ষা হলো—যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেছে, তাদের পথ আসলে জালিমদের পথ। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফরজকৃত বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। অবশেষে, এমন ব্যক্তি আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়।

﴿وَقَالَ لَهُمۡ نَبِيُّهُمۡ إِنَّ ٱللَّهَ قَدۡ بَعَثَ لَكُمۡ طَالُوتَ مَلِكٗاۚ قَالُوٓاْ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلۡمُلۡكُ عَلَيۡنَا وَنَحۡنُ أَحَقُّ بِٱلۡمُلۡكِ مِنۡهُ وَلَمۡ يُؤۡتَ سَعَةٗ مِّنَ ٱلۡمَالِۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰهُ عَلَيۡكُمۡ وَزَادَهُۥ بَسۡطَةٗ فِي ٱلۡعِلۡمِ وَٱلۡجِسۡمِۖ وَٱللَّهُ يُؤۡتِي مُلۡكَهُۥ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٢٤٧﴾

অর্থ: **[তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, আল্লাহ তালূতকে তোমাদের রাজা নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল, সে কিরূপে আমাদের উপর রাজা হতে পারে, অথচ রাজা হওয়ার জন্য আমরা তার চেয়ে অধিক হকদার; তাছাড়া তাকে আর্থিক সচ্ছলতাও দেওয়া হয়নি। নবী বলল, আল্লাহই তাকে মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে এবং দেহে সমৃদ্ধ করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজত্ব দান করেন। আর আল্লাহ বিশাল অনুগ্রহশীল, প্রজ্ঞাময়।]** *(* আয়াত নং: ২৪৭*)*

এরপর এখানে আরেকটি কঠোর বাস্তবতা উঠে এসেছে—যখন আল্লাহ তাআলা তাদের চাওয়া অনুযায়ী সাড়া দিলেন এবং তালুতকে তাদের বাদশাহ হিসেবে মনোনীত করলেন। এখানে কঠোর দিকটি হলো—কেবল সরাসরি নির্দেশ দেওয়ার পরিবর্তে তাদের বিবেককে পরীক্ষা করা এবং সামান্য ইঙ্গিত দিয়েই বড় শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তারা আপত্তি করে বলল: **قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا** *(*"কীভাবে সে আমাদের বাদশাহ হতে পারে*?"*) এরপর তাদের আপত্তির কারণ উঠে এসেছে: **وَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ** *(*"আমরা তার চেয়ে রাজত্বের বেশি উপযুক্ত, আর তাকে তো পর্যাপ্ত সম্পদও দেওয়া হয়নি।"*)*

প্রথম আপত্তি: وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ *(*"আমরা তার চেয়ে রাজত্বের বেশি হকদার।"*)* এটি 'অগ্রাধিকারের' ভিত্তিতে আপত্তি করা হয়েছে। তারা মনে করেছিল, বাদশাহ হওয়া উচিত তাদের গোত্র থেকেই। এখানে **أَحَقُّ** শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিভিন্ন অর্থ বহন করে। তবে এখানে তা **অগ্রাধিকারের** ইঙ্গিত করছে। তাদের ধারণা ছিল, বংশ ও সম্পদের ভিত্তিতে বাদশাহ নির্ধারিত হয়। মানুষ সাধারণত এমনই ধারণা

করে—যে বেশি সম্পদশালী বা উচ্চ বংশীয়, সে নেতৃত্বের বেশি উপযুক্ত। অথচ এ ধারণা ভুল, কারণ এটি আল্লাহর তাকদীর ও সিদ্ধান্তের বিপরীত। মানুষ কখনো কখনো আল্লাহর বিধান ও ইচ্ছা সম্পর্কে অন্ধ হয়ে যায়, কেবল বাহ্যিক মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয় আপত্তি: وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ("তার তো পর্যাপ্ত সম্পদ নেই।") এখান থেকে বোঝা যায়, তালুত ছিলেন সাধারণ ও কম সম্পদের অধিকারী। তাদের দৃষ্টিতে ধনী হওয়াটাই নেতৃত্বের মূল ভিত্তি। এটি প্রমাণ করে যে, মানুষের মূল্যায়নের মানদণ্ড অনেক সময় ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, তারা বাহ্যিক বিষয়কেই গুরুত্ব দেয়, অথচ প্রকৃত নেতৃত্বগুণ অন্তরের বিশুদ্ধতা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও তাকওয়ার ওপর নির্ভরশীল।

আর নদীর ধারে এসে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের সত্যিকারের পরীক্ষা নিলেন এবং অনেককে প্রত্যাখ্যান করলেন।

তালুতকে নেতৃত্বের জন্য মনোনীত করার প্রথম ও প্রধান কারণ ছিল—তিনি ছিলেন সাধারণ এবং গরিব, অথচ আল্লাহ তাআলা তাকেই পছন্দ করেছেন। **اِنَّ اللهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ** ("নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে তোমাদের ওপর বাছাই করেছেন।") **اصْطَفٰى (পছন্দ করা)** শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তিনি সকলের মধ্য থেকে সবচেয়ে যোগ্য ও প্রিয় ব্যক্তিকে বেছে নিয়েছেন। তিনি এমন গুণাবলির অধিকারী ছিলেন যা অন্যরা বুঝতে পারেনি, কারণ তাদের চিন্তাভাবনা ছিল সংকীর্ণ। এটি নবীদের মনোনয়নের ক্ষেত্রেও আল্লাহর সুস্পষ্ট নীতি—তিনি যাকে চান, তাকেই বাছাই করেন। তবুও আল্লাহ তাআলা আরও সুস্পষ্টভাবে তার যোগ্যতার বিবরণ দিয়েছেন:

وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ ("আর তিনি তাকে জ্ঞানে প্রশস্ততা দিয়েছেন।") এটি দ্বিতীয় প্রধান গুণ—যা প্রমাণ করে যে, সত্যিকার নেতৃত্বের জন্য গভীর জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

কেবল বংশ বা সম্পদ নয়, বরং গভীর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাই যোগ্য ব্যক্তির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ("আর তিনি তাকে জ্ঞান ও শারীরিক সক্ষমতায় বিস্তৃতি দিয়েছেন।") এটি তৃতীয় প্রধান গুণ—শারীরিক শক্তি ও সক্ষমতা। কারণ নেতৃত্বে শারীরিক শক্তি অপরিহার্য, বিশেষত যুদ্ধ ও কষ্ট সহ্য করার মতো পরিস্থিতিতে।

এইসব গুণ তালুতকে অন্যদের চেয়ে বেশি যোগ্য করে তুলেছিল। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—নেতৃত্ব মানুষের ইচ্ছা ও ধনসম্পদের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না, বরং আল্লাহ যাকে চান, তাকেই এই দায়িত্ব দেন। ("আর আল্লাহ যার ইচ্ছা, তাকে রাজত্ব দান করেন।") এটি সেই চিরন্তন সত্য, যা আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানেও উল্লেখ করেছেন—তিনি যাকে চান, সম্মান দেন, আর যাকে চান, অপদস্থ করেন।

অতঃপর এই আয়াতটি মহান উপদেশের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। আর তা হলো وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ আল্লাহ তাআলা তার জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপক এবং দান করার ক্ষেত্রে অনুগ্রহের ক্ষেত্রে এমনকি ক্ষমতার ক্ষেত্রেও। আর তিনি সকল বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত। আর একটু উপকার হলো অনুরূপভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যিনি প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের মাঝে রিযিক বিছিয়ে দিয়েছে। আর তিনি তালুত সম্পর্কে ভালোভাবে জানতেন। ফলে তিনি তাকে তোমাদের মধ্য থেকে রাজত্ব দান করেছেন। তিনি ভালোভাবে জানতেন এজন্যই তাকে পছন্দ করেছেন। পরবর্তীতে কারো কোন অধিকার ছিল না আপত্তি করার আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এই ধার্যকৃত বিষয়ের উপর। যার সিফাত পরিপূর্ণ যিনি যাকে ইচ্ছা তার ওপর প্রশস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে উচ্চমান।

﴿وَقَالَ لَهُمۡ نَبِيُّهُمۡ إِنَّ ءَايَةَ مُلۡكِهِۦٓ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَبَقِيَّةٞ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحۡمِلُهُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٤٨﴾

অর্থ: **[আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন, তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট তাবূত আসবে যাতে তোমাদের রব-এর নিকট হতে প্রশান্তি এবং মুসা ও হারূন বংশীয়গণ যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ থাকবে; ফেরেশতাগণ তা বহন করে আনবে। তোমরা যদি মুমিন হও তবে নিশ্চয় তোমাদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।]** (আয়াত নং: ২৪৮)

অত:পর তাদের কাছে তাদের নবী তার রাজত্বের কিছু নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন (আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন, তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট তাবূত আসবে যাতে তোমাদের রব-এর নিকট হতে প্রশান্তি এবং মুসা ও হারূন বংশীয়গণ যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ থাকবে; ফেরেশতাগণ তা বহন করে আনবে।) যা প্রকৃত বিষয়ে জোরদান এবং যুক্তি প্রতিষ্ঠায় প্রমাণের গুরুত্বের উপকারিতা দেয়। বিশেষ করে একগুয়েমিদের জন্য। তাদের ঐ প্রমাণের অনুগত্যের জন্য; যা অটলতা কে শক্তিশালী করার মাধ্যম। আর এমনিভাবে সুদৃঢ় সমাজ বিনির্মানে ও বানী একত্র করনে ,সেই সাথে প্রশাসনিক ও নেতৃত্বের সময় শিক্ষা ও দাওয়ায় প্রভাব বিস্তারে,যা কোন বিষয়ের শুদ্ধতার প্রমাণ বয়ে আনে অথবা যা গ্রহণ করা উদ্দেশ্য তার সর্বউত্তম বিকল্প নির্ধারনেরও মাধ্যম।

অত:পর কোরআনে কারিমার প্রসঙ্গটি ঐ সকল প্রমাণ এবং সত্য ও প্রকৃত বিষয়ের উপর স্বাধিন নিদর্শনাবলীকে একিভূত করে । আল্লাহ তায়ালা বলেন: **(তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট তাবূত আসবে যাতে তোমাদের রব-এর নিকট হতে প্রশান্তি এবং মুসা ও হারূন বংশীয়গণ যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ থাকবে; ফেরেশতাগণ তা বহন করে আনবে।)** সুতরাং প্রথম নিদর্শনটি হলো তোমাদের কাছ থেকে নেয়া সিন্দুক তোমাদের ফিরিয়ে দিবে। (তোমাদের নিকট তাবূত আসবে) আর দ্বিতীয়ত: তাতে রয়েছে রহমত ও প্রশান্তির সুবাতাস। আর অস্থিরতায় স্থীর থাকায় অন্তরে যে শক্তি,সন্তুষ্টি এবং সৌভাগ্যের উদয় হয় এবং ঈমান বৃদ্ধি ও আতংকিত না হওয়া প্রশান্তির নিয়ামতের একটি ফজিলত। আর আল্লাহ তায়ালা তার রসূল ও মুমিনদের উপর যেই প্রশান্তি অবতির্ন করেছেন তার মাধ্যমে তিনি তাদের অনুগ্রহ করেছেন। যেমনিভাবে সূরা ফাতহে এসেছে(তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। (আল্লাহ তায়ালা বলেন (আর আল্লাহ তার রসূল ও মুমিনদের উপর প্রশান্তি অবতির্ন করেছেন এবং তাদের উপর তাক্বওয়া (তথা আল্লাহ ভীতির) বাণীকে আবশ্যক করেছেন।) সুতরাং ইহা এক বিরাট নেয়ামত । আর (তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য প্রশান্তি) শব্দে রয়েছে এমন বিষয় যা তাদের উপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সর্বাঙ্গেই প্রশান্তির ফায়েদা দেয়। আর তৃতীয় আয়াতটি হলো (মূসা, হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী) মুসা ও হারুনের লাঠি,তাওরাত, মুসা ও হারুনের পোষাক। আর চতুর্থতমটি হলো (সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা) ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন: ফেরেশতারা আসমান ও জমিনের মাঝে সিন্দুক‡ক বয়ে নিয়ে এসেছেন ,এমনকি তালুতের হাতে সমর্পন করেন আর এমতাবস্থায় মানুষ অবলোকন করছিল। আর সাদী বলেন: সিন্দুকটি তালুতের গৃহে রইলো ফলে তারা শামউনের নবুওয়াতে বিশ্বাস আনলো ও তালুতের আনুগত্য করতে লাগলো।

আর ইহা ফায়েদা দেয় যে, আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা অসিম। আর তার আয়াতসমূহ ও প্রমানাদি প্রত্যেক সময় ও ক্ষণে সুস্পষ্ট উজ্জল। ফলে তাদের নবী তাদেরকে এই উজ্জল নিদর্শনের প্রতি ধাবিত করে যা এর প্রতি তাদের ঈমান ও তালুত তাদের বাদশা হওয়াকে আবশ্যক করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন(তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে) যা ফায়দা দেয় যে, আয়াতসমূহ ঈমানকে আবশ্যক করে। আর যে আয়াতসমূহের পর পিছন ফিরে যাবে সে তো জেদী, অহংকারী, অস্বীকারকারী।

﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهِۦ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٢٤٩﴾﴾

অর্থ: **[তারপর তালুত যখন সেনাবাহিনীসহ বের হলো তখন সে বলল, আল্লাহ এক নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে তা থেকে পানি পান করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়; আর যে তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত; এছাড়া যে তার হাতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সেও'। অতঃপর অল্প সংখ্যক ছাড়া তারা তা থেকে পানি পান করল। সে এবং তার সংগী ঈমানদারগণ যখন তা অতিক্রম করল তখন তারা বলল, জালূত ও তার সেবাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নেই। কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে তারা বলল, আল্লাহ্‌র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে! আর আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।]** (আয়াত নং: ২৪৯)

অতঃপর আয়াতে কারিমাগুলো তালুত ও সৈন্যবর্গের অন্য একটি বিষয়ে ধাবিত হলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন(অতঃপর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে) সুতরাং এই আয়াতটি সৈন্যবর্গের প্রথম পদক্ষেপ ও তাদের গৃহত্যাগ করে তালুতের নেতৃত্বে শত্রুর মোকাবেলার বিষয় বর্ণনা করে। আর তিনি তাদের তারা যা কিছুর সম্মোখিন হবেন এবং বিপদ ও পরীক্ষার মোকাবেলা করেবেন সে সম্পর্কে অবগত করে বলেন যে, নিশ্চই আল্লাহ তাদের নদীর পানির দ্বারা পরীক্ষা করবেন। সেই সাথে তখন তাদের কী করা উচিৎ তাও বর্ণনা করে দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন (সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক) আর ইহা এই ফায়েদা দেয় যে, ইহা একটি পরীক্ষা এবং অধিক সহ্যক্ষমতা,ধৈর্য এবং ইচ্ছাশক্তি দমনের পরীক্ষা। সুতরাং যে পানি পান করবে তার ইচ্ছাশক্তি পানির সামনে দুর্বল হয়ে পরবে। ফলে সে কঠিন মূহুর্তে গুনাহের অতি নিকটবর্তী। আর যে পানি পান থেকে নিবৃত থাকবে কঠিন পরিস্থিতে মোকাবেলায়,ধৈর্যে এবং আত্ব নিয়ন্ত্রনে সে অধিক সক্ষম। আর ফলাফল এই হবে যে, যে পানি পান করবে সে আমার সঙ্গি নয়, আমার অংশও নয়। এ থেকে এ ফায়েদা আসে যে, সংস্পর্শ সহযাত্রীবৃন্দের প্রত্যেক্যে মুশকিলে ফেলে দেয়। যেন তারা এক দেহ। ফলে যে দলছুট হয়ে যায় সে যেন এই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যা একটি পিন্ড বা সহযাত্রীবৃন্দের দেহের মত।

(সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে, লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক) আর যে খেল না সে আদেশ পালন করলো,ফলে সে আমার লোক। যেন সে এই দলের একটি অংশ। আর (আর খেল না) শব্দ অর্থাৎ তা চেঁকে দেখলো না। তবে ঐ পরিমান গ্রহণ করাকে নিষেধের আওয়তামুক্ত করা হয়েছে যতটুকু আল্লাহ তায়ালা বাদ দিয়েছেন। (কিন্তু যে লোক হাতের অঞ্জলি

ভরে সামান্য খেয়ে নেবে) আর অঞ্জলি ভরে নেয়া মানে হাত ও পাত্র দ্বারা নেয়া। আর এখান থেকে বড় চামচ শব্দটি এসেছে। আর একটি ফায়েদা হলো যে, আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হুকুম করেন। আর আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা মুমিনের উপর ওয়াজিব। এমনিভাবে পরীক্ষার সহযোগীতা নেয়ারও ফায়দা দেয়। সুতরাং তার গুরুত্ব বিভিন্ন জিনিস ও গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে অনুসারে। কেননা পরীক্ষা করনে রয়েছে এমন জিনিস যা নেককার ও বদকার কে প্রকাশ করে দেয়। তেমনি সক্ষমতার পার্থক্য বলে দেয় যার যোগ্যতা একজন থেকে অন্যজনের ভিন্ন হয়ে থাকে। আর সেনাপতির উপর আবশ্যক যাচাই করা এবং পরীক্ষার বিষয়সমূহ লক্ষ রাখা এবং প্রয়োগ,পরীক্ষা ও শ্রেণীবিভাজনেও খেয়াল রাখা। আর ইহা ঐ সকল বিষয় যার দ্বারা জনহিতকর কার্যের প্রতিটা বিভাগ ও স্তরে সুদৃঢ় হয়। বরং তার দ্বারা সাধারণ ও ব্যাক্তিগত কল্যাণসমুহ শক্তিশালী হয়। আর এতে মানুষের প্রতিটা শ্রেণি বৈসাদৃশ ঈমান, জ্ঞান ও হৃদয় বিশিষ্ট হয়। তেমনিভাবে আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য ও সারা দেওয়ারও ফায়েদা দেয়।

আর আল্লাহ তায়ালার বাণী **(সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে, লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক)** প্রত্যাশিত বিষয়ে পরীক্ষা ও সিদ্ধান্তের বিষয়ের ফায়েদা দেয়। তেমনিভাবে অবস্থা ও স্থান অনুযায়ী উৎসাহপ্রদানেরও ফায়েদা দেয়। সুতরাং (আমার লোক নয়) এবং (আমার লোক) শব্দে সৎলোকদের সাথে থাকার এবং ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির লোভে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার উৎসাহপ্রদান রয়েছে। আর তাতে প্রবৃত্তির উপর কষ্ট সহ্য ও ধৈর্যের প্রেরণা রয়েছে। ঈমান হলো মানবীয় আচরণের নিয়ন্ত্রক, যা তাকে বিপদের মুহুর্তে কল্যাণের দিকে অভিমুখী করে।

আর এ থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের সাথে পরীক্ষা ও যাচাই সম্পৃক্ত; আল্লাহ তায়ালা তাকে পরীক্ষা করেন যদিও সে আনুগত্যে চলমান থাকে। তারা ছিল অল্প সংখ্যক যারা যুদ্ধের জন্য কবুল হয়েছিল। তদপুরি সর্বপ্রথম পদক্ষেপ ছিল পরীক্ষা বা বিপদ। যাতে

মুসলমান বুঝতে পারে যে, পরীক্ষা মানেই আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট না। বরং তা দুনিয়ার জীবনে মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালার একটি পন্থা। আর যাতে করে যাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে তার প্রতি এমন দৃষ্টি না দেয়া হয় যে, তাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে অথবা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে গজবপ্রাপ্ত । বরং মুমিন যেন নিজেকে বলে যে, হয়তো আল্লাহ তায়ালা তাকে পরীক্ষা করতে পারেন- সে আনুগত্যের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও। ফলে সে আল্লাহ তায়ালার কাছে অনুগ্রহ কামনা করবে। অত:পর নদীতে পৌঁছানোর পর বাছাইয়ের মুহুর্ত আসলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন, *("**তারা সবাই পান করলো, অল্প কয়েকজন ছাড়া**।")* অর্থাৎ অধিকাংশ লোকই পানি পান করেছিল, যা নির্দেশ করে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সবসময় সঠিক নয়। সত্য তাদের সাথেই থাকে যারা সঠিক পথ অনুসরণ করে। যদিও তাঁরা সংখ্যায় কম হয়। সুতরাং যারা পানি পান করেনি, তাঁরাই ছিল অল্পসংখ্যক।

তারপর আল্লাহ তাআলা তাদের নদী অতিক্রম করার এবং নদী ত্যাগ করার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "অতঃপর যখন তিনি (তালুত) এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা নদী অতিক্রম করল"। এরপর আসে আরেকটি পরিস্থিতি, যেখানে ঈমানী বাহিনীর আরও পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই হয়। এটি হলো তাদের শত্রু জালুত ও তাঁর বাহিনীকে দেখার ঘটনা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ***"তাঁরা বলল, আজ আমরা জালুত ও তার সৈন্যদের সাথে লড়াই করার শক্তি রাখি না"***। এর থেকে বোঝা যায় যে, তাদের শত্রুর সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বেশি, যা তালুতের সৈন্যদের হতবাক করে দিয়েছিল। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "তালুতের সাথে নদী অতিক্রম করেছিল চার হাজার লোক, যাদের মধ্যে কিছু পানি পান করেছিল। কিন্তু যখন তারা জালুত ও তার বাহিনীকে দেখল, যাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ। তখন তিন হাজার ছয় শত বিরাশি জন (৩,৬৮২) ফিরে গেল।" (তাফসিরে কুরতুবী-৩/১৬৬)

এই পরিস্থিতিতে সৈন্যদের দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়: প্রথম দল বলল, "আজ আমরা জালুত ও তাঁর সৈন্যদের সাথে লড়াই করার শক্তি রাখি না।" আর দ্বিতীয় দল, "যারা মনে করে যে তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তারা বলল, কত ছোট দল আল্লাহর ইচ্ছায় বড় দলকে পরাজিত করেছে"

দ্বিতীয় দলটি ঈমানের এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে, তারা নিশ্চিত ছিল বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে। আর যদি তারা শহীদ হয়, তাহলে তো তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। এখানে "ظن" (ধারণা) শব্দটি "يقين" (নিশ্চিত বিশ্বাস) বুঝায়। অর্থাৎ, তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিল আল্লাহর সাহায্য আসবেই। এর থেকে বুঝা যায় যে, ঈমানই হলো অবিচলতার উৎস। আর ঈমানের দুর্বলতা সন্দেহের জন্ম দেয়, যা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন শত্রুর সংখ্যাধিক্যের ভয়, মৃত্যুর ভয়, ব্যর্থতার ভয়, অগ্রসর হওয়ার ভয়। অন্যদিকে, ঈমান হলো অবিচলতার শক্তি, সাহসের শক্তি, ভালো কাজ করার শক্তি, ব্যয় করার শক্তি এবং অগ্রসর হওয়ার শক্তি। এবং("يظنون أنهم ملاقوا الله") (তারা মনে করে যে তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে) এই বাক্যটি থেকে বোঝা যায় যে, তাঁরা মৃত্যুর পর আখিরাতের জীবনে বিশ্বাসী ছিল। তারা বিশ্বাস করেছিল যে তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং আল্লাহ তাদেরকে তাঁর পথে জিহাদ করার জন্য পুরস্কৃত করবেন। এটি সামরিক, শিক্ষাগত, দাওয়াতি, পেশাগত ও প্রশাসনিক দিক থেকে ঈমানী শিক্ষার গুরুত্বকে তুলে ধরে। ঈমানী শিক্ষাই একজন মুমিনকে এমন শক্তিশালী করে তোলে যে, সে কোনো ভয় বা প্রলোভনের সামনে নত হয় না, বরং দৃঢ় ও অবিচল থাকে।

তাদের সুন্দর বোধশক্তি এবং ঈমানী বিশ্বাসের শক্তির একটি সুন্দর দিক হলো এই যে, তারা বিজয়কে সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভরশীল মনে করেনি। বরং তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিল যে, বিজয় আসে আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন, (**"যারা মনে করে যে তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ**

করবে, তারা বলল, কত ছোট দল আল্লাহর ইচ্ছায় বড় দলকে পরাজিত করেছে")। তারা আল্লাহ তাআলাকে মজবুত করে ধরেছিল এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিল যে, পরাক্রমশালী ও মহাশক্তিধর আল্লাহর সাহায্যেই বিজয় আসবে। এটি একজন মুমিনের আকিদা বা বিশ্বাসের মূলনীতি। বিজয় ও সাফল্য আল্লাহ তাআলার সমর্থন ও সাহায্যের মাধ্যমেই আসে। এখানে তারা বিজয়কে "بِإِذْنِ اللَّهِ" (আল্লাহর ইচ্ছায়) এর সাথে সম্পৃক্ত করেছে, যা সঠিক বুঝ ও বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করে। এটি প্রমাণ করে যে, সবকিছুই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় ঘটে।

"بِإِذْنِ اللَّهِ" (আল্লাহর ইচ্ছায়) এই বাক্যটি মুমিনের জন্য একটি বিশাল বিশ্বাসগত ও আমলগত শক্তি। এর মাধ্যমে মুমিন আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে এবং আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তের ফলাফলে সন্তুষ্ট থাকে। যদি সে যথাযথ কারণ ও উপায় অবলম্বন করে, তবে সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর ইচ্ছায় সে সফল হবে। আর যদি তার ইচ্ছার বিপরীত কিছু ঘটে, তবে সে নিশ্চিত হয় এবং বলে, "আল্লাহ এটার অনুমতি দেননি।" যদি সে কোনো বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়, তবে "بِإِذْنِ اللَّهِ" (আল্লাহর ইচ্ছায়) বলে সে শক্তি অর্জন করে। যদি কোনো কিছু তাকে ভীত করে, তবে "بِإِذْنِ اللَّهِ" বলে সে তার ভয়কে জয় করে। যদি সে অনুভব করে যে অন্যরা তাকে ছেড়ে দিয়েছে, তবে "كل شيء بِإِذْنِ اللَّهِ" (সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায়) বলে সে প্রশান্তি লাভ করে। যদি সে কোনো কাঙ্ক্ষিত জিনিসের আভাস দেখে, তবে বলে "بِإِذْنِ اللَّهِ" বলে আশা প্রকাশ করে। আর যদি তাঁর পছন্দনীয় কিছু বাস্তবায়িত হয়, তবে বলে, "আলহামদুলিল্লাহ এটি আল্লাহর ইচ্ছায়ই হয়েছে।" সুতরাং "بِإِذْنِ اللَّهِ" হলো সেই শক্তি যা মুমিনের হৃদয়কে প্রতিটি মুহূর্তে এবং দুনিয়া ও জীবনের প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণ করে দেয়। এরপর তারা বলেছিল, "وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ" (আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন)। এটি তাদের শেখা একটি সত্যের ঘোষণা যে, আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সাহায্যকারী ও সমর্থক। তিনি তাদের সাথে আছেন সমর্থন, বিজয়, তাওফিক ও সাহায্যের মাধ্যমে। এটি প্রমাণ করে যে, ধৈর্য হলো

এমন একটি মাধ্যম, যা দ্বারা মুমিন আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও সহায়তা লাভ করে তার প্রয়োজন পূরণে এবং কষ্ট দূর করতে। এভাবে সে জীবনের সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে বিজয়ী হয়।

এ থেকে বুঝা যায় যে, "وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ" (আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন) এই বাক্যটি হলো একটি মূলনীতি। যা দ্বারা মুমিন তার প্রয়োজন পূরণে এবং যে কোনো ক্ষতি বা কষ্টের মুখোমুখি হলে শক্তি অর্জন করে। যখনই সে কোনো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তখন সে এই আয়াতটি প্রয়োগ করে সাহায্য চায়। যখনই সে কোনো কাজ শুরু করে, তখন সে এই আয়াতটি স্মরণ করে তার কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য চায়। কারণ, প্রতিটি কাজেই ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। যদি তার নফস আনুগত্য করতে আলসেমি করে, তবে সে এই আয়াতটি স্মরণ করে। যদি সে কোনো ভুল ইচ্ছা বা কামনার সম্মুখীন হয়, তবে সে এই আয়াতটি প্রয়োগ করে তা থেকে বিরত থাকে। সুতরাং এটি এমন একটি শক্তি, যে ব্যক্তি এটি স্মরণ করে এবং এর অনুসারে কাজ করে, আল্লাহ তাআলা তার সাথে থাকেন। ফলে সে যে কোনো অশুভ থেকে রক্ষা পায়, কল্যাণ লাভ করে, দুশ্চিন্তা দূর করে, দুঃখ মোচন করে, আলস্য দূর করে এবং দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে।

﴿وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالُواْ رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرٗا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٥٠﴾

অর্থ: **[আর তারা যখন যুদ্ধার্থে জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হলো তখন তারা বলল, হে আমাদের রব! আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দিন, আমাদের পা অবিচলিত রাখুন এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন।]** (আয়াত নং: ২৫০)

এরপর কুরআনের বাস্তব দৃশ্যটি তালুত এবং জালুতের মধ্যকার যুদ্ধের বর্ণনায় স্থানান্তরিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন; "আর তারা যখন যুদ্ধার্থে জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হলো।" আর এটিই ছিল প্রথম সাক্ষাতের সূচনা, যখন তালুতের সৈন্যরা আমালেক গোত্রপতি জালূত এবং তার বিশাল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলো, তখন তারা (একনিষ্ঠ চিত্তে) মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগল — যা তাদের উপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ, যে তিনি তাদের তাওফিক দিয়েছেন জালুত ও তার ভয়ংকর বাহিনীর সামনে তাঁর স্মরণ করার: (قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.) "তখন তারা বলল, হে আমাদের রব! আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দিন, আমাদের পা অবিচলিত রাখুন এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন।" তাদের প্রথম দোয়া ছিল: رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দিন," কারণ শত্রুর মুখোমুখি হওয়াই ধৈর্যের প্রয়োজন, এবং প্রতিটি পরিস্থিতি, যে কোনো সমস্যা বা পরীক্ষায়, ধৈর্য দরকার। আর (তাদের) এই দোয়া থেকে বোঝা যায় যে, একজন মুমিন আল্লাহর কাছে ধৈর্য প্রার্থনা করেন। আর তারা সেটা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছে। মুমিনগণ ধৈর্য ধারণ করেন এবং মহান আল্লাহর কাছে ধৈর্য ধারণের তাওফিক কামনা করেন, সেক্ষেত্রে তারা তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা বা ধারণার ওপর নির্ভর করে না। বরং উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে মহান আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেন। তারপর তারা মহান আল্লাহর

কাছে দৃঢ়তা কামনা করলেন এবং বললেন: وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا" আর আমাদের পদগুলোকে দৃঢ় রাখুন," কারণ বিপদের সময় দৃঢ়তা পাওয়া খুবই কঠিন, এটি আল্লাহ তায়ালার তাওফিক ছাড়া সম্ভব নয়। যুদ্ধের ময়দানে বা অন্য যেকোনো সংকটে, শত্রুদের ভয়ে না পালানো, এর জন্য কঠিন দৃঢ়তা প্রয়োজন, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের দান করেন। সুতরাং যাকে মহান আল্লাহ সাহায্য করেন না, সে কোনোভাবেই দৃঢ় থাকতে সক্ষম নয়। তারা হৃদয় এবং পদযুগল কোনোভাবেই তরবারির ঝলকানির সম্মুখে স্থির থাকতে পারার কথা নয়। এরপর তারা মহান আল্লাহর কাছে নাসর তথা একান্ত সাহায্য প্রার্থনা করলেন; বললেন: وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ "(হে আমাদের রব) কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন" তারা এই কাফেরদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করলেন, আর এটাই মুমিনদের শিক্ষা। "নিশ্চয়ই কেবলমাত্র সাহায্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই"। এটা যেকোন বিষয়ে। আর সেসব বিষয়ের অন্যতম হল এই যুদ্ধের ময়দান। যেখানে একজন মুমিন শুধুমাত্র মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নেবে। কোনোভাবেই নিজের শক্তিমত্তা ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে না। যাতে সে যুদ্ধের ময়দানে চরম অপদস্থতার কবল থেকে বাঁচতে পারে। বরং মহান আল্লাহর ক্ষমতা এবং তাঁর সাহায্যের উপর নির্ভর করবে।

এখান থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে, যেকোন মুহূর্তে, যেকোন বিষয়ে, যেকোন পরিস্থিতিতে দু'আ এর গুরুত্ব ফুটে ওঠে। কেননা, মহান আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন সাহায্য নেই, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃঢ়তা ব্যতীত কোন প্রকার দৃঢ় নেই, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ধৈর্যের তাওফিক প্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত কেউ ধৈর্য ধারণে সক্ষম নয়, মহান আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত কল্যাণ ব্যতীত কেউ কল্যাণ টেনে আনতেও সক্ষম নয়, এমনকি মহান আল্লাহর তাওফিক ব্যতীত কেউ অনিষ্ট প্রতিরোধ করতেও সক্ষম নয় ।

﴿فَهَزَمُوهُم بِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُۗ وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّفَسَدَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٥١ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتۡلُوهَا عَلَيۡكَ بِٱلۡحَقِّۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ٢٥٢﴾

অর্থ*:* ***[অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে (কাফেরদেরকে) পরাভূত করল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করলেন। আর আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও হেকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছে করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আর আল্লাহ্ যদি মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুগ্রহশীল। এ সব আল্লাহর আয়াত, আমরা আপনার নিকট তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করছি। আর নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।]*** *(*আয়াত নং*:* ২৫১-২৫২*)*

এরপর দৃশ্যটি ঈমানদার ও কাফেরদের মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনার দিকে মোড় নিল। যেমনটি মহান আল্লাহ বলছেন*;* "অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে *(*কাফেরদেরকে*)* পরাভূত করল"। পবিত্র কুরআন সরাসরী কাফেরদের পরাজয়ের ঘোষণা বর্ণনা করেছেন, অথচ তাদের পরাজয়ের কারণ কেবলমাত্র তালুতের বাহিনীর শক্তিমত্তা ছিল না। কেননা, তারা সৈন্য সংখ্যা বা অস্ত্রশস্ত্র কোন দিক থেকেই জালুতের বাহিনীর ধারে কাছেও ছিল না। বরং তাদের পরাজয় হয়েছিল মহান আল্লাহর নির্দেশে। আর এজন্যই মহান আল্লাহ বলেন*;* "**অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে পরাজিত করল**"। কেননা তারা শত্রুদের পরাজয় বরণ করাতে মহান আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করছিলেন। যেমনটি মহান আল্লাহ পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, "**কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে তারা বলল, আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে*!* আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।**" যিনি সাহায্য নাযিল করেছেন, তিনি হলেন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ।

এরপর আল্লাহ তায়ালা সেই অভিজ্ঞ পুরুষের কথা তুলে ধরেন, যিনি জালুতকে হত্যা করেছিলেন, (তিনি দাউদ আঃ)। আল্লাহ তায়ালা বলেন; "**আর দাউদ জালূতকে হত্যা করলেন।**" ঘটনাটি এমন যে, দাউদ (আঃ) তালুতের বাহিনী থেকে বের হলেন এবং জালুতকে হত্যা করলেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা দাউদ (আঃ)-এর প্রতি নিজ অনুগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, "এবং আল্লাহ তাকে রাজ্য এবং হিকমাহ তথা নাবুওয়াত দান করেন," যা বোঝায় যে, আল্লাহ তায়ালা দাউদ (আঃ)-কে তালুতের পর রাজ্য দান করেছিলেন এবং একই সাথে তাঁকে "হিকমাহ" (বুদ্ধি ও জ্ঞান) দান করেছিলেন, যা ছিল নবুওয়াহ (প্রেরিত আদেশ)। যা তিনি শামউইল (আঃ)-এর পর লাভ করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর মাঝে নবুওয়াত এবং রাজত্বের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। বরং মহান আল্লাহ তাঁকে আরও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন, সেটা হল: মহান আল্লাহ বলেন; "এবং তিনি তাঁকে যা চাইলেন, শিক্ষা দিলেন।" অর্থাৎ, যেসব জ্ঞান তাকে বিশেষভাবে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন, তাকে তা শিক্ষা দিলেন।

এই ঘটনাটি স্পষ্ট করে দেয় যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকেই রাজত্ব দান করেন। যেমনটি তিনি দাউদ (আঃ)-কে নবুওয়াত ও রাজত্ব দান করলেন। সাথে সাথে বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বমণ্ডিত করলেন। এরপর মহান আল্লাহ তাঁর (চিরাচরিত) প্রতিরোধ নীতির হিকমাহ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: **وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ** "আর আল্লাহ যদি মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত।" অর্থাৎ, যদি মহান আল্লাহ এক জাতিকে অন্য জাতি দ্বারা প্রতিহত না করতেন, যেমনটি এখানে আল্লাহ তায়ালা বানু ইসরাইল জাতি থেকে (আমালেক জাতিকে) তালুতের বাহিনী এবং দাউদ আলাইহিস সালামের বীরত্বের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তাহলে তারা (বানু ইসরাইল) ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং মহান আল্লাহর হিকমাহ বা কৌশল হল, এক জাতিকে হটিয়ে অন্য জাতিকে তাদের উপর কর্তৃত্বশীল বানানো—যাতে করে

এর মাধ্যমে অন্য জাতিকে সমূহ অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারেন। এভাবে আল্লাহর এই কৌশলকে দেখার মাধ্যমে মুসলিমদের উচিত, যখন তারা কোনো বিপদ বা লড়াইয়ের মধ্যে পড়েন, তারা যেন সঠিকভাবে চিন্তা করে এবং বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তায়ালাই পৃথিবীর সকল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাঁরই ইচ্ছায় পৃথিবীকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন।

মহান আল্লাহর এই প্রতিরোধ নীতির হিকমাহ একটি আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেয় যে, لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত।" এই প্রতিরোধ নীতি মূলত সৎকর্মশীলদের বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে, আর তার সংরক্ষণ মূলত জালেমের জুলুমের অবসান ঘটানো। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন; وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ "আর আল্লাহ্ যদি মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত।" সুতরাং এই প্রতিহত করার মাধ্যমে একপক্ষ নিহত হবে, বিষয়টি এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্য আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে, তাহলেই হিকমাহ বা কৌশল টি পূর্ণতা পাবে। আর সেটি হল, পৃথিবীর বুকে সংস্কার ও সংস্কারকারীদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা। এটার দরকার কল্যাণকর বিষয়ে পৃথিবীর সংস্কারের জন্য, সংস্কারকারীদের বাঁচিয়ে রাখার মাধ্যমে। আর পৃথিবীকে যাবতীয় বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ধ্বংস করার মাধ্যমে। অনুরূপ ভাবে আরেকটি শিক্ষা লাভ করা যায়, পৃথিবীর বিপর্যয় সৃষ্টি হয় মূলত তার উপর বসবাসকারীদের বিভিন্ন জুলুম অত্যাচার ও অন্যান্য কারণে। আর পৃথিবীর সংস্কার এসে থাকে মূলত তার উপর বসবাসকারী সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের মাধ্যমে। অনুরূপ ভাবে অত্র আয়াত থেকে আরেকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয় যে, হক্ব বাতিলের লড়াই চিরন্তন ও চলমান থাকবে, যতক্ষণ না ভাল পক্ষ মন্দ পক্ষকে শক্তিমত্তার মাধ্যমে মূলৎপাটন করে। সুতরাং প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি সৎকর্মশীলদের থেকে প্রতিরোধ নীতির কৌশলে অনিষ্ট দূর করেন।

যদি মানুষ তার জীবনের সর্বস্তরে মহান আল্লাহর এই নীতিকে ধারণ করত, তাহলে এর বাস্তবতা, প্রতিকৃতি, এবং ঘটনাবলী তার সম্মুখ জীবনের বিভিন্ন বাঁকে দেখতে পেত। যেমন ব্যবসা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, উপার্জন ইত্যাদি। যেমন,এক ব্যক্তি অন্যের জন্য কিছু নিয়ে আসে এবং তার মাধ্যমে এক ব্যক্তি এমন কিছু অর্জন করে যা সে কখনো প্রত্যাশা করেনি, এবং এমন কিছু অর্জন করতে সক্ষম হয় যা তার মনেরও মধ্যে ছিল না। এমনকি একজন ব্যক্তি তার জন্য কোনো দুঃখ-দুর্দশা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় অন্যকে সাহায্য করতে আসতে পারে। এভাবে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে একজনের মাধ্যমে দুই পক্ষ ,তিন পক্ষ বা তারচেয়েও বেশি উপকৃত হতে পারে, যেটা তারা কল্পনাও করেনি। কখনো এমনও হতে পারে যে, এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ অন্যান্যদের অনিষ্ট দূর করেছেন। সুবহানাল্লাহ ! তিনি পূতঃপবিত্র মহান। এসবই তাঁর পূর্ণ হিকমাহ এর ফল। আল্লাহ তায়ালার সর্বশক্তিমত্তা এবং সুপরিকল্পিত বুদ্ধিমত্তায় এর সকল ঘটনা সংঘটিত হয়। অত্র আয়াতের অন্যতম ফায়দা হল, আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি বিস্তৃত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন; “কিন্তু আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুগ্রহশীল।”

এরপর আল্লাহ তায়ালা এই ঘটনার উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন, তিনি বলেন, تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ “এসব আল্লাহর আয়াত, আমরা আপনার নিকট তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করছি।” হে নবী মুহাম্মাদ এই আয়াতগুলো আপনার কাছে পাঠ করে আপনার সত্যতা তুলে ধরছি। এর মাঝেই রয়েছে আপনার নবুওয়াতের প্রমাণ। মহান আল্লাহ বলেন; “**আর নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।**” এখানে আল্লাহ তায়ালা ওই সকল ব্যক্তিদের রদ করেছেন, যারা নবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে বলে, তুমি রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ নও। অথচ এই ঘটনাবলী মহান আল্লাহর পর ওই সম্প্রদায়ের মানুষ ব্যতীত কেউ জানে না। তাহলে নিরক্ষর নবী যিনি লিখতেও জানেন

না এমনকি পড়তেও জানেন না- তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে না জানলে কিভাবে জানলেন?

এই গল্পটি কেবল ধর্মীয় দাওয়াত ও প্রশিক্ষণের একটি উপায় হিসেবে নয়, বরং এর ভাষা, বিষয়বস্তুর মাঝে রয়েছে হেদায়েত এবং মৌজেঝা বা অলৌকিকত্ব। এবং তাতে আরো রয়েছে মানব জাতির জন্য শিক্ষা ও উপদেশ। এবং এতে রয়েছে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রজ্ঞা, শক্তি এবং সৃষ্টির মধ্যে তাঁর আইন ও বিধি অনুযায়ী পরিচালনা করার ক্ষমতা, যা প্রতিটি মুমিনের জন্য পাঠযোগ্য। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর সর্বশক্তির সাথে সৃষ্টির পরিপালন করেন এবং তিনি নিজেই তাঁর বান্দাদের ওপর কর্তৃত্ব রাখেন। এই কাহিনীর মাধ্যমে, মুসলিমদের উচিত কুরআনের শিক্ষাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, সেটা হতে পারে দাওয়াতি কার্যক্রম, প্রশিক্ষণমূলক, সংগঠন, আইনগত এবং শাসনমূলক পরিকল্পনায় ব্যবহার করা। কুরআনে এমন অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, সঠিক পথ প্রদর্শন করে, মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে।

﴿تِلۡكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۘ مِّنۡهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُۖ وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ دَرَجَٰتٖۚ وَءَاتَيۡنَا عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدۡنَٰهُ بِرُوحِ ٱلۡقُدُسِۗ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعۡدِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ وَلَٰكِنِ ٱخۡتَلَفُواْ فَمِنۡهُم مَّنۡ ءَامَنَ وَمِنۡهُم مَّن كَفَرَۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَتَلُواْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٥٣﴾

অর্থ: **[ঐ রাসূলগণ, আমরা তাদের কাউকে অপর কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছেন যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। আর মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণাদি প্রদান করেছি ও রুহুল কুদুস দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। আর আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদের**

পরবর্তীরা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি সমাগত হওয়ার পরও পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না; কিন্তু তারা মতভেদ করলো। ফলে তাদের কেউ কেউ ঈমান আনলো এবং কেউ কেউ কুফরী করল। আর আল্লাহ ইচ্ছে করলে তারা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না; কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছে তা করেন।] *(*আয়াত নং*:* ২৫৩*)*।

এরপর পবিত্র কুরআন রাসূলগণের মধ্যকার শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্য বর্ণনা করে। যেমন টি মহান আল্লাহ বলেন*;* "**ঐ রাসূলগণ, আমি তাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, তাদের মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কারো কারো মর্যাদা উঁচু করেছেন।**" আল্লাহ তায়ালার রাসূলগণ একে অপরের থেকে শ্রেষ্ঠতায় পার্থক্যপূর্ণ, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের দিক অধিক শ্রেষ্ঠ ও তুলনামূলক কম শ্রেষ্ঠ হিসেবে পার্থক্য করেছেন। এই শ্রেষ্ঠত্বের কমবেশী হওয়াটা তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে নয়, বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই। *(*فَضَّلْنَا*)* "আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি" এখানে শ্রেষ্ঠত্ব দানের বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী*:* تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ "ঐ রাসূলগণ, আমি তাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" আয়াতের অত্র অংশ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তায়ালাই রাসূলদের মধ্যে তফাৎ দিয়েছেন, এবং তাদেরকে বিশেষ গুণ, ক্ষমতা এবং বিস্ময়কর কিছু দিতে তিনি তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করেছেন। অনুরূপ ভাবে অত্র আয়াত থেকে এটাও প্রতিয়মান হয় যে, রাসূলগণের মধ্যকার শ্রেষ্ঠত্বের তফাৎ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই, সেখানে কোন মাখলুকের কোন প্রকার হাত নেই। বরং তা বিনা সংকোচে মেনে নেওয়া, বিশ্বাস করা এবং আনুগত্য স্বীকার করা ওয়াজিব। যেমনটি নবী মুহাম্মাদ *(*সাঃ*)* বলেছেন*;* لَا تُخَيِّرُوْا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ "**তোমরা নবীদের মাঝে একজন কে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না।**" তিনি অন্যত্র বলেন*;* "**নবীদের মধ্যে একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদা দিও না।**" আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের কে নবীদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠত্বের তফাৎ এর উপর ঈমান বা বিশ্বাস করার নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠত্বের বাঁছ বিচার করে

ইবাদত করার নির্দেশ দেন নাই। কেননা, এই শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্য মহান আল্লাহর হিকমাহ থেকে, আর এই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার ।

আর এই শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম হল,এক. (مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ) "তাদের মধ্য থেকে কারো কারো সাথে আল্লাহ তায়ালা কথোপকথন করেছেন।"সুতরাং আল্লাহ তায়ালার সরাসরী কথোপকথন, উক্ত নবীর জন্য একটি মর্যাদার বিষয়। যেমন মূসা আলাইহিস সালাম। তাকে বলা হয় কালিমুল্লাহ অর্থাত আল্লাহ তায়ালার সাথে কথোপকথনকারী। দুই. (وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ) "আর তিনি তাদের কিছু লোককে (উর্ধ্বতন) শ্রেণীতে স্থান দিয়েছেন।"যেমনটি ইসরা-মেরাজের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীদের বেশ কয়েকজন কে বিভিন্ন আসমানে তাদের মর্যাদা অনুপাতে দেখেছেন। যেমন মহান আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালাম এরপর ব্যাপারে বলেছেন; "এবং আমরা মারইয়াম-পুত্র 'ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি এবং রূহুল কুদুস দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি।"আল্লাহ তায়ালা ঈসা আলাইহিস সালাম কে তাঁর নবুওয়াত এর সত্যতা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন মুজেজা দিয়েছেন এবং রুহুল কুদস জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে তাঁকে শক্তিশালী করেছেন।

সেই শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম হল, আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কে খলীল তথা ঘনিষ্ঠ বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছেন। মূসা আলাইহিস সালাম কে কালিম তথা কথোপকথনকারী হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে দাউদ আলাইহিস সালাম কে রাজত্ব, নবুওয়াত এবং বর্মন তৈরির বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। সুলাইমান আলাইহিস সালাম কে পাখির সাথে কথোপকথন এবং তাঁর জন্য জীন জাতি তার অনুগত করে দিয়েছেন। ঈসা আলাইহিস সালাম কে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগের আরোগ্য দানের ক্ষমতা দিয়েছিলেন এবং মানুষ কি খেয়েছে এবং কি সঞ্চয করে রেখেছে তা বলে দেওয়ার ক্ষমতা দান করেছিলেন। এছাড়াও তাঁকে আরও অনেক নিদর্শনাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। আর আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মহান আল্লাহ ইসরা-মেরাজ

এর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁকে মানব ও জ্বীন উভয় জাতির রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁর উম্মাহ কে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁকে খতামুল আম্বিয়া বা সর্বশেষ নাবী বানিয়েছেন। খাবারে বারাকাহ্ দিয়ে তাঁর মুজেজার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। হাতের আঙুলের তলদেশ থেকে পানির নহর প্রবাহিত করে তাঁর মুজেজা প্রকাশ করেছেন। শত্রুদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার ঘটিয়ে তাকে সাহায্য করেছেন। এমন অগণিত অজস্র শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আল্লাহ তায়ালা কেবলমাত্র তাঁকেই দান করেছিলেন।

এখানে আল্লাহ তায়ালা যে জানিয়ে দিয়েছেন, তা থেকে একটি শিক্ষা মেলে, এবং তা হল, আল্লাহ তায়ালা যে কোনো ব্যক্তিকে অন্যের চেয়ে কোন দিক দিয়ে বিশেষ মর্যাদা দেন, সে মর্যাদা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, মানুষের পক্ষ থেকে নয়। যে ব্যক্তির কাছে এই বিশেষ গুণ বা শক্তি থাকে, সে গর্ব বা অহংকার করতে পারে না, কারণ এটি তার নিজের অর্জন নয়, এবং সে কখনোই তা অর্জনে সক্ষম নয়। বরং আল্লাহ তায়ালা তাকে এই গুণ দান করেছেন এবং তাকে বিশেষিত করেছেন। (অর্থাৎ, সব ভাল কিছুই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আসে, তাই মানুষকে কোন গুণের উপর গর্বিত হওয়া উচিত নয়।)

এখান থেকে একটি ফায়দা পাওয়া যায় যে, সমস্ত নেয়ামত সর্বদা আল্লাহ তায়ালার দিকেই নিসবত করতে হয়। যতবারই আল্লাহ তাঁর কোনো রাসূলকে পাঠিয়েছেন, ততবারই তাঁর প্রতি বিশ্বাস এবং আনুগত্য গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল, কারণ আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে যে আলামত এবং মুজিজা প্রকাশ করেছেন তা সকলের জন্য স্পষ্ট। কিন্তু বেশিরভাগ জাতি সেই রাসূলদের অস্বীকার করেছে এবং এর ফলে তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, যার কারণে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী দলগুলির মধ্যে যুদ্ধ বেধেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: “আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাদের পরবর্তীরা লড়াই করত না, তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ আসার পর।” যদি আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করতেন, চাইতেন যে, তাদের পরবর্তী প্রজন্মের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ স্পষ্ট হলে কোন প্রকার সংঘাত করবে না। তাহলে সেটা তাই হত। কেননা মহান আল্লাহর পূর্ণ ইচ্ছাশক্তি,ক্ষমতা

ও কর্তৃত্ব রয়েছে। এটা আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা ও শক্তির বাইরে নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সত্তাকে সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত ঘোষণা করেছেন। বরং অত্র আয়াত আল্লাহ তায়ালা তাঁর কুদরা বা ক্ষমতা এবং মাশিআহ্ বা ইচ্ছাশক্তি নামক দুইটি সিফাত বা গুণ সাব্যস্ত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন; "আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাদের পরবর্তীরা লড়াই করত না, তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ আসার পর।" কিন্তু, প্রেরিত রাসূলের উপর মতবিরোধের কারণেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হল। মহান আল্লাহ বলেন; "কিন্তু তারা মতবিরোধ করেছে। ফলে তাদের মধ্যে কেউ ঈমান এনেছে, আর তাদের কেউ কুফরী করেছে।" অত্র আয়াত থেকে প্রতিয়মান হয় যে, মতবিরোধ উম্মাহের জন্য ক্ষতিকর এবং তা শত্রুতা ও সংঘাতে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। অনুরূপ ভাবে এটাও বুঝা যায় যে, মতবিরোধের ভয়ংকর একটি পরিণতি হল, উম্মাহের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হবে। যা তাদের মাঝে একটা তাকফিরী ফেরকার জন্ম দিবে।এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন; "যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন, তারা সংঘাতে লিপ্ত হত না।" অর্থাৎ, এরপরও যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন যে তারা সংঘাতে লিপ্ত না হোক। তবে তাই হত। এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর মাশিআহ্ বা ইচ্ছাশক্তির সিফাত সাব্যস্ত করেছেন। সেটা হল, এরপরও যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন যে তারা সংঘাতে লিপ্ত না হোক, তবে তাই হত। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র সত্তাকে সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। এভাবে তিনি তাঁর কুদরা *(ক্ষমতা)* এবং মাশিআহ্ *(ইচ্ছাশক্তি)* নামক দুইটি সিফাত সাব্যস্ত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন*:* "**কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যা চান, তাই করেন।**" এসবই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার প্রতিফলন। পাশাপাশি তিনি যা চান না, তা সংঘটিত হওয়াকে নাফি বা নাকচ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার "ইরাদাহ্" *(ইচ্ছা)* নামক সিফাতটি একটি পূর্ণাঙ্গ সিফাত। মহান আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছুই সংঘটিত হতে পারে না। বরং আল্লাহ তায়ালা যেভাবে চান সেভাবেই সংঘটিত হয়।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٥٤﴾

অর্থ: ***[হে মুমিনগণ! আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন বেচা-কেনা, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না, আর কাফেররাই যালিম।]*** *(*আয়াত নং ২৫৪*)*।

এরপর পবিত্র কুরআন দানের প্রতি উৎসাহ প্রদানের আলোচনা আরম্ভ করেছে। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন; "**হে মুমিনগণ! আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর।**" আয়াতটিতে পবিত্র কুরআনের আহ্বানমূলক পদ্ধতি ব্যবহার হয়েছে, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পূর্বে সতর্কীকরণ এবং তার গুরুত্ব অনুধাবন করানো।

আহ্বান ও সম্বোধনের ক্ষেত্রে "ঈমানদার" বলে আখ্যায়িত করাটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে এক বিশাল মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়। সেই সাথে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ঈমানদার হবার স্বীকৃতিও বটে। (يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا) হে ঈমানদারগণ! এরচেয়ে বড় নিয়ামত আর কি হতে পারে? এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা হল, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যকার শিক্ষণ পদ্ধতি। সেটা হল, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষাদানের পূর্বে ডাক দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা। খেয়াল করুন, স্বয়ং স্রষ্টা মহান আল্লাহ যদি তার একজন বান্দাকে ডাক দিতে পারেন, তাহলে কেন একজন বান্দা তার মত আরেকজন বান্দাকে আহ্বান করে শিক্ষাদান করতে পারবে না?

তারপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দানের জন্য উৎসাহিত করেন, এমন একটি শৈলীতে যা তিনটি উৎসাহ প্রদানকারী উপাদান ধারণ করে: অনুপ্রেরণামূলক উদ্বুদ্ধকরণ, আদেশ ও সতর্কীকরণমূলক অনুপ্রেরণা। হে ঈমানদারগণ (يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا) এই

আহ্বানের মধ্যে অনুপ্রেরণামূলক উদ্বুদ্ধকরণ নিহিত রয়েছে। আর *(* اَنۡفِقُوۡا*)* খরচ করো, এখানে রয়েছে নির্দেশ। কারণ আদেশে মুমিনের ইচ্ছাশক্তি শক্তিশালী হয়, যাতে সে যা ভালোবাসে তা থেকে কিছু ব্যয় করতে পারে। এর মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে, কিছু বিষয় এমন থাকে যার জন্য আদেশ দেয়া প্রয়োজন, সাথে সাথে এর আগে উৎসাহ এবং সম্মাননা উল্লেখ করাও উচিত। যেমনটি মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। প্রথমে আহ্বান করেছেন; *(*يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا*)* হে ঈমানদারগণ*!* এরপর নির্দেশ দিয়েছেন, *(* اَنۡفِقُوۡا*)* খরচ করো। এরপর খরচের প্রতি উৎসাহ প্রদানের কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন; مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ يَّاۡتِىَ يَوۡمٌ لَّا بَيۡعٌ فِيۡهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَّ لَا شَفَاعَةٌ “সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন বেচা-কেনা, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না।” *(* অর্থাৎ এই খরচ পরকালে তার নিজের লাভের জন্য*)*। সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করেছেন যে, তার কাছে যা আছে তা সম্পূর্ণ খরচ করতে হবে না। বরং কিয়দংশ খরচ করলেই চলবে। মহান আল্লাহ বলেন; اَنۡفِقُوۡا مِمَّا رَزَقۡنٰكُمۡ “তোমাকে যে রিজিক প্রদান করেছি, তাদের থেকে কিছু অংশ ব্যয় করো।” অত্র আয়াতের অন্যতম একটি শিক্ষা হল, ব্যক্তি যা ব্যয় করবে, সেটাও মূলত আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ থেকেই। কেননা মহান আল্লাহ বলেন; مِمَّا رَزَقۡنٰكُمۡ “আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে।” এখানে বান্দার কাছে যে রিজিক আছে তা মহান আল্লাহর দিকেই নিসবত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন; مِمَّا رَزَقۡنٰكُمۡ “আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে।” এই শব্দের মাঝেই প্রমাণিত হয়, তোমাদের যা রিজিক দিয়েছি তার সম্পূর্ণ অংশ নয়। বরং তার সামান্য অংশ মাত্র। অনুরূপ ভাবে অত্র আয়াতে মহান আল্লাহর অনুগ্রহও ফুটে উঠেছে যে, তিনি কোন পরিমাণ ও অংশ নির্ধারণ করেন নাই। বরং তা দানকারীর বদান্যতার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে, আয়াতের শব্দ مِمَّا رَزَقۡنٰكُمۡ “আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে” প্রমাণ করে যে, যেকোন ধরনের রিজিক থেকেই দান করা যাবে। দান করাটা কোন নির্ধারিত প্রকারের সাথে নির্দিষ্ট নয়। বরং

আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সকল প্রকারের রিজিক থেকেই দান করা যাবে, সেটা হতে পারে; সম্পদ, ইলম, খাদ্য, পানীয়, পোশাক, চতুষ্পদ জন্তু, কায়িক পরিশ্রম, আপন পরিচয়ের মাধ্যমে উপকার সাধন, ইত্যাদি। এগুলো আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের রিযিক।

সুতরাং এখানে সেই মহান আল্লাহর পূতঃপবিত্রতা ঘোষণা করছি। যিনি তাঁর ভাষায় সর্বোচ্চ স্পষ্টতা এবং নিখুঁত ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্যকে ধারণ করেছেন, কেননা "যে রিজিক আমরা তোমাদের দিয়েছি" বাক্যটি নানা ধরনের উপকারিতা এবং দিকনির্দেশনার মধ্যে এক সাথে সমন্বিত হয়েছে, যেমন: বিভিন্ন ধরনের রিজিক, পরিমাণ, দাতার অবস্থা এবং দানে ব্যয়িত রিজিকের প্রসঙ্গ। পবিত্র সেই আল্লাহ তা'আলা যিনি তাঁর ভাষায় সবকিছু একত্রিত করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে সঠিক সিদ্ধান্ত, সুরম্য ভাষা, এবং অসাধারণ বর্ণনা এবং দাওয়াতি ও শিক্ষামূলক পদ্ধতি।

এই পবিত্র আয়াতটি মুমিনদেরকে দানের প্রতি উদ্যমী করে তোলে, পরকাল দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। যে দিনের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন; مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ يَّاۡتِىَ يَوۡمٌ لَّا بَيۡعٌ فِيۡهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَّ لَا شَفَاعَةٌ "সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন বেচা-কেনা, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না।" এই দিন এমন একটি দিন হবে যখন মানুষ আর কোনো কিছু বিক্রি করতে পারবে না, এমনকি আল্লাহর দেওয়া দুনিয়ার রিজিক দিয়েও তারা আখিরাতে তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কোনো কিছু কিনতে পারবে না। যেমন: ভালো কাজ, মর্যাদা, জান্নাত, আযাব থেকে আত্মরক্ষা, এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি। এই দিনে কোন প্রকারের ক্রয় বিক্রয় চলবে না। মহান আল্লাহ বলেন; (لَّا بَيۡعٌ فِيۡهِ) "কোনো বিক্রি হবে না"। অর্থাৎ ব্যবসা করা যাবে না। তিনি আরও বলেন; (وَ لَا خُلَّةٌ)"না কোনো বন্ধুত্ব" অর্থাৎ এমন বন্ধুত্ব যা উপকারে আসবে, তা আর থাকবে না।" তিনি আরও বলেন; ولَا شَفَاعَةٌ) "না শাফায়াত" অর্থাৎ কেউ কাউকে শাফা'ত করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দেন। দুনিয়াতে যা কিছু মানুষ আখিরাতে উপকারের জন্য ব্যবহার করতে পারে, তা এই দিন শেষ হয়ে যাবে, শুধু তা-ই কাজ

করবে যা মানুষ এই দুনিয়াতে আল্লাহর জন্য করেছে। এটি একটি উৎসাহ প্রদানকারী ও সতর্ককরণী পদ্ধতি, যার মাধ্যমে জীবনকে কাজে লাগানো যাবে। জীবনের সুযোগ এবং দুনিয়াতে করা কাজের মূল্য বুঝে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করাই এখানে উদ্দেশ্য। এই প্রক্রিয়ায়, দাতা মুমিন উপকার পাবে, যেহেতু সে যা দান করবে তা আখিরাতে তার পক্ষে সাফল্য হিসেবে আসবে, আল্লাহ তা'আলা তার অবস্থান উন্নত করবেন মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দিবেন। অনুরূপ ভাবে মহান আল্লাহর এই আদেশ বাস্তবায়নে দানের গুরুত্ব এবং পরকালে দাতার ফযিলত প্রাপ্তি প্রমাণিত হয়। সাথে সাথে দান সাদাকার মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগের বিষয়টি ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে সেটা প্রমাণিত হয়।

পবিত্র আয়াতটি শেষ হয় কাফিরদের অবস্থা বর্ণনার মাধ্যমে। মহান আল্লাহ বলেন; “আর কাফেররা অবশ্যই যালিম।” এখানে কাফেরদের মধ্যে পরিপূর্ণ জুলুম রয়েছে, তা স্পষ্ট করা হয়েছে। যে ব্যক্তি কাফের অবস্থায় মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, তারচেয়ে বড় জালেম আর কেউ নেই। কেননা, অফুরন্ত নিয়ামতে আচ্ছাদিত হয়েও তারা কুফুরী ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে নিজেদের উপর জুলুম করেছে।

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥﴾

অর্থ: **[আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে যে তার অনুমতি ব্যতীত তার কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তার জ্ঞানের কোন কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তার কুরসী আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দু'টোর রক্ষণাবেক্ষণ তার জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।]** *(*আয়াত নং*:* ২৫৫*)*

এরপর আয়াতুল কুরসী শুরু হয়েছে, যা পবিত্র কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত। যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, **নবী মুহাম্মাদ সাঃ উবাই বিন কা'বকে জিজ্ঞেস করলেন; পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতটি সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সর্বাধিক অবগত। তিনি বারবার প্রশ্নটি করলেন এবং সর্বশেষ উত্তর দিতে গিয়ে বললেন; সেটা হল আয়াতুল কুরসী। তিনি বলেন: (আল্লাহর শপথ! হে আবুল মুনযির, ইলম তোমার জন্য মোবারক হোক।)** সহীহ মুসলিম।

মহিমান্বিত আয়াতুল কুরসী শুরু হয়েছে মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে, اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلۡحَيُّ الۡقَيُّوۡمُ- যার প্রথম শব্দ হল, মহান আল্লাহর মহিমান্বিত নাম "আল্লাহ"। এরপর শুরু হয়েছে মহান আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনা। সেটা হল, "আল্লাহ তায়ালা এমন এক উপাস্য, যিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। আরবী শব্দ لا إله *(*নেই কোন উপাস্য*)* এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত যাবতীয় উপাস্যদেরকে অস্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। অতএব, আল্লাহ

ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা বা ইবাদত করা যাবে না। তাই কেউ যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করে, তাহলে সে মহান আল্লাহর সাথে কুফুরী করল এবং তার বিরোধীতা করল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বাক্যের মধ্যে কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদতকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে আসমানে অথবা জমিনে কোথাও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করা চলবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা হলেন (الحي) (চিরঞ্জীব), তিনি ব্যতীত সকলেই মরণশীল। এতে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া সমস্ত প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে, এবং পৃথিবী বা আকাশে যত উপাস্য রয়েছে, তারা আল্লাহর মতো স্থায়ী জীবন ধারণ করতে পারে না। জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করে, যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তা স্থায়ীভাবে জীবিত থাকতে পারে না, যতদিন না আল্লাহ তাকে জীবিত রাখেন। তিনি একমাত্র জীবিত, সবকিছু তাঁর ইচ্ছার অধীনে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন তিনি "القيوم" (তিনি সকল কিছুর অধিকারী)। এর অর্থ হল তিনি নিজেই পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত, অন্যের ওপর নির্ভরশীল নয়, অথচ অন্য সবকিছু তাঁর ওপর নির্ভরশীল। সমস্ত সৃষ্টির অস্তিত্ব, বিকাশ, চলাচল, জীবন, মৃত্যু, পুনর্জন্ম, রিজিক, সুস্থতা এবং সকল কিছু আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। তিনি সর্বদা সজাগ, সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, অন্যথায় তাঁর সৃষ্টির কিছুই থাকতে পারত না। এছাড়া তিনি "لا تأخذه سنة ولا نوم" (তিনি নিদ্রিত বা অবসন্ন হন না) বলেও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা কখনও নিদ্রা বা অবসন্নতায় আক্রান্ত হন না, যা তার শক্তি, মহিমা এবং পরিপূর্ণতার প্রকাশ। কেননা যে ব্যক্তি নিদ্রা বা অবসন্নতায় আক্রান্ত হয়, তার শক্তি দুর্বল, এবং সে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়, যা সৃষ্ট জীবের মধ্যে একটি সীমাবদ্ধতা। যা প্রমাণ করে মাখলুক তথা সৃষ্টিকূল খালেক তথা স্রষ্টার মুখাপেক্ষী। তিনি এমন স্রষ্টা, যিনি মহিমান্বিত, সম্মানিত, যিনি কখনও তন্দ্রাচ্ছন্ন হন না এবং নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা হলেন পূতঃপবিত্র ও মহান। সুতরাং একজন মাখলুক

কিভাবে আরেকজন মাখলুকের উপাসনা করতে পারে? যে নানাবিধ ত্রুটি আর সীমাবদ্ধতায় জর্জরিত ।

এরপর অত্র আয়াত আল্লাহ তায়ালার বিশাল রাজত্বের বর্ণনা শুরু করেছে, আর তা হল; لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ "আসমান ও যমীনের সবকিছুই কেবলমাত্র তাঁরই"। এর মানে হল যে, পুরো মহাজগতই আল্লাহর মালিকানায় রয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, সকল সৃষ্টি তাঁর দাস, এবং দাসদের জন্য এটি বাধ্যতামূলক যে তারা তাদের প্রভুর নির্দেশ অনুসরণ করবে। কাজেই, কোনো দাসকে তাঁর প্রভুর ইচ্ছা ছাড়া কিছু করতে বা অন্যভাবে চলতে দেয়ার অধিকার নেই। এটি পরিস্কারভাবে জানান দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর মালিক, এবং তিনি যেভাবে চান, সেভাবে সবকিছু পরিচালনা করেন। এর অর্থ হল যে, সৃষ্টির সব কিছু আল্লাহর মালিকানাধীন, এবং তিনি যা ইচ্ছা, তা ঘটাতে পারেন। এই আয়াতের অন্যতম একটি শিক্ষা হল, মালিকানাধীন সকল বস্তু মালিকের মুখাপেক্ষী। যেমন, তার অস্তিত্ব, খাবার, পানীয়, সুস্থতা, রিজিক, জীবনের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অতঃপর হাশর নাশর ও তার পরবর্তী সকল ক্ষেত্রেই।

এই মহিমান্বিত আয়াতটি আল্লাহর বিশাল ক্ষমতা সম্পর্কে আরোও তুলে ধরেছে, "من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه" **(কে সে যে তার অনুমতি ব্যতীত তার কাছে সুপারিশ করবে?)**। এই বাক্যে আল্লাহ তা'আলার মহিমা এবং গরিমা প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি প্রশ্নবোধক বাক্য, যা আল্লাহর গৌরব ও মর্যাদা স্পষ্ট করে যে, কেউ যদি আল্লাহর কাছে শাফা'ত করতে চায়, তবে তা শুধুমাত্র আল্লাহর অনুমতির মাধ্যমে সম্ভব। অত্র আয়াতের একটি শিক্ষা হল, মহান আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ কারো জন্য শাফায়াত করার নূন্যতম ধৃষ্টতা দেখানোর সাহস করবে না। এটা আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব, অহংকার, মহত্ত্ব, বিশাল রাজত্ব, সীমাহীন ক্ষমতা ইত্যাদির কারণে। যা আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর সময় সম্মানিতের সম্মান, সুপারিশকারীদের সুপারিশ ভেঙ্গে পড়ার ফায়েদা

দেয়- দুনিয়াতে তার মর্যাদা ও স্তর যাই থাকনা কেন। যতক্ষণ না আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা যাকে চান তাকে অনুমতি না দেন। আর এ ফায়েদাও দেয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার অনুমতি ছাড়া তার বান্দার অবস্থান তাদের ব্যাপারে কোনই কাজে আসবে না।

এই আয়াতটি আল্লাহর অসীম জ্ঞানের ব্যাপারে বর্ণনা করেছে, " يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم" **(তিনি জানেন তাদের সামনে কি আছে এবং তাদের পেছনে কি ছিল)**। আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টিকুলের ভবিষ্যতকে বেষ্টন করে রেখেছে, *(* يعلم ما بين أيديهم*)* "তিনি জানেন তাদের সামনে কি আছে।" সৃষ্টিকুল তাদের সামনে কি আছে তা সম্পর্কে অবগত নয়। আর মহান আল্লাহ এই সৃষ্টিকুলের ভবিষ্যতে কি ঘটবে, তা সম্পর্কে সম্যক অবগত। অনুরূপ ভাবে তাঁর জ্ঞান তাদের অতীতের সব কিছুই বেষ্টন করে রেখেছে। পক্ষান্তরে সৃষ্টিকুল তার নিজের সম্পর্কেই অতীত অনেক কিছুই ভুলে যায়। মনে রাখতে সক্ষম নয়। আর মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টি ওই পরিমাণই মনে রাখতে সক্ষম, যে পরিমাণ মহান আল্লাহ তাদের স্মরণ রাখার ইচ্ছে করেন ও তাওফিক দান করেন। وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ "একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না।" অর্থাৎ তারা আল্লাহর জ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানে না, তবে যা আল্লাহ তা'আলা চাইবেন, তেমনটাই তারা জানে। তাদের যে জ্ঞান রয়েছে, তা আল্লাহর ইচ্ছার একটি ক্ষুদ্র অংশ, যা তিনি তাদের জানাতে ইচ্ছুক। এটি নির্দেশ করে যে, বান্দা সর্বদা আল্লাহর জ্ঞানের মুখাপেক্ষী। তার স্মৃতি, বোঝাপড়া, চিন্তা, শেখা এবং শিক্ষাদানের বিষয়ে। এই কারণেই, বান্দার উচিত আল্লাহর কাছ থেকে জ্ঞান এবং বোঝাপড়া প্রার্থনা করা এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। যখন সে কিছু শেখে, তখন তাকে তার শেখার সফলতা এবং শিক্ষার জন্য আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে হবে, এবং বলতে হবে: "আল্লাহ আমাকে এই বিষয়টি বোঝার, ব্যাখ্যা করার, স্মরণ করার এবং এর থেকে উপকারিতা গ্রহণ করার ক্ষমতা দান করেছেন।" যদি আল্লাহ তায়ালার বদান্যতা এবং দান না থাকত, মাখলুক

নূন্যতম জ্ঞান লাভেও সক্ষম হত না। সেটা যে বিষয়ই হোক কেন, হোক তা শরীয়াহ এর জ্ঞান অথবা পেশাগত অথবা ব্যবসায়িক,বা বিজ্ঞান আর অন্য যেকোন বিষয়ের।

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের জ্ঞান সীমিত, যা আল্লাহ তা'আলা তাকে শিখিয়েছেন। যেমন ফেরেশতারা এই সূরার শুরুতে বলেছিলেন: "পবিত্র তুমি, আমাদের কোনো জ্ঞান নেই, শুধুমাত্র যা তুমি আমাদের শিখিয়েছ তা ব্যতীত, নিশ্চয়ই তুমি সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" আল্লাহ বলেন: "إِلَّا بِمَا شَاءَ" (শুধুমাত্র যা তিনি ইচ্ছা করেন), যা বোঝায় যে তাঁর বান্দাদের জ্ঞানের পরিমাণ ভিন্ন। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কাউকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ও ধরনের জ্ঞান দেন এবং অন্য কাউকে ভিন্ন পরিমাণ ও ধরনের জ্ঞান দেন। তাই মানুষের মধ্যে পার্থক্য থাকে, ফলে তারা একে অপরের প্রয়োজন অনুভব করে এবং পরামর্শ নেওয়ার দরকার হয়। মানুষ যখন পরামর্শ করে, এতে একজনের কথা অন্যজনের থেকে ভিন্ন হতে পারে, আবার কেউ অন্যের চেয়ে ভালো পরামর্শও দিতে পারে, যদিও বিষয়টি একই। কখনো ছোটদের কাছেও এমন জ্ঞান থাকতে পারে, যা বড়দের কাছে নেই, এবং নবীনদের কাছেও এমন কিছু থাকতে পারে, যা অভিজ্ঞদের নেই। তাই তারা বলে , "তুমি নদীতে এমন কিছু পাবে, যা সাগরেও পাবে না।" রাসূল (সা.) তার সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন, সাহাবারাও নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতেন। আর নবী (সা.) কখনো কখনো সাহাবীদের পরামর্শও গ্রহণ করতেন। যেমন উহুদের দিন তিনি সাহাবীদের পরামর্শ অনুযায়ী শত্রুর বিরুদ্ধে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন।

এই মহিমান্বিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরসীর বিশালতা বর্ণনা করেছেন, যা তাঁর মহান শক্তি ও গৌরবের প্রমাণ। **"তার কুরসী আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করেছে।"** তিনি সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং এতে তিনি কোনো ক্লান্তি অনুভব করেন না, কারণ তিনি সর্বশক্তিমান, পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির জন্য নিখুঁত ব্যবস্থা স্থাপন করেছেন, যেখানে কিছুই তাঁর আদেশ ছাড়া এগিয়ে বা

পেছনে যেতে পারে না। যে মহান সৃষ্টিকে রক্ষা করতে অপারগ হন না, তিনি অন্য কিছুর রক্ষাতেও অক্ষম নন।এ থেকেই বোঝা যায়, সৃষ্টির জন্য আল্লাহর হেফাযত একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই একজন মুসলিমের উচিত সর্বদা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাওয়া—ক্ষতিকারক প্রাণী, জিন-মানুষের অনিষ্ট, নিজের জীবন, সম্পদ, ধর্ম, বিবেক ও পরিবারসহ সব বিষয়ে। তাই হাদীসে নিরাপত্তার জন্য বিশেষ দু'আ ও যিকির এসেছে, যেমন ঘুমানোর আগে এবং সকাল-বিকেলে পড়ার জন্য। মানুষের জন্য আল্লাহর হেফাযত কতই না প্রয়োজন!

এই মহিমান্বিত আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ বলেন, "وهو العلي العظيم" (তিনি সর্বোচ্চ ও মহাসম্মানিত)। এতে বোঝা যায়, তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে, এবং সবকিছু তাঁর অধীনস্থ। তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী—স্থান, গুণ, শক্তি ও জ্ঞানের দিক থেকে। সবকিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে ও আনুগত্যে রয়েছে এবং সবকিছু তাঁর ক্ষমতা ও অধীনে রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার একটি গুণ হলো "العظيم" (সুমহান), যা সমস্ত মহিমা, শক্তি ও ক্ষমতার সমষ্টি। এটি বোঝায় যে, বান্দা তাঁর মহত্ব ও শক্তির মুখাপেক্ষী। তাই সব বিষয়ে আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া উচিত এবং কখনোই তাঁর মহত্ত্ব ও গৌরবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত নয়, কারণ বান্দা দুর্বল, আর সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান ও মহান।

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

অর্থ: **[দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কেন জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে। অতএব, যে তাগুতকেঅস্বীকার করবে ও আল্লাহর উপর ঈমান আনবে**

সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারন করল যা কখনো ভাঙ্গবে না। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, আল্লাহ তাদের অভিভাবক যারা ঈমান আনে, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান। আর যারা কুফরী করে তাগূত তাদের অভিভাবক, এরা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।] *(*আয়াত নং: ২৫৬- ২৫৭*)*

পবিত্র কুরআনের বক্তব্য ইসলাম গ্রহণ ও এতে প্রবেশের বিষয়ে আল্লাহর দাওয়াতি পদ্ধতির সত্যতা ব্যাখ্যা করে, যা মুমিনদের জানা উচিত। আল্লাহ বলেন*:* ***(দ্বীনের বিষয়ে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই)***। অতএব, আয়াতটি এই নির্দেশনার মাধ্যমে শুরু হয়েছে যে, নবী *(*সা.*)* কাউকে বলপ্রয়োগ করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবেন না। কেননা এমন কিছু কারণ রয়েছে যা জোর-জবরদস্তিকে অযৌক্তিক করে তোলে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত স্বেচ্ছায় ও আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করা। কারণ সত্যপথ ভুলপথ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। রাগিব আল-আসফাহানি বলেন, "الرشد" *(*সঠিক পথ*)* এর বিপরীত হলো "الغي" *(*ভ্রান্তি*)*, আর "الرشد" হলো প্রকৃত হিদায়াত ও সঠিক দিকনির্দেশনা।[৫৪]

আর *(*الغي*)* একটি ভুল বিশ্বাসের সমষ্টি *(*আল মুরজিউস সাবিক, ৩৬৯*)* তাই আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ইসলামে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করা অজ্ঞতা শেষ হয়ে গেছে। কারণ, সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে এটি আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত সত্য ধর্ম। এতে এমন প্রমাণ ও দলীল রয়েছে, যা এতে কোনো সন্দেহ বা অজ্ঞতার অবকাশ রাখে না। আর এর বিপরীত শিরক ও কুফরের অজ্ঞতাও দূর হয়েছে। ফলে সত্যপথ ভুলপথ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে— *(*নিশ্চয়ই সত্য পথ ভুল পথ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে*)*

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী "নিশ্চয়ই সত্যপথ ভুলপথ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে"— এর মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, যখন সত্য প্রকাশ পায়, তখন মিথ্যার ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে

---

(৫৪) দেখুন*:* আল মুফরাদাত ফি গরীবিল কুরআন*: (*পৃঃ ১৯৬*)*।

যায় এবং অন্যদের জন্যও সত্য স্পষ্ট হয়। এটি এ কথাও বোঝায় যে, নেককার ব্যক্তি যদি সঠিক পথ অনুসরণ করে, তবে তার জীবনযাত্রা নিজেই পথভ্রষ্টদের জন্য তাদের ভ্রান্তির স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বাস্তবতা কথার চেয়ে অধিকতর প্রভাবশালী হয়। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী "ধর্মের বিষয়ে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই"—এর মধ্যে রয়েছে দাওয়াতের একটি মূলনীতি, যার অর্থ হলো, মুসলমানের দায়িত্ব হলো কথায় ও কাজে ইসলামের সত্যতা স্পষ্ট করা, কিন্তু কাউকে এতে বাধ্য করা নয়। কারণ ইসলাম তার পূর্ণাঙ্গ বিধান, অকাট্য দলিল ও প্রমাণসহ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্য ধর্ম। এর নৈতিক, সামাজিক, উপাসনা, বিশ্বাস ও লেনদেন সংক্রান্ত বিধানসমূহ এমনভাবে সুস্পষ্ট যে, শুধু যথাযথ ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনাই ইসলামে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট। এতে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভালোবাসা ও আগ্রহ নিয়ে ইসলামে প্রবেশ করবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুক্তির পথ স্পষ্ট করে দেন, *(***যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে দৃঢ়ভাবে এক মজবুত বন্ধন ধারণ করল, যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।***)* তাহলে প্রথম পথ হলো, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যেকোনো উপাস্যের প্রতি অবিশ্বাস করা *(*যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে*)*, এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যে কোনো উপাস্যই তাগুত।আর দ্বিতীয়টি হলো*:* আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনা *(*এবং সে আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে*)*তার প্রতি ঈমান রাখা এক অটুট বন্ধন, যা তাঁর শরীয়তের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের পথ দেখায়। ফলস্বরূপ, একজন মুমিন এমন এক দৃঢ় বন্ধন ধারণ করে, যা কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না—*(*অর্থাৎ, "সে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরল সেই অটুট বাঁধন, যার কোনো বিচ্ছেদ নেই"*)*। ইবনে কাসীর *(*রহ.*)* বলেন, অর্থাৎ সে দ্বীনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যমকে আঁকড়ে ধরেছে। তিনি একে এমন এক দৃঢ় বন্ধনের সাথে তুলনা করেছেন, যা নিজে কখনো ছিন্ন হয় না—এটি সুদৃঢ়, মজবুত ও অটুটভাবে বাঁধা। মুজাহিদ বলেন, "দৃঢ় বন্ধন" মানে ঈমান। সুদ্দি বলেন, এটি ইসলাম। সাঈদ ইবন জুবায়ের ও যহহাক বলেন, এর অর্থ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। আনাস বিন মালেক বলেন, "দৃঢ় বন্ধন" হলো কুরআন। সালিম ইবনে আবিল-জাদ বলেন, এটি আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা। এসব বক্তব্য সবই সঠিক এবং পরস্পরের বিরোধী নয়।[৫৫] এটি আল্লাহ তা'আর বাক্যের মহিমা প্রমাণ করে। কিভাবে তাঁর বাণী এত বিস্তৃত অর্থ ও সকল ইচ্ছাকে ধারণ করেছে! মাত্র একটি বাক্য—"দৃঢ় বন্ধন"—এর মধ্যে এত গভীর অর্থ ও দিক নির্দেশনা স্থান পেয়েছে। পবিত্র সেই সত্তা, যার বাক্য সর্বোচ্চ সুস্পষ্ট ভাষায় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শব্দে তাঁর উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছে। শব্দগুলো মহিমান্বিত হয়েছে, কারণ তাতে সৃষ্টিকুলের প্রতিপালকের বাক্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুতরাং, সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের জন্য। এরপর এই মহিমান্বিত আয়াতটি শিক্ষা, জ্ঞান, এবং মহান উপদেশের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। এটি আল্লাহ তা'আলার বাণী: "আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"তিনি তাঁর বান্দাদের সব কথা শোনেন এবং তাঁদের সকল কাজ সম্পর্কে অবগত। এটি বান্দাকে বোঝার শক্তি দেয়, যাতে সে আল্লাহর গুণাবলীর সত্যতা উপলব্ধি করে। ফলে, সে সবসময় আল্লাহর নজরদারিতে থাকার অনুভূতি পায়, তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে এবং তাঁর আনুগত্যে থাকে। কারণ, আল্লাহ যেখানেই সে থাকুক না কেন, যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, শুনতে পান এবং তার সব ভালো-মন্দ কাজ জানেন। এ উপলব্ধি তাকে সঠিক পথে স্থির রাখে, যা আল্লাহর দয়া, মহান দান, কল্যাণ ও অনুগ্রহ লাভের কারণ হয়। মহান ও বরকতময় আল্লাহ!

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর পদ্ধতি ও মুমিনদের প্রতি যত্ন প্রদর্শন করেন এবং একইসাথে অবিশ্বাসীদের সাথে দুষ্কৃতিকারীদের পদ্ধতি বর্ণনা করেন, যাতে মানুষ বিভিন্ন পথের পার্থক্য বুঝতে পারে এবং সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে।(আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক; তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যান) এতে আল্লাহ স্পষ্ট

---

(৫৫) তাফসীর ইবনে কাসীর: (১/৩১৯)।

করেছেন যে, তিনি মুমিনদের অভিভাবক; তিনি তাদের শুরু থেকেই সাহায্য, সমর্থন ও সঠিক পথের দিশা দেন, যাতে তারা কুফর, শিরক, অজ্ঞতা ও অসৎ কাজের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে এবং ইসলামের আলোতে প্রবেশ করে—যেখানে রয়েছে সঠিক পথনির্দেশ, বিশুদ্ধ বিশ্বাস, উত্তম চরিত্র ও ন্যায়সঙ্গত বিধান। এ পথই তাদের জান্নাতে পৌঁছে দেয়। আর যারা কুফরী করে, তাদের অভিভাবক হয় আল্লাহ ব্যতীত তাদের উপাস্যরা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, (আর যারা কাফের, তাদের সাহায্যকারী হচ্ছে তাগূত, যারা তাদেরকে নূর থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়।) এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের এবং তাদের তাগূতদের অবস্থার তুলনা করেছেন, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের পূজা করা হয়। এই তুলনায় তিনি বুঝিয়েছেন যে, কাফেরদের অবস্থা মুমিনদের অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের তাগূতরা তাদেরকে ইসলামী নূর এবং শান্তির পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে কুফরের অন্ধকারে নিয়ে যায়, যা তাদের আরও দুঃখ-কষ্ট এবং যন্ত্রণার দিকে পরিচালিত করে, বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে।তাদের পরিণতি হবে জাহান্নামে (তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে) এখানে বলা হচ্ছে যে কাফেরদের পরিণতি হলো চিরকাল জাহান্নামে থাকা, এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ধর্ম তাদের রক্ষা করতে সক্ষম নয়।

এর মানে, আল্লাহর ধর্ম একটি আলো, যা তাঁর সম্পূর্ণ শরীয়তের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং এটি আখিরাতের আলো ও আনন্দের দিকে নিয়ে যায়। আর কুফর (অবিশ্বাস) অন্ধকার, যা অন্ধকার ও কঠিন শাস্তির দিকে ধাবিত করে। মুমিনরা এক মহান আলোর মধ্যে রয়েছে, আর কাফিররা অন্ধকারে নিমজ্জিত। চিন্তা, মন ও জীবনে—যদিও তাদের মধ্যে এবং তাদের উপর দুনিয়ার কিছু সুখ-সুবিধা দেখা যায়, তবুও তাদের আত্মা কষ্ট, দুর্ভোগ ও অবনতির চিহ্ন বহন করে।

আয়াতটির প্রসঙ্গ, পদ্ধতি ও অর্থ—শিক্ষা, যুক্তি, দাওয়াত ও নির্দেশনার গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে। বিপরীত বিষয়গুলোর মধ্যে তুলনার মাধ্যমে বিষয়গুলোর প্রকৃত সত্য

স্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয় এবং তা যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়। এই তুলনা মানুষের মনে চিন্তা, পরীক্ষা ও গভীরভাবে ভাবনার উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। কারণ, এই তুলনাই শ্রোতাকে স্পষ্ট জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে, যা তাকে অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করে এবং সত্যকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

"الله ولي الذين آمنوا" এই বাক্যে রয়েছে উৎসাহ এবং প্রেরণা। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তার অনুগ্রহে মুমিনদের সাহায্য করেন এবং তাদের জন্য একটি মহান ও সম্মানিত অবস্থান নির্ধারণ করেছেন। আর তা হলো আল্লাহ তা'আলা তার শক্তি, সুরক্ষা, পথপ্রদর্শন, শাসন, দয়া এবং উদার দানের মাধ্যমে মুমিনদের রক্ষক হন। এটি প্রয়োগিকভাবে সমর্থন এবং সাহায্যের গুরুত্ব তুলে ধরে, কারণ সাহায্য একটি প্রেরণা যা মানুষকে তার কাজ সম্পাদন করতে উৎসাহিত করে এবং অলসতা ও দুর্বলতা থেকে দূরে রাখে। এটি যদি মন্দ দূর করতে হয় বা উপকার আনার জন্য হয়, অথবা ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবস্থাপনায় হয়, সব ক্ষেত্রেই সাহায্য একটি মাধ্যম, যার মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণ অর্জিত হয়।

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

অর্থ: **[আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেননি, যে ইবরাহীমের সাথে তার রব সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইবরাহীম বললেন, "আমার রব তিনিই যিনি জীবনদান করেন ও মৃত্যু ঘটান, সে বলল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান, তুমি সেটাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও তো। তারপর**

যে কুফরী করেছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।] *(*আয়াত নং*:* ২৫৮*)*

এখানে কুরআনিক প্রসঙ্গটি ইব্রাহীম *(*আঃ*)*-এর একটি ঘটনার বর্ণনায় পরিবর্তিত হয়েছে, যা আল্লাহর বিশেষ বন্ধু *(*খলীলুল্লাহ*)*-এর সঙ্গে সংঘটিত এক গম্ভীর মুহূর্তকে তুলে ধরছে। আল্লাহ বলেন, **"তুমি কি দেখনি সে ব্যক্তিকে, যে ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্পর্কে তর্ক করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন?"** কুরআনের আয়াতে এটি এক আকর্ষণীয় প্রশ্নের আকারে উপস্থাপিত হয়েছে, যা ইব্রাহীম *(*আঃ*)*-এর ঘটনাকে উজ্জীবিত করতে এবং আল্লাহর একক অস্তিত্বের সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছে। এই রাজা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো রবের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিল। সুতরাং, এই ঘটনার বর্ণনা এমনভাবে এসেছে, যেন এটি একটি স্পষ্ট এবং দৃঢ় বাস্তবতা, যা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ বা সংশয় নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্যকে এমনভাবে খবর দিয়েছেন, যেন কেউ তা নিজের চোখে দেখেছে বা প্রত্যক্ষ করেছে। এখানে "ألم تر" এর অর্থ হলো "তোমার জ্ঞানে কি এটি পৌঁছায়নি?" এবং এটি পাঠক বা শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এসেছে, যাতে তারা কুরআনের মহিমা ও গুরুত্বপূর্ণ বার্তাগুলো বুঝতে পারে এবং তাদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন এই আলোচনাটি আল্লাহর প্রিয় নবী ইব্রাহীম *(*আঃ*)* এবং সেই অত্যাচারী রাজা এর মধ্যে ঘটেছিল।

এবং অনুরূপভাবে কিছু উপকারিতা হলো*:* আল্লাহ তাআলা রাজত্ব দেওয়ার ব্যাপারে নিজেকে কর্তৃত্বশীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন *(*أن آتاه الله الملك*)* অতএব, একজন মানুষের হাতে যা কিছু আছে, তা অল্প হোক বা বেশি, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি দান, তাঁর হিকমতের মাধ্যমে এবং আল্লাহ তা'আলার একটি হিকমত রয়েছে, যা তিনি জানেন, কারণ তিনি সর্বজ্ঞ এবং প্রজ্ঞাময়। আরও উপকার পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন, এমনকি অপরাধী বা কাফিরকেও, কারণ আল্লাহ

তাঁর হিকমত এবং ক্ষমতার মাধ্যমে দান করেন। অনুরূপভাবে, এর মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার দান হওয়া মানে এর জন্য তিনি সন্তুষ্ট এমন নয়, এবং দান বন্ধ করে দেওয়া মানে তাঁর ক্রোধ নয়; বরং তিনি তাঁর হিকমত অনুযায়ী দান করেন এবং কখনো কখনো দান বন্ধও করেন।

আল্লাহ তা'আলা বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন সেই ব্যক্তির প্রতি, যাকে তিনি রাজত্ব দান করেছেন। যেমনটি তাফসীর বইগুলোতে এসেছে, সে ছিল বাবিলের রাজা, নামরুদ বিন কনআন। মুজাহিদ বলেছেন, তিনি পৃথিবীর রাজা ছিলেন, পূর্ব এবং পশ্চিমের সমস্ত অঞ্চল তার অধীনে ছিল। মোট চারজন ছিলেন, দুইজন মুমিন এবং দুইজন কাফির। মুমিনদের মধ্যে ছিলেন সুলাইমান ইবনে দাউদ ও যুল-কারনাইন এবং কাফিরদের মধ্যে ছিলেন নামরুদ এবং তার সঙ্গী। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞানী।[৫৬]

এই রাজা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো রবের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিল। এই রাজার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সে শুধু আল্লাহ তাআলার অস্বীকারকারী ছিল না, বরং তার অহংকার এবং রাজত্বের বড়ত্বে এতটাই মগ্ন ছিল যে, সে নিজেকে রব দাবি করেছিল। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা যা দান করেন, তা কখনো কখনো মানুষের অহংকার সৃষ্টি করে, যা তাকে এমন দাবি করতে বাধ্য করে যা তার প্রাপ্য নয়। ইব্রাহীম *(আ.)* এই ভুল দাবী অস্বীকার করে বলেন, ***(আমার রব সেই যিনি জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন)"*** তিনি নামরুদের প্রভুত্বে অস্বীকার করেন এবং একমাত্র আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন, যিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। নামরুদ তার পাল্টা বলে, *"(আমি জীবন দিই এবং মৃত্যু দেই) "* অর্থাৎ সে বলছিল যে, সে যাকে চায় হত্যা করে এবং যাকে চায় বাঁচিয়ে রাখে। এটি ছিল তার কৌশল, যা মূল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে, শুধু উল্টোপাল্টা কথা বলা। এটি তার জেদ এবং অস্বীকারের প্রতিফলন। এর মাধ্যমে

---

(৫৬) তাফসীর ইবনে কাসীর: *(১/৩৩০)*।

বোঝা যায় যে, কিছু লোকের কাছে এমন কিছু কৌশল থাকে যা তারা দুর্বল মনের মানুষদের বিভ্রান্ত করতে ব্যবহার করে। তর্কে অংশ নেওয়া ব্যক্তির সতর্ক থাকা আবশ্যক এবং আল্লাহ তাআলার সাহায্য চাওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম আলা.-কে সাহায্য করেছিলেন, যাতে তিনি অন্য একটি যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেন, এমন একটি পদ্ধতিতে যা কেউ অস্বীকার বা বিকৃত করতে পারে না।আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম (আ.)-এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন, ইব্রাহীম আলা. বললেন, "আল্লাহ তাআলা সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন। অতএব তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে উদিত করো।" এটি এমন একটি অবস্থান ও দাবি, যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এখানে ইব্রাহীম আলা.-এর যুক্তি এতটাই শক্তিশালী যে, যারা কুফরি করে তাদের যুক্তি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে। তাঁরা কোনো উত্তর দিতে পারেনি। কারণ, সূর্য উদয় ও অস্তের স্থান পরিবর্তন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এটি এমন একটি সত্য যা সব মানুষ দেখতে পায়।

এরপর আয়াতের শেষে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জালিমের পরিণতি বর্ণনা করেছেন, (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) "আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।" অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা জালিমদের হিদায়াত ও সঠিক পথের সন্ধান দেন না। কারণ, তাঁরা সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহর সাহায্য ও তাওফিকও দেওয়া হয় না। এখানে আল্লাহ তাআলা জালিমদের হিদায়াত না দেওয়ার মাধ্যমে একটি সতর্কবাণী রয়েছে। তা হলো, সব ধরনের জুলুম থেকে দূরে থাকা। কারণ, জুলুম ও অত্যাচারের মাধ্যমে সাময়িক বিজয় অর্জিত হলেও আল্লাহ তাআলা জালিমদেরকে হিদায়াত দেন না । তাদেরকে এমন অবস্থায় ফেলে দেন, যা তাদের জন্য বিজয়ের মিষ্টত্বের চেয়েও বেশি কঠিন ও বেদনাদায়ক। যারা ইতিহাসে জালিমদের ঘটনাগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে, তারা দেখতে পাবে যে তাদের

পরিণতি সব সময়ই ভয়াবহ। তাই আমরা আল্লাহ তাআলার রহমত প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে জুলুম থেকে দূরে রাখেন এবং জুলুমকে আমাদের থেকে দূরে রাখেন।

﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

অর্থ: **[অথবা সে ব্যক্তির মত, যে এমন এক জনপদ অতিক্রম করছিল যা তার ছাদের উপর থেকে বিধ্বস্ত ছিল। সে বলল, মৃত্যুর পর কিভাবে আল্লাহ্ একে জীবিত করবেন? তারপর আল্লাহ তাকে এক শত বছর মৃত রাখলেন। পরে তাকে পুনজীবিত করলেন। আল্লাহ্ বললেন, 'তুমি কতকাল অবস্থান করলে?' সে বলল, 'একদিন বা একদিনেরও কিছু কম অবস্থান করেছি।' তিনি বললেন, বরং তুমি এক শত বছর অবস্থান করেছ। সুতরাং তুমি তোমার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় বস্তুর দিকে লক্ষ্য কর, সেগুলো অবিকৃত রয়েছে এবং লক্ষ্য কর তোমার গাধাটির দিকে। আর যাতে আমরা তোমাকে বানাবো মানুষের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। আর অস্থিগুলোর দিকে লক্ষ্য কর; কিভাবে সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দেই'। অতঃপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হলো তখন সে বলল, 'আমি জানি, নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান'।]** (আয়াত নং: ২৫৯)

এই উদাহরণটি পূর্ববর্তী উদাহরণের সাথে সংযুক্ত, যেখানে আল্লাহ তাআলা সেই অত্যাচারী রাজাকে পরাজিত করেছিলেন এবং ইব্রাহীম আলা.-কে দৃঢ় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা সাহায্য করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা এই উদাহরণে বলেন, "অথবা সে ব্যক্তির মত, যে এমন এক জনপদ অতিক্রম করছিল যা তার ছাদের উপর থেকে বিধ্বস্ত ছিল।" তুমি কি লক্ষ্য করেছ এই ব্যক্তির উদাহরণের দিকে, যে ইব্রাহীম আলা. এর সাথে ঝগড়া করেছিল তাঁর রবের ব্যাপারে? এই ব্যক্তি যে নগরীর পাশ দিয়ে গিয়েছিল, তা ছিল জনমানবশূন্য এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত। (خاوية) অর্থাৎ এটি সম্পূর্ণ খালি এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। (عروشها) অর্থাৎ এর ছাদ ও দেয়াল ভেঙে পড়েছিল। ব্যক্তিটি সেখানে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হয়ে ভাবছিল, এই নগরীর বাসিন্দাদের কী হয়েছে এবং কীভাবে এটি

এত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। এটি একসময় ছিল জনবসতিপূর্ণ, উন্নত এবং সক্রিয় একটি নগরী, যেখানে মানুষ বেচাকেনা করত এবং জীবনযাপন করত। কিন্তু এখন এটি সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এই দৃশ্য দেখে তাঁর মনে পুনরুত্থান নিয়ে সন্দেহ জাগল। সে বলল, *("কীভাবে আল্লাহ এটিকে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করবেন?")*। এই ব্যক্তির কথা *(الله هذه يُحي أنى)* থেকে বুঝা যায় যে সে আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাসী। নমরূদের মতো নয়। তবে সে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। সে এ কথা অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাবনায় বলেছিল। *(مِائَةَ اللهُ فَأَمَاتَهُ بَعَثَهُ ثُمَّ عَامٍ)"* তারপর আল্লাহ তাকে এক শত বছর মৃত রাখলেন। পরে তাকে পুনজীবিত করলেন।"। যখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতার মাধ্যমে তাকে বললেন*: "তুমি কতকাল এ অবস্থায় ছিলে?"* এই প্রশ্নের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাকে চিন্তা করতে এবং তাঁর অতীত ও বর্তমান অবস্থা স্মরণ করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। আল্লাহ তাআলা সরাসরি তাকে জানানোর পরিবর্তে প্রশ্নের মাধ্যমে শুরু করলেন। কারণ প্রশ্নের মধ্যে সতর্কতা, মনোযোগ আকর্ষণ এবং জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির অক্ষমতা প্রকাশের মতো অনেক উপকারিতা রয়েছে। এটি তাঁর নিজের সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং তাঁর অবস্থা সম্পর্কে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করে। এভাবে সে আল্লাহ তাআলার পুনরুত্থানের ক্ষমতা এবং তাঁর জন্য সবকিছু সহজ হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারল। কারণ, সৃষ্টির অক্ষমতা স্রষ্টার ক্ষমতার সাথে তুলনীয় নয়। স্রষ্টা মহান ও সর্বশক্তিমান। আর সৃষ্টি সবদিক থেকে দুর্বল ও অক্ষম আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও অনুগ্রহ ছাড়া। তাই সে ফেরেশতাকে তাঁর সীমিত জ্ঞান অনুযায়ী উত্তর দিল। সে বলল, "একদিন বা একদিনের কিছু অংশ।" তাঁর মৃত্যু ও অনুপস্থিতির সময়কাল তাঁর ধারণায় একদিন বা তাঁর চেয়েও কম ছিল। এটি তাঁর সীমিত ধারণা, যা আল্লাহ তাআলার মহান ক্ষমতা ও তাঁর পূর্ণ জ্ঞানের বিশালতা প্রকাশ করে।এরপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে উত্তর এলো, যা তাঁর হৃদয় ও অবস্থার উপর গভীর প্রভাব ফেলল, *("বরং তুমি একশত বছর*

অবস্থান করেছ।") নিঃসন্দেহে এই খবর তাঁর উপর গভীর প্রভাব ফেলল। তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে বুঝাতে থাকলেন, যাতে সে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অন্যরাও তাঁর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে। আল্লাহ তাআলা পুনরুত্থান ও প্রতিদানের ক্ষমতা সম্পর্কে বললেন, "তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে তাকাও, তা পচে যায়নি।"। আল্লাহ তাআলা তাকে বাস্তব ও স্পষ্ট প্রমাণের দিকে নির্দেশ দিলেন, যা দীর্ঘ সময় ধরে অপরিবর্তিত ছিল। এটি বুঝানোর জন্য যে পরিবর্তনের নিয়ম আল্লাহ তাআলার হাতে। যদি আল্লাহ চান, তবে সময়ের সাথে কোনো জিনিসের পরিবর্তন হবে না,যেমন আমাদের প্রভু চান। আবার তিনি চাইলে অন্য জিনিসকে পরিবর্তন করতে পারেন, যেমন ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা।

তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁর গাধার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, "(এবং তোমার গাধার দিকে তাকাও।)" যা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং কেবল হাড়গুলো অবশিষ্ট ছিল। এটি মৃত্যু ও ধ্বংসের স্পষ্ট প্রমাণ, যা তাঁর সামনে উপস্থিত ছিল। তারপর সে দেখল কীভাবে আল্লাহ তাআলা তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন, যখন সে তা দেখছিল। জীবন সঞ্চারিত হলো। "(এবং তোমার গাধার দিকে তাকাও।)" খাদ্য, যা সময়ের সাথে পচে যায় এবং নষ্ট হয়ে যায়, তা অপরিবর্তিত ছিল। অন্যদিকে গাধা, যা একশত বছর বেঁচে থাকতে পারে, তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এটি আল্লাহ তাআলার মহান ক্ষমতা প্রকাশ করে, যিনি নিয়ম ও বিধান পরিবর্তন করতে পারেন। এটি মানুষকে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও মহিমা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, যা তোমার মাধ্যমে ঘটেছে এবং তোমার জন্য হয়েছে, তা পরবর্তী লোকদের জন্য শিক্ষা ও নিদর্শনস্বরূপ। (আর যেন আমরা তোমাকে মানুষের জন্য নিদর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি) যাতে সে মানুষের জন্য নিদর্শন হয়। আল্লাহ তা'আলার পুনর্জীবন দান, পুনরুত্থান এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করার ক্ষমতার প্রমাণস্বরূপ।

তারপর আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, যাকে তিনি জীবিত করেছিলেন, কিভাবে তাঁর গাধার পুনর্জীবন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। সে দেখল, তার গাধার দেহ পচে গলে গিয়েছে এবং হাড়গুলো ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। এরপর আল্লাহ তাকে বললেন, "আর হাড়গুলোর দিকে তাকাও—কিভাবে আমরা সেগুলোকে একের পর এক জুড়ে দিচ্ছি।" অর্থাৎ, কিভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা হাড়গুলো পুনরায় একত্রিত হচ্ছে এবং সাজানো হচ্ছে, কারণ "النشز" অর্থ হলো উঁচু করা বা তুলে ধরা। এরপর এই হাড়গুলোকে একটির সঙ্গে অন্যটি যুক্ত করা হলো এবং পুনরায় যথাযথভাবে সাজানো হলো, যেমনটা ছিল। তারপর "এরপর আমরা এগুলোকে গোশত দ্বারা আবৃত করছি।" অর্থাৎ, হাড়গুলোর ওপর মাংসের আবরণ সৃষ্টি করা হলো এবং পুনরায় প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হলো।এ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করার পর সেই ব্যক্তি বলল, "আমি এখন নিশ্চিত জানলাম যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশালী।" অর্থাৎ, মৃত্যুর অবস্থা দেখা এবং পুনর্জীবনের প্রক্রিয়া অবলোকন করার পর সে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেল যে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সে শুধুমাত্র এই পুনর্জীবনের ব্যাপারেই আল্লাহর ক্ষমতা স্বীকার করেনি, বরং তার জ্ঞান ও বিশ্বাস সম্প্রসারিত হয়ে আল্লাহ সর্বকিছুর উপর ক্ষমতাবান—এই দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হলো।এটি প্রমাণ করে যে, কোনো বিষয়ে আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে জানা হলে, তা অন্যান্য বিষয়ে তাঁর ক্ষমতার স্বীকৃতিতেও প্রভাব ফেলে। যেমন, আল্লাহ যেভাবে বৃষ্টি ও পানির মাধ্যমে মৃত জমিকে পুনর্জীবিত করেন, তা তাঁর পুনর্জীবন, পুনরুত্থান এবং পুনরাগমনের শক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণ। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। এ থেকে শিক্ষা নেওয়া যায় যে, শিক্ষাদান ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সৃষ্টি ও নিদর্শনগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মানুষ অনেক সময় এগুলো ভুলে যায়। কিন্তু এই নিদর্শনগুলো মানুষের বিশ্বাস ও নিশ্চিত জ্ঞানকে শক্তিশালী করে যে, আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা, পরিচালক ও মালিক। তদুপরি, আল্লাহর কুরআনের আয়াত ও তাঁর সৃষ্টি—উভয়ই একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পরিপূরক।

﴿وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِي كَيۡفَ تُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰۖ قَالَ أَوَلَمۡ تُؤۡمِنۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطۡمَئِنَّ قَلۡبِيۖ قَالَ فَخُذۡ أَرۡبَعَةٗ مِّنَ ٱلطَّيۡرِ فَصُرۡهُنَّ إِلَيۡكَ ثُمَّ ٱجۡعَلۡ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٖ مِّنۡهُنَّ جُزۡءٗا ثُمَّ ٱدۡعُهُنَّ يَأۡتِينَكَ سَعۡيٗاۚ وَٱعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٦٠﴾

অর্থ: ***[আর যখন ইবরাহীম বলল, "হে আমার রব! কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন আমাকে দেখান, তিনি বললেন, তবে কি আপনি ঈমান আনেন নি? তিনি বললেন, অবশ্যই হ্যাঁ, কিন্তু আমার মন যাতে প্রশান্ত হয়! আল্লাহ্ বললেন, তবে চারটি পাখি নিন এবং তাদেরকে আপনার বশীভূত করুন। তারপর সেগুলোর টুকরো অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন করুন। তারপর সেগুলোকে ডাকুন, সেগুলো আপনার নিকট দৌড়ে আসবে। আর জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।]*** *(আয়াত নং: ২৬০)*

এরপর প্রসঙ্গটি অন্য একটি পুনর্জীবনের ঘটনার দিকে অগ্রসর হয়, যা ইবরাহিম খলিল আলাইহিস সালাম-এর সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:"এবং যখন ইবরাহিম বললেন: হে আমার প্রতিপালক! আপনি কীভাবে মৃতদের জীবিত করেন, তা আমাকে দেখান।" অতএব, ইবরাহিম (আ.) আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, যাতে তিনি মৃতদের কীভাবে জীবিত করেন তা দেখান। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন:"তুমি কি বিশ্বাস করো না?" এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইবরাহিম (আ.)-কে করা একটি প্রশ্ন। ইবরাহিম খলিল (আ.) জবাব দিলেন:"(হ্যাঁ) আমি বিশ্বাস করি, তবে আমার হৃদয় যেন প্রশান্তি পায়।"এই উত্তর থেকে বোঝা যায় যে, ইবরাহিম (আ.)-এর প্রশ্নে কোনো সন্দেহ ছিল না; বরং এটি ছিল পুনর্জীবনের ঘটনা সরাসরি প্রত্যক্ষ করার আকাঙ্ক্ষা। যদি আল্লাহ তাআলা তার বন্ধুকে (ইবরাহিম) পুনর্জীবনের

সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করতে দিতেন, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হতো না। এটি ইবরাহিম (আ.)-এর বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও আল্লাহর ক্ষমতায় তার আস্থার প্রতিফলন। তাই, যখন তিনি বললেন "(হ্যাঁ) আমি বিশ্বাস করি", তার অর্থ হলো: আমি জেনেছি, আমি বিশ্বাস করেছি যে, আপনি এ কাজে সক্ষম, তবে আমি শুধু নিজের হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য তা প্রত্যক্ষ করতে চাই।" তবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যাতে আমার হৃদয় প্রশান্ত হয়, কারণ চাক্ষুষ প্রমাণের সাথে বিশ্বাসের প্রমাণ একত্রিত হয়।" আল্লাহ তা'আলা ইবরাহিম (আঃ)-এর প্রার্থনার জবাব দিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "চারটি পাখি নাও"। তবে তিনি নির্দিষ্ট করে বলেননি কোন ধরণের পাখি হতে হবে। বরং তিনি বলেছেন: "এগুলোর সাথে অভ্যস্ত হও (অথবা সংযুক্ত করো)" অর্থাৎ তাদের কাছে যাও এবং তাদের নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসো।তারপর তিনি বলেন: "তারপর তাদের প্রত্যেককে একটি পাহাড়ের উপর পৃথকভাবে স্থাপন করো"। এটি একটি অলৌকিক নির্দেশনা যাতে বিশাল কৃতিত্ব রয়েছে। এখানে ইবরাহিম (আঃ) পাখিদের জবাই করা, টুকরো করা এবং বিভিন্ন পাহাড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি করেন, যাতে সেই জায়গাটি তাদের টুকরোগুলোর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যায়।এরপর আল্লাহ বলেন: "তারপর তাদের ডাকো, তারা দ্রুত তোমার কাছে চলে আসবে"। ইবরাহিম (আঃ) তাদের ডাকলেন, এবং তখন সেই পাখিগুলো দ্রুততার সাথে জীবিত হয়ে ফিরে এল। এটি শুধু পুনর্জীবন বা অংশগুলো একত্রিত করা নয়, বরং এর মধ্যে রয়েছে এক অতুলনীয় দ্রুততা, যা শব্দগত আহ্বানকে অতিক্রম করে না বরং একই সঙ্গে ঘটে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় এসেছে যে, ইবরাহিম (আঃ) প্রথমে তাদের মাথা হাতে নেন, তারপর আল্লাহ তাকে আদেশ করেন ডাকতে। তিনি ডাক দেওয়ার পর, আল্লাহ তা'আলা তাদের পালককে পালকের সাথে, রক্তকে রক্তের সাথে, মাংসকে মাংসের সাথে এবং অঙ্গগুলোকে নিজ নিজ অবস্থানে ফিরিয়ে আনেন।" প্রত্যেকটি পাখি কিছু অংশে বিভক্ত হয়ে যায়, যতক্ষণ না তা সম্পূর্ণরূপে তার নিজস্ব অবস্থানে ফিরে আসে। এবং তার জোড়া দু'টি সুখে বসবাস

করে, যাতে দৃষ্টির প্রকাশ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। এবং প্রত্যেকটি পাখিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, এটি উড়ে যায় এবং তার মাথাটি ইব্রাহিম (আ.)-এর হাতে ফিরে আসে।"

এরপর কুরআনের এই আয়াত শেষ হয়, যাতে আল্লাহ তাআলার মহিমা ও প্রজ্ঞার বর্ণনা করা হয়েছে— "জেনে রেখো, আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়" (العزيز الحكيم)। এখানে "আল-'অজীজ" (পরাক্রমশালী) এবং "আল-হাকীম" (প্রজ্ঞাময়) শব্দ দুটি সেই জ্ঞানকে বোঝায়, যা একজন মুসলিমের জানা উচিত।এটি বোঝায় যে আল্লাহ তাআলা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় এবং এটি ঈমানকে শক্তিশালী করে। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর জ্ঞান মানুষের জন্য কল্যাণকর এবং ক্ষতিকর বিষয় থেকে দূরে রাখে। এটি মানুষের জন্য তার জানা উচিত এবং আল্লাহর সৃষ্টিগত ও শরিয়তগত বিধান বোঝার মাধ্যমে এটি অর্জন করা সম্ভব।

"আর العزيز (পরাক্রমশালী) তাকে কোনো কিছু পরাভূত করতে পারে না, আর কিছু তার উপর বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। যা কিছু সে ইচ্ছা করে, তা তার অনুগতভাবে সংঘটিত হয়, এবং যা সে চায়, তা কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই ঘটে, কারণ সে সবকিছুর উপর আধিপত্যকারী। সে তার কথায়, কর্মে ও শরীয়তে প্রজ্ঞাবান। العزة (মহিমা) পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত। القهارة (পরাক্রমশালী ক্ষমতা) বলতে বোঝায় যে সে তার আদেশে সর্বশক্তিমান। الحكيم (প্রজ্ঞাবান) বলতে বোঝায় যে সে সকল কিছুকে যথাযথ স্থানে রাখে এবং তার শরীয়ত ও আদেশে প্রজ্ঞাপূর্ণ।এটি একজন মুমিনের জন্য এই মহান অর্থগুলো উপলব্ধি করা জরুরি, যা আল্লাহর গুণাবলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কারণ এটি মানুষের মনে শ্রদ্ধা, ভয়, আনুগত্য ও সত্যপথের প্রতি প্রবণতা সৃষ্টি করে, যা আল্লাহর আনুগত্য বাস্তবায়ন করে।

﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١﴾

অর্থ: **[যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশ শস্যদানা। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।]** (আয়াত নং: ২৬১)

অত:পর কোরআনে কারিমার বর্ণনা প্রসঙ্গটি আল্লাহর পথে ব্যয়ের উৎসাহ প্রদানের দিকে ধাবিত হয়েছে। **(যারা তাদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশতটি করে শস্যদানা। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ সুপ্রশস্ত (দানে), মহাজ্ঞানী।)** এই আয়াতে কারিমায় আল্লাহ তায়ালা একটি উদাহরন এর মাধ্যমে শুরু করেছেন। যা কোরআনে কারিমার দ্বারা সম্মোধিত ব্যক্তিবর্গের অর্থের নিকটবর্তি করে দেয়। আর এই বর্ণনা প্রসঙ্গ মুমিনদের জন্য। কেননা ঈমান ছাড়া দানের আমল কবুল করা হবে না। ফলে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালা যে তার সম্পদ তার রাস্তায় দান করে তাকে অধিক বৃদ্ধি শষ্য দানার সাথে সদৃশ্য করা হয়েছে।ইবনে কাছির (রহ) বলেন: আর এই উপমা সাতশত সংখ্যা উল্লেখের চেয়েও অন্তরের গভীরে পৌছে ।কেননা এখানে আল্লাহ তায়ালা নেকলোকদের জন্য তাদের নেক কাজ বোড়িয়ে দেয়ার ঈঙ্গিত রয়েছে।যেমনিভাবে ঐ বীজ বৃদ্ধি পায় যা ভালো জামতে বীজ বপন করেছে। আর হাদিসে সাতশতগুণ পর্যন্ত নেককাজ বৃদ্ধির বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে।

এই আয়াতে إخلاص (বিশুদ্ধ নিয়ত) এর বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যাতে দান-সদকার মাধ্যমে প্রকৃত উপকার পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন, (يُنفقون أموالهم في سبيل الله) অর্থ: "যারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর পথে"এতে ব্যয়ের উদ্দেশ্যকে "আল্লাহর

পথ" এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এর দুটি দিক রয়েছে:**এক.** ব্যয়ের খাতগুলো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হতে হবে। **দুই.** ব্যয়ের নিয়ত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্যই। যাতে এতে কোনো প্রদর্শন (রিয়া) বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য না থাকে। এ মহান আয়াতে ব্যয়ের ক্ষেত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে ("আল্লাহর পথে")। ইবনু সা'দী রাহি. বলেন,এর অন্তর্ভুক্ত হবে—উপকারী জ্ঞান প্রচারের জন্য ব্যয় করা, জিহাদের প্রস্তুতির জন্য ব্যয় করা, মুজাহিদদের সাহায্য ও তাদের প্রস্তুতির জন্য ব্যয় করা এবং মুসলিমদের কল্যাণে সকল ধরনের কল্যাণকর প্রকল্পে ব্যয় করা। এরপর আসে মিসকিন, দরিদ্র, অসহায় ও মুখাপেক্ষীদের জন্য ব্যয় করার বিষয়টি।[57] আর এটাই আল্লাহর পথে ব্যয়ের ফজিলত, গুরুত্ব ও অফুরন্ত প্রতিদানের প্রমাণ।আল্লাহর পথে ব্যয়ের অন্যতম ফজিলত হলো— আল্লাহর পথে ব্যয়কারীর জন্য বহুগুণ প্রতিদান রয়েছে, যার পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া কেউ গণনা করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, (والله يُضاعف لمن يشاء) "আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন।" এ আয়াতে প্রতিদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি, বরং এটিকে ৭০০ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি করার সম্ভাবনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহর অসীম দানশীলতার প্রমাণ। কিছু আলেম বলেন, এটি এ কথার ঘোষণা যে, আল্লাহ তাআলা যাকে চান, তাকে ৭০০ গুণেরও বেশি প্রতিদান দান করেন।[58] উক্ত আয়াত থেকে শিক্ষনীয় বিষয়:আল্লাহ তাআলার সীমাহীন দানশীলতা ও উদারতা। আল্লাহর পথে ব্যয়ের প্রতি উৎসাহ দেওয়া এবং দাতার প্রশংসা করা। দানশীল ব্যক্তির জন্য বিশেষ প্রতিদান ও তা বহুগুণ বৃদ্ধি করা- এটি তাঁর কর্মের প্রশংসা ও সম্মানসূচক স্বীকৃতি, পাশাপাশি তাকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করার উপায়। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহান গুণাবলি তুলে ধরে বলেন, "আর আল্লাহ প্রশস্ত (দানশীল) ও সর্বজ্ঞ।" তিনি তাঁর দানে প্রশস্ত এবং তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা

---

[57] ইবনু সা'দীর তাইসিরুল কুরআনুল কারিম ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান-১/২০৯

[58] কুরতবী, আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন-৩/১৯৮

অসীম। তাঁর দান ও অনুগ্রহের পরিধি কারও জন্য পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তাঁর অসীম করুণার গভীরতা কেবল তিনিই জানেন।

এ থেকে সৎকর্মে উৎসাহ দেওয়া, চেষ্টা ও সাধনার গুরুত্ব কতটুকু তা জানা যায়। একইভাবে পেশাগত ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও উৎসাহ প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা উৎসাহ হলো মানুষের মাঝে কল্যাণের চেতনা জাগিয়ে তোলার অন্যতম কার্যকর উপায়। মানুষের স্বভাবই এমন যে, তারা পুরস্কার, প্রশংসা ও উৎসাহ পেতে ভালোবাসে।

শস্যদানা (গমের শীষ) দ্বারা উদাহরণ প্রদান করা থেকে কৃষির মর্যাদা বোঝা যায়। কেননা কৃষির মাধ্যমে সৃষ্টির প্রয়োজন মেটানো হয় এবং খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। ইমাম কুরতুবী রাহি. বলেন, "এই আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, কৃষিকাজ মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সম্মানজনক পেশাগুলোর একটি এবং এটি শ্রমজীবী মানুষের জন্য অন্যতম উত্তম জীবিকা। তাই আল্লাহ তাআলা এর উদাহরণ দিয়েছেন।"[59] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: **"কোনো মুসলিম যদি কোনো গাছ রোপণ করে অথবা শস্য উৎপাদন করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা পশু খাদ্য গ্রহণ করে, তবে সেটি তাঁর জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।**" (সহীহ বুখারী) শস্যদানা দিয়ে উদাহরণ দেওয়ার মধ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এটি শিক্ষা দেয় কিভাবে একটি ধারণা ও চিত্রকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা যায়, যাতে তা সহজবোধ্য হয়। উপমা এমন হতে হবে যা মূল বিষয়ের সাথে প্রকৃতি, ধরন, পরিমাণ ও অর্থগত দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এর ফলে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, চিন্তাশক্তি প্রসারিত হয় এবং কল্যাণ ও সাফল্যের পথে চিন্তা-ভাবনা করা সহজ হয়।

---

[59] আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন: (৩/১৯৮)।

﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتۡبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنّٗا وَلَآ أَذٗى لَّهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٦٢ * قَوۡلٞ مَّعۡرُوفٞ وَمَغۡفِرَةٌ خَيۡرٞ مِّن صَدَقَةٖ يَتۡبَعُهَآ أَذٗىۗ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٞ ٢٦٣﴾

অর্থ: **[যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে। তারপর যা ব্যয় করে তা বলে বেড়ায় না এবং কোন প্রকার কষ্টও দেয় না, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রব-এর নিকট। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয়, তাঁর চেয়ে ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল]** (আয়াত নং : ২৬২-২৬৩)

আয়াতে দানের শিষ্টাচার সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, **"যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে। তারপর যা ব্যয় করে তা বলে বেড়ায় না এবং কোন প্রকার কষ্টও দেয় না।"** এতে ব্যয়ের গুরুত্ব পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং ব্যয়ের শিষ্টাচার স্পষ্ট করা হয়েছে। দান করার পর তা লোকদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত নয় বা নিজের দানের জন্য অহংকার করা উচিত নয়। কারণ, এটি দানগ্রহীতার মনোবেদনার কারণ হয় এবং তাঁর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত হানে। এটি তাকে দারিদ্র্যের কষ্ট ও প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করায়।এটি ইসলামী শিষ্টাচারের নীতি, যা করুণা, ভদ্রতা ও গোপনীয়তার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। অনুগ্রহ প্রদর্শনের নেতিবাচক প্রভাব এতটাই ভয়াবহ যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: **"তিন ব্যক্তির প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ দৃষ্টি দিবেন না, তাদের পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা কারা, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় তাঁরা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে! তিনি বললেন: সেই ব্যক্তি যে দান করে বলে বেড়ায়, যে ব্যক্তি অহংকার করে কাপড় ঝুলিয়ে হাঁটে। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রি করে।"** (তিরমিযি) এ হাদিসের মাধ্যমে দানের পর কষ্ট

দেওয়া ও বলে বেড়ানোর ভয়াবহতা স্পষ্ট হয়। এতে বুঝা যায় যে, কষ্ট দিলে দান না করাই উত্তম। এ সমীকরণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা রয়েছে, যা চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য উপলব্ধি করা সম্ভব।

আল্লাহ তা'আলা দানের দ্বিতীয় শিষ্টাচার বর্ণনা করেছেন, যা "দান করে বলে বেড়ানোর" (المن) অপেক্ষা আরও ব্যাপক। কেননা এতে দান করে বলে বেড়ানো ছাড়াও অন্যান্য কষ্টদায়ক বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেই কষ্টটা হচ্ছে, ('তারপর যা ব্যয় করে তা বলে বেড়ায় না এবং কোন প্রকার কষ্টও দেয় না ")।এতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, কষ্ট দেওয়া বলতে এমন সব কিছু বুঝায় যা দানগ্রহীতার জন্য কষ্টকর হতে পারে, যেকোনো উপায়ে।এতে দান করে বলে বেড়ানোও অন্তর্ভুক্ত, কেননা এটি কষ্টের একটি অংশ। তবে এটি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ এটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর। কষ্ট দেওয়া ব্যাপক হলেও দান করে বলে বেড়ানোকে আলাদাভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমে এটি আরও বেশি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। এটি ভাষাগত ও বর্ণনাশৈলীর দিক থেকে বুঝায় যে, দান করে বলে বেড়ানো এতটাই গুরুতর যে, এর প্রতি আলাদা করে দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি হয়ে পড়ে।

যারা এই ইসলামী নীতি ও শিষ্টাচার মেনে আল্লাহর জন্য ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহান পুরস্কার ও সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তাদের প্রতিদান তাদের রবের কাছে সংরক্ষিত"—এ প্রতিদানের বিশালতা ও পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া কেউ নির্ধারণ করতে পারে না। কারণ, আল্লাহর পুরস্কার অপরিসীম। বিশেষত, যখন আল্লাহ বলেন **"তাদের প্রতিদান তাদের রবের কাছে"**, তখন এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আরও বড় নিশ্চয়তা প্রদান করে। এর পাশাপাশি তাদের জন্য নিরাপত্তার সুসংবাদ রয়েছে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, (وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) "তাদের কোনো ভয় নেই"—এটি ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার নিশ্চয়তা। আর (وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) তাঁরা দুঃখিতও হবে না"- এটি অতীত নিয়ে অনুশোচনা ও দুঃখের মুক্তির নিশ্চয়তা। এইভাবে, ভবিষ্যতের ভয় ও

অতীতের দুঃখমুক্ত হওয়া মানেই প্রকৃত সুখ লাভ। এর সাথে রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অফুরন্ত প্রতিদান। এতে বুঝা যায় যে, ভয় ও দুঃখ মানুষের দুঃখ-কষ্টের প্রধান কারণ। সুতরাং, আল্লাহ তা'আলার কাছে কামনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে এবং সকল মুসলিমকে ভয় ও দুঃখ থেকে মুক্তি দেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত তুলনা তুলে ধরেছেন—(ভাল কথা ও ক্ষমা করা এমন দান থেকে উত্তম যার কারণে পরে কষ্ট দেওয়া হয়) এতে বুঝা যায় যে, একটি ভালো কথা বলা, কোনো মুসলিমের জন্য দু'আ করা বা অন্যায়কে ক্ষমা করা—এমন দান থেকে উত্তম, যা দানের পর কষ্ট দেওয়া হয়।এই তুলনাটি শ্রোতাকে সঠিক নৈতিক পদ্ধতি শেখায়, যা ইসলামের আদর্শ অনুসারে আত্মগঠন ও অন্যদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করার দিকনির্দেশনা প্রদান করে।এই বাক্যটি বলার অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তির উত্তম কথা বলা, কোনো কিছু দান না করেও সেই দানের চেয়ে উত্তম, যা কষ্ট বা অপমানের সঙ্গে জড়িত। তা যে কোনো ধরনেরই হোক না কেন।

এই তুলনার মাধ্যমে একজন মুসলিমকে শেখানো হচ্ছে যে, কর্মের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের একটি নীতি আছে। ভালো আচরণ ও শিষ্টাচার কর্মের মান উন্নত করে। এটি আমাদের শেখায় সদ্ব্যবহার ও মিষ্টভাষণের গুরুত্ব, ক্ষমার মর্যাদা এবং কষ্ট দেওয়ার ভয়াবহতা। এমনকি যখন দান-খয়রাতের সঙ্গে তা যুক্ত থাকে। কেননা একজন মানুষ যখন নিজের সম্পদ থেকে দান করে, তখন তা তাঁর আত্মার জন্য কষ্টকর হতে পারে, যদি না আল্লাহ তাকে সেই পরীক্ষায় সহায়তা করেন এবং উদারতা ও দানশীলতা তাঁর স্বভাবজাত হয়ে যায়।

এরপর এই আয়াতটি একটি নসিহতের মাধ্যমে শেষ হয়, যেখানে আল্লাহর দুটি গুণের উল্লেখ রয়েছে: (وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ) "আল্লাহ্ পরম ধনী ও পরম সহনশীল"। তিনি তাঁর সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন, কারও প্রয়োজন নেই, বরং তিনি অনন্ত ধনী এবং সর্বশক্তিমান। একইসঙ্গে, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত সহনশীল। তিনি তাদের

শাস্তি দিতে তাড়াহুড়া করেন না, বরং ক্ষমা করেন, দয়া করেন এবং তাদের ভুলত্রুটিকে উপেক্ষা করেন।যখন কোনো মুমিন ব্যক্তি এই মহান গুণগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে, তখন তাঁর হৃদয় আল্লাহর আনুগত্যে নত হয় আল্লাহ তা'আলার উত্তম নামসমুহ ও মহান গুণাবলি জানা অনুপাতে। আর সে উপলব্ধি করে যে, আল্লাহর জন্য দান করা উচিত উদারতার সঙ্গে। কারণ, যে তাঁর পথে দান করে, সে এমন এক মহান সত্তার জন্য ব্যয় করে যিনি ধনী ও দানশীল। এই উপলব্ধি মানুষকে দান করতে অনুপ্রাণিত করে, কারণ, তিনি এমন এক সত্তার জন্য দান করছেন, যিনি পরম সহনশীল। এটি মানুষকে দ্বিধাহীনভাবে দান করতে শেখায়, কারণ, তিনি এমন এক সত্তার জন্য দান করছেন, যিনি মহাদাতা। এটি মানুষকে দানের ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে শেখায়, কারণ, তিনি দান করছেন এমন এক সত্তার জন্য, যিনি পরম সহনশীল ও দানশীল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই উপলব্ধি মানুষকে দারিদ্র্যের ভয় থেকে মুক্তি দেয়, কারণ, যে আল্লাহর পথে ব্যয় করে, সে এমন এক সত্তার জন্য ব্যয় করে, যিনি পরম ধনী ও দানশীল।

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ تُرَابٞ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٞ فَتَرَكَهُۥ صَلۡدٗاۖ لَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءٖ مِّمَّا كَسَبُواْۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٦٤ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثۡبِيتٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ كَمَثَلِ جَنَّةِۭ بِرَبۡوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٞ فَـَٔاتَتۡ أُكُلَهَا ضِعۡفَيۡنِ فَإِن لَّمۡ يُصِبۡهَا وَابِلٞ فَطَلّٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٦٥ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمۡ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٞ مِّن نَّخِيلٖ وَأَعۡنَابٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلۡكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٞ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعۡصَارٞ فِيهِ نَارٞ فَٱحۡتَرَقَتۡۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ ٢٦٦﴾

অর্থ: **[হে মুমিনগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিস্ফল করো না, যে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না। ফলে তাঁর উপমা হলো এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর কিছু মাটি থাকে, তারপর প্রবল বৃষ্টিপাত সেটাকে পরিস্কার করে রেখে দেয়। যা তাঁরা উপার্জন করেছে তার কিছুই তাঁরা তাদের কাজে লাগানোর ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।* আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করার জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যেখানে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে সেথায় ফলমূল জন্মে দ্বিগুন। আর যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা যথার্থ প্রত্যক্ষকারী।*তোমাদের কেউ কি চায় যে, তাঁর খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকবে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত থাকবে এবং যেটাতে তাঁর জন্য সবরকমের ফলমূল থাকবে। আর সে এবং তাঁর কিছু দুর্বল সন্তান-সন্ততি থাকবে, তারপর তাঁর (এ বাগানের) উপর এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয়ে তা জ্বলে যাবে? এভাবে আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পার।]** (আয়াত নং: ১৬৪-১৬৬)

এরপর কুরআনের বর্ণনা অব্যাহত থাকে, যেখানে দান ও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের শিষ্টাচার, এর মহিমা ও প্রতিদান,এবং কীভাবে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাঁর আলোচনা। আল্লাহ বলেন, (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى) "হে মুমিনগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নিস্ফল করো না।"এই মহান আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে আহ্বান করেছেন। এটি ঈমানদারদের জন্য এক মহান মর্যাদা। কারণ, মহান সৃষ্টিকর্তা নিজেই তাদের ঈমানের ঘোষণা দিয়েছেন। এই আহ্বান এমন এক মহামূল্যবান নিয়ামত, যা

তাঁর অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ে ধারণ করলে গভীরভাবে অনুভব করা যায়। এই আহ্বান বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, যাতে তাঁরা জানে কী তাদের জন্য কল্যাণকর। একই সঙ্গে, এটি শিক্ষাগত দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যে, কাউকে ডাকার সময় তাঁর সর্বোত্তম গুণের মাধ্যমে সম্বোধন করা উচিত। যখন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের এভাবে সম্বোধন করেন, তখন একজন মানুষকে তাঁর অন্য ভাইয়ের প্রতি কীভাবে আচরণ করা উচিত, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এরপর আল্লাহ তাআলা আবারও সতর্ক করেছেন, যাতে ঈমানদাররা তাদের দান-সদকা এমন কিছু দ্বারা নষ্ট না করে, যা এর মূল্য ও প্রতিদানকে নষ্ট করে ফেলে। যেন তাঁরা তাদের পরিশ্রম বৃথা না করে এবং নিজেদের অপকার না করে,যাতে করে তাঁরা দানের মহা প্রতিদান থেকে বঞ্চিত না হয়।এই নিষেধাজ্ঞার তিনবার পুনরাবৃত্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নির্দেশ করে - মুমিনদের উপর এর ভয়াবহতা ও গুরুত্ব। এটি ঈমানদারদের জন্য এক কঠোর সতর্কবার্তা এবং শিক্ষণীয় বিষয়। এটি আল্লাহর রহমতের বহিঃপ্রকাশ, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য রেখেছেন। হোক সে দানকারী বা গ্রহণকারী। কারণ, এতে দানকারী তাঁর দানের প্রতিদান হারাবে না, আর দানগ্রহীতা কষ্টের সম্মুখীন হবে না। এতে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় থাকে এবং মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব সংরক্ষিত হয়।

আল্লাহ তাআলা দান-সদকার পর দানগ্রহীতাকে কষ্ট দেওয়া বা দান করে বলে বেড়ানো ব্যক্তিকে এমন এক লোকের সঙ্গে তুলনা করেছেন, "যে লোক দেখানোর জন্য দান করে, অথচ সে কিয়ামতের দিবসে বিশ্বাসী নয়।" যে ব্যক্তি দানের পর অপমান করে বা বলে বেড়ায়, সে লোক দেখানোর জন্য দানকারী ও আখিরাতে অবিশ্বাসীর মতো। প্রথমটি দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। কারণ, এটি লোক দেখানোর জন্য করা হয়। আর দ্বিতীয়টি আখিরাতের সঙ্গে সম্পর্কিত। কারণ, এতে পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অভাব থাকে। এ থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তির মধ্যে এই দুই গুণ বিদ্যমান, তাঁর দান-

সদকা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়, কারণ তার কাজ মুনাফিকের মতো, যে দানের ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি নয়, বরং লোক দেখানোকে প্রাধান্য দেয়। সে এমন একজনের মতো, যে কিয়ামতের দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে না। ফলে সে দানকে শুধু খ্যাতি ও প্রশংসা পাওয়ার উপায় হিসেবে দেখে, কিন্তু আখিরাতের প্রতিদান সম্পর্কে কোনো গুরুত্ব দেয় না।পরকালের প্রতি বিশ্বাস মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয়ের সৃষ্টি করে, যা তাকে তাঁর সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং সেই দিনের জন্য প্রস্তুত হতে বাধ্য করে।

এটি শিক্ষাগত, নৈতিক, দাওয়াতমূলক এবং দিকনির্দেশনামূলকভাবে উপমার গুরুত্ব তুলে ধরে। উপমার মাধ্যমে বিষয়টি সহজভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এবং গ্রহণকারীর কাছে মূল বার্তা স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা দান-সদকার করার পর কষ্ট দেওয়া বা বলে বেড়ানোর ভয়াবহতা আরও স্পষ্ট করতে আরেকটি উপমা ব্যবহার করেছেন, যা পূর্বের নিষেধাজ্ঞাকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি বলেছেন, অর্থ: "তার উপমা হলো এক মসৃণ পাথরের মতো, যার ওপর কিছু মাটি ছিল। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ল, ফলে সেটিকে একদম পরিষ্কার করে দিল। যা তারা উপার্জন করেছে তাঁর কিছুই তারা তাদের কাজে লাগানোর ক্ষমতা রাখে না।" এখানে দানকে তুলনা করা হয়েছে একটি মসৃণ পাথরের (صفوان) সঙ্গে, যার ওপরে সামান্য মাটি ছিল। এরপর যখন প্রবল বৃষ্টি (وابل) এসে পড়ল, তখন সেই মাটিকে ধুয়ে নিয়ে গেল। ফলে পাথরটি একদম পরিষ্কার হয়ে গেল—মাটির কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট থাকল না। একইভাবে, দানের পর কষ্ট দেওয়া, অহংকার করা, লোক দেখানো বা অন্য কোনো খারাপ নিয়ত যুক্ত হলে, তা বিনষ্ট হয়ে যায়। এসব কাজ দানকে মূল্যহীন করে দেয় এবং আল্লাহর কাছে এর কোনো প্রতিদান থাকে না। দানকারী বা ব্যয়কারী দানের মাধ্যমে উপকৃত হবে না। আল্লাহ তা'আলা দানকারীর ফলাফল বর্ণনা করেছেন, (لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا) "তাঁরা তাদের

উপার্জন থেকে কিছুই লাভ করতে পারবে না " অর্থাৎ তাঁরা যা সদকা করেছে, তাঁর মাধ্যমে উপকার নিতে সক্ষম হবে "আর আল্লাহ কাফেরদের পথনির্দেশ করেন না।" নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কাফেরদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না এবং তাদের এমন কোনো কাজে সফলতা দেন না, যা তাদের জন্য কল্যাণকর। কারণ, তাঁরা আল্লাহকে অস্বীকার করে। এতে কুফর ও তাঁর পথসমূহ থেকে সতর্ক করার বার্তা রয়েছে।

এরপর আল্লাহ তাআলা দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষদের কথা উল্লেখ করেছেন। যারা সৎ ও খাঁটি নিয়তে, দানের শিষ্টাচার মেনে ও শুধুমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে দান করে। "আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করার জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যেখানে মুষলধারে বৃষ্টি হয়। ফলে সেখানে ফলমূল জন্মে দ্বিগুন " এই আয়াতের শুরুতেই "উপমা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষিত হয় এই উপমা, এর উদ্দেশ্য ও বিষয় বস্তুর জন্য। এই উপমা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যকে তাঁর অন্তর্নিহিত অর্থ ও বিষয়বস্তুর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে, যা শ্রোতার কাছে অর্থকে স্পষ্ট ও বোধগম্য করে তোলে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পদ ব্যয় করে (ابتغاء مرضات الله) এবং যারা নিশ্চিত যে আল্লাহ তাদের যথাযথ প্রতিদান দেবেন (وتثبيتاً من أنفسهم), তাদের দানের পেছনের কারণ ও উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এই নীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যা প্রমাণ করে যে এতে কোনো ধরনের লোক দেখানো, কষ্ট দেওয়া বা অহংকার ছিল না। কারণ, এই নীতিগুলোই একজন মুমিনকে দান করে বলে বেড়ানো, কষ্ট দেওয়া ও রিয়া (লোক দেখানো) থেকে বিরত রাখে। এই মুমিনরা তাদের দানে আন্তরিকতা ও প্রতিদানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের গুণাবলি ধারণ করে থাকে। তাঁরা এমন এক বাগানের মতো, যা উঁচু ভূমিতে অবস্থিত। (كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ) এই উদ্যান বা বাগানে বৃষ্টি এসে সেচ দেয়, ফলে এটি অন্যান্য বাগানের তুলনায় দ্বিগুণ ফলন দেয়।

আর যদি এতে বৃষ্টি না হয়, তবে তা শিশির (টল) দ্বারা সিক্ত হয়। (فَاِنۡ لَّمۡ يُصِبۡهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ) " আর যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট " এই শিশির বা নরম কুয়াশার পানিও তাঁর জন্য যথেষ্ট, যাতে এটি ফলন দিতে ও উৎপাদনশীল হতে পারে। তেমনিভাবে একজন মুমিনের আমল কখনো ব্যর্থ হয় না। বরং আল্লাহ তা'আলা তা গ্রহণ করেন, বৃদ্ধি করেন এবং প্রতিটি কর্মের উপযুক্ত প্রতিদান দেন। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন, (وَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ) অর্থ: " আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা যথার্থ প্রত্যক্ষকারী। " অর্থাৎ বান্দার কোনো আমল আল্লাহ তা'আলার কাছে গোপন থাকে না।

আল্লাহ তা'আলার বাণী (كمثل جنة بربوة) "উঁচু ভূমিতে অবস্থিত এক উদ্যানের মতো" দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, দান-সদকা একটি উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ কাজ, যা অন্য সব কাজের তুলনায় উচ্চতর অবস্থানে রয়েছে। যেমন এক মনোরম উদ্যান উঁচু স্থানে অবস্থিত হয় এবং নিচু জমির তুলনায় অধিক ফলদায়ী হয়। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর আচরণ, উদ্দেশ্য ও ঈমানের কারণে কখনোই কোনো ধরনের কষ্ট দেওয়ার নিম্ন অবস্থানে নামে না।এটি প্রমাণ করে যে, দান করে বলে না বেড়ানো ও কষ্ট দেওয়া দানের মর্যাদা ও মহত্ত্ব অত্যন্ত মহান। যেমন জান্নাতে রয়েছে, চমৎকার দৃশ্য, মনোরম সুগন্ধ ও প্রশান্ত পরিবেশ, তেমনি খাঁটি নিয়তে দেওয়া দানেরও এক অনন্য সৌন্দর্য রয়েছে, যা জান্নাতের সৌন্দর্যের মতোই মনোমুগ্ধকর। উদ্যান যেমন বিভিন্ন ধরনের ফল ও খাবার দিয়ে উপকৃত করে, তেমনি দানও বিভিন্নভাবে কল্যাণ ও প্রতিদান বয়ে আনে—দানকারীকে বিপদ থেকে রক্ষা করে, গুনাহ ক্ষমা করায়, মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং মহান পুরস্কার অর্জনের পথ সুগম করে। উদ্যান যেমন অন্যদের ফল ও খাদ্য দিয়ে উপকৃত করে, তেমনি দানও মানুষ ও জীবজন্তুর উপকারে আসে এবং কল্যাণের পথে ব্যবহৃত হয়।

উপমা ব্যবহারের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, ইসলাম জ্ঞান অর্জন ও প্রচারের ক্ষেত্রে শ্রোতাদের কাছে বিষয়টি সহজবোধ্য ও কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়ার প্রতি কতটা গুরুত্ব

দেয়। এটি সর্বোত্তম ও সবচেয়ে নিখুঁত শিক্ষাগত ও নৈতিক পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করে।এছাড়া, এটি মুমিনদের শেখায় কীভাবে তাঁরা তাদের বক্তব্য, পদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও উদাহরণ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক কৌশল অবলম্বন করতে পারে। এতে যে উদ্দেশ্য ও চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা শ্রোতার মনে মহান অর্থগুলো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। পাশাপাশি, এই উপমার মাধ্যমে নৈতিকতা ও শিষ্টাচারের শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং এমন চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়, যা শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করে।

কুরআনের বাক্যক্রম মুমিনদের শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা দিতে থাকে, যাতে এই ঈমানি ধারণাগুলো তাদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও ব্যাখ্যামূলক উপায়ে বিষয়টি তাদের নিকট স্পষ্ট করা হয়, যেন তাদের আমল সঠিক পথে থাকে এবং মহান আল্লাহ তাআলার সরল পথে পরিচালিত হয়। আল্লাহ বলেন, "**তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকবে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত থাকবে এবং যেটাতে তার জন্য সবরকমের ফলমূল থাকবে। আর সে এবং তার কিছু দুর্বল সন্তান-সন্ততি থাকবে, তারপর তার (এ বাগানের) উপর এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয়ে তা জ্বলে যাবে?**" এতে রয়েছে প্রত্যেক দানকারী মুমিনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশনা ও শিক্ষা, যা এই মহিমান্বিত আয়াতে উল্লেখিত মহান দিকনির্দেশনাগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

এখানে শিক্ষামূলক বক্তব্যটি একটি প্রশ্নের মাধ্যমে শুরু হয়েছে, যা চিন্তা এবং বিবেককে উস্কে দেয়। এটি সঠিক বোধসম্পন্ন মনের পক্ষে এমন একটি উপমার অবস্থা মেনে নেওয়া অসম্ভব বলে মনে হয়। উপমাটি শুরু হয়েছে একটি প্রশ্ন দিয়ে: "আপনার মধ্যে কেউ কি চায় যে তাঁর কাছে এমন একটি উদ্যান থাকুক, যা সেরা ফলসমূহ যেমন খেজুর ও আঙ্গুরসহ সমস্ত ধরনের ফল ধারণ করে, এবং যার মধ্যে দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়, তবে এই সমস্ত ভালো দিক থাকা সত্ত্বেও, তাঁর অবস্থান হবে বয়সজনিত দুর্বলতা এবং দুর্বল সন্তানদের সাথে?" অর্থাৎ, তার জীবনে এমন এক পরিস্থিতি আসবে যেখানে

বয়সের কারণে তাঁর শক্তি শেষ হয়ে গেছে এবং তাঁর সন্তানরা দুর্বল এর মধ্যে এত সাফল্য থাকার পরও তাঁর ওপর একটি ধ্বংসাত্মক ঝড় আসবে, যা আগুনে পুড়িয়ে দিবে। এমন পরিস্থিতি তাকে অতি কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে ফেলবে। ইমাম শাওকানী রাহি. বলেছেন, "এটি একটি উপমা, যা নির্দেশ করে যে কেউ যখন ভালো কাজ করে এবং তাঁর সাথে কিছু ক্ষতি বা অযথা কাজ যোগ করে, তখন সে তা পরকালে কোনো উপকারে আসবে না। যেমন সেই ব্যক্তির মতো, যার কাছে এই বর্ণিত বাগান আছে, কিন্তু শেষমেশ তাঁর অবস্থান এমন যে, তাঁর ভালো কাজ কোনো কাজে আসে না ।"[60]

এটি বুঝায় যে, কাজ আধিক্যতার পরিমাণে নয়, বরং তা আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা এবং ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। যে ব্যক্তি তাঁর দানে আল্লাহ তাআলার আদেশ মেনে চলে না, তাঁর কাজ পরকালে তাঁর জন্য আক্ষেপের কারণ হবে। বিশেষত, যখন পরকালে সবচেয়ে ছোট্ট এবং গ্রহণযোগ্য কাজও আল্লাহ তা'আলার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান হবে। এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলার প্রতি ইখলাস অপরিহার্য এবং রিয়া, দান করে বলে বেড়ানো বা কষ্ট দেওয়ার মতো আচরণ থেকে দূরে থাকা উচিত। কারণ, এসব কিছুই কাজের স্বীকৃতি ও পুরস্কারকে নষ্ট করে দেয়।

আল্লাহ তাআলার বার বার নির্দেশনা এবং উপমা প্রদান এই বিষয়টির গুরুত্বকে আরও স্পষ্ট করে। মুসলিমদের উচিত এটি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা। এই উপমায় যে ধরনের হতাশা এবং দুঃখ বর্ণিত হয়েছে, তেমন হতাশা আর কিছুতেই দেখা যায় না। এখানে একটি শস্যপূর্ণ বাগান, যা সমস্ত রকম ফলমূল দ্বারা পরিপূর্ণ, কিন্তু তাঁর মালিক ও তাঁর দুর্বল সন্তানরা তা রক্ষায় সক্ষম নয়। এরপর একটি আগুনের ঝড় এসে তা ধ্বংস করে দেয়। এই পরিস্থিতিতে, মালিকের জন্য হতাশা এবং দুঃখের স্তর কতটা গভীর হবে ? তাঁর সন্তানদের ধ্বংস হওয়া নিয়ে তাঁর যে ভয় থাকবে, নিজের

---

[60] আশ শাওকানী, ফাতহুল কাদির-১/২৮৮

অবস্থার প্রতি তাঁর যে ভয় থাকবে এবং তিনি যে সমস্ত অর্থ এবং শ্রম ব্যয় করেছেন তা পুনরুদ্ধার করতে পারবেন না, তা কতটা কষ্টকর হবে! এভাবেই যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা মেনে দান করল না, তাঁর দান পরকালে তাঁর জন্য হতাশার কারণ হবে। কারণ, তা রিয়া, দান করে বলে বেড়ানো অথবা কষ্ট দেওয়ার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেন, " এভাবে আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন।" অর্থাৎ, এভাবেই আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ এবং তাঁর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা তিনি তাঁর বান্দাদের থেকে কামনা করেন। এরপর তিনি তাদের জন্য নির্দেশ দেন, যা তাঁর বাণীর শেষে রয়েছে, "যেন তোমরা চিন্তাভাবনা করো"। এতে নির্দেশনা রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যা আদেশ ও নিষেধ করেছেন এবং যা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক।যাতে মানুষ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে পারে। এটি বুঝায় যে, আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা ও মনোযোগ দেওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এগুলো মানুষকে আল্লাহর শরিয়্যাহ বাস্তবায়নের পথে পরিচালিত করে, যেমনটি তিনি নির্ধারণ ও নির্দেশ করেছেন।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧﴾

অর্থ: ***[হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর, এবং আমি যা যমীন থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর; এবং নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না। অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।]*** (আয়াত নং: ২৬৭)

কুরআনের ধারাবাহিক বর্ণনায় মুমিনদের দান-খয়রাতের নীতিমালা, পদ্ধতি ও নৈতিকতা শেখানো হচ্ছে। যাতে তাদের আমল শুদ্ধ হয় এবং তাঁরা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ অর্জন করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর, এবং আমি যা যমীন থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।"সুতরাং, আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা ঈমানদারদেরকে তাদের ঈমানের বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সম্বোধন করে, যা মহান অর্থ ও গভীর তাৎপর্য বহন করে। এটি তাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস, যা সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। আর উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির জন্য উত্তম ও মহৎ কাজই উপযুক্ত।তাই আল্লাহর দেওয়া এই নির্দেশ অনুসারে, প্রকৃত মুমিনদের উচিত পবিত্র ও উত্তম সম্পদ ব্যয় করা, যা তাদের মর্যাদার সাথে মানানসই।

সুতরাং, আল্লাহ তাআলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদের উত্তম সম্পদ থেকে দান করার নির্দেশ দেন এবং নিম্নমানের বস্তু দান করা থেকে বিরত থাকতে বলেন, "তোমরা তোমাদের অর্জিত উত্তম বস্তু থেকে ব্যয় করো।" এই মহান নির্দেশনা (তোমরা তোমাদের অর্জিত উত্তম সম্পদ থেকে ব্যয় করো) বাক্যে আদেশের মাধ্যমে এসেছে, যা উত্তম বস্তু নির্বাচন করার বাধ্যবাধকতা প্রমাণ করে। এছাড়াও, "من طيبات ما كسبتم" বাক্যাংশটি সাধারণভাবে সমস্ত উত্তম সম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করে সামগ্রিক ও বিশদভাবে। এটি অর্জিত

সম্পদের প্রতিটি ভালো অংশকেই বোঝায়—হোক তা তাঁর প্রকারভেদে, পরিমাণে, বা অন্যান্য দিক থেকে উত্তম। ফলে নিম্নমানের বা অবৈধ উপার্জন এর অন্তর্ভুক্ত নয়।এছাড়াও, দান করা শুধুমাত্র মানুষের উপার্জিত সম্পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এতে ভূমি থেকে উৎপন্ন সম্পদও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, (এবং যা আমরা তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি)।এই আয়াতের মাধ্যমে নির্দেশনাটি উপার্জনের উভয় উৎসকে অন্তর্ভুক্ত করে—একটি হলো ভূমি থেকে উৎপন্ন সম্পদ, যেমন শস্য, খনিজ ও অন্যান্য সম্পদ; আর অন্যটি হলো মানুষের নিজ প্রচেষ্টায় উপার্জিত সম্পদ, যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন ও শিল্পকর্মের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ।

আরেকটি মহান শিক্ষা হলো: নির্দেশনার যথাযথ নির্ভুলতা, যা সকল প্রকার উপার্জন ও ভূমি থেকে উৎপন্ন সম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করে—হোক তা মানুষের প্রচেষ্টার ফলে অর্জিত বা আল্লাহ তাআলার কৃপায় বিনা পরিশ্রমে উৎপন্ন, যেমন বৃষ্টির মাধ্যমে উদ্ভিদ জন্মানো। এটি আল্লাহ তা'আলার এক মহান অনুগ্রহ তাঁর বান্দাদের উপর ।দান ও ব্যয়ের পরিমাণ তা-ই হওয়া উচিত, যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মন থেকে আসে ও প্রশান্তি দেয়। আয়াতের মধ্যে "من" শব্দটি "الطيبات" এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে, যা অংশবিশেষ দানের ইঙ্গিত দেয়— "من طيبات ما كسبتم" (তোমরা তোমাদের উপার্জিত উত্তম অংশ থেকে ব্যয় করো)। তবে যাকাত এর ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট, যা ইসলামের পবিত্র বিধানসমূহ দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমরা যা যমীন থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি।" এখানে আল্লাহ তা'আলা শস্য উৎপাদন ও অঙ্কুরোদ্গমনের কৃতিত্ব একমাত্র নিজের প্রতি নিবদ্ধ করেছেন। কারণ, কৃষক কেবল জমি চাষ করে, বীজ বপন করে এবং অপেক্ষা করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজের অসীম ক্ষমতা ও পরিপূর্ণ সৃষ্টিকৌশলে এই বীজকে বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে যান।প্রথমে তা মাটির নিচ থেকে অঙ্কুরিত হয়, তারপর তা বেড়ে ওঠে, অবশেষে ফল ও ফসল উৎপন্ন করে।এতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ই উদ্ভিদ ও শস্যের স্রষ্টা

এবং তা ভূমি থেকে উৎপন্নকারী, যা তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার বহিঃপ্রকাশ। যা কিছু সৃষ্টির হাতে রয়েছে, সবই মূলত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দান। যেমন সুরা আল-ওয়াকিয়াহ-তে সর্বজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা এটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। "তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি সেটাকে অংকুরিত কর, না আমরা অংকুরিত করি?[61] আল্লাহ তা'আলা উপার্জনকে বান্দার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। "তোমাদের অর্জিত উত্তম সম্পদ থেকে" এতে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যেসব কিছু পৃথিবী থেকে বের করেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর দয়ায় এবং অনুগ্রহে। এই আয়াতে বলা হয়েছে (وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ) যেন বোঝা যায় যে, আল্লাহর অশেষ করুণা মানুষের উপর এবং মানুষ নিজেরা বাহির করতে বা উৎপাদন করতে অক্ষম। এটা ভাষার সূক্ষ্মতা এবং মহান আল্লাহর সংলাপের গুরুত্ব প্রকাশ করে। মহান আল্লাহর গুণাবলির প্রতি প্রশংসা করা উচিত।

তারপর আল্লাহ তা'আলা দান করার আদব ও নৈতিকতা বর্ণনা করেন এবং বলেন, "তোমরা মন্দ বস্তু থেকে দান করো না।" অর্থাৎ, তোমরা খারাপ বা নিকৃষ্ট জিনিস বেছে বেছে দান করো না। এখানে "তায়াম্মামু" শব্দটি অনুসন্ধান, নির্বাচন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ জিনিস বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। একইভাবে, "খাবিস" শব্দটি সব ধরনের খারাপ বা নিকৃষ্ট নির্বাচনকে বুঝায়। এই মহান বাণীটি প্রতিটি অবস্থা, ধরন এবং খারাপ উপার্জন ও উৎপাদন থেকে নিষেধ করে। এটি একই শব্দে বহু অর্থ ও তাৎপর্য সংগ্রহ করে, যা একজন মহান প্রভুর পক্ষ থেকে একটি মহান বাণী। এটি দানের ক্ষেতে সর্বোত্তমটা প্রদানের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা নির্দেশ করে এবং নিকৃষ্ট বা খারাপ জিনিস প্রদান করতে নিষেধ করে। যদি তাকে এমন নিকৃষ্ট জিনিস দেওয়া হয়, যা সে দান করতে চাইছে, তাহলে সে তা গ্রহণ করবে না, বরং তা গ্রহণ করার সময় তাঁর মধ্যে থাকা ত্রুটি ও নিকৃষ্টতা উপেক্ষা করবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তোমরাও

---

[61] সুরা ওয়াকিয়া, আয়াত নং-৬৩-৬৪

তা গ্রহণ করবে না, তবে যদি চোখ বন্ধ করে নাও।" এই নির্দেশনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দানকারী ব্যক্তিকে তাঁর নিজের অবস্থানে ফিরিয়ে এনেছেন। যাতে সে এই পরিস্থিতি অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারে যে, যদি এই দানকারীকে তাঁর দেওয়া নিকৃষ্ট জিনিসের মতো কিছু দেওয়া হয়, তবে সে তা গ্রহণ করবে না; বরং তা গ্রহণ করার সময় তাঁর মধ্যে থাকা ত্রুটি ও নিকৃষ্টতা উপেক্ষা করবে। আল্লাহ তাআলা দানকারীকে তার নিজের অবস্থানে ফিরিয়ে এনেছেন, যাতে এটি দানের অবস্থানকে সব দিক থেকে বুঝতে এবং দান নির্বাচনের গুরুত্ব ও প্রভাব অনুভব করতে প্রেরণা দেয়। অর্থাৎ, যদি তুমি নিজের জন্য এমন নিকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করতে রাজি না হও, তাহলে অন্যকেও তা দান করো না।এটি শিক্ষনীয় ও প্রশিক্ষণগত দিক থেকে গুরুত্বপর্ণ যে, শিক্ষক, নির্দেশক, দাঈ, প্রশিক্ষক এবং সাধারণভাবে যেকোনো বক্তা যেন সত্যের দিকে ফিরিয়ে আনেন, তাকে সেই অবস্থানে স্থাপন করেন যেখানে তাকে নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। যাতে তারঁ কাছে পুরো চিত্রটি সমস্ত দিক ও কোণ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণীর মতো: *"তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তাঁর ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"[62]

এই মহান নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে উত্তম, মূল্যবান, উৎকৃষ্ট এবং পবিত্র জিনিস থেকে দান-খয়রাত নির্বাচন করা, যা এই সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে আল্লাহ পবিত্র। তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে মুমিন আত্মার মহানুভবতা, উদারতা এবং আত্মার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলোকে জয় করতে শেখে। আল্লাহ তাআলা যা পছন্দ করেন এবং যা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে, তা প্রদানের মাধ্যমে আত্মার কৃপণতাকে পরাজিত

[62] বুখারী, হাদিস নং-১৩ ।

করে। যখন আত্মা এই গুণে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হয়, তখন এটি তাঁর চরিত্রে পরিণত হয়।

এছাড়াও এই আদবের মধ্যে রয়েছে এমন দান যা গ্রহীতার হৃদয়ে আনন্দ ও প্রশান্তি আনে। কারণ, সুন্দর ও উত্তম দান তাঁর মনকে প্রসন্ন করে এবং সে সন্তুষ্টি ও পূর্ণ দু'আর সাথে তা গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে সামাজিক ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে যখন সদকা বা দান-খয়রাত বিভিন্নভাবে বিতরণ করা হয়, তা যাকাত হোক বা সাধারণ সদকা হোক। এর মাধ্যমে সমাজে রহমত, কল্যাণ, সম্পর্ক এবং আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

এই মহান আয়াতে কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের আদেশ এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের আদেশ হলো আল্লাহ তাআলার বাণী: *"তোমরা পবিত্র জিনিস থেকে ব্যয় করো"*। আর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ হলো তাঁর বাণী: *"তোমরা মন্দ জিনিস বেছে নিয়ে দান করো না"*। এই স্পষ্ট বর্ণনা এটাই প্রমাণ করে যে, বক্তব্য স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে শ্রোতা এর প্রয়োগ ও চেষ্টার গুরুত্ব বুঝতে পারে।

এই মহান আয়াতটি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের একটি মহান নির্দেশনা দিয়ে শেষ হয়েছে: " জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত"। এই নির্দেশনা শুরু হয়েছে জ্ঞানার্জনের আদেশের মাধ্যমে যে, আল্লাহ তাআলা অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত। তিনি তাঁর বান্দাদের থেকে, তাদের উপার্জন থেকে এবং তাদের দান-খয়রাত থেকে সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত। এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, এই দান-খয়রাতের প্রতিদান তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। কারণ, আল্লাহ তোমাদের থেকে সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত। তিনি গরিব, অভাবী ও প্রয়োজনমন্দদেরকে সম্পদশালী করতে সক্ষম। কিন্তু তাঁর পরিপূর্ণ হিকমাহ (প্রজ্ঞা) এটাই নির্ধারণ করেছে যে, সমাজে বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ের মানুষ থাকবে রিজিকের ক্ষেত্রে।

আল্লাহ তাআলা প্রশংসিত। তিনি আসমান ও জমিনে, দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসিত। তাঁর সকল কাজ, বাণী, শরিয়ত এবং তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি প্রশংসিত। তাঁর নির্দেশনায়, গুণাবলীতে এবং সব কিছুতেই তিনি প্রশংসিত। যখন একজন বান্দা আল্লাহ তাআলার গুণাবলী ও তাঁর সুন্দর নামগুলো উপলব্ধি করে, তখন তা তাকে আনুগত্যের দিকে, তাঁর উপর নির্ভরশীলতার দিকে পরিচালিত করে। আল্লাহ তাআলার বাণী (وَاعْلَمُوا) " জেনে রাখো" এর মধ্যে যে উপকারিতা রয়েছে, তা হলো তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের আবশ্যকতা। এই মহান আয়াতে আল্লাহ তাআলার দুটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: "আর জেনে রাখো নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত"।

﴿ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغۡفِرَةٗ مِّنۡهُ وَفَضۡلٗاۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٢٦٨﴾

অর্থ: ***[শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী-প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।]*** (আয়াত নং: ২৬৮)

এই মহান কুরআনিক নির্দেশনা লোভ ও কৃপণতার কারণ এবং দান-খয়রাত থেকে দারিদ্র্যের ভয় সম্পর্কে বর্ণনা করে। যাতে মুমিন ব্যক্তি সেই সব কারণ জানতে পারে যা তাকে লোভ ও দানে কৃপণতা করতে প্ররোচিত করে। আল্লাহ তা'আলা এগুলোর সমাধান দিয়েছেন মুমিনকে উত্তম, মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট জিনিস দান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, মহান প্রশান্তির সাথে। আল্লাহ তাআলা বলেন,("শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ"।) এই আয়াতটি দান ও প্রদান থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে শয়তানের প্ররোচনামূলক ভয়ের কথা উল্লেখ করে শুরু হয়েছে। আল্লাহর বাণী ("শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং

অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়")শয়তান মানুষকে দারিদ্র্যের ভয় দেখিয়ে আল্লাহর আনুগত্যে দান-খয়রাত করতে বাধা দেয়। এভাবে সে মানুষকে দান করতে দ্বিধাগ্রস্ত করে। উত্তম ও পবিত্র জিনিস বেছে নিতে নিরুৎসাহিত করে। এমনকি সম্পদ কমে যাওয়ার ভয়ে দান থেকেই বিরত রাখে। যদি কেউ দান করে, তাহলেও সে নিজের কাছে থাকা নিকৃষ্ট জিনিস দান করতে চেষ্টা করে। উত্তম ও ভালো জিনিস ভবিষ্যতের লাভের আশায় নিজের কাছে রেখে দেয়।নিকৃষ্ট জিনিস দান করে, দারিদ্র্যের ভয়ে। আর উত্তম ও মূল্যবান জিনিস নিজের জন্য রেখে দেয়, ধনী হওয়ার আশায়। শয়তান এভাবে দারিদ্র্যের ভয় দেখিয়ে ("তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায়") মানুষকে প্ররোচিত করে।

অশ্লীল কাজ সম্পর্কে শয়তান মানুষকে নির্দেশ দেয়, সে অশ্লীল কাজকে সুন্দর করে উপস্থাপন করে এবং তা করার জন্য মানুষকে প্ররোচিত করে। অশ্লীল কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম: কৃপণতা ও লোভ, যা শয়তান মানুষের মনে সুন্দর করে তুলে ধরে এবং মানুষকে অর্থ ও সম্পদ অশ্লীল ও বাতিল কাজে ব্যয় করতে উৎসাহিত করে। শয়তানের এই নির্দেশ (অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়) থেকে বুঝা যায় যে, সে মানুষের উপর এতটাই প্রভাবশালী যে, সরাসরি তাকে পাপ কাজে নির্দেশ দেয়। এটি প্রত্যেক মুসলিমের জন্য একটি সতর্কবাণী। যাতে তাঁরা শয়তানের প্রভাব ও শত্রুতার মাত্রা সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং সর্বদা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যখন শয়তানের প্ররোচনা বেশি শক্তিশালী হয়।

অন্যদিকে, আল্লাহ তাআলা ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন ("আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ")। আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি সত্য, তিনি ক্ষমা ও রিজিকের প্রতিশ্রুতি দেন। ইমাম শাওকানী রাহি. বলেছেন, "فضلا" (অনুগ্রহ) শব্দের অর্থ হলো, আল্লাহ তাদেরকে তাদের দানের চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবেন এবং তাদের রিজিক প্রশস্ত করে দেবে।আর

পরকালে তাদেরকে এমন কিছু দান করবেন যা উত্তম, অধিক, মহান ও সুন্দর।[63] আর আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি মুমিনকে ভালো কাজ, দান-খয়রাত ও উদারতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, সে দারিদ্র্যের ভয় করে না, বরং আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও প্রাচুর্য প্রত্যাশা করে। এছাড়াও সে তাঁর দান-খয়রাতের জন্য উত্তম ও পবিত্র রিজিক বেছে নেয়। কারণ, সে দয়ালু ও মহান আল্লাহর কাছ থেকে এর প্রতিদান পেতে চায়।

এই মহান আয়াতটি উপযুক্তভাবে সমাপ্ত হয়েছে: *("*আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ*")*। তিনি তাঁর দান, অনুগ্রহ, জ্ঞান ও ক্ষমতায় প্রাচুর্যময়। তাঁর সৃষ্টির কেউই তাঁর প্রাচুর্যের সীমা গণনা করতে পারে না।তাঁর মহান প্রাচুর্যের প্রকৃত রহস্য কেবল তিনিই জানেন। তিনি জানেন মুমিন কী করে, কী দান করে, কীভাবে দান করে, কোন সম্পদ থেকে দান করে এবং কেন দান করে। তাঁর জ্ঞান থেকে কিছুই গোপন নয়। এজন্য মুমিনের উচিত আল্লাহ তাআলার মর্যাদা ও তাঁর মহান, প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ দানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ করা। এই অর্থগুলো প্রতিটি নির্দেশনার শেষে উপদেশের গুরুত্ব তুলে ধরে, যা আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান মুমিনকে সকল ভালো কাজের দিকে পরিচালিত করে এবং সকল মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

---

63 শাওকানী, ফাতহুল কাদির-১/২৮৯

﴿يُؤۡتِي ٱلۡحِكۡمَةَ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرٗا كَثِيرٗاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٦٩﴾

অর্থ: ***[তিনি যাকে ইচ্ছে হেকমত দান করেন। আর যাকে হেকমত প্রদান করা হয় তাকে তো প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়; এবং বিবেকসম্পন্নগণই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।]*** *(*আয়াত নং: ২৬৯ *)*

আল্লাহ তাআলা হিকমাহ *(*জ্ঞান ও প্রজ্ঞা*)*-এর মর্যাদা এবং যারা তা লাভ করে তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। তিনি ইঙ্গিত দেন যে, তিনিই একমাত্র হিকমাহ দানকারী। *("*আল্লাহ যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন। আর যাকে জ্ঞান দান করা হয়, তাকে প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়।*")* এই আয়াতটি শুরু হয়েছে এ কথা দিয়ে যে, আল্লাহ তাআলাই হিকমাহ দান করেন। তাঁর কোনো সৃষ্টিই কাউকে হিকমাহ দান করতে পারে না। এমনকি নিজেকেও নয়। হিকমাহ দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা *("*আল্লাহ যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন*")*। সুতরাং হিকমাহ দান ও প্রদান একমাত্র তাঁরই হাতে। কেউ নিজের জন্য হিকমাহ নিতে পারে না, বা অন্যকে দান করতে পারে না, বা উত্তরাধিকারসূত্রে তা প্রদান করতে পারে না। বরং আল্লাহ তাআলাই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী একমাত্র হিকমাহ দানকারী *("*আল্লাহ যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন*")*। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, যে ব্যক্তি হিকমাহ কামনা করে, তাঁর উচিত প্রথমে আল্লাহর কাছে দু'আ করা এবং আনুগত্যের মাধ্যমে তা অনুসন্ধান করা। তারপর হিকমাহ অর্জনের উপায় অবলম্বন করা।

হিকমাহ *(*জ্ঞান ও প্রজ্ঞা*)*-এর অর্থ ও তাৎপর্য অনেক বিস্তৃত। এর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত:

নবুয়ত,কুরআন বুঝার ক্ষমতা, ইলম *(*জ্ঞান*)* ও ফিকহ *(*ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে গভীর বুঝ*)* , সঠিক কথা বলা, আল্লাহ তাআলার দ্বীন সম্পর্কে সতর্কতা,আল্লাহ তাআলার ভয়,

দীনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা, বুঝার ক্ষমতা, জ্ঞান ও আমল ।[64] ইবনে কাসীর রাহি. বলেছেন, "সঠিক মত হলো, হিকমাহ হচ্ছে, যেমনটি জুমহুরে উলামাগণ বলেছেন, হিকমাহ শুধুমাত্র নবুয়তের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং এটি নবুয়তের চেয়েও ব্যাপক। নবুয়ত হলো এর সর্বোচ্চ স্তর।[65] হিকমাহর এই বহুমুখী তাৎপর্যের ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, হিকমাহ শব্দটি বিভিন্ন ধরনের মহান গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য ও অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই মানুষের উচিত কুরআন মাজীদের বাক্যগত সৌন্দর্য ও গভীরতা নিয়ে চিন্তা করা, যেখানে হিকমাহ শব্দটি সকল ধরনের কল্যাণ ও মহান গুণাবলীকে ধারণ করে।

এরপর আল্লাহ তাআলা হিকমাহ (জ্ঞান ও প্রজ্ঞা) লাভকারীর মর্যাদা বর্ণনা করেছেন তাঁর মহান বাণীতে: ("আর যাকে হিকমাহ দান করা হয়, তাকে প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়।") এতে হিকমাহর মর্যাদা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি হিকমাহ লাভ করে, সে প্রকৃতপক্ষে প্রচুর কল্যাণ লাভ করে। কারণ, হিকমাহ মানুষকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে সাহায্য করে। ফলে হিকমাহর অধিকারী ব্যক্তি জান্নাতের অধিকারী হয়। হিকমাহর মাধ্যমে বুদ্ধি ও বিবেক আলোকিত হয়, মনের উঁচু স্তরে পৌঁছানো যায়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, সম্মান রক্ষা করা যায়, মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, অজ্ঞতা দূর হয়, ভুল সংশোধন করা যায়, সত্যকে তার যথার্থ স্থানে প্রতিষ্ঠা করা যায়, মানুষের উন্নতি ঘটে, আদব-আখলাক (শিষ্টাচার ও নৈতিকতা) প্রকাশ পায়। হিকমাহর অধিকারী ব্যক্তি মানুষের কাছে প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত হয় এবং অনেকের চেয়ে অগ্রগণ্য হয়। কারণ, সে প্রচুর কল্যাণ বহন করে। ("আর যাকে হিকমাহ দান করা হয়, তাকে প্রচুর ভালো জিনিস দান করা হয়।") এটি হিকমাহ (জ্ঞান ও প্রজ্ঞা) অনুসন্ধান এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। এর জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করা, তাঁর আনুগত্যে

---

[64] ইবনে জাওযী, যা'দুল মাসির ফি ইলমে তাফসির-১/২৮০, ইবনে কাসির-১/৩২৯

[65] ইবনে কাসির-১/৩২৯

আত্মনিয়োগ করা এবং হিকমাহ অর্জনের উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। এর মধ্যে সর্বপ্রথম কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করা। তারপর সেই অনুযায়ী আমল করা।

এই মহান আয়াতটি একটি উপদেশ দিয়ে শেষ হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি মূল্যবান উপহার। এই উপদেশ ও সতর্কতা কেবল তাঁরাই গ্রহণ করে, যারা চিন্তা-ভাবনা করে এবং স্মরণ রাখে *(*বুদ্ধিমানরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।*)*। কারণ, উপদেশ ও সতর্কতা থেকে কেবল তাঁরাই উপকৃত হয়, যারা বুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী এবং যারা শোনা কথার মর্ম বুঝতে সক্ষম।

﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾﴾

অর্থ: ***[আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা জানেন। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল; আর যদি গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্থকে দাও তা তোমাদের জন্য আরো ভাল; এবং এতে তিনি তোমাদের জন্য কিছু পাপ মোচন করবেন। আর তোমরা যে আমল কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।]*** *(*আয়াত নং: ২৭০-২৭১*)*

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর পর এই আয়াতটি এসেছে, যা শ্রোতাদেরকে আল্লাহ তাআলার ব্যাপক ও সর্বব্যাপী জ্ঞানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়: *("*তোমরা যা কিছু ব্যয় করো বা যা কিছু মানত করো, আল্লাহ তা জানেন।*")* এই আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের কথা বর্ণনা করে, যা বান্দার সকল প্রকার দান-খয়রাতকে ঘিরে রয়েছে। তা কম হোক বা বেশি, ছোট হোক বা বড়, তুচ্ছ হোক বা মূল্যবান, পবিত্র হোক বা অপবিত্র ,আল্লাহ তাআলা সবই জানেন।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। আর মানুষ যখন বুঝতে পারে যে আল্লাহ তার ব্যয়কৃত সম্পদের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন, তখন এটি তাকে তার ব্যয়ের প্রতি সজাগ ও সচেতন করে তোলে, যাতে সে প্রতিটি ক্ষেত্রে তার ব্যয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে।

এছাড়াও এই আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মানুষ নিজের উপর যে সকল ইবাদত বা মানতের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে, তা আল্লাহ জানেন *("*তোমরা যা কিছু মানত করো, আল্লাহ তা জানেন*")*। আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান থেকে কিছুই গোপন নয়। তাই মুমিনের উচিত আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন,

তা থেকে দূরে থাকা এবং সতর্ক থাকা। যেমন, নিকৃষ্ট বা অপবিত্র জিনিস দান করা থেকে বিরত থাকা। কারণ, এ ধরনের দান আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত এবং এটি নিজের উপর জুলুম করার শামিল। এরপর আল্লাহ তাআলা এই জুলুম থেকে সতর্ক করে বলেছেন, (*"আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।"*)। অর্থাৎ, যারা জুলুম করে, তাদের জন্য আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচানোর মতো কোনো সাহায্যকারী নেই। এটি জালিমদের জন্য একটি কঠোর সতর্কবাণী।

পবিত্র ও উত্তম জিনিস দান করা একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য, এতে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া, অহংকার বা রিয়া (লোক দেখানো) না থাকলে দানকারীর জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর দান গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিদান বৃদ্ধি করেন এবং মানুষ তাকে ভালোবাসে। যাদেরকে দান করা হয়, তাঁরাও তাকে ভালোবাসে। কারণ, তাদের মন প্রসন্ন হয়, তাদের সম্মান করা হয় এবং তাঁরা দানকারীর জন্য দু'আ করে। যারা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে, তাদেরকে তাঁরা ভালোবাসে। এভাবে সমাজের সদস্যদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

তারপর আল্লাহ তা'আলা সদকা প্রকাশ্যে বা গোপনে দেওয়ার বিধান এবং এর সাথে সম্পর্কিত প্রতিদানের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,(*"যদি তোমরা সদকা প্রকাশ্যে দাও, তবে তা উত্তম। আর যদি গোপনে দাও এবং অভাবগ্রস্তদের দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভালো।"*) প্রকাশ্যে সদকা দেওয়ার প্রশংসা করা হয়েছে। আবার গোপনে সদকা দেওয়াকে আরও বেশি প্রশংসা করা হয়েছে। ইমাম ইবনে সাদী রাহি. বলেছেন,"শরীয়তের নীতিমালা মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখে। কখনও প্রকাশ্যে সদকা দেওয়া ভালো। কারণ, তা অন্যের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তৈরি করে এবং মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে।"[66]। আল্লাহ তাআলা উভয় পদ্ধতিরই প্রশংসা

---

[66] ইবনে সাদী, তাইসিরুল কারিমির রহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান-১/২১৫

করেছেন - প্রকাশ্যে দেওয়া এবং গোপনে দেওয়া। তিনি সর্বজ্ঞ, যিনি সদকা প্রকাশকারীর নিয়ত জানেন। যদি কেউ অন্যের মধ্যে ভালো কাজের অনুপ্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে সদকা দেয়, তবে তা অতিরিক্ত কল্যাণ বয়ে আনে।

সদকার অনেক উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে: আল্লাহ তাআলার প্রশংসা লাভ ("তা উত্তম")। দানকারীর জন্য কল্যাণ অর্জন ("তা তোমাদের জন্য আরও ভালো")। গুনাহ মোচন ("এবং তা তোমাদের গুনাহ মোচন করবে")। এরপর এই আয়াতটি একটি মহান উপদেশ দিয়ে শেষ হয়েছে, ("আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে সম্যক অবগত।")। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন তোমরা কী দান করেছ, এর ধরন, পরিমাণ, সংখ্যা, গুণমান এবং তা উত্তম নাকি নিকৃষ্ট। এমনকি তিনি দানের নিয়ত ও উদ্দেশ্যও জানেন। বান্দার কোনো কাজই তাঁর কাছে গোপন নয়। এই সত্যটি উপলব্ধি করা এবং দানের সময় আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা মানুষকে সেই পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়, যা আল্লাহ তাআলা চান।

﴿لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَىٰهُمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَلِأَنفُسِكُمۡۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ ٱللَّهِۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٢﴾

অর্থ: *[*তাদের হিদায়াত দানের দায়িত্ব আপনার নয়; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে হিদায়াত দেন। আর যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদের জন্য আর তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ব্যয় করে থাক। আর তোমরা উত্তম কোন কিছু ব্যয় করে থাকলে তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবেই দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।*]* **(আয়াত নং: ২৭২)**

অত:পর কোরআনের বর্ণনা প্রসঙ্গ অমুসলিমদের উপর ব্যায় করার প্রতিবিধানের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর আয়াতে কারিমাটি হেদায়াতের স্বীকৃতির বিষয় নিয়েই শুরু করেছে যে, তা তার কোন সৃষ্টির হাতে নেই। (তাদেরকে সৎপথে আনার দায় তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন।) সুতরাং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এই বার্তা যে, হেদায়াতের তাওফিক তোমার অধিনে না যে তোমার উপর আবশ্যক হবে। নিশ্চই হে নবী তোমার দায়িত্ব হলো দিকনির্দেশনা,বর্ণনা ও পথপদর্শনের হেদায়াত করা। আর হেদায়াতের তাওফিক সে তো আল্লাহর হাতে।) সুতরাং তাদের হেদায়াতের দায়িত্ব তোমার জন্য ওয়াজিব নয়। আর এ ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থেকে তাদের হেদায়াতের আগ্রহ ও দায়িত্বের পেরেশানী দূরিভূত করা হয়েছে। কেননা তিনি এর উপর আগ্রহি। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেছেন (তিনি মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়ালু) যা এই ফায়েদা দেয় যে,সর্বাগে তার সৃষ্টির কাররই অনুনয় এবং আদেশ করে অন্যকে হেদায়াতের ক্ষমতা নেই। বরং তা হবে দোয়া, দিকনির্দেশনা এবং সৎ আদর্শ দিয়ে যা অমুসলিমকে ইসলামে অগ্রগামী করে দেয়। আর ইহা মহান দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আল্লাহর দিকে আহবান কারীর জন্য একটি ফায়েদা। আর ইহা আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের প্রতি মানুষকে পরিচালনার পথপদর্শনের কারন গ্রহনের মাধ্যমে যা হবে ইসলামের উদ্দেশ্য, সৌন্দর্য ও পদ্বতি বর্ণনার করার দ্বারা অন্যকে হেদায়াতের জন্য আল্লাহর কাছে চাওয়া ও দোয়া করার ফায়েদা দেয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেছেন। (হে আল্লাহ আপনি আবু জাহল ইবনে হিশাম অথবা উমরের মাধ্যমে ইসলামকে সম্মানিত করুন। অত:পর তিনি সকাল ও দুপুর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অতিবাহিত করলেন ও ইসলাম গ্রহন করলেন। এবং সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী (হে আল্লাহ দাওস গোত্রকে হেদায়াত দিন এবং আমার কাছে নিয়ে আসুন।

আর তাফসীরে এসেছে: যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকরা ইসলাম গ্রহন করবে সেই জন্য তাদের উপর ব্যায় করাকে নিষেধ করলেন তখন এই আয়াত নাযিল হয়। আর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম ওয়ালা ছাড়া অন্য কাওকে দান না করতে আদেশ দিয়েছিলেন;অত:পর এই আয়াত নাযিল হয়। ফলে এরপর প্রত্যেক ধর্মের যে কেও চায় তাকে দান করতে আদেশ করলেন। আর ইহা এই ফায়েদা দেয় যে, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন (তার প্রতি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) সে ব্যাপারে সম্মতি দেননি সেহেতু ইসলামের পথ হলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ঐশি পথ। আর এই ধর্ম মুসলিম ও কাফেরের জন্য রহমত আর তার কার্যক্রম একজন অমুসলিমকে তা এর প্রতি আগ্রহি করে। যখন সে ইসলামের পথের বদান্যতা ও দানশীলতা দেখে। আর ইহা কখনোই বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক ছাড়া হবে না।

অত:পর মহান আয়াত কতিপয় এমন জিনিসের বিবেচনায় পরিচালিত হয় যা মানব অন্তরে এই ব্যায় ও দানের ক্ষেত্রে উদিত হয়। ফলে একজন মুমিন জানেন যে,তিনি অন্যের জন্য যা দান করছেন তা মুলত তারই। (যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপাকারার্থেই কর) অথাৎ এর ছোয়াব ও প্রতিদান তোমার উপরই ফিরে আসে। সুতরাং ব্যায়কারী অন্যের জন্য দুনিয়াতে যা কিছুই ব্যায় করেন তার প্রতিদান ও ফলাফল দুনিয়া ও আখেরাতে তার তার উপরই ফিরে আসে। দুনিয়াতে বরকত,খারাবি প্রতিহত ও রিযিক বৃদ্ধির মাধ্যমে আর আখেরাতে ক্ষমা ও মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে। সুবহানাহু ও তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়া সু-প্রশস্ত যার কোন সীমানা নাই। অত:পর আয়াতটি উত্তম যিনিস ব্যায়ের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করেছে। (উত্তম) যাতে সব খারাপ জিনিসকে দূরে ঠেলে দেয়া যায়। কেননা তা উত্তম নয়। আর এতে মুমিনকে তার কাছে থাকা সর্বত্তম যিনিস ব্যায় করার উৎসাহ প্রদান রয়েছে। এরপর আল্লাহ তাবারকা ও তায়ালা ব্যায় করার নিয়তের বর্ণনা করছেন। ((আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না) ইহা বিশ্লেষণ দিকনির্দেশনা যে, তোমরা যাই ব্যায় করো তা আল্লাহ তায়ালার জন্য; অন্য কারো জন্য নয়। যাতে করে প্রদর্শানিচ্ছা ও সুনামের বিষয় তার সাথে না থাকে। তেমনিভাবে তার সাথে অন্য উদ্দেশ্য থাকা দুরিভূত হয়। যেমন: কখনো মনের সাথে ঘটে থাকে যে, দান করার পর প্রকাশ পেল যে তার দান যার হাতে যাওয়ার কতা ছিল তার হাতে যায়নি। ইবনে কাসির (রহ) বলেন; যদি তুমি আল্লাহর জন্য দান করো তবে সে কি করলো তা তোমার দেখার বিষয় নয়। সুতরাং যদি সদকা কারি আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে সদকা করে তাহলে তার প্রতিদান আল্লাহর উপর।ভালোকে দিল না খারাপকে, হক্কদারকে না অন্যকে সে বিষয় তার দেখার দরকার নেই। সে তার নিয়তের উপর ছোয়াব পাবে। আর ইহা আল্লাহ তায়ালার বিধানের অনুগ্রহ,মানব অন্তরের সূক্ষাদি বিষয়ের খেয়াল এবং যা তার সহীত ঘটে থাকে যা ইহা **আল্লাহ** তাবারকা ও তায়ালার বিধান হওয়ার ক্ষেত্রে জোরদান করে।

অত:পর আল্লাহ তাবারকা ও তায়ালা ব্যায় করার পরিধির ব্যাপারে জোরদান করেন। যে এই পরিধি নিশ্চই আল্লাহ তায়ালার নিকট সংরক্ষিত। দানকারীর প্রতি যে কোন জুলুম থেকে দুরে। (তোমরা যে, উত্তম অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।) সুতরাং আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন দানকারীকে তার দানের ব্যাপারে জুলুম করা হবে না। আর ইহা দানকারীর দান যেকোন বিনাশ থেকে আল্লাহ তায়ালার রক্ষা করনে অধিক জোরপ্রদান।

﴿لِلۡفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحۡصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسۡتَطِيعُونَ ضَرۡبٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ يَحۡسَبُهُمُ ٱلۡجَاهِلُ أَغۡنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعۡرِفُهُم بِسِيمَٰهُمۡ لَا يَسۡـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلۡحَافٗاۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ٢٧٣﴾

অর্থ: **[এগুলো অভাবগ্রস্থ লোকদের প্রাপ্য; যারা আল্লাহ্‌র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘুরাফিরা করতে পারে না; আত্মসম্মানবোধ না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে; আপনি তাদের লক্ষন দেখে চিনতে পারবেন। তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে চায় না। আর যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সে ব্যাপারে সবিশেষ জ্ঞানী।]** (আয়াত নং: ২৭৩)

অত:পর আল্লাহ তায়ালা একঝাক সাহাবীদের থেকে মুমিনদের নিকট না চওয়া বিরত থাকার চিত্র বর্ণনা করেন। যাতে করে তা প্রত্যেক সময় ও সমাজের দিকনির্দেশনা হয়ে থাকে। এরপর তাবরকা ও তায়ালা বলেন (খয়রাত ঐ সকল গরীব লোকের জন্যে যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে) ফলে এই মহান আয়াতটি তার বর্ণনা ভঙ্গিতে ঐ সকল গরীবদের খেয়াল রাখতে সর্বদিকের সতর্কতাকে অন্তর্ভুক্তি করেছে যারা আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেদের আবদ্ধ করেছে। তাদের প্রয়োজন পুরা হয় এবং অভাব মুক্ত হয় এমন কিছু তারা করতে পারেনা। (জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়)

সুতরাং জীবিকার সন্ধানে যমিনে বিচরনের সক্ষমতা তাদের থেকে নাই হয়ে গেছে। ফলে তারা ব্যাবসা বা কাজের দ্বারা উপার্জন করতে সফর করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেদের আবদ্ধ রাখার কারনে। ইহা ফায়েদা দেয় যে, এখানে এমন কতক গরীব ও অভাবি আছে তাদের কেউ খোঁজ রাখে না। তাদের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ কেউ তাদের অবস্থার দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। সেই সাথে গরীবকে তার দারিদ্রতার দরুন কষ্ট দেয়া যাবে না সে ফায়েদাও দেয়। কখনো সে পথ পেতে এবং তার প্রয়োজন পুরো হবে এমন কাজের তাওফিক পেতে ব্যক্তিগত বা চিন্তাগত অথবা পরিচিতিগতভাবে অক্ষম হোন। সুতরাং ধনীরা সে বিষয়ে সতর্ক থাকবে। তার প্রতি মন্দ ধারনা করবে না এবং কর্মপরিত্যাগ কারী অলসতার তিরষ্কার নিন্দা করবে না। বরং তাকে পথ দেখাবে ও সাহায্য করবে যদি সে যেই অবস্থায় আছে তা থেকে কর্ম ও উপার্জন এর অবস্থায় স্থানান্তর হতে চায়। তেমনিভাবে ধনীদের গরবিদের জন্য সচেতন করা, তাদের প্রসংশা ও তাদের জন্য সতর্কতার ফায়েদাও দেয়।

আর আরো ফায়েদা নেয়া যায় যে, মানুষ কাজের ক্ষেত্রে ভালো ও সুন্দর করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে। ফলে কেউ আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে স্বপে দেয়। ফলে সে এ ছাড়া অন্য কিছুতে তার সময়কে লাগায় না,অন্যকিছু ভালোও করে না। আর কখনো এর দ্বারা তার জীবনের প্রয়োজনীয় যিনিস সে পায়না। যা অন্য কারো থেকে তাকে অমুখাপেক্ষি রাখবে। আর যে ধনী অথবা যার উপার্জনের সক্ষমতা আছে এবং তার জন্য রিযিক ও তার কারনসমূহ সহজ সেই ইহা ঠিক করবে যাতে তার জীবনও আল্লাহর রাস্তাসমূহের কোন এক রাস্তায় হয়। আর অন্যদের থেকে বিরত থাকা ইসলামের একটি সীমানা।

অত:পর আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল লোকদের গুন বণৃনা করেন যাদের অবস্থা আয়াতে কারিমা অন্তর্ভুক্ত করেছে। এবং ব্যায় কারীদের দৃষ্টি তাদের দিকে নিবদ্ব করেছে যে তারা(অজ্ঞ লোকেরা যাঞ্চা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে।) সুতরাং

তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ মনে করে যে, তারা সচ্ছল তাদের অপরের ব্যায় করা থেকে অমুখাপেক্ষি। আর তা তাদের পবিত্রতা ও চাওয়া থেকে নিজেদের নিবৃতিরাখার কারনে। অথবা ঐ ধরনের কিছু প্রকাশ করা যা তাদের প্রয়োজন ও দারিদ্রতা প্রকাশ করে। নিশ্চই ইহা প্রত্যেক জিনিসের উচ্চ প্রতিচ্ছবি। ফলে তাদের যে তাদের অবস্থা সুক্ষভাবে জানে সে ছাড়া কেউ তাদের বুঝতে পারেনা। আর এই চিত্র ফকির মিসকিনদের প্রথমসারির মুসলমানদের অবস্থার প্রতিচ্ছবির শিক্ষা দেয় যাতে তা শিক্ষার পদ্ধতি হয়ে থাকে।আর মানুষের মাঝ থেকে তাদের চিনার জন্য তাবরকা ও তায়ালা তাদের যে গুনাবলী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ বলেন *(**তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে**।)* সুতরাং দারিদ্রতা প্রমানের আলামত হলো তাদের উপর স্পষ্ট প্রয়োজনীয়তার গুণাবলী। সুতরাং হে দান করার কাংখিত ও সম্মোধিত ব্যাক্তি*!* এদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তাদের দারিদ্রতা প্রমাণকারী আলামতসমূহ দ্বারা। যেমন শারীরিক প্ররিশ্রম*;* যা ধনী-গরিব ও অসুস্থ-সুস্থ প্রকাশ করে। তেমনিভাবে বিনয়, যা তাদের শরীর ও আচরণে ফুটে উঠে। *(*অজ্ঞ লোকেরা যাঞ্চা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে*)* সুতরাং তাদের দুটি বড় রূপ। একটি রূপ তাদের *(*পবিত্রতা*)* এর অবস্থা অবগত ব্যক্তি ছাড়া কেও তাদের বুঝতে পারে না। আরেকটি রূপ জানলে ওয়ালারা তা বুঝেন। *(*তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে।*)* আর ইহা রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে ঐ সকল ব্যাক্তিবর্গ ও মানুষের জন্য গভীর বিশ্লেষণ যারা নিজেদেরকে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় স্বপে দিয়েছে।

অত*;*পর আল্লাহ তাবারকা ও তায়ালা তাদের অবস্থা সম্পর্কে বলেন*(*তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না*)* সুতরাং তাদের থেকে কখনোই মানুষের কাছে চাওয়া ঘটে না ফলে তাদের থেকে কাকুতি মিনতিও ঘটে না। কেননা তারা পবিত্র। তাদের হাত কারো দিকে বাড়ায় না।আর অন্য কেও তাদের দারিদ্রতা ও অভাব উপলব্ধি করে না। সুতরাং তা এমন গুনাবলী একজন ব্যাক্তি এর নিকট অবস্থান করে বরত্ব ও

সম্মানের দিক থেকে। আর শাব্দিক একটি ফায়েদা হলো সনির্বন্ধ অনুরোধই কাকুতি।ফলে যতই তাদের প্রয়োজন হোক না কেন কখনোই তাদের থেকে চাওয়া প্রকাশ পায়না। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।

আর একটি ফায়েদা হলো আল্লাহ তায়ালার কিতাবে শব্দবিন্যাসের সৌন্দর্যতা। যার মধ্য থেকে এই আয়াতে কারিমাটি। বরং শব্দ তার স্বস্থানে এমন বর্ণনা যে বুদ্ধিমানদের আন্দোলিত করেছে। আর প্রত্যেক বাক্য যেখানে জ্ঞান একটু থামে এর চমৎকার বিন্যাস ও আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে সুক্ষভাবে পরিবেপ্তি করায় হতবুদ্ধি,অবাক হয়ে যায়। অত:পর প্রত্যেক আয়াত অবাক হয় এবং তার মত কলম ধরার সাহস কেও করে না এবং ফকীহ ও আলেমদের যেই এর প্রামানিকতায় একটু সময় দেন আধিক্যের আধিক্য সহ অঞ্জলি ভরে নেন। আলেম ছাড়াও আয়াতের শব্দাবলী প্রত্যেক মানুষ পড়ে ও শুনে। ফলে তারা সেখান থেকে দয়াময় সম্মানিতর ব্যাপক উদ্দেশ্য জানতে পারে। সুতরাং আল্লাহ কত মহান যিনি তার কিতাবকে সব অলৌকিকতা দিয়ে বিশেষায়িত করেছেন।

অত:পর আয়াতে কারিমাটি শেষ হয় দানকারীর মনশান্তি যাতে বৃদ্ধি পাবে তা দিয়ে। (তোমরা যে উত্তম অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত) এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য প্রত্যেক ব্যয়কে নিষেধ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা উত্তম ব্যয়কে নির্ধারণ করেছেন। (তোমরা যে উত্তম ব্যয় করবে) এর পরিপ্রেক্ষিতে কল্যাণ শামিল নয় এমন প্রত্যেক ব্যয়কে না করা হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা সব ব্যয় সম্পর্কে জানেন, ছোট ও বড়, যা অল্প থেকে নেয়া হয়েছে বা বেশি থেকে নেয়া হয়েছে। তার সম্পর্ক যেখান থেকে নেয়া হয়েছে তার সাথে যদিও তা হয় আল্লাহ তায়ালার জন্য বা সুনাম ও লোক দেখানোর জন্য। অতএব যদি তিনি এ বিষয়ে জ্ঞান রাখেন অচিরেই সে দানকারী যা দান করেছে ও অগ্রে প্রেরণ করেছে তা ছাড়িয়ে যাবে।

﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُم بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٤﴾

অর্থ: **[যারা রাত-দিন, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে পুরস্কার। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।]** (আয়াত নং: ২৭৪)

এখানে আল্লাহ তাআলা দানশীলদের প্রতিদান, পুরস্কার এবং উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এবং তাদের জন্য মহা পুরস্কার এবং কোনো ধরণের ভয় বা দুঃখ না থাকার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এটি আল্লাহ- তাআলার পক্ষ থেকে দানকারীদের প্রশংসা, যারা তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করেন রাত-দিন, গোপনে ও প্রকাশ্যে। এর মধ্যে পরিবারের জন্য ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত, যেমন সহীহ হাদিসে এসেছে: **রাসূল সাঃ বলেছেন,** ***(আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার বিনিময়ে প্রদান করা হবে। এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে (তারও প্রতিদান পাবে)।*** (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ তাআলার বাণী **"الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ"** দ্বারা বোঝানো হয়েছে, দানের পরিমাণ ও সময়ের ভিন্নতা, যা দাতার উদারতার বহিঃপ্রকাশ। আর **"سِرًّا وَعَلَانِيَةً"** দ্বারা বোঝানো হয়েছে, কিছু দান গোপনে করা হয় এবং কিছু দান প্রকাশ্যে করা হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, প্রকাশ্যে দান করা নিন্দনীয় নয়, বরং কখনো এটি অন্যদের দানের প্রতি অনুপ্রাণিত করতে পারে, তবে এতে রিয়া বা আত্মপ্রদর্শনের উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন: **" فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"** এই দানশীলদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার ও সম্মান। **"عِنْدَ رَبِّهِمْ"** বলার মাধ্যমে তাদের উচ্চ মর্যাদার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, কারণ এটি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে বিশেষ সম্মানের প্রতীক। এছাড়া, **" وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ"**— অর্থাৎ ভবিষ্যতে তারা কোনো অনিশ্চয়তা বা বিপদের সম্মুখীন হবে না এবং **"وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"**— তারা অতীতের কোনো বিষয় নিয়ে দুঃখিত হবে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা দয়ালু, পরম দাতা ও অনুগ্রহশীল।

অন্যদিকে, কিয়ামতের দিন এমন কিছু লোক থাকবে যারা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: "**আর তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপ দিবস সম্পর্কে যখন সব বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, অথচ তারা রয়েছে উদাসীনতায় বিভোর এবং তারা ঈমান আনছে না।**" (সূরা মারিয়াম: ৩৯) এটি শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে উৎসাহ ও পুরস্কারের গুরুত্বকে তুলে ধরে। যারা নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, তাদের প্রশংসা ও প্রতিদান দেওয়া উচিত, কারণ এটি মানুষের অন্তরের খারাপ প্রবৃত্তি, মন্দ চিন্তা ও হীনমন্যতা দূর করতে সহায়তা করে এবং তাকে সর্বোত্তমভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়াও, এটি সুন্দর ও উত্তম দান করার শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব বোঝায়। দান করার সময় ভালো জিনিস দান করা, মানুষের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা এবং বিশেষ করে আত্মমর্যাদাশীল গরিবদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦﴾

অর্থ*: [***যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতই। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।* আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ কোন অতি কুফরকারী পাপীকে ভালবাসেন না।*]* (আয়াত নং*:* ২৭৫-২৭৬*)*

আল্লাহর রাস্তায় দান-খরচের আলোচনা ব্যাখ্যা করার পরপরই, কুরআনুল কারীম এখানে সুদের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন*:* **(যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়।)** এখানে আয়াতটিতে সুদের ভয়াবহতা এবং কিয়ামতের দিন সুদখোরদের অবস্থা ভয়ংকরভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। তারা তাদের কবর থেকে উঠবে যেন কেউ উন্মাদ হয়ে গেছে, শয়তানের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কারণ, সে এমনভাবে দাঁড়াবে যা হবে অস্বাভাবিক ও ভয়ংকর। ঠিক তেমনিভাবে, দুনিয়াতেও তার অবস্থা এর থেকে খুব একটা আলাদা নয়। সুদখোরের লোভ, লালসা ও প্রবৃত্তি তাকে দ্রুত সম্পদ অর্জনের দিকে ঠেলে দেয়। ফলে সে এমনভাবে দৌড়ায় ও ছুটে বেড়ায় যেন কোনো পাগল বা ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তি কিছু হারিয়ে ফেলবে বলে আতঙ্কিত। তার লোভ তার দেহ ও চিন্তাকে

এক অস্বাভাবিক দ্রুততায় নাড়া দেয়, যেন সে শয়তানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এই ভয়াবহ চিত্র একজন মুসলিমকে সতর্ক করে যে, সুদের কারণে যেন তার অবস্থাও এমন ভীতিকর না হয়। বরং মুসলিমের উচিত বৈধ উপায়ে উপার্জন করা এবং আল্লাহ তাআলা নিষিদ্ধ করেছেন এমন সুদ ও হারাম ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে দূরে থাকা। সুদের ভয়াবহতা এতটাই গুরুতর যে, আয়াতটিতে এটিকে অত্যন্ত নিন্দিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে ***(যারা সুদ খায়)***, যেখানে 'খাওয়ার' কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে, যদিও এর অর্থ উপার্জন করা বোঝায়। খাওয়ার উল্লেখ এসেছে কারণ মানুষের জন্য সম্পদ অর্জনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো খাদ্য গ্রহণ, আর এতে লোভ ও অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা বেশি প্রকট হয়। এ থেকেই বোঝা যায়, আয়াতটি কেবল অর্থ উপার্জন নয়, বরং সুদের প্রবৃত্তিগত নোংরা দিককেও চিত্রিত করেছে।

আর ربا এর অর্থ হলো, অর্থ ও খাদ্যদ্রব্যের লেনদেনে নির্ধারিত পরিমাণ বা নির্দিষ্ট সময়সীমার বিনিময়ে বাড়তি নেওয়া। এই আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যগঠন এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে তা মানুষের হৃদয়ে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে এবং ভয় সৃষ্টি করে, যাতে তারা সুদ থেকে সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়। এরপর, আল্লাহ তাআলা সুদকে যারা বৈধ মনে করে তাদের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন***: (এটা এজন্য যে তারা বলে, "ব্যবসা তো সুদের মতোই!")*** তারা সুদকে ব্যবসার সমতুল্য মনে করেছে, কিন্তু এটি কোনো তুলনা বা যুক্তিসংগত ধারণা নয়। যদি তারা কিয়াস করতে চাইত, তবে বলত " إِنَّمَا ٱلرِّبَا مِثْلُ ٱلْبَيْعِ " *(*সুদ তো ব্যবসার মতো*)*। কিন্তু তারা উল্টো বলেছে " إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَا" যেন তারা নিজেদের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং প্রশ্ন তুলতে পারে*:* কেন এটি *(*সুদ*)* হারাম করা হলো, অথচ ঐটি *(*ব্যবসা*)* হালাল করা হলো*?* এই প্রশ্নের মাধ্যমে তারা আল্লাহ তায়ালার শরিয়তের উপর আপত্তি তুলেছে এবং নিজেদের স্বার্থে সুদকে বৈধ করার চেষ্টা করেছে।

এখান থেকে বোঝা যায়, পথভ্রষ্ট ব্যক্তি প্রথমে নিজের ভুলকে বৈধ মনে করতে শুরু করে এবং নিজের আত্মার উপর দোষারোপ না পড়ার জন্য নানা অজুহাত দাঁড় করায়। এরপর, সে সহজ-সরল মানুষদের শারীয়তের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ধোঁকা দেয় এবং অন্যদেরও নিজের পথের দিকে টেনে আনতে চায়। ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তিরা সাধারণত এভাবেই নিজেদের পথকে যুক্তিযুক্ত করার চেষ্টা করে এবং নিজেদের প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার অনুসরণ করে। আল্লাহ আমাদের প্রবৃত্তির দাসত্ব এবং শয়তানের প্রতারণা থেকে রক্ষা করুন! কিন্তু একজন প্রকৃত মুসলিম একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলার বিধান মেনে চলে, তাঁর আদেশের উপর কোন রকম আপত্তি বা প্রশ্ন তোলে না, এবং শয়তান বা প্রবৃত্তিকে এতে প্রবেশ করতে দেয় না। কেননা, নিশ্চয়ই আল্লাহ যা করেন, সে বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না, আর তাঁর বিধানের উপর কারো আপত্তি করার সুযোগ নেই।

অতঃপর, আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বিধান ঘোষণা করেছেন: (আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।) এরপর, এই আয়াত সুদগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য মুক্তির পথও খুলে দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: **(যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে, তারপর সে বিরত হয়েছে, তবে যা সে অতীতে করেছে, তা তার জন্য থাকবে এবং তার বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত।)** অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুদ হারামের আদেশ শুনেছে এবং তা শোনার পর তা থেকে বিরত হয়েছে, তার পূর্ববর্তী লেনদেনের বিষয়ে তাকে দায়ী করা হবে না। তার অতীতের বিষয় আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল—তিনি চাইলে ক্ষমা করবেন বা চাইলে শাস্তি দেবেন। এখানে আয়াতের "তার বিষয় আল্লাহর হাতে" বাক্যের বহুবিধ অর্থ হতে পারে: ১. এখানে (তার বিষয়) শব্দটি (সুদ)-এর প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে, যার মানে হলো: সুদের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং এতে কারো আপত্তি করার অধিকার

নেই। ২. এটি ما سلف পূর্ববর্তী সুদী লেনদেন-এর প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে, যার মানে হলো: সুদগ্রস্ত ব্যক্তির অতীতের গুনাহ আল্লাহ তাআলা চাইলে ক্ষমা করবেন। ৩. এটি সুদগ্রস্ত ব্যক্তির নিজের প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে, যার মানে হলো: সে সুদ থেকে সত্যিকারে ফিরে এসেছে কিনা, তা আল্লাহর হাতে—তিনি চাইলে তাকে স্থির রাখবেন বা পুনরায় বিপথগামী হতে দেবেন। এই বিভিন্ন অর্থের অন্যতম একটি শিক্ষা হলো যে, কুরআনের ব্যাখ্যা কেবলমাত্র প্রকৃত জ্ঞানী, ভাষার দক্ষ বিশেষজ্ঞ, এবং ইসলামী দলিলের সঠিক ও ভুল পার্থক্য বুঝতে সক্ষম, নাসিখ ও মানসুখ (বাতিল ও কার্যকর বিধান), এবং সাধারণ ও বিশেষ বিধান সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন—তাঁরাই করতে পারেন। সুতরাং, কেউ যেন কুরআনের ব্যাখ্যা করতে বা তার কোনো অংশ সম্পর্কে মতামত দিতে দুঃসাহস না করে, যদি না সে প্রকৃত জ্ঞান রাখে।

কিন্তু যারা উপদেশ পাওয়ার পরও সুদে ফিরে যায় এবং নিজেদের যুক্তি দিয়ে এটিকে বৈধ প্রমাণ করার চেষ্টা করে—যেমন, সুদ ও ব্যবসাকে এক মনে করে—তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা কঠোর শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন: (**আর যারা পুনরায় *[সুদে]* ফিরে যায়, তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে এবং সেখানে চিরস্থায়ী হবে।**) যে ব্যক্তি সুদের নিষেধাজ্ঞা জানার পরও আবার সুদের দিকে ফিরে যায়, সে শাস্তির যোগ্য। কেননা, তার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, আর সে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ তাআলার বিধান লঙ্ঘন করেছে। এতে রয়েছে সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি এবং কঠিন শাস্তির কথা, যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সতর্কতা ও সাবধানতার কারণ হওয়া উচিত। মৃত্যুর আগে এবং আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতের পূর্বে সুদ থেকে তওবা করা আবশ্যক, যাতে সে সুদের ভয়াবহ পাপ নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির না হয়।

আর (**আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন।**) এখানে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সুদের বরকত ছিনিয়ে নেন এবং তা হ্রাস করে দেন। বাহ্যিকভাবে সুদগ্রহীতা লাভবান মনে হলেও, তার সম্পদের প্রকৃত মূল্য ও সুখ নষ্ট হয়ে যায়। এতে কোনো

প্রকৃত আনন্দ বা প্রশান্তি থাকে না, বরং তা কষ্ট ও দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, **(আর দান-খয়রাতকে বৃদ্ধি করেন।)** যা দুনিয়াতে বরকত বাড়ায় এবং পরকালে বহু গুণ প্রতিদান লাভ করে। এখানে দুটি বিপরীত দিকের তুলনা করা হয়েছে—একদিকে সুদ, যা বাহ্যিকভাবে সম্পদ বৃদ্ধি মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তা ধ্বংস হয়ে যায়; আর অন্যদিকে দান-সদকা, যা প্রথমে সম্পদের পরিমাণ কমানোর মতো মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তার বরকত ও প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

সুদ লোভীদের কাজ, আর দান-সদকা উদার ব্যক্তিদের কাজ। এই দুইটি বিষয় চেহারা, প্রভাব, এবং পরিণতির দিক দিয়ে কখনো সমান হতে পারে না। এটি একজন মুমিনের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা—সে কি লোভের পথ বেছে নেবে, নাকি উদারতার পথে চলবে? প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি দান-সদকার পথে চলে এবং সুদের পথ থেকে দূরে থাকে। এই ধরনের পরস্পরবিরোধী তুলনা কুরআনের এক অসাধারণ শিক্ষাদান পদ্ধতি, যা মানুষকে গভীরভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে। এতে স্পষ্টভাবে দেখা যায় কোনটি সুস্থ ও কল্যাণকর পথ এবং কোনটি ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক। এটি সত্য ও মিথ্যা, ন্যায়ের পথ ও অন্যায়ের পথ, কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে সঠিক পথ বেছে নেওয়ার শিক্ষা দেয়।

এই তুলনামূলক আলোচনা কুরআনের চমৎকার পদ্ধতির অন্যতম, যা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করে এবং সর্বোত্তম ও সুস্পষ্টভাবে তাকে হেদায়েতের পথ দেখায়। এটি সেই মহান কুরআন, যা সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন, যাতে মানুষ সত্যের সন্ধান পায় এবং ন্যায়ের পথে চলতে পারে।

এই আয়াতের শেষাংশে একটি হৃদয়স্পর্শী উপদেশ রয়েছে- "والله لا يُحب كلَّ كَفَّارٍ **(আর আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না)**। আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি এমন কাউকে ভালোবাসেন না, যে অকৃতজ্ঞ ও

গুরুতর পাপাচারে লিপ্ত। এখানে أثيم শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে অতিরঞ্জিত রূপে, যদিও كفار শব্দের মধ্যেই পাপের ব্যাপকতা নিহিত রয়েছে। আল্লামা ইবনু সা'দী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি হল সে, যে আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, তাঁর অনুগ্রহকে অস্বীকার করে এবং গুনাহের ওপর অটল থাকে।" আল্লাহ তাআলা কাউকে ভালোবাসেন না—এই ঘোষণা একজন মুমিনের হৃদয়ে প্রবল প্রভাব ফেলে। কারণ, মুমিন সর্বদা আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকে এবং সেইসব গুণাবলি থেকে দূরে থাকতে চায়, যেগুলো তাকে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করতে পারে। ইমাম ইবনু কাসির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: "অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তিকে ভালোবাসেন না, যার অন্তর কুফরিতে নিমজ্জিত, যার কথা ও কাজ গোনাহে ভরা। সুদখোর ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা তার জন্য যে হালাল রিজিক নির্ধারণ করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকে না এবং বৈধ উপার্জনে তুষ্ট হয় না। বরং সে মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতে চায়। সে আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং চরম জালিম, যে অন্যদের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রাস করে।"

এই আয়াতে হৃদয়কে নাড়া দেওয়ার মতো বার্তা রয়েছে, যা একজন মুমিনকে সুদ থেকে সতর্ক করে এবং তাকে এমন শ্রেণিতে পড়া থেকে বিরত রাখে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তাঁর ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٧﴾

অর্থ: ***[নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যাকাত দিয়েছে, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রব-এর নিকট। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।]*** (আয়াত নং: ২৭৭)

অতঃপর কুরআনুল কারীম সেই সকল বান্দার প্রশংসা বর্ণনা করে, যারা আল্লাহ তাআলার অনুগত এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে। এতে বোঝানো হয়েছে যে, যারা তাঁর আনুগত্য করে এবং যারা অবাধ্য হয়, তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর সেই বান্দাদের প্রশংসা করেছেন, যারা ঈমান এনেছে। তিনি প্রথমে ঈমানের কথা উল্লেখ করেছেন, কারণ এটি সকল ইবাদতের মূল ভিত্তি। ইসলাম ও আত্মসমর্পণের মূলসূত্র এটি এবং আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকার প্রধান উপায়ও এটি, যার মধ্যে সুদও অন্তর্ভুক্ত। এরপর তিনি সৎকর্ম করার কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে "সৎকর্ম" বলতে সব ধরনের নেক কাজ বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন এবং যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে। এটি সেই সকল মন্দ কাজের বিপরীত, যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ, যেমন সুদ গ্রহণ। এরপর তিনি নামাজ ও যাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও এগুলো সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত, তবুও আল্লাহ এগুলোর গুরুত্ব ও মর্যাদা বোঝানোর জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তৃতীয়ত নামাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে— "وأقاموا الصلاة"। নামাজ মানুষকে অশ্লীলতা ও পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, যার মধ্যে অন্যতম সুদ। চতুর্থত, যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে— "وآتوا الزكاة"। যাকাত ব্যয় ও উদারতার প্রতীক, যা সুদের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুদ লোভ ও সংকীর্ণতার পরিচয় বহন করে, আর যাকাত দানশীলতা ও সহানুভূতির নিদর্শন।

অতঃপর, আল্লাহ এইসব ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের প্রতিদান সম্পর্কে বলেন— তাদের জন্য তাদের রবের কাছে পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। অর্থাৎ, তারা প্রতিদানপ্রাপ্ত ও পুরস্কৃত হবে এবং আল্লাহর

পক্ষ থেকে নিরাপদ থাকবে। তাই কিয়ামতের দিন তারা কোনো ভীতির সম্মুখীন হবে না এবং কোনো আফসোসও করবে না। কারণ, মানুষের অনুতাপ তাকে কিয়ামতের দিন দুঃখভারাক্রান্ত করবে, কেননা তখন আর ভুল সংশোধনের সুযোগ থাকবে না। কিন্তু এই বর্ণিত ব্যক্তিরা সে কষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে, কারণ তারা আল্লাহর আনুগত্যে জীবন অতিবাহিত করেছে।

এই কুরআনি নির্দেশনার মাধ্যমে সুদের বিধান ও সুদখোরের পরিণতি বর্ণনা করার পর, আল্লাহ মানুষের সামনে দুটি পরিণতি তুলে ধরেছেন: ১. আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ, পাপাচারীকে ভালোবাসেন না। ২. তাদের জন্য তাদের রবের কাছে পুরস্কার রয়েছে, তারা কোনো ভয় পাবে না এবং তারা কোনো দুঃখও করবে না। এ থেকে বোঝা যায় যে, তুলনামূলক বিশ্লেষণ কিভাবে মানুষের চিন্তাকে সংশোধন করতে এবং সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। এটি ইসলামের ঈমানি ও ইবাদতের ভিত্তির অন্যতম অংশ, যেমন কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও দেখা যায়।

﴿فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩ وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٨٠ وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٨١﴾

অর্থ: **[কিন্তু যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলম করবে না এবং তোমাদের যুলম করা হবে না। আর যদি সে অসচ্ছল হয়, তাহলে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তার অবকাশ রয়েছে। আর সদাকা করে দেয়া তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। আর তোমরা সে দিনের ভয় কর,**

যে দিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা উপার্জন করেছে, তা পুরোপুরি দেয়া হবে। আর তাদের যুলম করা হবে না।] *(*আয়াত নং: ২৭৮-২৮১*)*

কুরআনুল কারীম এখানে আবারও চিকিৎসামূলক নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করেছে, যা উপদেশ গ্রহণ ও সঠিক পথ অনুসরণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে মর্যাদাপূর্ণ উপাধিতে সম্বোধন করেছেন—"হে ঈমানদারগণ!" যে ব্যক্তি এমন সম্মানজনক উপাধিতে সম্বোধিত হয়, তার কর্তব্য হলো সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং মনোযোগ সহকারে তা গ্রহণ করা। এখানে আহ্বানকারী স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, যিনি ঈমানের গুণে তাঁদের সম্বোধন করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ঈমানদারদের জন্য এই আহ্বানকে অবহেলা করা উচিত নয়; বরং তাদের অবশ্যই এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁদের জন্য একটি মহান নির্দেশনা দিয়েছেন—"আল্লাহকে ভয় করো।" এটি গভীর তাৎপর্য বহন করে। এর অর্থ হলো— আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর শক্তি ও প্রতাপকে ভয় করো, তাঁর শাস্তিকে ভয় করো, তাঁর অসীম ক্ষমতাকে ভয় করো; একই সঙ্গে তাঁর রহমতের আশা রাখো, তাঁর পুরস্কারের প্রত্যাশা করো এবং দ্রুত তাঁর আনুগত্যের পথে এগিয়ে যাও। পাশাপাশি যেসব বিষয় তিনি নিষিদ্ধ করেছেন, সেগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকো।

এই সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থবোধক শব্দযুগলের মধ্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত উপদেশ নিহিত রয়েছে। এরপর তিনি স্পষ্টভাবে আদেশ দিয়েছেন—"সুদ থেকে যা কিছু অবশিষ্ট রয়েছে, তা ছেড়ে দাও।" অর্থাৎ অতীতে যেসব সুদ সংক্রান্ত লেনদেন ছিল, সেগুলোর সবকিছুই এখন পরিত্যাগ করতে হবে। এই নির্দেশনা এত ব্যাপক যে, এতে কেবল পূর্ববর্তী সুদের পরিমাণই নয়, বরং যেসব সুদ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বা নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল—সবকিছুই

অন্তর্ভুক্ত। কেউ যেন আর কোনোভাবেই সুদের অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ না করে; বরং তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে, কারণ এটি চূড়ান্ত ও নিষ্পত্তিমূলক আদেশ।

قال ***ChatGPT:***

"إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ" *(যদি তোমরা ঈমানদার হও)* – এই শর্তটি ঈমানের সত্যতার উপর গুরুত্বারোপ করছে। অর্থাৎ, যদি প্রকৃত ঈমান থাকে, তবে সুদ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। অতএব, যে ব্যক্তি সুদ পরিত্যাগ করে না, তার এই আচরণ তার ঈমানের দুর্বলতার প্রমাণ বহন করে। এমন ব্যক্তিরা সেই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: **"আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ, পাপাচারী কাউকে ভালোবাসেন না।"**

এখানে **"যদি তোমরা ঈমানদার হও"** বাক্যাংশটি প্রমাণ করে যে, ঈমান মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে। যেমন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: **"যখন কোনো ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, তখন সে প্রকৃত ঈমানদার থাকে না।"** *(বুখারি ও মুসলিম)* এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, ঈমান দুর্বল হলে মানুষ পাপ থেকে নিজেকে সংযত রাখতে পারে না, বিশেষত বড় গুনাহের ক্ষেত্রে। দুর্বল ঈমান প্রবৃত্তির আকর্ষণ ও কু-প্রবৃত্তির দাসত্বের দিকে ধাবিত করে, যা তাকে নৈতিকভাবে দুর্বল করে ফেলে। সুতরাং, ঈমানকে শক্তিশালী করা এবং আত্মিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে তা উন্নীত করা অত্যাবশ্যক। কেননা, কেবল শক্তিশালী ঈমানই মানুষকে পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে এবং আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের পথে পরিচালিত করতে পারে।

এরপর কুরআনের বর্ণনা সেই ব্যক্তিদের অবস্থা তুলে ধরে, যারা এই উপদেশ ও আল্লাহর দিকনির্দেশনা থেকে শিক্ষা নেয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"আর যদি তোমরা তা না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।"** এটি এক কঠোর হুঁশিয়ারি তাদের জন্য, যারা জেনেশুনে সুদকে বৈধ মনে করে এবং আল্লাহর

নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনের দুঃসাহস দেখায়। এটি আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে যুদ্ধ, যা শাস্তি, দুর্ভোগ, বরকতহীনতা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কে আছে যে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম? এটি সুদের ভয়াবহতা ও নিষিদ্ধতার চরম প্রকাশ, যা আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে ঘৃণিত হারামগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এখানে **"حرب" (যুদ্ধ)** শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা সমস্ত যুদ্ধের ধরন ও প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, এমনকি যা মানুষের কল্পনাতেও আসে না। তবে যদি কেউ আন্তরিকভাবে তওবা করে, তবে আল্লাহ তাআলা বলেন: **"আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদের জন্য থাকবে।"** এটি প্রমাণ করে যে, সুদ থেকে ফিরে আসার প্রথম পদক্ষেপ হলো তওবা করা। এই আয়াতের মাধ্যমে তওবার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়, কারণ এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—অতীতের জন্য অনুতাপ, ভবিষ্যতে তা না করার দৃঢ় সংকল্প এবং অবৈধ সুদ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে আসার দৃঢ় মনোভাব।

আল্লাহ তাআলার বাণী: **"আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদের জন্য থাকবে।"** এতে সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, মূলধন বৈধ, তবে সুদের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হারাম। ফলে কেউ কারও প্রতি অন্যায় করবে না এবং কারও প্রতিও জুলুম করা হবে না—**"তোমরা কাউকে জুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না।"** এতে সুদের কারবারিদের জন্য সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাতে উভয় পক্ষ ন্যায়বিচার পায়। যদি কোনো ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়, তবে কুরআনের নির্দেশ হলো: **"আর যদি সে (ঋণগ্রহীতা) সংকটে থাকে, তবে স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।"** এতে আল্লাহ তাআলা ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতার প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার সামর্থ্য আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে বলেছেন।

এরপর আল্লাহ তাআলা ঋণদাতার জন্য আরও উত্তম বিকল্পের কথা বলেন: **"আর যদি দান করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম।"** ঋণদাতার সামনে দুটি

পথ খোলা রাখা হয়েছে: ১. সে ঋণ পরিশোধের জন্য অপেক্ষা করবে। ২. অথবা সম্পূর্ণ ঋণ মাফ করে দেবে। যদিও বাহ্যিকভাবে এটি ক্ষতির মতো মনে হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এটি ঋণদাতার জন্য সবচেয়ে উত্তম। যখন আল্লাহ তাআলা বলেন **"خَيْرٌ لَّكُمْ"** (তোমাদের জন্য উত্তম), তখন এর বিপরীত কিছুই হতে পারে না। কেননা এতে রয়েছে: দান করার ফলে আল্লাহর বরকত, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে আরও উত্তম প্রতিদান দেবেন। তাছাড়া ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার জন্য দোয়া করবে, যা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। আর এতে মানুষের মধ্যে দয়া, সহানুভূতি ও সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি পাবে।

সবশেষে, সুদের আলোচনা শেষ হয় এক মহান উপদেশ দিয়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"আর সেদিনের ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে, তারপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জনের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে, আর কারও প্রতি অন্যায় করা হবে না।"** এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ, যা মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে এবং আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ সেদিন প্রত্যেকেই তার আমলের পূর্ণ প্রতিদান পাবে এবং বিন্দুমাত্রও জুলুম করা হবে না।

হে আল্লাহ, আপনার অশেষ অনুগ্রহ ও রহমতে আমাদের প্রতি সদয় হোন, হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়!

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ

صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

অর্থ: **[হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর ঋণের লেন-দেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে। আর তোমাদের মধ্যে একজন লেখক যেন ইনসাফের সাথে লিখে রাখে এবং কোন লেখক আল্লাহ তাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, তা লিখতে অস্বীকার করবে না। সুতরাং সে যেন লিখে রাখে এবং যার উপর পাওনা সে (ঋণ গ্রহীতা) যেন তা লিখিয়ে রাখে। আর সে যেন তার রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে এবং পাওনা থেকে যেন সামান্যও কম না দেয়। অতঃপর যার উপর পাওনা রয়েছে সে (ঋণ গ্রহীতা) যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয়, অথবা সে লেখার বিষয়বস্তু বলতে না পারে, তাহলে যেন তার অভিভাবক ন্যায়ের সাথে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখ। অতঃপর যদি তারা উভয়ে পুরুষ না হয়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী- যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর। যাতে তাদের (নারীদের) একজন ভুল করলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেয়। সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে, যখন তাদেরকে ডাকা হয়। আর তা ছোট হোক কিংবা বড় তা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করতে তোমরা বিরক্ত হয়ো না। এটি আল্লাহর নিকট অধিক ইনসাফপূর্ণ এবং সাক্ষ্য দানের জন্য যথাযথ। আর তোমরা সন্দিহান না হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। তবে যদি নগদ ব্যবসা হয় যা তোমরা হাতে হাতে লেনদেন কর, তাহলে তা না লিখলে তোমাদের কোন দোষ নেই। আর তোমরা সাক্ষী রাখ, যখন তোমরা বেচা-কেনা করবে এবং কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। আর যদি তোমরা কর, তাহলে নিশ্চয় তা হবে তোমাদের সাথে অনাচার। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী।]** (আয়াত নং: ২৮২)

অতঃপর আল্লাহ তাআলা দান-সদকা ও তাঁর পথে ব্যয় করার গুরুত্ব, সুদের নিষেধাজ্ঞা এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে একাধিক মহান ও প্রভাবসৃষ্টিকারী আয়াত বর্ণনা করার পরপরই, সবচেয়ে দীর্ঘ আয়াতের মাধ্যমে বান্দাদের পারস্পরিক লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা পরস্পর নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ঋণ লেনদেন কর, তখন তা লিখে নাও।"** এই আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের উদ্দেশে সম্বোধন করেছেন: **"হে ঈমানদারগণ!"**—এটি আল্লাহ তাআলার বান্দাদের প্রতি এক বিশেষ আহ্বান। আল্লাহর সম্বোধন মানুষের পারস্পরিক সম্বোধনের মতো নয়; বরং এটি মনোযোগ আকর্ষণ, গভীর চিন্তা-ভাবনা ও একাগ্রতার সঙ্গে শোনার জন্য এক গুরুতর আহ্বান।

এখানে **"ঈমানদারগণ"** বলে সম্বোধন করার মাধ্যমে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে, তাদের ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, যা এক মহামর্যাদা। এটি এক বিশেষ নেয়ামত, যা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং সম্মানের সঙ্গে তাঁর আহ্বান গ্রহণ করার দাবি রাখে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের এমন সুন্দরভাবে সম্বোধন করেছেন, সেহেতু এটি বান্দাদের পারস্পরিক সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহারের গুরুত্বও প্রতিফলিত করে। আমাদের উচিত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় একে অপরকে আহ্বান করা, যাতে কথাবার্তার শুরুতেই মানুষের মনোযোগ আকর্ষিত হয় এবং তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ঈমানদারদের বিশেষভাবে সম্বোধন করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন: **"যখন তোমরা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ঋণ লেনদেন কর, তখন তা লিখে নাও।"** এখানে আল্লাহ তাআলা ঋণ-লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ের সুরক্ষা ও স্বচ্ছতার জন্য লিখে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে ঋণের পরিমাণ, পরিশোধের নির্ধারিত সময় এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। আল্লাহ তাআলা সাধারণ ভাষায় বলেছেন: **"যখন তোমরা ঋণ**

লেনদেন কর”—যা ঋণের সব প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে ব্যক্তিগত ঋণ, পণ্যের মূল্য পরিশোধের বাকি অংশ, জমি-বাড়ি সংক্রান্ত লেনদেন—সবই অন্তর্ভুক্ত হয়। একইভাবে **“فاكتبوه”** (তাহলে তা লিখে নাও)—এই বাক্যের মধ্যে ঋণের মেয়াদ, ধরণ, পরিমাণ, গুণগত মান ও শর্ত—সবকিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি কুরআনের ভাষাগত অলংকারের অন্যতম নিদর্শন, যেখানে সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। এ আয়াত থেকে আমরা এক মহান শিক্ষা পাই—আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের স্বার্থরক্ষা ও কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন। ঋণ লিখে রাখার এই বিধান মানুষকে ভুলে যাওয়া, সন্দেহ-অবিশ্বাস, মৃত্যু অথবা অন্য কোনো কারণে সৃষ্ট ভুল বোঝাবুঝি থেকে রক্ষা করে। এটি সম্পর্কের বিচ্ছেদ ও বিরোধের কারণগুলো প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

এরপর আল্লাহ তাআলা ঋণ লেনদেন লিখে রাখার মূলনীতি ও উপাদানসমূহ স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন: **“আর তোমাদের মধ্যে যেন কোনো লেখক ন্যায্যতার সাথে লিখে দেয়।”** এখানে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন যে, ঋণ সংক্রান্ত চুক্তি লেখার দায়িত্ব এমন একজন লেখক পালন করবেন, যিনি **“بِالْعَدْلِ”** (ন্যায্যতা/ ইনসাফ) বজায় রাখবেন—অর্থাৎ সত্য ও সঠিকভাবে চুক্তি লিখবেন, যাতে কোনো কম-বেশি না হয়; ঋণের পরিমাণ কিংবা পরিশোধের সময়সীমা—কোনোটিতেই যেন কোনো পরিবর্তন না ঘটে।

এই নির্দেশ থেকে বোঝা যায় যে, **ন্যায্যতা বা ইনসাফ** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ, যা লেখকের মধ্যে থাকা আবশ্যক। এতে সততা ও আমানতের গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়। এটি আমাদের শেখায় যে, **ন্যায়পরায়ণ ও সৎ ব্যক্তিদের দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ দেওয়া জরুরি**, কারণ তাদের কার্যসম্পাদন সরাসরি মানুষের অধিকারের সংরক্ষণ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত। অতএব, যারা ন্যায়পরায়ণ, তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া এক ধরনের অপরিহার্য কর্তব্য। এ আয়াত থেকে আমরা আরও বুঝতে পারি যে, লেখা ও লিপিবদ্ধ

করা এক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান। এটি কেবল সম্মানজনক বিষয় নয়, বরং এটি এক বিশাল দায়িত্ব, যা যথাযথভাবে সম্পাদন করা অপরিহার্য।

এরপর আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: **"আর যে লেখককে লিখতে বলা হয়, সে যেন লেখা থেকে বিরত না থাকে, যেমন আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন।"** এখানে আল্লাহ তাআলা লেখককে বাধ্য করেছেন যে, যখন তাকে লিখতে বলা হবে, তখন সে যেন লিখতে অস্বীকার না করে। কারণ আল্লাহ তাকে যে বিশেষ জ্ঞান দিয়েছেন, সেটি তাঁরই অনুগ্রহ, এবং এটি লেখকের ওপর এক বিশেষ দায়িত্ব। তাই এ ব্যাপারে সে যেন কোনো কার্পণ্য না করে এবং যখন তাকে আহ্বান করা হবে, তখন সে যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে সাড়া দেয়।

এই নির্দেশ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান এক মহান নিয়ামত। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **"كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ" (যেমন আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন)** এটি প্রমাণ করে যে, মানুষের প্রাপ্ত সব জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। সুতরাং, যার কাছে জ্ঞানের কোনো বিশেষ দান রয়েছে, সে যেন তা গোপন না করে, বরং এ জ্ঞানের দ্বারা সমাজ ও উম্মাহর উপকার সাধন করে।

এখানে আল্লাহ তাআলা লেখকের জন্য বিষয়টি আরও তাকিদের সাথে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন: (সুতরাং সে যেন লিখে দেয়।) এটি একটি আদেশ, যা লেখার দায়িত্ব পালন করা বাধ্যতামূলক করে তোলে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা, ঋণগ্রহীতার লেখকের কাছ থেকে লিখিয়ে নেওয়া সংক্রান্ত আরো কিছু সূক্ষ্ম বিষয় উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন: (যার ওপর ঋণের দায়িত্ব রয়েছে, সে যেন লেখকের কাছ থেকে লিখিয়ে নেয়।) অর্থাৎ, ঋণগ্রহীতাই লেখকের কাছে চুক্তির মূল বিষয়বস্তু, ঋণের পরিমাণ, পরিশোধের সময় স্পষ্ট করে লিখিয়ে নিবে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান, কারণ: এটি ঋণগ্রহীতার পক্ষে তার নিজের স্বীকারোক্তি হিসেবে গণ্য হবে, যাতে পরবর্তীতে কোনো অস্বীকৃতির অবকাশ না থাকে।

এটি সাক্ষীদের সামনে তার নিজ দায়িত্ব নিশ্চিত করবে। এটি ঋণদাতার স্বার্থ রক্ষা করবে, কারণ ঋণগ্রহীতা নিজে স্বীকার করলে ঋণদাতা পরে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে তার পক্ষে প্রমাণ হাজির করা সহজ হবে।

এখানে আরেকটি গভীর শিক্ষা রয়েছে: কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সুনির্দিষ্ট বণ্টন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আয়াতে বলা হয়েছে, ঋণদাতা অধিক ক্ষমতাশালী হলেও তাকেই লেখকের কাছে (স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করে) লিখিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, বরং ঋণগ্রহীতাকেই দেওয়া হয়েছে। এর কারণ হলো, ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সঠিক দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন, যেন ব্যক্তিগত প্রভাব বা ক্ষমতার জোর দিয়ে কেউ অন্যের উপর কর্তৃত্ব না ফলাতে পারে। এটি এজন্য বলা হয়েছে যাতে ঋণদাতা (পাওনাদার) ঋণগ্রহীতার স্বীকারোক্তি থেকে উপকার পেতে পারে। কারণ, যখন ঋণগ্রহীতা স্বীকার করে যে সে ঋণী, তখন পাওনাদারের অধিকার নিশ্চিত হয়। এতে তার পাওনার দাবি প্রমাণিত হয়। কিন্তু, যদি ঋণগ্রহীতা অন্য কারও ওপর ঋণের দায় চাপিয়ে দেয়, তাহলে পাওনাদার এর থেকে কোনো সুবিধা পাবে না। কারণ, সেই ব্যক্তি তা অস্বীকার করতে পারে বা কোনো অজুহাত দেখিয়ে দায় এড়াতে পারে। ফলে, এই ধরনের স্বীকারোক্তি পাওনাদারের জন্য কার্যকর হবে না।

এরপর আল্লাহ তাআলা মুত্তাকী হওয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং ঋণগ্রহীতাকে তার দায়িত্ব পালনের প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। এতে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, ঋণগ্রহীতা তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে এবং ঋণের শর্তাবলি—যেমন পরিশোধের সময়কাল, পরিমাণ, প্রকার ও সংখ্যা—সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করবে। পাশাপাশি, তাকে তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে সে ঋণের পরিশোধের ক্ষেত্রে কোনো টালবাহানা না করে এবং দায়িত্ব পালনে গাফিলতি না দেখায়। আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার এই উপদেশ কেবল ঋণগ্রহীতার জন্য নয়, বরং তার মতো অন্যান্য ঋণগ্রহীতা ও সকল মুসলমানের জন্য সর্বোত্তম পথনির্দেশনা।

এরপর আল্লাহ তাআলা উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে অবমূল্যায়নের নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করেছেন। তিনি বলেন: **"এবং পাওনা থেকে যেন সামান্যও কম না দেয়।"** এতে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, ঋণগ্রহীতা যেন তার দায়িত্ব থেকে একটুও কম না করে এবং পাওনাদারের হক যথাযথভাবে পরিশোধ করে। এ বিধান সব ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং ঋণ সংক্রান্ত জটিলতা এড়াতে সাহায্য করে। এই নির্দেশনা থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করা এবং মানুষের হক যথাযথভাবে আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের শিক্ষা দেয় এবং কম দেওয়ার প্রবণতা থেকে বিরত থাকতে বলে। পাশাপাশি, এটি লিখিত চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকার আদেশ প্রদান করে, যাতে কোনো পক্ষ অন্যের প্রতি অন্যায় করতে না পারে। এই বিধান কেবল ব্যক্তিগত লেনদেনের ক্ষেত্রে নয়, বরং সমাজের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা, কর্মসংস্থান, প্রশাসনিক কার্যক্রম ও ন্যায়বিচারের প্রতিটি ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা হিসেবে বিবেচিত হয়। আল্লাহর এই বিধান মানবসমাজের জন্য কল্যাণকর এবং এক মহান দায়িত্ব, যা যথাযথভাবে পালনের গুরুত্ব অপরিসীম।

তারপর আল্লাহ তাআলা চুক্তির উভয় দিকে ঘটতে পারে এমন সম্ভাবনার ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন: **"অতঃপর যার ওপর পাওনা রয়েছে, সে (ঋণগ্রহীতা) যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয়, অথবা সে লেখার বিষয়বস্তু বলতে না পারে..."** এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঋণগ্রহীতার এমন কিছু পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন, যেখানে সে ঋণ সংক্রান্ত চুক্তি সঠিকভাবে লিখতে বা বুঝতে অক্ষম হতে পারে। এখানে প্রথমে "سَفِيهًا" (সাফিহান) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হলো এমন ব্যক্তি যে নিজের অর্থের অপচয় করে এবং সঠিকভাবে ব্যয় করতে জানে না। এটি এমন একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, যে চিন্তাশক্তির অভাবে বা অজ্ঞতার কারণে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বুঝতে অক্ষম। পরবর্তীতে "ضَعِيفًا" (যয়ীফান) শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে, যা একদিকে

বার্ধক্য এবং অন্যদিকে শারীরিক বা মানসিক দুর্বলতাকে নির্দেশ করে। এটি এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি বয়সের কারণে বা শারীরিকভাবে লিখতে বা কোনো চুক্তি সঠিকভাবে বুঝতে অক্ষম হন।

এভাবে আল্লাহ তাআলা দুইটি ভিন্ন পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন—প্রথমত, একজন নির্বোধ ব্যক্তির অবস্থার কথা, যিনি লেখার বা চুক্তির বিষয়ে অবগত হতে অক্ষম; এবং দ্বিতীয়ত, একজন শারীরিকভাবে দুর্বল বা বয়সজনিত কারণে অক্ষম ব্যক্তির অবস্থার কথা। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **"لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ"**—এটি নির্দেশ করে যে, এমন একজন ব্যক্তি যদি লিখতে অক্ষম হন, তবে তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ তার পক্ষে লিখে দিতে পারে, যা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সঠিক চুক্তি স্থাপনের জন্য জরুরি। এই আয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় যে, চুক্তি বা কোনো ঋণ লেনদেনের ক্ষেত্রে যদি কোনো পক্ষ লিখতে অক্ষম হয়, তবে তার জন্য সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, যেমন একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাকে সহায়তা করবে। একে নিছক আনুষ্ঠানিকতা মনে না করে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ এতে সম্ভাব্য বিরোধ বা বিভ্রান্তি এড়িয়ে যাবার সুযোগ পাওয়া যায়।

এই বিধান শুধু আইনি বা ঋণ লেনদেনের ক্ষেত্রে নয়, বরং প্রতিটি মানুষের জীবনেই প্রয়োগযোগ্য। ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য এমন সঠিক নিয়মাবলী এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে, যা তাদের পারিবারিক, সামাজিক এবং ব্যবসায়িক সম্পর্কগুলিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার মাধ্যমে কল্যাণের পথ দেখায়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যেখানে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে সব ধরনের সমস্যা ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

এই আয়াতে একটি গভীর শিক্ষা রয়েছে—অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জন্য তাদের পারিবারিক, সমাজিক, ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক সকল বিষয়ে- একমাত্র যথেষ্ট এবং তাঁর নির্ধারিত পদ্ধতিতেই সব ধরনের সমস্যা ও ফেতনার সমাধান নিহিত রয়েছে।

আল্লাহ তাআলার বিধান ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা ব্যবস্থা সঠিকভাবে গাইড করতে সক্ষম নয়।

তারপর আল্লাহ তাআলা চুক্তি লেখার সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতার সমাধানও নির্ধারণ করেছেন। যদি ঋণগ্রহীতার মধ্যে কোনো অক্ষমতা বা অসুবিধা থাকে, তবে তিনি বলেন: **"فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ"** (তাহলে যেন তার অভিভাবক ন্যায়ের সাথে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়)। এখানে বোঝানো হয়েছে যে, ঋণগ্রহীতা যদি লেখার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে না পারে, তবে তার পিতা-মাতা, অভিভাবক, বা যিনি তার বিষয় পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন, তিনি যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা সম্পাদন করেন।

এর কারণ হলো, একজন অভিভাবকের দায়িত্ব হলো তার অধীনস্থদের সুরক্ষা প্রদান করা এবং অন্যায় বা জুলুম থেকে রক্ষা করা। কিয়ামতের দিন তার এ দায়িত্বের ব্যাপারে হিসাব নেওয়া হবে, কারণ একজন অভিভাবক তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে। এখানে অভিভাবককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে বলা হয়েছে, যাতে উভয় পক্ষ—ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা—ন্যায়বিচার পায় এবং কারো প্রতি অন্যায় না হয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা চুক্তি ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সাক্ষীর গুরুত্ব সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন: **"وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ"** (আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখ)। এখানে সাক্ষী হিসেবে **"مِنْ رِّجَالِكُمْ"** (তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে) বলা হয়েছে, যা প্রাপ্তবয়স্ক ও দায়িত্বশীল পুরুষদের নির্দেশ করে। শিশু বা অপরিণত ব্যক্তিদের সাক্ষী হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে বলা হয়েছে যে, সাক্ষী হিসেবে এমন ব্যক্তিদের নির্বাচন করা উচিত, যারা পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য। অপরিচিত ব্যক্তিদের সাক্ষী রাখা হলে, প্রয়োজনের সময় তাদের ডাকা কঠিন হয়ে যেতে পারে। এজন্য শরীয়ত সাক্ষীদের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে, যাতে সাক্ষ্যগ্রহণে কোনো অসুবিধা না হয় এবং ক্ষতিকর পথগুলো রুদ্ধ হয়।

যদি দুইজন পুরুষ সাক্ষী পাওয়া না যায়, তবে আল্লাহ তাআলা বিকল্প বিধান রেখেছেন: **"فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ"** (যদি তারা উভয়ে পুরুষ না হয়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী—যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর)। এখানে নারী সাক্ষীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়েছে, যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তাহলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।

আল্লাহ তাআলা নারীদের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন: **" أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى"** (যাতে তাদের একজন ভুল করলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেয়)। এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নারীদের মধ্যেই রাখা হয়েছে, কারণ তারা নিজেদের মধ্যে সহজেই আলাপ-আলোচনা করতে পারে, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পুরুষদের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ তারা সাধারণত লেনদেন ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমে অভিজ্ঞ এবং এই বিষয়ে তাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু নারীরা যেহেতু এই ধরনের লেনদেনে কম অভ্যস্ত, তাই একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে। এটি নারী সাক্ষীদের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার একটি ব্যবস্থা, যাতে সাক্ষ্যপ্রক্রিয়া আরও দৃঢ় হয়।

এভাবে ইসলাম সাক্ষ্যদান ও ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে একটি সুবিবেচিত ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধান প্রণয়ন করেছে, যা অন্যায় ও জুলুম প্রতিরোধ করে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণের জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন, যাতে কোনো ভুল বা অবিচার প্রশ্রয় না পায় এবং প্রত্যেকের অধিকার সংরক্ষিত হয়।

অতঃপর সাক্ষীদের উপর যা আবশ্যক তা মহান আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেন (সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে, যখন তাদেরকে ডাকা হয়।) এটা সাক্ষীদের প্রতি নির্দেশ যে, তাদেরকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হলে তারা যেন অস্বীকার না করে। হাসান বলেছেন: এই আয়াতটি দুটি বিষয়কে একত্রিত করেছে। ১. যদি সাক্ষ্যের জন্য ডাকা হয় তবে আসতে

অস্বীকার যেন না করে। ২. যদি এটি আদায় করার জন্য ডাকা হয় তবুও যেন আসতে অস্বীকার না করে।[৬৭] যদি তাকে লেখা এবং ঋণের সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয় তবে সে তা প্রত্যাখ্যান করবে না এবং বিরোধ বা অনুরূপ ঘটনা ঘটলে তাকে তা যাচাই করতে বলা হলে তিনি অস্বীকার করবেন না।

নিশ্চয়ই কুরআনের প্রতিটি নির্দেশ আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতিফলন। এখানে আল্লাহ তাআলা ঋণ সংক্রান্ত চুক্তি লিখতে অবহেলা না করতে বলেছেন, কারণ এটি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সুসংহত রাখা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক। আল্লাহ তাআলা বলেন:"এবং এতে ক্লান্ত হয়ো না যে, তা ছোট হোক বা বড়, নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত লিখে নাও।" (সূরা আল-বাকারা: ২৮২) এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে, লেনদেন ছোট হোক বা বড়, তা লিখে রাখা উচিত। এখানে "ছোট" শব্দটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে ছোট লেনদেনকেও অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ সাধারণত বড় লেনদেনের ক্ষেত্রে মানুষ সতর্ক থাকে, কিন্তু ছোট লেনদেনে উদাসীনতা দেখায়, যা পরবর্তীতে বিরোধ ও সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন "নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত", অর্থাৎ চুক্তির মেয়াদ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে, যেন ভবিষ্যতে কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা মতবিরোধ সৃষ্টি না হয়। এটি আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকলে দ্বন্দ্ব ও অবিচারের আশঙ্কা থাকে। এরপর আল্লাহ তাআলা লিখিত চুক্তি সংরক্ষণের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন: "এটি আল্লাহর কাছে অধিক ন্যায়সঙ্গত।" অর্থাৎ ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও শর্তাবলী লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা ন্যায়বিচারের অন্যতম মাধ্যম। "এটি সাক্ষ্যের জন্য অধিক সহায়ক।" অর্থাৎ লিখিত চুক্তি থাকলে সাক্ষ্যদান সহজ হয় এবং ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা কমে যায়।"এবং সন্দেহের অবকাশ কমায়।"অর্থাৎ স্পষ্টভাবে চুক্তি লিপিবদ্ধ থাকলে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সুযোগ

---

(৬৭) আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন: (৩/২৫৭)।

থাকে না, যা বিরোধ, কলহ ও পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে পারে। কুরআনের এই নির্দেশনা প্রমাণ করে যে ইসলামী শরিয়ত শুধু উপাসনার জন্য নয়, বরং মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকেও সুবিচার ও শান্তির ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চায়। তাই মুসলমানদের উচিত প্রতিটি আর্থিক লেনদেন ও চুক্তি লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা, যাতে সমাজে ন্যায়বিচার ও সম্প্রীতি বজায় থাকে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত মতবিরোধ এড়ানো যায়।

আর যখন পরিস্থিতি মানুষের মধ্যে দ্রুত বাণিজ্যের বাস্তবায়নকে কঠিন করে তোলে, তখন আল্লাহ তাআলা ব্যতিক্রম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন যা মহিমান্বিত কুরআনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে:"তবে যদি তা উপস্থিত বাণিজ্য হয়, যা তোমরা নিজেদের মধ্যে সরাসরি পরিচালনা কর, তবে তা লিপিবদ্ধ না করাতেও তোমাদের কোনো দোষ নেই" (সূরা আল-বাকারা: ২৮২)। অর্থাৎ, যদি লেনদেন হাতাহাতি করে নগদ ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়, তাহলে তা লিখতে না পারার কারণে কোনো সমস্যা নেই, কারণ এখানে ঋণ বা পাওনা পরিশোধে গড়িমসির ঝুঁকি নেই; বরং এটি সরাসরি আদান-প্রদান করা লেনদেন।

এরপর আয়াতে ক্রয়-বিক্রয় এবং সাক্ষী রাখার নির্দেশ এসেছে: **"আর যখন তোমরা পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় কর, তখন সাক্ষী রেখো"**। এখানে আল্লাহ তাআলা বেচাকেনার ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম ইবন কাসির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: এটি অধিকাংশ উলামার মতে উৎসাহ প্রদান (الإرشاد والندب) হিসেবে এসেছে, এটি আবশ্যকীয় নয়।এখানেই ফিকহী চিন্তার গভীরতা প্রতিফলিত হয়। কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন দলিলকে একত্র করে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমল দ্বারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে যে, এই আদেশটি বাধ্যতামূলক নয়, বরং এটি উৎসাহমূলক। নিঃসন্দেহে, এই ফিকহী বিশ্লেষণ সাধারণ বোঝাপড়া থেকে গভীর গবেষণা ও চিন্তাধারার দিকে নিয়ে যায়। এই আয়াতের ব্যাখ্যা ও ফিকহী বিশ্লেষণে

অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, আয়াতের এই অংশ: "ولا يضار كاتب ولا شهيد"। এর কয়েকটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা রয়েছে:

১. লেখক যা শোনে তাই লিখবে, তার ইচ্ছামতো কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করবে না, এবং সাক্ষীও তার সাক্ষ্যে কিছু কম-বেশি করবে না।

২. লেখককে লেখা থেকে বিরত রাখা যাবে না, আর সাক্ষীকে সাক্ষ্য দেওয়া থেকে বাধা দেওয়া যাবে না।

৩. লেখক ও সাক্ষী ব্যস্ত থাকলেও যদি তাদের ডাকা হয় এবং তারা অস্বীকৃতি জানায়, আর কেউ যদি তাদের বাধ্য করে ও কষ্ট দেয়, তাহলে এটি তাদের ক্ষতি করা হবে।

এই ধরনের বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে কুরআনের একটি শব্দ বা বাক্যাংশের বিভিন্ন সম্ভাব্য দিক বিবেচনা করে, উলামাগণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর ব্যাখ্যার মাধ্যমে সঠিক বিধান নির্ধারণ করেছেন।

পবিত্র কুরআনের ভাষাগত বিশুদ্ধতা ও অলঙ্কারশাস্ত্র এতটাই মহান যে, এক কথায় বা বাক্যে একাধিক অর্থ নিহিত থাকতে পারে। তবে প্রতিটি অর্থ পারস্পরিকভাবে ঘনিষ্ঠ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং নির্ভুলভাবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণ করে। অতীতেও এমন বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে, ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে। এরপর মহান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ এই আয়াতটি এক গভীর উপদেশ দিয়ে শেষ হয়। আল্লাহ বলেন: وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ অর্থ: "আর যদি তোমরা তা করো, তবে নিশ্চয়ই এটি তোমাদের জন্য পাপ।" অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করো অথবা নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদন করো, তবে তা তোমাদের জন্য অপরিহার্য পাপ হয়ে যাবে, যা তোমাদের ওপর আবশ্যকভাবে স্থির থাকবে এবং তোমরা তা থেকে মুক্তি পাবে না। "ফুসুক" অর্থ হলো আনুগত্য থেকে বিচ্যুতি, যা স্পষ্টতই আল্লাহর আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে একটি কঠোর সতর্কবার্তা। এরপর আল্লাহ তাকওয়ার নির্দেশ দেন: “তোমরা তাঁকে ভয় করো”, তাঁর আদেশ মান্য করো এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো।

তারপর তিনি বলেন:"وَيُعَلِّمكم الله অর্থ: এবং আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দেন।" (সূরা বাকারা: ২৮২) এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মানুষের কল্যাণকর জ্ঞান সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তিনিই তাঁর বান্দাদের সকল উপকারী জ্ঞান দান করেন এবং ভবিষ্যতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন হবে, তাও তিনি সহজ করে দেন। এর ফলে মানুষের উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাকওয়া অবলম্বন করা। কেননা তাকওয়া অর্জন করলে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের আরও জ্ঞান, দয়া ও হেদায়াত প্রদান করেন। এরপর তিনি বলেন: وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ অর্থ: "আর আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত।" অর্থাৎ, তিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থা ও সকল বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত, তাঁর নিকট কিছুই গোপন থাকে না। আয়াতের শেষাংশে এটিই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

অর্থ: **[যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তাহলে বন্ধক রাখার জিনিসগুলো অন্যের দখলে রাখতে হবে, যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে সে যেন আমানত ফিরিয়ে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে ব্যক্তি তা গোপন করে, তার অন্তর পাপী। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।]** (আয়াত নং: ২৮৩)

এখানে এমন একটি অবস্থা উল্লেখ হয়েছে যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা সফরে থাকতে পারেন; "যদি তোমরা সফরে থাক"। এখান থেকে বোঝা যায় যে, কুরআনের বিধান কতটা পরিপূর্ণ ও বিস্তৃত। এতে মানুষের জীবনের সম্ভাব্য প্রতিটি অবস্থার দিকনির্দেশনা

দেওয়া হয়েছে। এমন নিখুঁত ও সার্বিক বিধান একমাত্র আল্লাহর ওহী ব্যতীত সম্ভব নয়। কারণ এটি ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল সম্ভাব্য পরিস্থিতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আল্লাহ বলেন: وَاِنۡ كُنۡتُمۡ عَلٰى سَفَرٍ وَّ لَمۡ تَجِدُوۡا كَاتِبًا অর্থ: "আর যদি তোমরা সফরে থাকো এবং কোনো লেখক না পাও।"অর্থাৎ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে যখন চুক্তি লিখে রাখার জন্য কেউ উপস্থিত থাকবে না। কুরআন এ সম্ভাবনাকেও বিবেচনায় নিয়েছে এবং তার জন্য যথাযথ সমাধান প্রদান করেছে। এই বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন লেনদেন ঋণের ভিত্তিতে সম্পাদিত হবে এবং লেখার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন: খাতা ও কলম বা লেখক অনুপস্থিত থাকবে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান নির্দেশনা, যা মানুষের প্রতিটি অবস্থা ও প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের পণ গ্রহণের দিকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন তিনি বলেছেন: ((فرهان مقبوضة) অর্থাৎ, লিখিত দলিলের পরিবর্তে, পণ এমনভাবে গ্রহণ করা হয় যে, ঋণদাতা তা থেকে সুবিধা নিতে পারে। এটি ঋণগ্রহীতা বা দেউলিয়া ক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রেতাকে দেওয়া পণকে নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এটি বিক্রয় বিষয়ে শরীয়তের এক নিখুঁত দিক, যা মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এমন পরিস্থিতি হতে পারে যখন মানুষ বাসস্থানে বা যাত্রার সময় অথবা পুরো মূল্য পরিশোধ করতে অসমর্থ হয়, অথবা লিখিত দলিলের অভাব থাকে। তখন বিক্রেতা ও ক্রেতার স্বার্থ থেমে থাকে না, বরং অধিকারীকে তার অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সেই সম্পর্ক পূর্ণতা লাভ করে। এরপর আল্লাহ তাঁর নির্দেশনা পরিবর্তন করে বলেন, "তাহলে যদি তোমাদের মধ্যে কেউ কাউকে নিরাপত্তা দেয়"। এখানে উভয় পক্ষের মধ্যে নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা বজায় থাকার অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা বিশ্বাসের সঙ্গে আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে। তাই আল্লাহ উভয় পক্ষকে তাৎক্ষণিকভাবে চুক্তি লিখতে বা জামিন দিতে নিষেধ করেন এবং একে অপরকে পূর্ণ সম্মান ও দায়িত্ব পালনে নির্দেশ দেন। তাই ঋণী ব্যক্তি (ক্রেতা বা দেউলিয়া) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার ঋণ

পরিশোধ করবে। এখানে আল্লাহ ক্রেতাকে (ঋণী বা দেউলিয়া) "অত্মীয়" (যাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার বিশ্বাসের প্রতি দায়িত্বশীল। এবং আল্লাহ ঋণকে "অত্মীয়তা" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যা খুবই প্রখরভাবে এবং শক্তিশালীভাবে এটি পূর্ণতার দিকে নির্দেশ করে, যেন এটি একজন বিশ্বাসী হিসেবে পালন করতে হবে। তারপর আল্লাহ তাঁকে "সে যেন তাঁর প্রভুর প্রতি ভয় করে" (এটা তার কর্তব্য পালন করার জন্য নির্দেশ)। এখানে আল্লাহ তাঁকে তাঁর প্রভু (যিনি মালিক এবং সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন) এর ভয় থাকতে বলেন, যাতে তিনি তাঁর প্রভুর নির্দেশ পালন করেন। এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী , প্রভাবশালী সতর্কতা ও উপদেশ, যা আল্লাহর মহিমা এবং কুরআন সম্পর্কে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শেখায়।

এটি এমন একটি উপদেশের পরিপূরক যা আল্লাহর এই আয়াতে পরিস্ফুটিত হয়েছে: (আর সাক্ষ্য গোপন কোরো না)। এটি সাক্ষীকে সাক্ষ্য গোপন করার বা তা প্রকাশ না করার বিষয়ে নিষেধ করা, যেন তার সত্যতা লুকিয়ে রাখা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (যে তা গোপন করবে, তার অন্তর একধরনের দুষ্ট হয়ে যাবে)। শাইখ সুদ্দী (রহ.) বলেছেন: "এখানে অন্তর বলতে দুষ্ট অন্তর বোঝানো হয়েছে।" (১) অর্থাৎ তাকে দুষ্ট হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং অন্তরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ এটি আস্থার মূল কেন্দ্র, যা এখান থেকে উদ্ভূত হয় বা সেখানে দুর্বল বা গোপন থাকে। এই উপদেশে এটা পরিষ্কার হয় যে, সাক্ষ্য বা অন্য কোনো আস্থার ক্ষতি অন্তরে ঘটে, যা তার দুষ্টতা ও অশুদ্ধতার লক্ষণ। আর সাক্ষ্য বা অন্য আস্থার সঠিকভাবে পালন করা অন্তরের নৈতিকতা এবং পবিত্রতার প্রমাণ, কারণ অন্তরই মানুষের আস্থার মূলস্থল।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (والله بما تعملون عليم) অর্থাৎ, "আল্লাহ তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে জানেন।" আল্লাহর কাছে মানবজাতি কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টির কোনো কাজই অজানা নয়। এটি আমাদেরকে সতর্ক থাকতে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে

উৎসাহিত করে, যাতে আমরা এমন কিছু না করি যা আল্লাহ জানেন এবং তা পাপ বা অন্য কোনো ভুল হতে পারে। আল্লাহর জ্ঞান উপলব্ধি করা মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি তাকে আনুগত্যে বাধ্য করে এবং পাপ থেকে দূরে থাকতে সহায়ক হয়। যখন কখনো তার মনে পাপ করার ইচ্ছা আসে, তখন তাকে আল্লাহর জানা বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (والله بما تعملون عليم) এটি একটি মৌলিক নিয়ম, যা মানুষের আচরণ এবং সুষ্ঠু কর্মের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। যদি তার মনে কোনো পাপ করার চিন্তা আসে, তখন সে নিজেকে বলবে, "আল্লাহ জানেন তোমরা কি কাজ করো," যদি সে শিথিল হতে চায়, তখনও সে এই কথা মনে করবে, "আল্লাহ জানেন তোমরা কি কাজ করো," যদি সে ভালো কিছু করার ইচ্ছা করে, তখন সে নিজেকে উৎসাহিত করবে, "আল্লাহ জানেন তোমরা কি কাজ করো," এবং যদি সে ভালো কাজের বিষয়ে সন্দিহান হয়, তখনও এই চিন্তা তাকে সাহায্য করবে, "আল্লাহ জানেন তোমরা কি কাজ করো।" এই ধারণাটি তাকে ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করবে এবং পাপ থেকে রক্ষা করবে, আল্লাহর সাহায্য ও ইচ্ছায়। এছাড়াও, কুরআনে বাণিজ্য, লেনদেন এবং ঋণ সম্পর্কিত আল্লাহর যত্নশীল নির্দেশনা রয়েছে, যা ব্যবসা ও কেনাবেচাকে সম্মানিত ও উৎসাহিত করে, কারণ এতে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক উপকারিতা ও সহযোগিতা নিহিত রয়েছে, এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর কাছে পছন্দনীয় দানে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এটি কর্মের গুরুত্ব এবং অলসতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়, এবং ইসলামের বিধানসমূহ মানবিক সক্ষমতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ সাধনের পথ দেখায়। কুরআনের দীর্ঘতম সূরার মধ্যে থাকা সবচেয়ে বড় আয়াতে বাণিজ্য, লেনদেন, ঋণ এবং জামিন সংক্রান্ত বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সকল বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

﴿لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ أَوۡ تُخۡفُوهُ يُحَاسِبۡكُم بِهِ ٱللَّهُۖ فَيَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٢٨٤ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨٥ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦﴾

অর্থ: **[আল্লাহর জন্যই যা রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা রয়েছে যমীনে। আর তোমরা যদি প্রকাশ কর যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে অথবা গোপন কর, আল্লাহ সে বিষয়ে তোমাদের হিসাব নেবেন। অতঃপর তিনি যাকে চান ক্ষমা করবেন, আর যাকে চান আযাব দেবেন। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।* রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।* আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর**

দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।] *(*আয়াত নং*:* ২৮৪-২৮৬*)*

পবিত্র সূরাটির এবারের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার রাজত্ব, ঈমানি বিষয়াদি, মাগফিরাত এবং অনুগ্রহের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, **"আল্লাহর জন্যই যা রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা রয়েছে যমীনে।"** এই কথার মাধ্যমে তিনি নিজের সত্তা এবং রাজত্বের বিশালতা তুলে ধরেন। আল্লাহর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী, সমস্ত সৃষ্টির উপাদান, তাদের পরিচালনা, জ্ঞান এবং অধিকার—সবকিছুই আল্লাহর হাতেই। এমনকি মানুষের অন্তরে যা কিছু লুকানো থাকে, যা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে ঘটে, তা সবকিছুই আল্লাহ জানেন এবং তাঁরই কাছে এর হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, **"আর তোমরা যদি প্রকাশ কর যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে অথবা গোপন কর, আল্লাহ সে বিষয়ে তোমাদের হিসাব নেবেন।"** এই আয়াত আল্লাহর অসীম জ্ঞানের প্রমাণ বহন করে এবং আখিরাত ও হিসাবের দিনের বাস্তবতা প্রমাণ করে। এটি প্রমাণ করে যে আল্লাহ তাআলাই বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও একমাত্র রাজা, যিনি সবকিছু পরিচালনা করেন, যাঁর কাছে সমস্ত জ্ঞান রয়েছে এবং যাঁর কাছে কোনো কিছুই গোপন নয়। আল্লাহ তাআলা জানেন, যারা শত্রুতা বা মুনাফিকির সাথে বিশ্বাসের আচরণ করে কিংবা যারা কেবল রিয়া ও লোকদেখানোর জন্য ভালো কাজ করে। তিনি জানেন, যারা অন্তরে সৎ মনোভাব নিয়ে কোনো কাজ করতে চায়, কিন্তু শারীরিকভাবে তা করতে পারে না—যেমন, কেউ জানার পরেও সময়মতো তার নামাজ আদায় করতে অক্ষম হয়। আল্লাহ তাআলা তার অন্তরের ইচ্ছা ও সংকল্পও জানেন। সুতরাং, এটি সুস্পষ্ট যে আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন, সবকিছু দেখেন এবং তাঁর কাছে কিছুই গোপন নয়। এর মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য এটি একটি শিক্ষা যে, তারা আল্লাহর গোলাম এবং তাদের যা কিছু আছে, তা আল্লাহর রাজত্বের অংশ। তাদের যা কিছু সম্পদ রয়েছে, তা আল্লাহর তত্ত্বাবধানে, এবং আল্লাহ তাআলা

তাদের সে সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে সাহায্য করেন। এই উপলব্ধি মুসলমানদের আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, ভয় ও সাহায্য কামনা এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করতে উদ্বুদ্ধ করে।

এই আয়াতে মহান আল্লাহর ক্ষমা এবং মাফ করার অধিকার সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। "**তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন।**" আল্লাহর বিচারের কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই, এবং তাঁর সিদ্ধান্তে কোনো বাধা আসতে পারে না। তিনি সমগ্র সৃষ্টির ওপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন, এবং তাঁর জ্ঞানের আওতায় সবকিছু বিদ্যমান। আয়াতটি আল্লাহর মাফ করার অসীম ক্ষমার প্রমাণ বহন করে এবং বান্দার জন্য আল্লাহর অনুগ্রহের একটি শক্তিশালী ইঙ্গিত দেয়। যতই পাপ হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা যদি চান, তবে তা মাফ করবেন। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশালী। এই উপলব্ধি মুসলমানদের আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনায় উদ্বুদ্ধ করে। এমনকি পাপ বা গুনাহ যত বড়ই হোক, আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন—এই আশায় কখনো হতাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তাআলার এই বাক্য **"لمن يشاء"** (অর্থাৎ, যাকে তিনি চান) নির্দেশ করে যে, ক্ষমা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। বান্দার আচরণও তাঁর ইচ্ছার অধীন, কারণ বান্দা জানে না সে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত হবে কি না, অথবা সে সেই ব্যক্তি হবে যার পাপ কখনো মাফ হবে না। তাই একজন মুমিনকে সর্বদা আনুগত্য, তাওবা এবং পাপ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে, যেন সে পাপাচারে লিপ্ত না হয়। তবে আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও রহমত সবকিছুর ঊর্ধ্বে, যেমনটি ইসলামী শরীয়তে বর্ণিত হয়েছে; হাদিসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ বলেন: **" أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني"** অর্থাৎ, **"আমি আমার বান্দার ধারণার সাথে আছি, এবং সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথে থাকি।"** (সহীহ বুখারী)

এই আয়াতটি যখন নাজিল হয়েছিল, তখন সাহাবিদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল, কারণ এতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, অন্তরের সব বিষয় হিসাব করা

হবে। আবু হুরাইরা রা. বলেন, যখন এই আয়াতটি রাসুলুল্লাহ সা. এর প্রতি নাজিল হয়েছিল, যেখানে আল্লাহ বলেছেন: **"আল্লাহর জন্যই যা রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা রয়েছে যমীনে। আর তোমরা যদি প্রকাশ কর যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে অথবা গোপন কর, আল্লাহ সে বিষয়ে তোমাদের হিসাব নেবেন। অতঃপর তিনি যাকে চান ক্ষমা করবেন, আর যাকে চান আযাব দেবেন। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"** তখন সাহাবাদের জন্য এটি কঠিন হয়ে উঠেছিল। তারা রাসুলুল্লাহ সা. এর কাছে এসে বললেন: "আমাদের উপর অনেক বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে যা আমরা সইতে পারি না, যেমন নামাজ, রোজা, যাকাত, জিহাদ এবং দান, আর এখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে যা আমাদের জন্য বহন করা কঠিন।" তখন রাসুলুল্লাহ সা. তাদের বললেন: **"তোমরা কি তোমাদের পূর্বসূরী জাতি আহলে কিতাবদের মতো বলতে চাও, তারা তো বলেছিল, 'আমরা শুনেছি এবং অবাধ্য হয়েছি'? বরং বলো: 'আমরা শুনেছি এবং তা মেনে নিয়েছি, আমাদের ক্ষমা করো হে রব, এবং আমাদের প্রত্যাবর্তন তো তোমারই কাছে।'"** তখন সাহাবীরা একসঙ্গে এটিকে মেনে নেন এবং তাদের মুখে এটি স্বীকৃত হয়ে যায়। এরপর আল্লাহ তাআলা আরও দুটি আয়াত নাজিল করেন: **"ঈমান এনেছে রসূল যা তার রবের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং ঈমান এনেছে মুমিনগণ..."** এবং: **"আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে..."**

এই দুটি আয়াত সাহাবিদের জন্য প্রশান্তি ও সমর্থনের উৎস হয়ে উঠল। কারণ, এতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করলেন যে, তিনি বান্দার ওপর এমন কোনো বোঝা চাপাবেন না যা তাদের সাধ্যের বাইরে। এছাড়া, এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সম্মানিত করেছেন এবং তাদেরকে তাঁর নবীর সাথে ঈমান আনার জন্য বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তাঁদের উদ্বেগ দূর করেছেন এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রকৃত ঈমানদারগণ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর সকল

রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। তারা কোনো নবী বা রাসুলের মধ্যে পার্থক্য করে না। এটি তাদের ঈমানের সুস্পষ্ট প্রমাণ, যা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করতে চায়, তাদের জন্যও প্রযোজ্য। তারা বলে: **"আমরা শুনলাম এবং মানলাম।"** এটি মুসলমানদের প্রকৃত আদর্শ—আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাঃ-এর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা। সুতরাং, প্রকৃত মুমিনরা আল্লাহর কোনো আদেশ বা নিষেধকে নিজেদের মতামত বা ইচ্ছা দ্বারা প্রত্যাখ্যান করবে না, বরং বিনম্রভাবে বলবে: "আমরা শুনলাম এবং মানলাম।"

অতএব, "আমরা শুনলাম এবং মানলাম।" হলো মুসলমানের মৌলিক নীতিমালা। যদি তার হৃদয়ে আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তবে সে বলবে, "আমরা শুনলাম এবং মানলাম।" যদি শয়তান বা কোনো মানুষ তাকে মন্দ পরামর্শ দেয়, তবে সে বলবে, "আমরা শুনলাম এবং মানলাম।" যদি সে এমন কিছু শোনে যা আল্লাহর কিতাব বা রাসুল সাঃ-এর সুন্নাহর বিপরীত হয়, তবে সে এতে আশ্রয় নেবে এবং বলবে, "আমরা শুনলাম এবং মানলাম।" যদি কেউ আল্লাহর শরিয়াহ নিয়ে বিতর্ক করে, তবে সে দৃঢ়ভাবে বলবে, "আমরা শুনলাম এবং মানলাম।" এটাই তাকে আল্লাহর বিধানের বিপরীত কিছু মোকাবিলা করার শক্তি দেবে।

এছাড়া, মুমিনরা বলেন: **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ভুলগুলো ক্ষমা করুন, এবং আপনার দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।"** এখানে তারা আল্লাহর কাছে নিজেদের গুনাহ ও ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং নিশ্চিত করে যে, একদিন তাদের তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। এটি সেইসব মুমিনদের জন্য শক্তি যোগায়, যারা নিজেদের অবহেলা বা ভুল বুঝতে পারে এবং বারবার বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ক্ষমা করুন এবং আপনার দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।" যদি কোনো গুনাহ

সংঘটিত হয়, তবে তারা মনে করে এবং বলে, "হে আমাদের প্রভু! আমাদের ক্ষমা করুন এবং আপনার দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।"

এভাবে, আল্লাহ তাআলা বলেন: **"আল্লাহ কোনো ব্যক্তির ওপর তার সামর্থ্যের বেশি কিছু চাপান না।"** এটি আল্লাহর অশেষ দয়ার নিদর্শন যে, তিনি তাঁর শরিয়তে এমন কিছু আরোপ করেননি যা মানুষের সাধ্যের বাইরে। বরং তিনি মানুষের অবস্থা অনুযায়ী তাঁদের জন্য সাহায্য ও ক্ষমার ব্যবস্থা রেখেছেন। যেমন, রমজানে অসুস্থদের জন্য রোজার বিকল্প, যারা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে অক্ষম তাদের জন্য বসে নামাজ পড়ার অনুমতি, ভুলক্রমে নামাজে কোনো ভুল হলে তা সংশোধনের জন্য সিজদা সাহু ইত্যাদি। আল্লাহ কাউকেই তার সামর্থ্যের বাইরে কিছু করতে বাধ্য করেন না, কারণ তিনি প্রতিটি সৃষ্টির শক্তি ও সক্ষমতা সম্পর্কে অবগত। তিনি জানেন, কোন পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তি তাঁর আদেশ পালন করতে পারবে এবং কার জন্য কী পরিমাণ সহজ বা কঠিন। তিনি মুমিন, দরিদ্র, ভীত বা নিরীহ—সকলের অবস্থাই জানেন এবং তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী দায়িত্ব দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: **" لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ।"** অর্থাৎ, **"মানুষ যে সৎকর্ম করবে, তা তার জন্যই, এবং যে পাপ করবে, তার দায়ভারও তার ওপরই বর্তাবে।"** এতে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজ কর্মের জন্য দায়বদ্ধ। আল্লাহ কারও প্রতি অন্যায় বা অবিচার করেন না। এই উপলব্ধি একজন মানুষকে তার ভুল থেকে সতর্ক করবে এবং সৎ কাজ করার জন্য আরও অনুপ্রাণিত করবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা হলো যে, আল্লাহ তাআলা কুরআনে **"كَسَبَ"** (অর্জন) শব্দের সঙ্গে সরাসরি সৎকর্ম বা পাপ শব্দ উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বলেছেন: **" لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ"** অর্থাৎ, "যা সে অর্জন করেছে, তা তার জন্য; আর যা

উপার্জন করেছে, তার দায়ভার তার ওপর।" এখানে কুরআনের শব্দ ব্যবহারের একটি সূক্ষ্মতা রয়েছে। **"كَسَبَ"** (সাধারণ অর্জন) যদি ভালো হয়, তাহলে তার সুফল অর্জনকারীর জন্য হয়। আর **"اِكْتَسَبَ"** (সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে উপার্জন) যদি পাপ হয়, তাহলে তার শাস্তি তার ওপর বর্তাবে। তাই এখানে আলাদা করে "ভাল" বা "পাপ" শব্দ উল্লেখের প্রয়োজন হয়নি। এটি কুরআনের বাচনশৈলীর সৌন্দর্য, যেখানে অপ্রয়োজনীয় শব্দ বাদ দিয়ে গভীর অর্থবহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া শিখিয়েছেন: **" رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا"** অর্থাৎ, "হে আমাদের রব! যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ভুল করে ফেলি, তাহলে আমাদের শাস্তি দিয়ো না।" এটি আল্লাহ তাআলার কৃপা ও দয়ার পরিচায়ক, কারণ মানুষ কখনো ভুল থেকে মুক্ত নয়, এবং বিস্মৃতি তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। এই ভুলের কারণে অনেক সময় সে আল্লাহর আদেশ পালন করতে ব্যর্থ হয় এবং সৎকর্মের পথে পিছিয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের এই দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা ভুল করলে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে। এরপর আল্লাহ তাআলা বান্দাদের এমন আরেকটি দোয়া শিখিয়েছেন, যাতে তাঁরা কঠিন বোঝা থেকে মুক্তির জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারে: **" رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا"** অর্থাৎ, "হে আমাদের রব! আমাদের ওপর এমন বোঝা দিয়ো না, যেমন তুমি পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ওপর দিয়েছিলে।" এই দোয়ার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমাদের ওপর অতিরিক্ত কঠিন কোনো বিধান চাপিয়ে না দেন, যা আমাদের জন্য কষ্টকর হবে। পূর্ববর্তী কিছু জাতির ওপর কঠোর বিধান ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে সহজ বিধানের মাধ্যমে কুরআনের মধ্যে দয়া ও সহজতা দান করেছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা শিখিয়েছেন: **" رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ"** অর্থাৎ, "হে আমাদের রব! আমাদের এমন কোনো বোঝা দিয়ো না,

যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।" এই দোয়ার মাধ্যমে বান্দারা আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়, যেন তিনি তাদের এমন কোনো কঠিন পরীক্ষা বা বিপদের সম্মুখীন না করেন, যা তাদের সহ্যশক্তির বাইরে চলে যায়।

আল্লাহ যখন তাঁর বান্দাদের এই মহামূল্যবান দোয়া শিখিয়েছেন, তা প্রমাণ করে যে, তিনি অত্যন্ত দয়ালু। তিনি বান্দাদের জন্য কষ্ট, দুর্ভোগ বা বিপদ চান না। বরং তিনি চান যে, বান্দারা তাঁর কাছে প্রার্থনা করুক, তাঁর ওপর নির্ভর করুক এবং তাঁর সাহায্য কামনা করুক। এরপর এই দোয়ার শেষ অংশে বলা হয়েছে: **" وَاعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا"** এখানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অনুরোধ করা হয়েছে: **"وَاعْفُ عَنَّا"** অর্থাৎ, আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও এবং তার জন্য আমাদের শাস্তি দিও না। **"وَٱغْفِرْ لَنَا"** অর্থাৎ, আমাদের পাপ ঢেকে দাও এবং আমাদের সম্পূর্ণ ক্ষমা করো। "মাগফিরাত" মানে হলো, পাপ ঢেকে রাখা এবং শাস্তি থেকে রক্ষা করা। **"وَٱرْحَمْنَا"** অর্থাৎ, আমাদের প্রতি দয়া করো, আমাদের কল্যাণ দান করো এবং আমাদের এমন কিছু থেকে রক্ষা করো যা আবারও গুনাহের দিকে ধাবিত করে। এরপর বলা হয়েছে: **"أَنتَ مَوْلَانَا"** অর্থাৎ, তুমি আমাদের অভিভাবক, সহায়ক ও রক্ষাকর্তা। **"فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ"** অর্থাৎ, তাহলে আমাদের সাহায্য করো, তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমার দ্বীনকে অস্বীকার করে এবং তোমার একত্ববাদ ও নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর নবুয়তের সত্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে। এতে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহই একমাত্র ক্ষমাশীল, যিনি সত্যিকার অর্থে বান্দাকে ক্ষমা করেন। যাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়, তিনি ছাড়া অন্য কারও ক্ষমা চাওয়ার কোনো অর্থ নেই। তিনি দয়ালু, যাঁর দয়া ছাড়া বান্দার কোনো পথ নেই। এবং তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী, যার কাছে প্রতিটি কাজে সাহায্য চাওয়া হয়। তাই একজন মুমিন সর্বদা তাঁর দয়ার আশ্রয়ে থাকে, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাঁর সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানায়।

এর ফায়েদাগুলোর মধ্যে রয়েছে বহু অর্থবোধক দোয়া শেখানো। এটি বান্দাদের জন্য আল্লাহর রহমতের অন্তর্ভুক্ত যে, তিনি তাদেরকে শিখিয়েছেন যে, কীভাবে বহু অর্থবোধক, সর্বোত্তম ও সর্বাধিক পরিপূর্ণ দোয়া সহ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে হয়। তাছাড়া এই দুটি আয়াতের ফায়েদার অন্তর্ভুক্ত হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী: "**সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত যে ব্যক্তি কোন রাতে তিলাওয়াত করবে, আয়াত দুটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।**" (সহীহ বুখারী)। অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন: "**সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত, যা আমাকে আরশের নিচের ভান্ডার থেকে দান করা হয়েছে, আমার পূর্বে কোনো নবীকে তা দেওয়া হয়নি।**" (মুসনাদে আহমাদ)। অপর হাদিসে রয়েছে: "**যে ঘরে তিন রাত ঐ দুটি আয়াত তেলাওয়াত করা হবে, সে ঘরে শয়তান নিকটবর্তী হতে পারবে না।**" (তিরমিযি)।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত। আর আমাদের ক্ষমা করুন, কারণ আপনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রথম খন্ডের কাজ শেষ হলো।

আল্লাহর ইচ্ছায় এর পরে দ্বিতীয় খণ্ড আসবে।